ম্যাকসিম গর্কি

মা

: প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড :

অনুবাদ : পুষ্পময়ী বসু

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি লিঃ
কলিকাতা ১২

প্রথম সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪ ॥

ম্যাকসিম গর্কির মাদার
মূল রুশভাষা থেকে ইংরেজি অনুবাদ : মার্গারেট ওয়েটলিন্ ॥
ইংরেজি সংস্করণের প্রকাশক : ফরেন ল্যাঙ্গোয়েজেস পাবলিশিং হাউস, মস্কো ॥

পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ : পদ্মময়ী বসু ॥

প্রচ্ছদপট : খালেদ চৌধুরী ॥

প্রকাশক : সুরেন দত্ত ॥
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি লিঃ
১২ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা ১২ ॥

মুদ্রক : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিঃ,
৫ চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা ৯

শোভন সংস্করণ : চার টাকা।
সুলভ সংস্করণ : আড়াই টাকা ॥

প্রথম খণ্ড

এক

রোজ রোজই সেই এক—সেই ভোর না হতেই কারখানার বাঁশীটার কাঁপা কাঁপা বিশ্রী চীৎকার... কুলি-বস্তির গুমোট তেলচিটে আকাশটা আঁত্‌কে ওঠে। ও তো ডাক নয় যেন সমন। পেশীগুলো চাঙ্গা হয়ে ওঠার আগেই আধ-পথে ওদের ঘুম ভেঙ্গে যায়। ধড়্‌ফড়্‌ ক'রে উঠে ধোঁয়াটে খুপরিগুলো থেকে আঁধার মুখে মানুষ-গুলো কিলবিল করতে করতে বেরিয়ে আসে ভয়-খাওয়া আরশোলার মত। কন্‌কনে ঠাণ্ডা; রাতের আঁধার তখনও লেগে থাকে ভোরের গায়ে। এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো রাস্তাটা দিয়ে হন্‌হনিয়ে ছোটে ওরা। কারখানার উঁচু উঁচু পাথুরে খুপ্‌রিগুলো ওদেরই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে তাচ্ছিল্য-ভরা আত্ম-প্রত্যয়ে। তাদের সার-বাঁধা চৌকো চৌকো তৈলাক্ত চোখের আলো পড়ে এঁদো রাস্তাটার ওপর। মানুষগুলোর পায়ের তলায় কাদা ছপ্‌ছপ্‌ করে। কর্কশ, মোটা, ঘুম-জড়ান কণ্ঠের গালাগালি আর শাপ-মন্যির তোড়ে বায়ুমণ্ডল যেন ককিয়ে ওঠে। কিন্তু সব ছাপিয়ে লোকগুলোর কানে বাজে কারখানার যন্ত্র-দানবের গর্জন আর বাষ্পের ভস্‌ভসানি। কুলিবস্তির ওপর দিয়ে মাথা উঁচিয়ে এমনি একটা সর্বনেশে ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে চিমনিগুলো যে দেখলে ভয় করে। মনে হয় যেন কাদের হাতের মোটা মোটা উঁচানো গদা।

তারপর যখন সন্ধ্যে হয়, পড়ন্ত সূর্যের ক্লান্ত ছায়া এলিয়ে পড়ে জানলায় জানলায়, পোড়া-কয়লার ছাইয়ের মত ক'রে কারখানাটা তার পাথুরে উদর থেকে মানুষগুলোকে উগ্‌রে ফেলে। আবার সেই নোংরা রাস্তা বেয়ে কালো কালো কঠোর মুখের মিছিল; ক্ষুধার্ত ঠোঁটের ফাঁকে দাঁতগুলো ঝিলিক দেয়। কলের তেল কালির গন্ধ বেরয় চট্‌চটে গা দিয়ে। কিন্তু এবেলা ওরা বেশ ছল্‌ছলিয়ে চলে; গলার স্বরের মধ্যেও স্ফূর্তির সুর—আজের মত খাটুনি সারা। এখন ব্যস্‌ ঘরে ফিরে, কিছু গিলে দেহ এলিয়ে দেওয়া।

ওদের দিনগুলোকে গিলে খায় কারখানা; আর দেহের শক্তি নিংড়ে নিংড়ে যতটা পারে শুষে নেয় যন্ত্র-দানব। একটা একটা ক'রে দিন এমনি ক'রে যায়—একেবারে মুছেই যায় নিশ্চিহ্ন হ'য়ে, আর এক পৈঠে ক'রে মানুষগুলোর পা এগোয় কবরের দিকে। কিন্তু তা হোক—এখনকার মত তো দেহটা বিশ্রাম পাবে। সেই আশায়, আর ধোঁয়া-ভরা মদের আড্ডার কল্পনায় ওদের মনে এখন রং-ধরা।

রবিবারদিন ঘুম ভাঙতে বেলা দশটা। বিয়ে-থাওয়া-করা সংসারী গেরস্ত গোছের যারা তারা উঠে পোষাকী কাপড় পরে গির্জায় যায় আর ধর্মে মতি নেই বলে গাল দিতে থাকে ছেলে-ছোকরাদের। উপাসনার পর বাড়ী ফিরে পিরোগি* খেয়ে আবার লম্বা ঘুম সেই সন্ধ্যে অবধি।

বছরের পর বছর হাড়-ভাঙা খাটুনিতে দেহটা ক্ষয়ে ক্ষয়ে ওদের ক্ষিদেও মরে যায়। মদ খেয়ে ভোঁতা ক্ষিদেটাকে শান দিতে যায়। কিন্তু কড়া ভদ্‌কার ঝাঁকে পেটের মরা নাড়ীগুলো চিড়্‌বিড়িয়ে ওঠে।

* পিরোগি—পিঠে-জাতীয় এক রকম খাবার জিনিস।

সন্ধ্যের সময় একটু বেড়াতেও যায়। বেরুবার সময় বর্ষাতি জুতো থাকলে ওটাই পরে বেরুবে, হোক না রাস্তা খট্‌খটে শুকনো। আর ছাতা থাকলে জল রোদ্দুর না থাকলেও তা মাথায় দিয়ে বেরুনো চাই।

কারো সাথে দেখা সাক্ষাৎ হ'লে সেই একই কথা—কারখানা, কাজ আর ফোরম্যান...। অর্থাৎ কারখানার চার দেয়াল ডিঙিয়ে যায়না ওদের আলাপ। পান্‌সে, একঘেয়ে দিন। এরই মধ্যে কদাচিৎ কখনও বা এক-আধটা, অতি ক্ষীণ, ভীরু চিন্তার ঝল্‌কি ঝলক্ দিয়ে যায়।

বাড়ী ফিরে ওরা বৌকে ঠেঙিয়ে হাতের সুখ করে। চ্যাংড়ারা মদের আড্ডায় যায়; অথবা পালা ক'রে বন্ধু-বান্ধবের বাড়ী আড্ডা দেয়,—হল্লা ক'রে, অশ্লীল গান গেয়ে, নেচে, গালাগালি দিয়ে আর ক'ষে মদ খেয়ে। ভেতর-ফাঁপা দেহ সইতে পারে না। নেশা ধরে সহজেই। কিন্তু কি যেন একটা অজানা ফরিয়াদ বুকের মধ্যে জ্বলতে থাকে সব কিছুর তলায়, বেরুবার পথ পায়না। মনের জ্বালায় তারা নিজেরাই খেয়ো-খেয়ি করে পাশব হিংস্রতায়, কথায় কথায় হাতাহাতি, রক্তারক্তি, হাত-পা-মাথা ভাঙ্গা, খুনোখুনি পর্যন্ত।

মানুষের সাথে মানুষের সহজ সম্পর্কটুকু ওদের বেলায় কি যেন এক বিদ্বেষে বিষিয়ে থাকে। ও বিষ ওদের চোদ্দপুরুষের; ওদের দেহের অনপনেয় ক্লান্তির মতোই ও বিষ আদিম ও অক্ষয় হয়ে আছে রক্তের মধ্যে। হয়ত কালো ছায়ার মতো একেবারে কবর পর্যন্ত অনুসরণ করবে। ওই বিষের জ্বালায়ই ওরা ক্রূর, ওরা ভয়ংকর। ইচ্ছে ক'রে নয়।

রবিবারগুলোয় ছোকরারা অনেক রাত্তিরে মাতাল হয়ে বাড়ী ফেরে ছেঁড়া কাপড়ে, সর্বাঙ্গ ধুলো-কাদায় লুটোপুটি হয়ে; কালসিটে-পড়া-চোখ, জখমী নাক, কখনও বন্ধুদের ঠেঙিয়ে এসে বিদ্বেষের সঙ্গে আস্ফালন করে, আর নয়তো গুঁতোনি খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে আসে, গোমড়া মুখে গজরায়, কিংবা চোখ লাল করে গর্জায়—মাতাল, করুণ, অসহায় আর ন্যক্কারজনক মানুষগুলো। কোন কোন দিন ছেলেরা বাড়ীই ফেরে না; পাঁড় মাতাল হয়ে প'ড়ে থাকে রাস্তার ধারে বেড়ার আড়ালে নয় আড্ডাখানার মেঝেয়। বাপ মা খুঁজে পেতে কুড়িয়ে আনে। বড়রা যাচ্ছে-তাই ক'রে গালি-গালাজ করে; তাদের ভদকায় ঠাসা গতরগুলোর উপর ঠ্যাঙ্গানি লাগায়। কিন্তু বড় ভাবনাও হয়। ধরে নিয়ে বিছানায় ফেলে ওদের। পরের দিন সাত সকালে কারখানার বাঁশীটা যখন ভোরের আলো ঠেলে আঁধারের ঢেউয়ের মত তেড়ে-ফুঁড়ে আসে, তখন আবার ওদের ঠেলে ঠুলে তুলে দেয়।

ছেলে-পুলের ওপরও ওদের মায়া দয়া নেই। জল্লাদের মত মারে, হাজার বার যমের বাড়ী পাঠায়। ছেলেরা নেশা করে, মারামারি করে—ক'রবেই; নিজেরাও করেছে যখন চ্যাংড়া ছিল; বাপ মায়ের কাছে এমনি ঠ্যাঙ্গানিও তারা খেয়েছে। এমনি ভাবেই তো চলে এসেছে ওদের জীবন—একটানা ঢিমে ঢিলে স্রোতে গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে বছরের পর বছর তার ঘোলা জল, আদ্যি কালের পুরানো মন, চাল-চলন আর রীত-করণের পাড়-বাঁধা হ'য়ে। অনেক গভীরে শিকড় চালিয়েছে তাদের এই দৈনন্দিন একঘেয়ে কাজ আর চিন্তার অভ্যাস।

মাঝে মাঝে বস্তিতে ভিন্ জায়গা হ'তে মানুষ জন আসে। বাসিন্দারা নূতনের টানে উৎসুক হয়ে চোখ তুলে চায়। তাদের আগেকার কাজের জায়গার গল্প শোনে ভাসাভাসা আগ্রহে। কিন্তু মজুরদের জীবন, সেই এক থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-

বড়ি-খোড়্। ধীরে ধীরে নূতনের রং খসে, গল্পও পুরোনো হয়; খাড়া কান আর তোলা চোখ নেমে আসে।

কিন্তু কেউ কেউ আবার নূতন কথাও বলে। সাত জন্মে কেউ শোনেনি এমন সব কথা। কেমন যেন সন্দেহ হয়। তবু শোনে প্রত্যেকেই। মন দিয়ে শোনে; তর্ক করে না। কেউ চটেও যায়; কারুর মনে আবার কিসের জানি শঙ্কা জাগে। কি যেন একটা আশার আবছা ছায়াও দোলা দিয়ে যায় কারুর মনে। ওদের দুঃখের জীবন আরো জটিল ক'রে তোলে এই সব শঙ্কা। ভয় ভুলবার জন্য ওরা তাই আরো বেশি ক'রে মদ খায়।

দশের থেকে একটু আলাদা কেউ হ'লেই ওরা সন্দেহের চোখে দেখে। ভয় পায়—হোক পান্‌সে জোলো, কিন্তু মোটের ওপর একটা ধারায় চলছে তো জীবনটা। কে জানে কি ঝামেলা বাঁধাবে ওই লোকগুলো। নাই থাক সুখ, স্বস্তি তো আছে। জীবনের ভারী বোঝাটা একই ভাবে বয়ে এনেছে ওরা। বইছে, বইবে। জেনে রেখেছে ও থেকে মুক্তি নেই। মুক্তিই যদি নেই, তবে যা আছে এই ভালো। হেরফের হ'লে দুঃখ বাড়বে বই কমবে না।

অতএব যারা নূতন কথা বলে, ওরা চুপচাপ তাদের পাশ কাটিয়ে যায়। নয়া মানুষগুলো অন্য কোথাও চলে যায় দু'দিন পরে। কেউ কেউ কারখানায় কাজ নিয়ে থেকেও যায়। দু'দিনেই গড্ডালিকা স্রোতে মিশে যায় তারা। নয়তো বা ভালো-মানুষের মতো আলাদা ঘর বেঁধে থাকে...

এমনি ক'রে গোটা পঞ্চাশ বছর কোনমতে বেঁচে থেকে ওরা মরে।

দুই

মিখাইল ভ্লাসফ্-এর জীবনও এমনি। লোমশ শরীর; এই এতখানি পুরু ভ্রূর তলায় কুতকুতে চোখ-জোড়া দিয়ে দুনিয়াটাকে ও ভারি সন্দেহ আর অবহেলার দৃষ্টিতে দেখত। কারখানার মেকানিক, সারা কারখানায় ওর জুড়ি ছিল না, না কাজে, না গায়ের জোরে। কিন্তু ওপর-ওলার সাথে মাথা নুইয়ে কথা কইতে পারল না কোনদিন, তাইতে ওর পয়সাও হলো না। তারপর ছুটির দিনে ও কাউকে-না-কাউকে ধ'রে ঠ্যাঙ্গাবেই। কাজেই কেউ ওকে দেখতে পারত না। ভয়ে ওর কাছে ঘেঁসত না কেউ। পাল্টা ঠ্যাঙ্গানি দেবার চেষ্টা করেছে কেউ কেউ, কিন্তু এঁটে উঠতে পারেনি। কাউকে তেড়ে আসতে দেখলেই হ'লো—ভ্লাসফ্ ইঁট পাথর, কাঠ, লোহা, হাতের কাছে যা পেল খপ্ করে তুলে নিয়ে দু'পা ফাঁক করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল তাক্ করে। ওই লোমশ হাত আর দাড়ি-ছাওয়া মুখের সর্বনেশে ভঙ্গি দেখলেই মানুষের পিলে চমকে উঠত। তার ওপর ওর ক্ষুদে ক্ষুদে ধারাল চোখ দুটোর দৃষ্টি, যেন ছুঁচলো লোহার মতো মানুষকে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় ক'রে দিত। সে কি চেহারা তখন ওর—যেন ভয়লেশহীন আর নির্মম হিংস্র বুনো জানোয়ারটা—ঝাঁপিয়ে প'ড়ল ব'লে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হেঁড়ে গলায় গর্জায় : 'আয় না শালা, কুত্তীর বাচ্চা! আয়!' দাড়ির ফাঁক দিয়ে তামাটে দাঁতগুলো কড়্মড় করে। ও-পক্ষের আত্মাপুরুষ তখন

প্রায় খাঁচা ছাড়া। গাল দিতে দিতে তারা গ্রুটি গ্রুটি পালায়।

ঘেন্নায় ধক্‌ধক্‌ করে দুই চোখ।

'এই কুত্তীর বাচ্চা!' চীৎকার করে তেড়ে আসে পেছন থেকে, 'আয় না দেখি, কোন শালার মরার সাধ হয়েছে...'

ও সাধ কারো নেই।

ভ্ল্যাসফ্‌ কথা বড় একটা কয় না। পুলিশ হোক, বড় বড় অফিসার, ওপরওলা, যেই হোক, সব্বাইকে বলে কুত্তীর বাচ্চা। ওটা ওর মুখের বুলি। বৌকে কুত্তী ছাড়া ডাকে না।

'এই কুত্তী! আমার প্যান্টটা ছিঁড়ে একশা হ'লো যে...'

ছেলে পাভেলের তখন চৌদ্দ বছর বয়েস। বাপ কেন জানি একদিন তেড়ে এসে ঝুঁটি ধরতে গেল। ছেলে একটা হাতুড়ী তুলে বললে :

'খবরদার। গায়ে হাত দিয়েছ তো!'

'য়্যাঁ, এন্দুর!' ব'লে তেড়ে ছুটল ছেলের তনু দেহটির দিকে, বার্চ গাছের দিকে যেমন প্রকাণ্ড মেঘের ছায়া এগিয়ে যায়।

হাতুড়ি ওঠায় পাভেল : 'বাস্‌, ঢের গুঁতোনি খেয়েছি, আর না'!

ছেলের দিকে একবার তাকিয়ে লোমশ হাত দু'খানা গুটিয়ে নেয় ভ্ল্যাসফ্‌। ছোট্ট একটু হাসি ছিট্‌কে বেরয়।

'আচ্ছা, আচ্ছা! দেখা যাবে!'

তারপর একটা দীর্ঘ-শ্বাস ফেলে বলে :

'সাধে কি আর কুত্তীর বাচ্চা বলি!'

কিছুক্ষণ পরে বৌকে গিয়ে বলে :

'আমার কাছে আর টাকা পয়সা চেয়েছিস তো দেখবি মজা। তোর লায়েক ছেলের ভাত খাবি এখন থেকে।'

বড় সাহস ক'রে জবাব দেয় বৌ : 'আর তুমি টাকাগুলো মদের গেলাসে ফুঁকবে, তাই না?'

'তোর কিরে, কুত্তী! জানিস্‌ ইচ্ছে করলেই মেয়েমানুষ রাখতে পারি!'

মেয়েমানুষ রাখেনি ও। কিন্তু এর পর যে দু'টো বছর বেঁচে ছিল ছেলের সাথে একটি দিনও কথা কয়নি আর।

একটা কুকুর ছিল ভ্ল্যাসফের; মালিকের মতই তার বিরাট লোমশ দেহ। প্রতিদিন যাবার সময় কারখানা পর্যন্ত সাথে সাথে যেত আর সন্ধ্যে বেলায় গেটের সামনে গিয়ে প্রভুর অপেক্ষায় বসে থাকত। ছুটির দিনগুলো মদের আড্ডায় আড্ডায় ঘুরে ঘুরে বেড়াত ভ্ল্যাসফ্‌। কথা বলতো না কারো সাথে, কেবল মানুষের মুখের দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকাত যেন খুঁজছে কাউকে। কুকুরটা তার ঝাঁকড়া লেজ নেড়ে নেড়ে দিনমান প্রভুর পায়ে পায়ে ঘুরত। রাত্তিরে মাতাল হয়ে ভ্ল্যাসফ্‌ বাড়ী ফিরে যখন খেতে বসত, নিজের সাথে খাওয়াত কুকুরটাকে। কোনও দিন ওটাকে গালও দেয়নি; ধ'রে ঠ্যাঙ্গায়ও নি, অথচ আদরও করেনি। খাবার পর বাসন কোসন সরাতে স্ত্রীর যদি একটু দেরি হয়েছে, টান মেরে সব মেজেতে ফেলে দিয়ে এক বেতাল ভদ্‌কা সামনে নিয়ে দেয়ালে পিঠ টান ক'রে হেলান দিয়ে বসেছে। তারপর চোখ বুজে, মুখ এতখানি হাঁ ক'রে গান জুড়েছে। সে কি গান! গান নয়তো ডুকরে ডুকরে মড়া-কান্না। নিশুতি রাতে শুনে আঁতকে উঠত মানুষ। বিচ্ছিরি আওয়াজটা গলা

থেকে বেরিয়ে এসে গোঁফের সাথে জড়িয়ে যেত; খাওয়া রুটির টুকরোগুলো পেট থেকে বেরিয়ে আসতে চাইত ওর গানের ঠেলায়। ব'সে ব'সে মোটা মোটা আঙুল দিয়ে দাঁড়ি-গোঁফে বিলি কাটত আর গান গেয়ে যেত এক মনে। গানের কথা একটিও বোঝা যেত না। কিন্তু স্বর শুনলে শীতের দিনে নেকড়ে বাঘের কান্নার কথা মনে প'ড়ে যেত। যতক্ষণ বোতলে ভদ্কা থাকত ততক্ষণ গান চলত। তারপর হয় বেঞ্চিতে এলিয়ে পড়ত, নয় তো টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ত। গভীর একটানা ঘুম, সেই যতক্ষণ না ভোরবেলায় কলের বাঁশী বাজে। কুকুরটা ওর পাশে শুয়ে ঘুমোত।

লোকটা মারা গেল একটা রগ ছিঁড়ে। পাঁচ দিন বিছানায় প'ড়ে ছট্ফট্ ক'রল। মুখটা কালো মেরে গিয়েছিল। চোখ বন্ধ ক'রে দাঁতগুলো কড়্মড়্ করত আর থেকে থেকে বোকে ব'লত :

'আর্সেনিক দে... দে... বিষ দিয়ে মেরে ফেল্ আমায় ...'

ডাক্তার ব'লে গেল, পুল্টিশ লাগাও। আর একটা অপারেশন ক'রতে হবে, আজই রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার।

হাঁপাতে হাঁপাতে মিখাইল বললে : 'শালা কুত্তীর বাচ্চা! তোর কেরদানী ছাড়াই মরতে পারব। ভাগ শালা, মর!'

ডাক্তার চলে গেলে স্ত্রী চোখের জলে ভেসে বহু কাকুতি মিনতি করল অপারেশন করাবার জন্য। মিখাইল স্ত্রীর দিকে মুঠি বাগিয়ে বলল শুধু : 'দাঁড়া ভালো যদি হই, তোকে মজাটা দেখাব!'

সকাল বেলা কারখানার বাঁশীও বাজল, মিখাইল চোখ বুজল চিরদিনের মত। কফিনে শুলো মিখাইল, মুখটা খোলা, ভ্রূ দুটো কোঁচকান, যেন কারো ওপর রেগে আছে। ওর বৌ, ছেলে, কুকুরটা, দানিলো ভেসোভশিচকফ্, (একজন দাগী চোর। কারখানা থেকে বের ক'রে দেওয়া হয়েছে ওকে), আর বস্তি থেকে জন কয় ভিখারী গিয়ে ওকে কবর দিয়ে এল। বৌটা নিঃশব্দে একটুখানি কাঁদল। পাভেল একটুও কাঁদল না। সবাই বলাবলি ক'রতে লাগল :

'পেলাগেয়া এবার বাঁচলো!'

আর একজন বললে : 'যেমন কুকুর ছিল, কুকুরের মতই মরেছে!'

কবর দেওয়া হ'য়ে গেলে, সবাই চলে গেল; কিন্তু কুকুরটা সেই খোঁড়া মাটির ওপর ব'সে ব'সে কবরটা শুঁকতে লাগল।

ক'দিন পরে কে যেন মেরে ফেলল কুকুরটাকে...

তিন

বাপ মারা যাবার সপ্তাহ দু'এক পরে এক রবিবার সাংঘাতিক মাতাল হ'য়ে বাড়ী ফিরল পাভেল ভ্লাসফ্। টলতে টলতে ঘরে ঢুকে টেবিলের মাথার দিককার চেয়ারটায় ধপ্ ক'রে ব'সে প'ড়ে বাপের মত ক'রে টেবিল পিটিয়ে চীৎকার ক'রে হুকুম করল মাকে : 'খানা লাও'।

পাশের চেয়ারেই ব'সে ছিল মা। দুই হাতে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধ'রল।

মাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে পাভেল ব'লে উঠল :

'যাও যাও, তাড়াতাড়ি করো একটু!'

স্বরে ব্যথা আর স্নেহ ভ'রে মা বলে : 'হাঁরে বোকা ছেলে'! বলতে বলতে ছেলের হাতখানি সরিয়ে দেয়।

'তামাক খাব আমি। বাবার পাইপটা বের ক'রে দে শিগ্গির।' পাভেল বলে জড়িয়ে জড়িয়ে। ভারী জিভটা যেন ন'ড়তে চায় না।

এর আগে আর কখনও মাতাল হয়নি পাভেল। ভদ্‌কায় ওর দেহটা দুর্বল হ'য়েছে, কিন্তু জ্ঞান হারায়নি কখনও।

'আমি মাতাল? সত্যি মাতাল হয়েছি?' প্রশ্নটা যেন হাতুড়ী পিটিয়ে চলে মাথার মধ্যে।

মা বকলোনা একটুও, গভীর স্নেহে শুধু কাছে এসে ব'সল। আরও লজ্জা পেল পাভেল। মায়ের দৃষ্টিতে সে কি বেদনা, ওর বুকের মধ্যে তার ধাক্কা লাগে। বুক ঠেলে কান্না আসতে চায়। আরো বেশী করে মাতলামির ভান ক'রে কান্না চাপে।

মা ওর ভেজা আলুথালু চুলে হাত বুলোতে বুলোতে আস্তে আস্তে বলে :

'ছিঃ একি করেছিস্, বাবা! এমন ক'রতে আছে?'

ওর গা গোলায়। খুব খানিকটা বমিও হ'ল। ফ্যাকাশে কপালটার ওপর ভিজে গামছা চাপিয়ে মা তাকে বিছানায় শুইয়ে দেয়। একটু আরাম লাগে। কিন্তু তখনও চারদিকের সব যেন ঘুরছে। চোখের পাতা এমনি ভারী যে চোখ তুলে তাকাতে পারে না। মুখে বিশ্রী স্বাদ। চোখের পাতা একটুখানি ফাঁক ক'রে মায়ের চওড়া মুখখানির দিকে তাকিয়ে ভাবে :

'বোধ হয় আমি ছোট বলেই এত নেশা। অন্যেরাও তো খায়, কই তাদের তো কিছু হয় না। আমার কেন এমন হয়।...'

মায়ের কোমল স্বর কানে আসে। মনে হয় যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে :

'হাঁরে, এমনি ক'রে মদ খাস্ যদি, আমায় খাওয়াবি কি ক'রে বলতো?'

চোখ সেঁটে বন্ধ ক'রে জবাব দেয় পাভেল :

'সবাই তো খায়।'

মায়ের দীর্ঘশ্বাস পড়ে। ঠিকই তো বলেছে। ও নিজেও তো জানে এক ওই শুঁড়িখানায়ই যা হোক ছিঁটে ফোঁটা সুখের সোয়াদ পায় মানুষগুলো।

তবু বলে : 'তা হোক। তাই ব'লে তুই মদ ধরিসনি, বাবা। তোর বাপ তোর ডবল মদ খেত। তার হাতে আমার দশা দেখেছিস তো! তুইও আমার মুখের দিকে চাইবি না?'

মায়ের করুণ কোমল কথাগুলি শুনে পাভেলের মনে পড়ে, বাবা বেঁচে থাকতে সারা বাড়ীর মধ্যে মাকে যেন কোথাও দেখাই যেতনা। মুখে একটি কথা ছিলনা; আর স্বামীর মারের ভয়ে সর্বক্ষণ কাঁটা হ'য়ে থাকত। নিজেও বেশীর ভাগ বাইরে বাইরে পালিয়ে বেড়াত, বাবার সামনে প'ড়তে চাইতনা। কাজেই মায়ের কাছ থেকে দূরে দূরেই রয়ে গেছে বরাবর। নেশার ঝোঁক শান্ত হ'য়ে এলে মাকে ও তাকিয়ে তাকিয়ে ভালো ক'রে দেখে—

লম্বা দেহটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে খানিকটা; হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি আর স্বামীর ঠ্যাঙ্গানিতে দেহটা গেছে ভেঙ্গে। একেবারে নিঃশব্দে চলা-ফেরা নড়া চড়া করে এক পাশে একটু কাৎ হ'য়ে, যেন সর্বদাই কিসের সাথে ধাক্কা খাবে খাবে একটা

ভয়। চওড়া মত বাদামী কাটের ফোলা ফোলা চামড়া-কোঁচকান মুখ। তাতে জ্বল্ জ্বল্ করছে এক জোড়া ভীরু আর্ত চোখ বস্তির আর দশটা মেয়ের মতই। ডান ভ্রুর ওপর দিকে একটা গভীর কাটা দাগ থাকায় ভ্রুটা একটু ওপর দিকে টানা। মনে হয় ডান কানটাও বাঁ কান থেকে কিছু ওপরে। যার ফলে, সর্বদাই যেন উদ্বেগের সঙ্গে কান খাড়া ক'রে আছে এমনি ভাব মুখে। ঘন কালো চুলের ফাঁকে ফাঁকে সাদার রেখা দেখা দিয়েছে। সবার নীচে সবার পিছে প'ড়ে-থাকা মা ওর শুধুই যেন কোমলতা... বিষাদেরই প্রতিমা একখানি...।

গাল বেয়ে দু'ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ে মায়ের। ছেলে আস্তে আস্তে বলে : 'কেঁদনা মা। বড় তেষ্টা পেয়েছে। একটু কিছু দাও'।

'দাঁড়া বরফ দিয়ে জল নিয়ে আসি।'

মা ফিরে এসে দেখে পাভেল ঘুমিয়ে পড়েছে। ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। হাতের গ্লাশটা কাঁপে থর্‌থর্ ক'রে—ঝাঁকানি খেয়ে বরফের টুক্‌রো-গুলো গ্লাশের গায়ে লেগে ঠুন্ ঠুন ক'রে বাজে। মিনিটখানেক পর, গ্লাশটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে হাঁটু গেড়ে ব'সে পড়ল দেবতা-সন্তদের মূর্তির কাছে। বাইরে কোথায় মদ খেয়ে মাতলামি করছে বস্তির মানুষেরা, তার কোলাহল আছড়ে পড়ছে এসে জানালার সার্শীর গায়ে। হৈমন্তী সন্ধ্যার শিশির-ভেজা আঁধারে অ্যাকর্ডিয়নের শব্দ ঝমঝমিয়ে চলেছে। কে একজন হেঁড়ে গলায় গান ধরেছে। ওধারে কুৎসিত ভাষায় খিস্তি করছে আরেকজন; মেয়েদের ক্লান্ত বিরক্ত গলা শোনা যাচ্ছে... ভারী বিশ্রী লাগছে সব। আবহাওয়া যেন গুলিয়ে উঠছে।

ভ্লাসফ্‌দের ছোট্ট বাড়ীখানার আবহাওয়া এখন আগের চেয়ে অনেক শান্ত সংযত। অন্য বাড়ীগুলোর চাইতে কেমন যেন আলাদা রকম। পাড়ার এক ধারে ওদের বাড়ী, বিলের ধার ঘেঁষে একটা খাড়া বাঁধের উপর। বাড়ীখানার প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ জুড়ে রান্না ঘর, আর একখানা ছোট ঘর; তাতে পার্টিশন দিয়ে এক ধারে থাকে মা। বাকী অংশে দুটো জানালা-ওয়ালা একটা বড় চার-কোণা ঘর, এক কোণে পাভেলের বিছানা, আর এক দিকে একটা টেবিল আর খান দুই বেঞ্চি। আসবাবের মধ্যে গোটা কয় চেয়ার, একটা ছোট্ট আয়না-ওলা ড্রেসিং টেবিল, কাপড়-চোপড় রাখার জন্য একটা ট্রাঙ্ক, দেয়ালে একটা ঘড়ি, আর এক কোণায় রাখা যীশু-খৃষ্টের মূর্তি।

পাভেলের চাল-চলতি ওর বয়সী ছেলেদের মতই। একটা অ্যাকর্ডিয়ন, কড়া ইস্ত্রীর প্লেট-ওয়ালা সার্ট, জমকালো টাই, জুতো ছড়ি সব কিনে এনেছে। সন্ধ্যে বেলায় আড্ডায় যায়, নানারকমের নাচ শেখে, রবিবার ভদ্‌কা খেয়ে মাতাল হ'য়ে বাড়ী ফেরে। কিন্তু প্রতিবারই ওর অবস্থা ভারী কাহিল হ'য়ে পড়ে। সোমবার ঘুম ভাঙ্গে মাথা-ধরা, বুক-জ্বালা, ফ্যাকাশে মুখ আর সারা দেহে যন্ত্রণা নিয়ে।

এক দিন মা জিজ্ঞেস করে : 'কিরে, কাল রাতে খুব ফূর্তি করলি?' মুখটাকে বিকৃত ক'রে তেঁতো স্বরে জবাব দেয় পাভেল : 'ছিঃ, আর ব'লো না। এর চেয়ে মাছ ধরা ভালো। একটা বন্দুক কিনে এবার থেকে শিকার করব।'

তবে ও কাজটা করে খুব মন দিয়ে, এক দিনও কামাই নেই, কুঁড়েমির জন্য জরিমানাও হয়নি কখনও, চুপচাপ থাকে, বেশী কথা বলে না; কিন্তু ওর ডাগর ডাগর নীল চোখ দুটোর মধ্যে কিসের যেন অস্বস্তি। ওর মায়ের চোখও ঠিক অমনি। বন্দুকও কিনল না। মাছ ধরতেও গেল না। ক'দিনেই বোঝা গেল ও একেবারে

আলাদা আর এক পথের দিশা পেয়েছে। আড্ডায় আগের চেয়ে কম যায়। কিন্তু রবিবারে কোথায় যেন উধাও হয়। অথচ বাড়ী ফেরে মাতাল না হ'য়ে। মায়ের তীক্ষ্ম চোখ দেখে ছেলের মুখখানা দিন দিন রোগা হ'য়ে যাচ্ছে, চোখ দুটির গাম্ভীর্য বাড়ছে; আর ঠোঁট দুটি একটা কঠিন রেখায় দৃঢ়-সংবদ্ধ। মনে হয় ও বুকের তলায় কোন গোপন দুঃখ ব'য়ে বেড়াচ্ছে; আর নয়তো কোন রোগে ওর দেহ ক্ষয়ে যাচ্ছে। আগে বন্ধু-বান্ধব আসত। এখন বাড়ীতে ওকে পাওয়াই যায় না, তাই তারা আসা ছেড়েছে। মা খুশিই হন মনে মনে, ছেলে তার কারখানার সবার থেকে আলাদা। কিন্তু আবার ভয়ও করে—চার পাশের এ'দো গলির ভিড় থেকে সরে এসে কোন্ পথে বা গেল ছেলে তার।

এক এক সময় জিজ্ঞাসা করে : 'হ্যাঁরে পাশা, গা-গতর ভাল আছে তো তোর।'

'কই কিচ্ছু তো হয়নি, ভালোই তো আছি।' জবাব দেয় ছেলে।

'এত রোগা হ'য়ে যাচ্ছিস্ কেন তাহ'লে?' একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে মায়ের বুক ঠেলে।

বই নিয়ে আসতে লাগল পাভেল বাড়ীতে। লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ে; পড়া শেষ হ'লে লুকিয়ে রেখে দেয়। মাঝে মাঝে কাগজে কি যেন টোকে বই থেকে। তাও লুকিয়ে রাখে।

মা ছেলের মধ্যে কথা-বার্তা, দেখা-শোনা কমই হয়। সকাল বেলায় নিঃশব্দে চা খেয়ে কাজে যায়। দুপুরে খেতে আসে, সামান্য দু'একটা এদিক ওদিক কথা হয় তখন। তারপর সেই সন্ধ্যায় এসে নেয়ে-খেয়ে প'ড়তে বসে। অনেকক্ষণ পড়ে। রবিবার সেই সকালে বেরয়, ফেরে অনেক রাতে। মা জানে ছেলে শহরে যায় থিয়েটর-টিয়েটর দেখে। কিন্তু শহরের কোন বন্ধু সাত জন্মে এবাড়ী আসে না। ছেলেও যেন দিন দিন বোবা হ'য়ে যাচ্ছে। যেটুকু কথা বলে, মায়ের কান ঠিক ধরেছে, ওর ভাষায় নূতন রীত্ লেগেছে। আগের সেই বিশ্রী কথা-বার্তা, গালি-গালাজ নেই। নতুন ভাষায় কথা কয় ছেলে, সবটা বোঝে না মা। তা ছাড়া চাল চলতিও বদলেছে। আগের মত ফুল-বাবুটি হয়ে সাজে না। সাজার চেয়ে শরীর, কাপড়-চোপড় সাফ রাখার দিকে নজর বেশী। আগের মত রাগ-চিল্লোনো নেই; চলন-বলন সহজ হয়েছে, হালকা হয়েছে, মোলায়েম হয়েছে। তবু মায়ের ভাবনা হয়। এসব কি, কেমন ক'রে এমন বদলে গেল ছেলে, কিচ্ছু বুঝতে পারে না। মায়ের সাথেও ব্যবহারেও তার নয়া ধরন। কখনও নিজেই ঘর ঝাঁট দেয়, রবিবার নিজের হাতে বিছানা করে; সব সময় মায়ের কাজে সাহায্য করতে ছুটে আসে। কই কুলি-বসতির কোন ছেলে তো অমন করে না।

একদিন একটা ছবি নিয়ে এ'ল পাভেল—তিন জন লোক পথ চলতে-চলতে কিসের আলোচনায় ডুবে আছে। ছবিখানিকে টাঙিয়ে রাখল দেয়ালে।

পাভেল বুঝিয়ে দিল পুনরুত্থানের পর যীশুখৃষ্ট যাচ্ছেন।

মার খুব ভালো লাগে ছবিখানা—কিন্তু মনে হয়, অতই যদি তোর যীশুর ওপর ভক্তি তো গির্জেয় যাসনে কেন?

তাকের ওপর বইয়ের ভিড় বেড়ে চলে। এক ছুতোর বন্ধু ওকে বানিয়ে দিয়েছিল তাকটা। ওর ঘরখানাও আর ঘর নেই, আরামের নীড় হ'য়ে উঠেছে।

সাধারণতঃ মাকে ও মা ব'লেই ডাকে। কখনও কখনও আর একটু আদর ক'রে বলে মা-মণি—যেমন, 'রাত্তিরে ফিরতে দেরী হবে, মা-মণি! আবার ভাবতে ব'সো না যেন!'

বড় ভালো লাগে মায়ের। ছেলের কথায় কি যেন আছে—মনের মধ্যে ব'সে যায়। একটুও হাল্কা কথা নেই।

কিন্তু যতই দিন যায়, আর মায়ের ভয় বাড়ে। অকারণ ভয়। কেন যে কিছুই বোঝা যায় না। শুধু এটুকু বোঝে মা, কিছু একটা নিয়ে মেতেছে ছেলে—সাধারণ ব্যাপার নয় সে। মনটা ভারী হ'য়ে ওঠে। ছেলের ওপর রাগ হয়। কেমন সুন্দর আর দশটা ছেলে। যেমন হয় এ বয়সে। আর এ ছেলে একেবারে সন্ন্যেসী। দুনিয়া-ছাড়া সৃষ্টি-ছাড়া ব্যাপার। মুখেও একটু হাসি নেই। এই কাঁচ বয়সে কি এসব মানায়! আবার মনে হয়, কি জানি কোন মেয়ের প্রেমে-টেমে পড়ল না তো!

কিন্তু খালি হাতে তো প্রেম হয় না। মাইনের টাকা তো কড়ি অবধি গুণে মায়ের হাতে তুলে দেয়।

এমনি ক'রে সপ্তাহ গেল, মাস গেল, দু'টি বচ্ছরই চ'লে গেল কোথা দিয়ে। আশ্চর্য দুটো বছর! নিঃশব্দে নীরবে চলে গেল জীবন...কত ভাবনা মনে উঠল পড়ল—সব অস্পষ্ট, আবছা। দিনে দিনে শুধু ভয় বেড়ে গেল...!

চার

সেদিন সন্ধ্যেবেলা খেয়ে-দেয়ে নিজের ঘরে এল পাভেল। জানালার পরদা টেনে দিয়ে, টিনের ল্যাম্পটা দেয়ালের গায়ে পেরেকে ঝুলিয়ে দিল। তারপর ঘরের কোণায় টেবিলে গিয়ে পড়তে ব'সল। বাসন-কোসন ধুয়ে মা রান্নাঘর থেকে আস্তে-আস্তে বেরিয়ে এসে ছেলের পাশে দাঁড়ায়। পাভেল মুখ তুলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মায়ের দিকে তাকায়।

অপ্রস্তুত হ'য়ে ওঠে মা। তাঁর ভ্রূ-জোড়া কুঁচকে যায়। 'কিছু না রে খোকা, অমনি,' বলতে বলতে তাড়াতাড়ি গিয়ে আবার রান্নাঘরে ঢোকে। কিন্তু থাকবে কি করে! মনের মধ্যে লড়াই চলেছে। আবার হাত ধুয়ে এসে ছেলের পাশে দাঁড়ায়।

'এই শুধোচ্ছিলাম, সারাদিন মুখ গুঁজে এত কি পড়িস তুই!' আস্তে-আস্তে জিজ্ঞাসা করে।

বই বন্ধ ক'রে পাভেল বলে : 'বসো মা।'

মা পিঠ টান ক'রে গুছিয়ে বসে যেন ভয়ংকর গুরুতর একটা কিছু শুনবে, এমনি ভঙ্গিতে।

মায়ের দিকে তাকায় না পাভেল। আস্তে-আস্তে বলতে আরম্ভ করে। স্বরটা কেন জানি কঠোর হ'য়ে ওঠে।

'এই-যে-সব বই পড়ছি দেখছ, এসব পড়া নিষেধ। আমরা যারা এমনি ক'রে খেটে-খুটে খাই তাদের সম্বন্ধে সত্যি কথা লেখা আছে কি না, তাই পড়া নিষেধ এসব বই। এগুলো গোপনে ছাপা হয়। যদি কর্তারা টের পান, বাস্, টেনে নিয়ে জেলে পুরবেন। জানো? জেল! সত্যি কথা জানতে চাই কিনা তাই। বুঝলে?'

হঠাৎ যেন নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসে মায়ের। ফ্যাল্-ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে থাকে

ছেলের দিকে। এ যেন ওর ছেলে নয়, অন্য মানুষ, অচেনা। ওর গলার স্বরটাও যেন কেমনতর অন্য রকম। আগের চেয়ে গভীর, গম্ভীর, অনেক বেশী সুন্দর, যেন গম্-গম্ ক'রে ঘর ভ'রে দেয়। পাভেল তার চওড়া গোঁফ-জোড়ায় হাত বুলোতে-বুলোতে ভ্রুর নীচ দিয়ে কেমন অদ্ভুতভাবে কোণের দিকে চেয়ে থাকে। ছেলের জন্য বড় ভয় করে মায়ের, কেমন মমতা হয়।

জিজ্ঞাসা করে : 'আচ্ছা খোকা, তাহ'লে এসব করিস কেন?'

'করি কেন?' মাথা তুলে মা'র দিকে তাকিয়ে জবাব দেয় অত্যন্ত ধীর শান্ত স্বরে; 'সত্যি কথা জানতে চাই যে!'

স্বরটা কোমল কিন্তু কঠিন। চোখেও কেমন একটা কঠিন দীপ্তি। বুকের মধ্যে কে যেন ব'লে গেল মা'র, ছেলে তার কঠিন ব্রত নিয়েছে। অতি সংগোপন সাংঘাতিক সেই ব্রতের মন্ত্রে চিরকালের মত তার দীক্ষা হ'য়ে গেছে। চিরকাল জীবনের সব কিছুকে নিয়তি ব'লে মেনে বিনা প্রশ্নে মাথা পেতেছে মা। আজও কোনও কথা খুঁজে পায় না। কঠিন দুঃখে তার হৃৎপিণ্ডখানা কুঁকড়ে মুচড়ে যেতে লাগল। আর গাল বেয়ে নিঃশব্দে গড়াতে লাগল ফোঁটা-ফোঁটা চোখের জল।

'কেঁদোনা মা, ছিঃ,' অত্যন্ত কোমল স্বরে বলে পাভেল। কিন্তু মায়ের বুকে গিয়ে ধাক্কা লাগে, মনে হয় এ তো সান্ত্বনা নয়, বিদায় নেয়া।

'ভাব তো মা,' পাভেল ব'লে চলে, 'কি জীবন আমাদের এখানে। তোমার নিজের এই চল্লিশ বছরের জীবনটার কথাই ভাব তো! বাবার মার খেয়েছ—এখন আমি বুঝি কেন বাবা তোমায় অমন ক'রে মারতেন। নিজে যে নরক ভোগ ক'রেছেন, তার শোধ তুলেছেন তোমার ওপর। কষ্ট পেয়েছেন, অসহ্য মনে হয়েছে; কিন্তু কোনও দিন ভাবতে চেষ্টা করেননি কেন এমন হয়। এর গোড়া কোথায়। বাবা এই কারখানায় কাজ করেছেন ত্রিশটা বছর। শুরু করেছিলেন সেই যখন মোটে দুটো ডিপার্ট নিয়ে এর পত্তন হয়েছিল। সেই জায়গায় এখন সাতটা।'

মন প্রাণ দিয়ে শোনে মা, কিন্তু ভয়ে বুকটা দুরু-দুরু ক'রে। কি অপূর্ব এক আলো জ্বলছে ছেলের চোখে। টেবিলের ধারে বুকটা ঠেকিয়ে, মায়ের অশ্রু-ভেজা মুখ-খানার দিকে ঝুঁকে বলে যায় যে-সত্যকে সে জেনেছে তার বাণী। ওই নিয়ে এই ওর প্রথম বক্তৃতা। যে-সব জিনিস সে অত্যন্ত স্পষ্ট ক'রে জেনেছে বুঝেছে, তারি কথা সে ব'লতে লাগল জোয়ান বুকের সমস্ত শক্তি, আর নিষ্ঠাবান ছাত্রের সাচ্চা-প্রাণের উদ্দীপনা দিয়ে। মাকে বোঝানর চাইতে নিজেকে পরখ করার দরকার বেশী। মাঝে-মাঝে থামে, কথা হাতড়ায়—তখন চোখ পড়ে ওর সামনের ওই আর্ত মুখ আর অশ্রুর আড়ালে ঝলমলানো চোখ দু'টির দিকে। ভয়ে বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে তারা। ওর বড় মায়া হয় মায়ের জন্য। আবার বলতে আরম্ভ ক'রে। কিন্তু এবারে আর অন্য কথা নয়। শুধু মায়ের নিজের জীবনের কথা :

'কোনও দিন এতটুকু আনন্দ পেয়েছ, মা? মনে ক'রে রাখার মত কিছু কি ছিল তোমার জীবনে?'

মা শোনে, বিষণ্ণ ভাবে মাথা নাড়ে। কি যেন একটা নতুন অচেনা ঢেউ দিয়েছে বুকের মধ্যে, হরষও লাগায় আবার প্রাণও কাঁদায়—ওর ভাঙা বুকটায় যেন আদর ক'রে হাত বুলিয়ে দিয়ে যায়। এর আগে ওর নিজের কথা এমন ক'রে কেউ তো বলেনি! আবছা কি সব ভাবনা যেন ডানা ঝাপটায়। এতদিন আমল দেয়নি।

সেই ডাগর কালে অসন্তোষের জীবনটাকে নিয়ে যে ছট্‌ফটানি ছিল বুকের মধ্যে, এতদিনে তা ঠাণ্ডা হ'য়ে এসেছিল। আজ ছেলের কথায় সেই মরা গাঙে আবার বান ডাকে। তখন সইদের সাথে ওই নিয়ে বলা-কওয়া অনেক করেছে, অনেক নালিশ-ফরিয়াদ করেছে। কিন্তু নরক-যন্ত্রণার মূলটা খোঁজেনি। আর আজ ওই এক-রত্তি ছেলে, ওর নিজেরই পেটের ছেলে—সামনে বসে আছে, সেই কিনা মায়ের ব্যথা বুঝেছে: মায়ের জন্য দরদে তার কলজেটা ভরে গেছে। গর্বে মায়ের বুক সাত হাত ফুলে ওঠে। অমন ছেলে! তার চোখ মুখের না-বলা কথাগুলোও মায়ের মনটাকে ছুঁয়ে যায়।

কিন্তু করুণা মায়েদের জন্য নয়।

একথা জানে মা। মেয়েদের জীবন সম্বন্ধে যা বলছে পাভেল তাতো সবই জানা, অতি পুরানো তিক্ত বাস্তব। শুনে কত রকমের কত ভাবই যে উদয় হয় মায়ের মনে। মনটা যেন কোমলতায় গলে যায়।

বাধা দিয়ে মা বলে : 'কি করতে চাস এখন?'

'প্রথমে নিজের পড়া-শোনা। তারপর অন্যদের শেখান। আমাদের শ্রমিকদেরও পড়তে হবে, জানতে হবে আমাদের জীবনে এত কষ্ট কেন।'

পাভেল-এর কঠিন নীল চোখ দুটো একটা কোমল আলোয় ভ'রে উঠল। খুশি হ'য়ে ওঠে মা। গালের বলি-রেখার ভাঁজে-ভাঁজে চোখের জল তখনও থরো-থরো কাঁপছে, কিন্তু শান্ত স্নিগ্ধ মৃদু হাসিতে ঠোঁট দু'খানি ভ'রে উঠল। ওদিকে মনের মধ্যে লড়াই চলেছে। জীবনের সর্বনেশে চেহারাটাকে অমন খাঁটি ক'রে বুঝেছে এই ছেলে, তার জন্য এক দিকে গর্ব, আর এক দিকে আসে ভয়। ঐটুকু ছেলে—অত বড় কাজ একা হাতে তুলে নিয়েছে। নরক যন্ত্রণা তো সবাই সইছে, আমি অবধি। ও তো অভ্যেস হ'য়ে গেছে সবার। বলতে যায় :

'একা তুই কি করবি রে, বাবা?'

কিন্তু বলল না, বলতে পারল না। তার প্রতি দিনের খোকা আজ কেমন ক'রে জ্ঞানি শক্তি-ধর, মস্ত বড় একজন মানুষ হ'য়ে উঠল চোখের সামনে। হয়তো একটু দূরে স'রে গেছে, যাক। আজ শ্রদ্ধায় যে ভরে গেছে মা'র মন, ঐ কথা ব'লে শ্রদ্ধা-টুকুকে নষ্ট করতে মন সরল না।

পাভেল দেখলে মায়ের ওষ্ঠের স্নিগ্ধ হাসি, তাঁর মুখের গভীর একাগ্রতা, আর চোখের জ্যোতিতে বিচ্ছুরিত ভালোবাসা। ওর মনে হ'ল যে-সত্যে দীক্ষা নিয়েছে ও, মা যেন বুঝেছেন তা। নিজের ওপর ওর বিশ্বাস বেড়ে গেল। আরও উত্তেজিত হয়ে উঠল ওর ভাষা, স্বর, বলার ভঙ্গি। কখনও হাসে, কখনও কপালটা কুঁচকে ওঠে; কখনও বা ঘৃণায় কথাগুলো আগুন হ'য়ে ওঠে। ঘরের মধ্যে ঝন্‌-ঝন্‌ ক'রে বাজে শক্ত কথাগুলো। মা ভয় পেয়ে যায়, মাথা নেড়ে আস্তে-আস্তে বলে :

'সত্যি রে, খোকা? এসব সত্যি?'

'সব সত্যি।' দৃঢ় কণ্ঠের জবাব আসে। সব সত্যি, এই দুর্ভাগাদের ভালো ক'রতে চায় এমন লোকও আছে। সত্য কথা তারাই শুনিয়েছে সবাইকে। কিন্তু শত্রুরা, যারা মানুষের মত বাঁচতে দেবে না ব'লে পণ করেছে, তারা জানোয়ারের মত ক'রে ওই ভালো লোকগুলোকে শুধু তাড়া করে বেড়িয়েছে, ধরে জেলে পুরে ঘানিতে জুতে দিয়েছে।

'আমি দেখেছি তাদের, মা,' উত্তেজিত স্বরে চীৎকার ক'রে ওঠে পাভেল, 'তারাই

সত্যিকারের মাটির ছেলে!'

আরো ভয় পায় মা। আবার জিজ্ঞাসা ক'রতে যায় 'সত্যি রে এসব, সত্যি?' কিন্তু সাহস হয় না। নিশ্বাস বন্ধ ক'রে শোনে—বুঝতে পারে না কেমন ধারা মানুষ এরা, এই যারা ওর ছেলেকে এমন সর্বনেশে কথা বলতে আর ভাবতে শিখিয়েছে। অবশেষে বলে :

'হ্যাঁরে, ভোর যে হ'য়ে এল। শুতে যা এবার। একটু ঘুমিয়ে নে।'

'যাচ্ছি, মা, যাচ্ছি।' বলে পাভেল তার পর মায়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে শুধায় : 'যা বললাম বুঝতে পেরেছ, মা?'

দীর্ঘ-নিশ্বাস পড়ে। 'বুঝেছি রে বুঝেছি'। আবার চোখের জল উথলে ওঠে। হঠাৎ বুক-ভাঙ্গা আতুর উচ্ছ্বাস বেরিয়ে আসে : 'ওরে মরবি যে রে তুই!'

ওঠে পাভেল, ঘরের এদিক থেকে ওদিকে যায়, বলে :

'এখন বুঝলে তো আমি কোথায় যাই, কি করি! সব খুলে বলেছি। এখন তোমার কাছে আমার এইটুকু কথা, যদি আমায় ভালোবাসো, আমায় বাধা দিও না, মা-মণি।'

'খোকা! খোকা! কেন শোনালি এসব কথা!' কাতর স্বরে মা বলে।

পাভেল মায়ের হাতখানা নিজের হাতে তুলে নিয়ে শক্ত ক'রে চেপে ধরে। ওই হৃদয়-ঢালা মা-মণি ডাক, আর ওই হাতের গভীর স্পর্শ—অভিভূত হ'য়ে যায় মা। অমন ক'রে হাত ধরা যায় এ তো কোনও দিন জানেনি। এ যে একেবারে নূতন, অদ্ভুত!

ভেঙে পড়ে মা : 'না, আমি কিছু ক'রব না দেখিস। শুধু একটু সাবধানে থাকিস্ তুই বাবা!' সাবধান হ'তে বলল বটে, কিন্তু কি যে বিপদ মা নিজেই জানে না। তবু কাতর কণ্ঠে আবার বলে : 'বড্ড যে রোগা হ'য়ে যাচ্ছিস দিন দিন রে'।

স্নেহ-ঝরা দৃষ্টি দিয়ে দীর্ঘ শক্ত দেহখানাকে যেন একেবারে বুকের ভেতর টেনে আনে : 'তাই যা, তোর পথে তুই যা। আমি কক্খনও বাধা দেব না। কিন্তু একটা কথা বলি, লোকের সাথে কথা-বার্তা কইতে একটু সাবধান। মানুষই কিন্তু মানুষের শত্রু। নিজেদের মধ্যেই তাদের এত হিংসে, ঘেন্না, লোভ। একজনকে মেরে দুঃখ দিয়েই তাদের আনন্দ। একবার যদি ওরা বোঝে তুই ওদের দোষ ধরছিস্ তোকে ঘেন্না করবে, ছিঁড়ে খাবে।'

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পাভেল শোনে মায়ের আতুর কথাগুলো। শেষ হ'লে একটু হেসে বলে :

'ঠিক বলেছ মা, মানুষ ভালো নয়। কিন্তু যেদিন জানলুম যে সংসারে ন্যায় ব'লে একটা জিনিস আছে, সে-থেকে আর আমার খারাপ লাগে না কাউকে। আমি নিজেই জানিনে, কেমন ক'রে কি হ'লো। ওঃ ছোটবেলা কি ভয়ই করতাম সব কিছুকে। তারপর বড় হ'লাম যখন—তখন ঘেন্না—এক দিক থেকে সব্বাইকে ঘেন্না করতুম। কখনও করতুম লোকগুলো পশুর মতো ব'লে। কিন্তু আবার কাউকে কেন যে ঘেন্না করতুম, নিজেই জানিনে। কিন্তু এখন সব অন্য রকম হয়ে গেছে। এখন ওদের ওপর আমার ভারী মায়া হয়। সে যাই হোক, এখন বুঝি, লোকগুলি যদি খারাপ হ'য়েই থাকে সে-দোষ ওদের নয়। এখন আর আমার মনে রাগ নেই ওদের ওপর।'

পাভেল থামে। যেন বুকের মধ্যে কার ডাক শুনতে পায়। তারপর কি যেন

ভাবতে ভাবতে আস্তে আস্তে বলে :

'এই হলো সত্য কথা মা! এই সত্য তোমায় বুঝতে হবে।'

'হায় ভগবান! এমনি করে বদলে গেছিস্ তুই? একি হ'ল তোর? এ যে সর্বনেশে বদল হ'ল যে রে তোর!' ছেলের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস পড়ে মায়ের।

পাভেল ঘুমিয়ে পড়লে সন্তর্পণে এসে তার বিছানার কাছে দাঁড়ায় মা। চিৎ হয়ে শুয়ে আছে পাভেল। সাদা বালিশটার ওপর ওর কঠিন কালো মুখখানার প্রতিটি রেখা অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে প্রকট হ'য়ে আছে। খালি পায়ে রাতের জামা গায়ে দাঁড়িয়ে আছে মা, হাত দু'খানি বুকের ওপর চাপা, ঠোঁট দুটি নড়ছে কি এক অব্যক্ত ভাষার ব্যঞ্জনায়। গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে বড় বড় ফোঁটায় চোখের জল।

পাঁচ

আবার সেই নিঃশব্দ জীবন—বড় দূরের অথচ যেন বড় কাছের।

সপ্তাহের মাঝখানে কি একটা ছুটি প'ড়ল। বেরিয়ে যেতে যেতে মাকে বলল পাভেল :

'শনিবার দিন শহর থেকে ক'জন বন্ধু-বান্ধব আসবে, মা।'

'শহর থেকে!' কি জানি কেন হঠাৎ মায়ের মেজাজ বিগড়ে গেল। পাভেল বিরক্ত হয়ে একটু চেঁচিয়েই জিজ্ঞাসা করে : 'কি হ'লো আবার তোমার?'

এপ্রন দিয়ে চোখ মুছে, দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে মা বলে :

'কি জানি, জানিনে বাপু! যা তুই...'

'ভয় করছে?'

'করবে না?' স্বীকার করে মা।

মায়ের দিকে ঝুঁকে বাপের মত ঝাঁঝ দিয়ে বলে পাভেল :

'ভয়ে ভয়েই তো মরলে সব। ভয় পাই বলেই কর্তারা আরো জুজুর ভয় দেখিয়ে কাবু ক'রে রাখে।'

'রাগ করিসনে রে,' মায়ের আর্ত-স্বর লুটিয়ে পড়ে, 'রাগ করিসনে। সারাটা জীবন ভয় করে করে আত্মাটা অবধি ভয়ের পাষাণ-চাপা হয়ে আছে।'

'মাপ করো, মা! কিন্তু এ ছাড়া পথ নেই।' নরম হয় পাভেল।

পাভেল চলে যায়।

তিনটে দিন ভয়ে ভয়ে রইল মা। কাঁপুনি আর থামে না। সর্বনেশেরা কি না এখানে এসে জুটবে! ওরাই তো ছেলেটাকে বিগড়ে দিয়েছে...'

শনিবার। কারখানা থেকে এসে পাভেল নেয়ে ধুয়ে কাপড় বদলে বেরিয়ে গেল। বলে গেল : 'কেউ এলে বলে দিও, আমি এই এলাম ব'লে। ভয় টয় পেয়ো না যেন।'

দেহটা যেন অসাড় হয়ে গেল, একটা বেঞ্চিতে ব'সে পড়ল মা। আঁধার মুখে পাভেল তাকায় তার দিকে, বলে :

'কোথাও না হয় গিয়ে থাকগে কিছুক্ষণ।'

ছেলের কথায় কলজেয় ঘা লাগে।

'না, কেন যাব ?'

নবেম্বরের শেষ। হিম-জমাট মাটির ওপর মিহিমিহি বরফ পড়েছে। ছেলে চলে গেল। বরফগুলো মচ্‌মচিয়ে ওঠে তার পায়ের নীচে। জানালার শার্সীর গায়ে ঘাপটি মেরে আছে কালো কালো অন্ধকার। মা দুই হাতে বেঞ্চি চেপে দোরের দিকে তাকিয়ে ওখানেই বসে রইল...

গাটা ছম্‌ছম্‌ করে... অদ্ভুত পোশাকপরা, সাংঘাতিক কতগুলো লোক চারদিক থেকে আসছে অন্ধকারে গুঁড়ি মেরে চুপিসারে। ঘিরে ফেলেছে বাড়ীটাকে। আঙ্গুল দিয়ে দেয়াল হাতড়ে হদিস খুঁজছে।

কে যেন কোথা শীষ্‌ দিয়ে একটা সুর ভাঁজছে। চারদিকের থম্‌থমানির ওপর দিয়ে হাল্কা ভাবে কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে ভাসছে শব্দটা। ভারী মিঠে, কেমন যেন কাঁদন-জাগানো সুর। শূন্য আঁধারে কিসের সন্ধানে ঘুরছে। ওই ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে—একেবারে জানালার গায়ে এসে থেমে গেল—দেয়ালের কাঠের মধ্যে যেন সেঁধিয়ে গেল।

গেটের কাছে কার পায়ের আওয়াজ—হুট্‌পাট্‌ ক'রে আসছে কে যেন। মা চমকে উঠে দাঁড়ায়। ভ্রূ দুটো যেন টান খেয়ে ওপর দিকে ছিট্‌কে উঠল।

দরজা খুলে মস্ত বড় একটা লোম-ওয়ালা টুপী পরা মাথা ঢুকল। তারপর নীচু চৌকাঠের মধ্যে দিয়ে একটা ঢ্যাঙ্গা দেহ কুঁজো হ'য়ে গলিয়ে এল। ভেতরে এসে মানুষটা সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে মস্ত একটা নিশ্বাস নিয়ে ডান হাতটা তুলে মাকে বলে : শুভ-সন্ধ্যা !

কথা না ব'লে মাথা ঝুঁকিয়ে মা পাল্টা নমস্কার জানাল।

'পাভেল বাড়ী আছে ?'

ধীরে ধীরে লোমের কোটটা খুলে নিল লোকটা। একটা পা তুলে টুপী দিয়ে জুতো থেকে বরফ ঝাড়ল; তারপর আর একটা জুতো থেকে। শেষে টুপীটা এক কোণে ছুঁড়ে ফেলে ঘরের মধ্যে এ'ল। একটা চেয়ার নেড়ে চেড়ে দেখল বসা চলবে কিনা। তারপর ব'সে প'ড়ে মুখের সামনে হাত আড়াল ক'রে মস্ত একটা হাই তুলল। কদম-ছাঁট চুল, সুন্দর চৌকস মাথার গড়ন। পালিশ ক'রে কামান মুখ, কিন্তু গোঁফ-জোড়া ঠিক আছে, তার চিকন ডগা ঝুলে পড়েছে নীচের দিকে। ডাগর ডাগর বেরিয়ে-আসা কটা চোখ দুটো দিয়ে ঘরখানাকে পাঁতি পাঁতি ক'রে দেখতে লাগল।

পায়ের ওপর পা দিয়ে ব'সে দুলতে দুলতে জিজ্ঞাসা করে :

'নিজেদের বাড়ী না ভাড়া ?'

'ভাড়া।'

'বড় ছোট, জায়গা নেই বিশেষ মনে হ'চ্ছে।'

'খোকা আসবে এক্ষুণি, একটু ব'সো।'

লম্বা লোকটা জবাব দেয় : 'বসেই তো আছি।'

মায়ের যেন বুকে বল আসে। বড় ঠাণ্ডা লোকটি, গলার স্বরটাও নরম, মুখখানাও সাদাসিধে। স্ফটিকের মত স্বচ্ছ পরিষ্কার চোখ দু'টি। দৃষ্টিটা এমনি যেন ওটা ওর প্রাণের খোলা দরজা—কেমন আপন-করা, অথচ দুষ্টু দুষ্টু ভাব। এতখানি লম্বা দুই ঠ্যাং, চোখা-চাখা গড়নের ঢ্যাঙ্গা দেহটা নুয়ে প'ড়েছে। সারা মানুষটার মধ্যে কি যেন আছে—কাছে টানে দূরের মানুষকে। মায়ের বড় ইচ্ছে হয়

ছেলেটার পরিচয় শুধায়, দশটা কথা শুধায়, কোত্থেকে এসেছে, খোকার সাথে তার কদ্দিনের আলাপ। কিন্তু অবসর দিলেনা ছেলে, নিজেই শুধিয়ে বস্‌ল ফস্‌ ক'রে :

'ও মাগো, অমন ক'রে কে মেরেছে তোমায় গো?' জিজ্ঞাসা করার ধরনটা মমতা-ভরা ছিল, চোখেও দুলল স্নিগ্ধ হাসি। কিন্তু মায়ের অপমান লাগল। ঠোঁট চেপে অত্যন্ত কাঠ-খোট্টা রকম ভদ্রভাবে জবাব দিল :

'তোমার তা দিয়ে দরকার কি?'

সমস্ত শরীরটাকে মায়ের দিকে ঝুঁকিয়ে জবাব দেয় অতিথি :

'রাগ করছেন কেন, মা? আমি কিছু ভেবে জিজ্ঞাসা করিনি। আমার যে মা আমায় পেলেছে তারও অমনি একটা দাগ আছে কি না? একটা মুচির সঙ্গে থাকত। আমার মা ছিল ধোবা, আর সেই লোকটা ছিল মুচি। কি জানি কোথায় কি ক'রে জুটল এসে। মায়েরও কপাল পুড়ল। একদিন একটা যন্ত্র ছুঁড়ে মারল মাকে। তাইতে ঠিক অমন একটা দাগ হ'য়ে রইল। বাপস্‌! কি মারই মারত ধ'রে মাকে। আমি তখন এসেছি মার কাছে। তাইতে সব দেখেছি। কি যে ভয় করত! ভয়ে আমার সারা গায়ের রক্ত জল হ'য়ে যেত।'

এই প্রাণ-খোলা কথায় মায়ের রাগ জল হ'য়ে গেল। এখন ভয় হ'ল অতিথির ওপর রুক্ষ হয়েছে, পাভেল এসে রাগ করবে না তো? অপরাধীর হাসি হেসে বললে :

'আমি ঠিক রাগ করিনি। তবে বড় হঠাৎ কথাটা পাড়লে কিনা। বলতে নেই, চ'লে গেছেন। আমার স্বামীরই মারের দাগ ওটা। আচ্ছা, তুমি কি তাতার*?'

লোকটা পা নাচিয়ে দাঁত বার ক'রে হেসে উঠল, মনে হ'ল যে ওর কান দুটো অবধি ন'ড়ে উঠল। পরক্ষণেই গম্ভীর হ'য়ে গেল। 'না, এখনও হতে পারি নি।'

ঠাট্টাটা বুঝতে পেরে হেসে বলল মা : 'তোমার কথা শুনে রুশ ভাষা ব'লে মনে হয় না কি না!'

হাসতে হাসতে অতিথি জবাব দেয়, 'ঠিকই বলেছেন। রুশ ভাষার চাইতে অনেক ভালো ভাষা আমার। আমার বাড়ী কানেভ্‌এ। আমি খখল†।'

'এদিকে অনেক দিন আছো?'

'শহরে এসেছি প্রায় বছর খানেক। কিন্তু কারখানায় মাত্র এই এক মাস হ'ল। এখানেই হয়ত থেকে যাব। আপনার ছেলে এবং আরো জন কয় বেশ ভালো ভালো লোকের সাথে আলাপ হয়েছে।' গোঁফ জোড়া টানতে টানতে জবাব দেয় অতিথি।

বেশ ভালো লাগে ছেলেটিকে। তার ওপরে অমন ক'রে ছেলের তারিফ ক'রেছে, কি যে ওকে ক'রবে মা ভেবে পায় না।

'একটু চা দি?' জিজ্ঞাসা করে।

'একা খাব কেন? দাঁড়ান আসুক সবাই।' কাঁধ দুটোকে উঁচিয়ে জবাব দেয় খখল।

ওর কথা শুনে আবার ভয় করে মা'র। কি জানি অন্যরা আবার কেমন মানুষ হবে। এ ছেলেটির মতই যেন হয়।

বাইরে আবার পায়ের শব্দ শোনা যায়। উঠে দাঁড়ায় মা। অবাক হ'য়ে যায়।

* পুরনো কাপড়-জামা যারা বিক্রী করত তাদের সাধারণত 'তাতার' বলা হত।
† উক্রেন-বাসীদের রুশ ভাষায় চলতি নাম।

তাড়াতাড়ি দরজা খুলে ঢুকল একটি মেয়ে। ছোট্টখাট্টো দেখতে, কিষাণ মেয়ের মত সাদাসিধে মুখ, চুলের রাশ একটা মোটা বেণীতে বাঁধা।

'দেরী হ'য়ে গেছে বুঝি আমার?' আস্তে নরম সুরে বলে মেয়েটি।

দরজার দিকে চেয়ে জবাব দেয় খখল:

'আরে এসো! কে বললে দেরী হয়েছে! একটুও নয়।'

'বাঁচলাম। আপনি নিশ্চয়ই পাভেল মিখাইলোভিচ্-এর মা! নমস্কার, আমার নাম নাতাশা।'

'তোমার আসল নাম কি মা?' মা জিজ্ঞাসা করে।

'ভ্যাসিলিয়েভ্না। আপনার?'

'পেলাগেয়া নিলোভ্না।'

'আমাদের পরিচয় তো হ'য়ে গেল!'

'হল বৈকি।' হাসিমুখে জবাব দেন মা। কিন্তু বুকের মধ্যে কেমন খচ্ ক'রে ওঠে।

খখল নাতাশার কোট-টুপী খুলতে সাহায্য করতে করতে জিজ্ঞাসা করে: 'বাইরে খুব ঠাণ্ডা?'

'ওরে বাবা, মাঠ পেরুতে প্রাণ বেরিয়ে গেছে! যা হাওয়া!'

অতি পরিষ্কার কণ্ঠ। অতি মিঠে। ছোট্ট মুখটুকু, ওষ্ঠ দুটি নিটোল, দিব্যি গোলগাল চক্‌চকে চেহারা, যেন পীচ্ ফলটি। কোট্ খুলে জমে-যাওয়া হাত দিয়ে গোলাপী গাল দুটো ঘ'সতে ঘ'সতে আর মেজেতে জুতো খট্‌খট্ করতে করতে পাশের ঘ'রে গিয়ে ঢুকল।

মা লক্ষ্য করে, মেয়ের পায়ে রবারের বুট্ নেই। হিহি ক'রে কাঁপতে কাঁপতে নাতাশা বলে:

'উঃ এক্-কে বা-র্-রে জ-জমে গেছি যে!'

'রোসো সামোভারটা চড়িয়ে দিচ্ছি। এক মিনিটে হ'য়ে যাবে।' ছুটে মা গিয়ে রান্না ঘরে ঢোকেন।

মেয়ে যেন কতকালের চেনা। মায়ের প্রাণের মিহি দরদটুকু ওর ওপর ঝ'রে পড়ে। পাশের ঘরের কথা-বার্তা কানে আসে। মায়ের মুখ হাসিতে ভ'রে ওঠে।

'এতক্ষণ কচ্ছিলে কি নাখোদকা বলতো?' মেয়েটি শুধায়।

শান্তভাবে খখল জবাব দেয়: 'কি আর করব? পাভেলের মা'য়ের কি সুন্দর চোখ দেখেছ? আমার মায়ের—মানে, নিজের মায়ের চোখও ঠিক ঐ রকম। প্রায়ই মনে হয় মার কথা। কেন জানিনে মনে হয় মা বেঁচে আছেন।'

'কিন্তু তুমি তো বলেছ, তিনি মারা গেছেন।'

'আমার নিজের মা নয়, যিনি পেলেছিলেন সেই মা মারা গেছেন। আমি আমার নিজের মা'র কথা বলছি। কে জানে হয়ত কিয়েভ্-এর রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে মেগে বেড়াচ্ছেন। আর ভদ্‌কা খেয়ে মাত্‌লামো ক'রে পুলিশের মার খাচ্ছেন...'

'অভাগা ছেলে!' বুক-ফাটা দীর্ঘ-নিশ্বাস প'ড়ে মায়ের। তাড়াতাড়ি ক'রে নীচু গলায় কি যেন বলে নাতাশা। ওর গলায় কোন উত্তেজনা নেই। খখলের গলা ঝংকার দিয়ে ওঠে:

'এখনও খুকীটিই র'য়ে গেলে। নাক টিপ্‌লে হয়তো দুধ গলবে। একটা

লোককে সংসারে আনা ভারী সোজা। কিন্তু তাকে মানুষ করা কঠিন। বুঝলে!'

মুগ্ধ হ'য়ে যায় মা। ভারী ইচ্ছে করে খখলকে আদর ক'রে দুটো কথা বলে। কিন্তু সেই মুহূর্তেই দরজা ঠেলে ঢুকল এসে নিকোলাই ভেসভ্শিচকফ, দাগী চোর দানিলোর ছেলে। সারা এলাকা জুড়ে ভারী বদনাম নিকোলাইএর, কারো সাথে মেশেনা; প্যাঁচার মত মুখ ক'রে সবার কাছ থেকে সরে সরে থাকে। এবং এ জন্য ওর ওপরে লোকের অত্যাচার কম নয়।

মা অবাক হ'য়ে জিজ্ঞাসা করে : কি ব্যাপার নিকোলাই, কিছু দরকার আছে?'

মাকে একটা নমস্কারও করলে না। বসন্তের দাগ-ওয়ালা চওড়া মুখটা হাতের তেলো দিয়ে মুছতে মুছতে জিজ্ঞাসা করল :

'পাভেল বাড়ী আছে?'

'না।'

ভেতরের দিকে তাকিয়ে ঘরে এসে ঢুকল :

'নমস্কার, কমরেড্।'

মার ভালো লাগে না। অবাক হ'য়ে যায় নাতাশা হাত বাড়িয়ে দিলে ওর দিকে। দেখে মনে হচ্ছে ভারী খুশি হয়েছে ওকে দেখে সে।

নিকোলাইএর পর এলো আরো দু'জন—নেহাৎ ছেলেমানুষ। একজনের নাম ফিওদর। তাকে চেনে মা। কারখানার পুরোনো কর্মী সিজফ্এর ভাইপো। চোখা মুখ, এক মাথা কোঁকড়া চুল; কপালটা উঁচু। দ্বিতীয় ছেলেটি লাজুক গোছের। সোজা চুল পেতে আঁচড়ান। এ ছেলেটি চেনা নয়, কিন্তু ওকে দেখে মার ভয় করল না। সব শেষে এল পাভেল। তার সাথে কারখানারই দু'জন শ্রমিক।

'সামোভার চড়িয়ে দিয়েছ মা? ওঃ ভারী লক্ষ্মী মেয়ে।' মিঠে ক'রে পাভেল বলে।

বিশাল কৃতজ্ঞতা ঢেউ দিচ্ছে মায়ের বুকে। কেন, কিসের জন্য কিছুই ঠাহর হয় না। ছেলেগুলোর জন্য কি যে ক'রবে ঠিক পায় না। শুধায় :

'দৌড়ে গিয়ে ভদ্কা কিনে নিয়ে আসব?'

'না না ওসব কিছু চাই না।' হেসে জবাব দেয় পাভেল।

হঠাৎ মনে হয় মায়ের—মজা দেখবার জন্য ছেলে ওকে মিছেমিছি ভয় দেখিয়েছে বাড়িয়ে বাড়িয়ে ব'লে। আস্তে ছেলের কানে কানে জিজ্ঞাসা করে :

'এরাই বুঝি তারা? সেই টের পেলেই যাদের পুলিশে ধরবে!'

'হ্যাঁ গো হ্যাঁ?' ও ঘরে যেতে যেতে পাভেল বলে।

মা স্নেহগদগদ স্বরে পেছন থেকে হাঁকেন :

'যাঃ যত বাজে বকতেও পারিস্।' মনে মনে ভাবে দরদে ভরে : 'এখনও একেবারে ছেলেমানুষ!'

ছয়

সামোভার নিয়ে আসে মা। টেবিলের চার ধারে ভিড় ক'রে বসে আছে সব। নাতাশা কোণের দিকটায় আলোর সামনে। তার হাতে একখানা বই।

'জনসাধারণের অবস্থা এমন বিশ্রী কেন—তার কারণ বুঝতে হ'লে......', নাতাশা বলে।

খখল জুড়ে দেয় : 'এবং তারা নিজেরাই বা এমন বিশ্রী কেন...'

'একেবারে মূলে গিয়ে পেঁছাতে হবে। দেখতে হবে ভালো ক'রে...'

'দেখো দেখো, বাছারা, ভালো ক'রে দেখ... ভালো ক'রে...' চা তৈরী করতে করতে মনে মনে গুন্‌গুনিয়ে যায় মা।

সবাই চুপ হয়ে যায়।

পাভেল ভ্রূ কুঁচকে বলে : 'কি বলছ মা?'

'না, তোদের কিছু বলিনি। এই নিজের মনেই বলছিলাম।' অপ্রস্তুত হয়ে বলে মা, 'ভাবছিলাম, সত্যি, একটু দেখ তোরা।'

নাতাশা, পাভেল খিল খিল করে হেসে ওঠে।

'চা পেয়ে বাঁচলাম। ধন্যবাদ নেন্‌কো।'* খখল বলে।

'দাঁড়াও বাবা! ধন্যবাদটাদ পরে দিও। আগে খেয়ে দেখতো।' মা বলে।

তারপর ছেলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে : 'আমি থাকায় অসুবিধা হচ্ছে না তো?'

'সে কি, মা!' নাতাশা জবাব দেয়, 'আপনি হলেন বাড়ীর গিন্নী, আমরা আপনার অতিথি। আপনি থাকলে অসুবিধা হবে! কিন্তু কই মা, চা কই! জলদি জলদি। জমে গেলাম যে। কাঁপতে কাঁপতে হাড়ে হাড়ে ঠক্‌ঠকানি লাগছে।' শিশুর মতো কাতর গলায় বলল সে।

'এই যে দিচ্ছি, এই যে। এক মিনিট।' মা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন।

নাতাশা চা খেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। তারপর বেণীটাকে সামনের দিকে টেনে এনে হলদে মলাট-ওলা ছবির বইটা থেকে আবার পড়তে শুরু করে। মা চা ঢালে আর শোনে। সন্তর্পণে হাত পা নাড়ে, যেন বাসন-পত্রের শব্দ না হয়। সামোভারে ফুটন্ত জলের গম্ভীর শোঁসানির তলায় নাতাশার মিঠে গলার আওয়াজ ডুবে যায়। ঘরের মধ্যে যেন গল্পের লাটাই থেকে সুতো খুলে চলেছে...সেই কবে বুনো মানুষের দল থাকত পাহাড়ের গুহায়, পাথর ছুঁড়ে বনের পশু-পাখী শিকার করত......রূপ-কথার মতো লাগে। এর মধ্যে খারাপটা কি আছে যে পড়তে নেই! কিন্তু বেশিক্ষণ শুনতে ভালো লাগে না। কেমন ক্লান্ত লাগে। সুতরাং অতিথিদের মুখগুলিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল মা। ওরা কেউ টের পেল না।

নাতাশার পাশেই বসেছে পাভেল। ওই সবচেয়ে দেখতে ভালো। নাতাশা পড়ছে প্রায় বইয়ের ওপর মাথা ঠেকিয়ে। সামনে এসে-পড়া দুরন্ত চুলের গোছা-গুলোকে হাত দিয়ে সরিয়ে দেয়। কখনও বা বই থেকে চোখ তুলে বন্ধুদের দিকে সস্নেহে তাকায়; মাথাটায় ঝাঁকুনি দিয়ে নীচুস্বরে নিজের মত প্রকাশ করে। খখল টেবিলের একধারে এলিয়ে বসে নাকের ডগার ওপর দিয়ে আড়-চোখে গোঁফ

---

* উক্রেন দেশের লোকেরা আদর ক'রে 'মা'কে বলে নেন্‌কো।

জোড়াকে দেখে আর আঙ্গুল দিয়ে খোঁটে। ভেসভ্শিচকফ কাঠের মত সোজা হয়ে চেয়ারে বসে আছে দুই হাঁটুর ওপর দুই হাত চেপে; ভ্রু-শূন্য, বসন্তের দাগ-ওয়ালা মুখখানায় কোন ভাবের বিকার নেই। যেন মুখ নয়, মুখোস। ঝকঝকে পেতলের সামোভারের গায়ে ওর মুখের ছায়া পড়েছে, ছোট-ছোট চোখ দিয়ে নিবিষ্ট মনে ও তাই দেখছে, নিশ্বাসও পড়ছে না প্রায়। পড়া শুনতে শুনতে ছোট্ট ফিওদরের ঠোঁট নড়ে নিঃশব্দে, যেন বইয়ের কথাগুলো আপন মনে আওড়ায়। হাঁটুর ওপর কনুই ভর করে, হাতের তেলোয় মুখ রেখে ওর বন্ধু মাথা নীচু করে শুনছে। ঠোঁটের কোণে কেমন একটা চিন্তিত হাসি। যে-দু'জন পাভেলের সঙ্গে এসেছে, তাদের একজনের মাথায় লাল কোঁকড়া চুল আর সবুজ চোখ। কেবলই উস্‌খুস্‌ করছে যেন কিছু বলতে চায়। আর একজনের কদম-ছাঁট হালকা সোনালী চুল; দুই হাতের মধ্যে মাথা রেখে মাটির দিকে চেয়ে আছে আর আঙুল দিয়ে আস্তে আস্তে মাথায় টোকা মারছে। মুখটা দেখা যায় না, হাতের আড়াল পড়েছে। ঘরখানায় কেমন যেন চমৎকার একটা আরামের হাওয়া। অদ্ভুত লাগে মায়ের। এমনটি তো আগে কখনও পাননি। নাতাশার মিঠে গলা শুনতে শুনতে মনে হয় আগের দিনের কথা—সন্ধ্যেবেলায় কি বিশ্রী হট্টগোল চলত। বাড়ীর পুরুষদের মুখ দিয়ে ভক্‌ ভক্‌ করে বের হত ভদকার গন্ধ, আর কি অশ্লীল নোংরা তাদের ভাষা। কি কুৎসিত ভাষায় ঠাট্টা তামাসা করত সবাই। মনে হতেই হৃৎপিণ্ডটা কুঁকড়ে ওঠে। মায়া হয় নিজের ওপর।

স্বামীর সাথে বিয়ের ব্যাপারটাও মনে পড়ে। একটা জলসা ছিল এক জায়গায়। অন্ধকার একটা দরজার ধারে দেয়ালের গায়ে ওকে চেপে ধরে ঘোঁত ঘোঁত করে জিজ্ঞাসা করল লোকটা : 'বল, আমায় বিয়ে করবি কি না!' অপমানে মরে যাচ্ছিল ও। কিন্তু লোকটা নাছোড়বান্দা। অসভ্য। দুই হাতের মুঠোয় শক্ত করে ওর স্তন ধরে কেবলি চাপতে লাগল। তার ভিজে গরম নিশ্বাস ভস্‌ভসিয়ে ওর মুখে চোখে এসে লাগছিল। ব্যথায় ওর সর্বশরীর টনটন করে উঠল। হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করছিল ও। কিন্তু লোকটা গর্জে উঠল :

'কোথায় যাচ্ছিস? জবাব দিয়ে তবে যাবি।'

লজ্জায় দুঃখে ও মরমে মরে যাচ্ছিল। মুখ দিয়ে কথা সরছিল না।

এমনি সময় কে একজন এসে যাওয়ায় তাকে ছেড়ে দিল জানোয়ারটা। কিন্তু বলে দিল, রবিবার ঘটক যাবে। ওর কথার অন্যথা হয়নি।

চোখ বন্ধ হয়ে আসে মায়ের। গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

ভেসভশিচকফ্-এর প্রতিবাদের কণ্ঠ শোনা যায় : 'মানুষ কেমন ছিল তা জানতে চাইনে আমি। জানতে চাই, তাদের জীবন কেমন হওয়া উচিত।'

'ঠিক কথাই বলেছ।' লাল-মাথা-ওয়ালা উঠে পড়ে বলে।

ফিওদর চেঁচিয়ে ওঠে, 'না আমি তা স্বীকার করি না।'

তর্ক বেধে যায়। কথা ছোটে যেন আগুনের হল্কা। মা বোঝে না ওরা অমন করে চেঁচায় কেন। উত্তেজনায় সকলের মুখ লাল, কিন্তু চটেনি কেউ; অথচ এতকাল মা এর বিপরীতটাই শুনে এসেছে। একটি নোংরা কথা কারো মুখে নেই।

মেয়েটি সামনে আছে কি না, নিশ্চয়ই সেজন্য সামলে আছে ওরা, সিদ্ধান্ত করেন মা।

নাতাশা নিবিষ্ট দৃষ্টিতে সবাইকে লক্ষ্য করে। ওর চোখের ভাব—যেন ভারী

ছেলে-মানুষ সব। ওর এই গম্ভীর ভাবখানা বড় ভালো লাগে মায়ের।

হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে নাতাশা : 'দাঁড়াও কম্‌রেড্‌রা...' সবাই কথা থামিয়ে ওর মুখের দিকে চায়।

'যারা বলছ যে আমাদের সব কিছুই জানা দরকার, ঠিক কথাই বলেছ। আমাদের মধ্যে জ্ঞানের আলো জ্বললে, তবে তো যারা আঁধারে আছে তাদের ঘরে আলো জ্বালতে পারব। সব কিছুর ঠিক আর সাচ্চা জবাব আমাদের হাতের কাছে থাকা চাই। সুতরাং যত সত্য আর যা কিছু মিথ্যা সবই আমাদের জানতে হবে, পুরোপুরি...'

ওর কথার তালে তালে খখলের মাথা নড়ে। ভেসভ্‌শিচকফ্‌ লাল-মাথা আর পাভেলের সাথে যারা এসেছিল তাদের মধ্যে একটি ছেলে—এরা এক দল হলো। মায়ের কেন জানি ভালো লাগে না।

নাতাশার কথা শেষ হলে পাভেল দাঁড়ায়।

'শুধু এক পেট খেতে পাওয়াটাই আমাদের সব নয়। যারা আমাদের ঘাড়ের ওপর চেপে বসে আছে, আমাদের চোখে ঠুলি এঁটে রেখেছে, তাদের দেখাতে হবে আমরা সব দেখতে পাচ্ছি। আমরা বোকা নই, জানোয়ারও নই যে পেট পুরে খেতে পেলেই খুশি থাকব। শত্রুদের দেখাতে হবে, যত নীচেই তারা আমাদের ফেলে রাখুক, যত অত্যাচারই করুক, আমরা মানুষ; এবং সেই হিসেবে জ্ঞানের মাপকাঠিতে তাদের চেয়ে খাটো তো নই-ই, বরঞ্চ অনেক ক্ষেত্রে বড়।'

ছেলের কথা শুনতে শুনতে মায়ের বুকটা যেন গর্বে নাচতে থাকে। কি সুন্দর কথাগুলো বললে!

'খাবার আছে অনেকের ঘরেই,' খখল বলে, 'কিন্তু সাচ্চা মানুষ আঙুলে গোনা যায়। এই যে আমরা জানোয়ারের জীবন নিয়ে এঁদো পচা পাঁকের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে আছি তার ওপর পুল বাঁধতে হবে। ওই হলো আমাদের একমাত্র কাজ, বন্ধুগণ! সেই পুলের ওপর দিয়ে তৈরি হবে ভাবীকালের মানুষে মানুষে মিতালীর রাজ্যে পোঁছুবার পথ।'

ভেসভ্‌শিচকফ্‌ ঝেঁঝে বলে : 'লড়াইয়ের সময় যখন হ'য়ে গেছে হাত মুড়ে বসে আছ কেন সব?'

মাঝরাত্তিরের পর সভা ভাঙল। সব থেকে আগে উঠে চলে গেল লাল-মাথা আর ভেসভ্‌শিচকফ্‌। এ ব্যাপারটাও মা'র ভালো লাগে না। মনে মা ভাবে : 'বাবা, কি তাড়া!' আড়ষ্টভাবে ঝুঁকে বিদায় দেয় তাদের।

'নাখোদকা, আমায় একটু বাড়ী পোঁছে দেবে?' নাতাশা জিজ্ঞাসা করে।

'আলবৎ! এ আবার বলতে হয়?' খখল জবাব দেয়।

রান্নাঘরে গিয়ে নাতাশা তার কোট টুপী পরে। মা লক্ষ্য করে ওর মোজাটা একেবারে পাতলা। বলে :

'এই শীতে এমন হালকা মোজা পরেছ! এতে হয় কখনও! দেব এক জোড়া পশমী মোজা বুনে? নেবে মা?'

'কিন্তু পশমের মোজায় যে ভারী চুলকোয়!' হাসতে হাসতে বলে নাতাশা।

'আচ্ছা, না চুলকোলেই তো হল।'

নাতাশা স্থিরভাবে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। মার কেমন বিব্রত বোধ হয়। বলে :

'কিছু মনে করো না মা! আমি বোকা মুখ্যু মানুষ। কিন্তু কথাটা বলেছিলাম আমি প্রাণ থেকে।'

মায়ের হাতে একটা আবেগ-ভরা চাপ দিয়ে শান্তভাবে নাতাশা বলে : 'কি যে বলেন মা!'

নাতাশার পেছন পেছন বেরিয়ে যেতে যেতে মায়ের চোখের দিকে তাকিয়ে খখল বলে : 'শুভরাত্রি, নেন্‌কো।'

মা ছেলের দিকে চায়। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একটু একটু হাসছে সে।

'হাসছিস্ কেনরে?' অপ্রস্তুত হয়ে মা জিজ্ঞাসা করে।

'না না কিছু না। মনটা আজ খুশি আছে কিনা।'

'দেখ আমি বুড়ো হাবড়া, বোকা মুখ্যু ঠিকই, কিন্তু ভালো জিনিসের কদর করতে আমিও জানি।' একটু রাগ করে বলে মা।

'বেশ বেশ! শুতে যাও তো এখন লক্ষ্মী মেয়ে! অনেক রাত হলো।'

'যাচ্ছি বাপু, যাচ্ছি।'

টেবিলের কাছে গিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে এঁটো বাসন-পত্র সরাতে আরম্ভ করে। মনের খুশিতে এই শীতের মধ্যেও ঘাম ছুটল। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি সুন্দর সব! এত শান্তিতে কাটল।

'ভালোই করেছিস্, খোকা। বড় ভালো ছেলে তোর ওই খখল আর ওই মেয়েটি। একরত্তি মানুষ, কিন্তু কি চট্‌পটে, কি সুন্দর মেয়ে। কে রে মেয়েটি?'

'শিক্ষয়িত্রী, মা, ও।' মেজেতে পায়চারি করতে করতে পাভেল জবাব দেয়।

'বোধ হয় ভারী গরীব। না রে? কাপড় চোপড় দেখলেই বোঝা যায়। এত ঠাণ্ডা, কিন্তু গরম জামাটামা তেমন কই! ওর বাবা মা কোথায় থাকেন?'

'মস্কো-তে।'

তারপর মায়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কোমল স্বরে গম্ভীর ভাবে বলে :

'ওর বাবা মস্ত বড় লোক। লোহার ব্যবসা করেন। খান কয় বাড়ী আছে। ও এ পথে এসেছে বলে তিনি ওকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। ছোটবেলা থেকে ঐশ্বর্যের মধ্যে বড় হয়েছে। পায়ে কুটোটি ফোটেনি। হাত পাতলে দুনিয়া এসে হাজির হয়েছে হাতের তেলোয়। কিন্তু আজ এই রাত্তিরে একা একা পাঁচ ছয় মাইল পথ ভেঙে যেতে হবে ওকে...'

শুনে চম্‌কে ওঠে মা। কপাল কুঁচকে ছেলের দিকে তাকিয়ে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়েন। তারপর আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করেন :

'হ্যাঁ রে! কোথায় গেল? শহরে?'

'হ্যাঁ মা।'

'আহা রে! চ্‌চ—চ্‌চ!..ভয় করবে না ওর?'

'সে তো দেখলেই, ভয় ডর ওর কিছু নেই।' হেসে বলে পাভেল।

'কিন্তু গেল কেন? রাতটা এখানেই তো থাকতে পারত। আমার কাছে শুয়ে থাকত।'

'না, সে ঠিক হতো না। ভোর বেলা কেউ ওকে এখানে দেখে ফেলত হয়তো। তা আমি চাই না।'

চিন্তিত ভাবে মা জানালার বাইরে তাকায়। আস্তে আস্তে বলে :

'বুঝতে পারিনে, পাভেল, এর মধ্যে বিপদেরই বা কি আছে, মানা করারই বা কি

আছে। অন্যায় তো কিছু করছিসনে তোরা!'

ঠিক যেন নিশ্চিন্ত হতে পারে না; একটা সন্দেহ থেকে যায়। পাভেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে সমর্থনের আশায়।

'না, অন্যায় কিছু করিনে আমরা,' জোরের সাথে জবাব দেয় পাভেল। 'কিন্তু তবু আমাদের সবাইকে জেলে যেতে হবে, জেনে রেখো।'

মা'র হাত কাঁপতে থাকে। চাপা গলায় বলে :

'ভগবান করুন, তোর যেন কিছু না হয়!'

অত্যন্ত কোমল স্বরে পাভেল বলে : 'তোমায় মিথ্যে আশায় রাখব না। বাঁচার কোনও পথ নেই আমার।' একটুখানি স্নিগ্ধ হাসি খেলে যায় মুখে।

'শুতে যাও এবার মা। অনেক খেটেছ আজ।'

নিজের ঘরে এসে একলা পায় নিজেকে মা। জানালায় এসে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। ভয়ঙ্কর ঠান্ডা। থম্‌থম্‌ করছে মেঘ। ঝোড়ো হাওয়া বইছে। ঘুমন্ত খুদে খুদে বাড়ীগুলোর ছাদের ওপরকার জমা বরফ ঝেঁটিয়ে ফেলছে হাওয়ায়, দেয়ালের গায়ে ছোবল মেরে রাগে ফোঁস ফোঁস করছে, সাঁ করে নীচে নেমে রাস্তার কুচি কুচি বরফের রাশ উড়িয়ে হাঁকিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। চাপা গলায় নিজের মনে বলে মা :

'যীশু! যীশু! দয়া কর!'

বুকের মধ্যে কান্না উথাল পাথাল করে। বিপদের কথা ছেলে তো বেশ শুনিয়ে গেল নির্বিকার চিত্তে। ওর আর কি! কিন্তু মায়ের মন শান্ত হতে পারে কই! রাত্তির বেলাকার অন্ধ পতঙ্গের মত একটা ভয় ছট্‌ফটিয়ে মরছে প্রাণের মধ্যে। চোখের সামনে যেন একটা বরফ ঢাকা তেপান্তরের মাঠ। তার ওপর দিয়ে ফালি ফালি ছেঁড়া সাদা হাওয়া, মিহি আর্তনাদ করে ছুটোছুটি করছে, লুকোচুরি খেলছে। মাঠের মাঝখানে একটি মেঘের আঁধার ছায়া-মূর্তি, বাতাসের সাথে লড়াই করে করে এগিয়ে আসছে। চলতে যেন আর পারছে না। বাতাস তার পায়ে পায়ে ঘূর্ণি খেয়ে জড়িয়ে যাচ্ছে, উড়িয়ে নিচ্ছে কাপড়, বরফের ছুঁচলো টুক্‌রোগুলোকে মুঠো মুঠো ক'রে ছুঁড়ে মারছে তার চোখে মুখে। বেচারার ছোট্ট পা দু'খানি ডুবে যাচ্ছে বরফের স্রোতে। যেমনি কন্‌কনে ঠান্ডা, তেমনি রুদ্র চেহারা প্রকৃতির। হেমন্তের তুফানী হাওয়ার মার খেয়ে ছোট্ট একলা ঘাসের শীর্ষটির মত নুয়ে যাচ্ছে ওর দেহটা। ওর ডান দিকে বিলের বুকটা থেকে পাঁচিলের মত হয়ে আকাশ পানে উঠে গেছে গহন জঙ্গল। এখানেই আগে রোগা রোগা বার্চগাছ আর পাতা-ঝরা আসপেন গাছেরা ফিসফিসিয়ে কথা কইতো। ওই হোথা দূরে শহরের আলোর ঝিলমিলানি দেখা যাচ্ছে।

সারা দেহ ভয়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে মায়ের...প্রাণটা আকুতি করে ওঠে : ভগবান! ভগবান! দয়া করো...

একটি একটি ক'রে দিন যায়—না কে যেন জপের মালা ফেরায় ব'সে—দিন গড়ায় সপ্তাহে, সপ্তাহ গড়ায় মাসে। প্রতি শনিবার পাভেলের বন্ধুরা আসে; যে সুদীর্ঘ সোপান বেয়ে সুদূর এক লক্ষ্যের পথ ভাঙছে তারা, প্রতিদিনকার বৈঠকে তার একটি ক'রে পৈঠা এগোয়।

নতুন নতুন মানুষ এসে পুরানোদের সাথে যোগ দেয়। ছোট্ট ঘরখানায় যেন ধরতে চায় না। নাতাশা আসে সারা দেহে ক্লান্তি নিয়ে, দেহ তার হিমে জমে কাঠ হ'য়ে যায়, কিন্তু মুখের হাসিটি তেমনিই থাকে। পাভেলের মা এক-জোড়া পশমের মোজা বুনে নিজের হাতে তার ছোট্ট পা দু'খানিতে পরিয়ে দিয়েছে। প্রথমটায় হেসেছিল নাতাশা, তারপর হঠাৎ চুপ করে একেবারে গম্ভীর হয়ে গেল।

আস্তে আস্তে বলতে লাগল : 'আমার একজন ধাই-মা ছিলেন। আশ্চর্য স্নেহ-প্রবণ ছিলেন। আমার বড় অদ্ভুত লাগে মা, কি দুঃখের জীবন শ্রমিকদের! কি অবিচার, কি অত্যাচার চলে বেচারাদের ওপর দিয়ে, কিন্তু তাদের...' অনেক দূরের, ওর কাছ থেকে বহু বহু দূরের কাদের দিকে ইশারা করে বলে, '...তাদের চেয়ে অনেক বেশী নরম মন ওদের!'

পেলাগেয়া বলে : 'কি মেয়ে গো! বাপ মা সবাই ছেড়েছে..!'

দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ে। মুখ দিয়ে কথা সরে না; মনের কথাকে ভাষা দিতে পারে না। কিন্তু নাতাশার দিকে চেয়ে চেয়ে আবার এক অজানা কৃতজ্ঞতায় বুক ভরে ওঠে। ওর সামনে মাটির ওপর ব'সে পড়ে। নাতাশা সামনের দিকে ঝুঁকে কি যেন ভাবতে ভাবতে একটু একটু হাসে। বলে :

'ঠিকই বলেছেন, বাপ-মায়ের স্নেহ আমার কপালে জুটল না। কিন্তু সে না হয় নাই হল। আমার বাবা ভাই সব ভারী রাগী মানুষ। মদ খেয়ে টং হয়ে থাকে। আমার বড় বোন আছে একটি, সেও বড় দুঃখী। বিয়ে করেছে বলতে গেলে এক বুড়োকে। ওর স্বামী ওর থেকে বয়সে অনেক বড়। খুব বড়লোক। কিন্তু যেমনি কঞ্জুস তেমনি ইতর। মায়ের জন্য আমার বড় কষ্ট হয়। আপনারই মতো সাদাসিধে সরল মানুষ। এই এতটুকু ছোট্ট, যেন ইঁদুরটি; ঠিক ইঁদুরের মত ছুটোছুটিও করতে পারেন, আর তেমনি ভীরু। এক এক সময় এত দেখতে ইচ্ছে করে মাকে!'

বিষণ্নভাবে মাথা নেড়ে মা বলে : 'বেচারা!'

হঠাৎ নাতাশা মাথাটা পেছন দিকে সরিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল যেন কিছু ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে।

'না না, এক এক সময় আমার খুব ভালো লাগে। মনে হয় আমার মত সুখী বুঝি কেউ নেই!'

মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে যায়, চোখ ঝল্‌সে ওঠে। দুই হাত মায়ের কাঁধের ওপর রেখে বলে গভীর আবেশে :

'যদি জানতেন, কি বিরাট কাজ আমরা হাতে নিয়েছি, যদি বুঝতেন.. !'

পেলাগেয়া ভ্লাসফের মনে একটু যেন হিংসে হয়।

'একে তো বুড়ো হাব্‌ড়া, তায় মুখ্যু, লেখাপড়াও জানিনে...' অত্যন্ত ব্যথার স্বরে উঠতে উঠতে বলে......

...পাভেল এখন আগের থেকে বেশী কথা বলে, আরো আগ্রহ দিয়ে জোর দিয়ে বলে। দিনের পর দিন রোগা হয়ে যাচ্ছে ও। মায়ের মনে হয় নাতাশার সাথে কথা বলার সময়, ওর চোখের কঠিন ভাবটা যেন কোমল হ'য়ে আসে। ব্যবহার, ভাব-ভঙ্গি সব সহজ হয়ে যায়। মনে মনে ভাবে : 'তাই হোক, তাই হোক, ভগবান করুন তাই যেন হয়।' মুখে মৃদু হাসির আভাস দেখা দেয়।

বৈঠকী তর্ক-বিতর্ক চরমে উঠলে খখল উঠে দাঁড়িয়ে ঘণ্টা-পেটা হাতুড়ীর মত সামনে পেছনে দুলতে দুলতে মিঠে কথা বলে সবাইকে ঠাণ্ডা করে। কাজ কাজ করে সকলকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে গোমরা-মুখো ভেসভ্‌শিচকফ্‌ আর কেবলি তর্ক করে লাল-মাথা সাময়লফ্‌। ওদের পেছনে আছে ইভান বুকিন—ওকে দেখলে মনে হয় এক্ষুনি ধোপ খেয়ে এল। ইয়াকভ্‌ সামফ্‌ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ফিট্‌ফাট মানুষ; কথা কয় কম, কিন্তু যখন কয় তার ওজন থাকে। এই লোকটি আর ফিওদর মাজিন সর্বদা পাভেল আর খখল-এর পক্ষ নেয় তর্কাতর্কির সময়।

কখনও কখনও নাতাশার জায়গা দখল করে ফর্সা, চশমাপরা লোকটি—নিকোলাই ইভানোভিচ্‌। কোন এক দূর গাঁয়ে ওর জন্ম, তার ছাপ রয়েছে ওর ভাষায়। কিন্তু এমনিতে সব দিক থেকে ওর জুড়ি নেই। কখনও বড় কিছু নিয়ে কথা কয় না। বাড়ী-ঘর কাচ্চা-বাচ্চা, গৃহস্থালী, আনাজ-পাতি, রুটি মাংসের দর, ব্যবসা-বাণিজ্য, থানা-পুলিশ—এই সব, অর্থাৎ আটপৌরে জীবনের বেসাতি নিয়ে ওর কথা-কারবার। কিন্তু এমনি ওর বলার মুন্সিয়ানা যে যার ভেতরে যা গলদ, জন-সাধারণের কিসে কোথায় ক্ষতি হচ্ছে বিলকুল পরিষ্কার হয়ে যায়। মায়ের মনে হয় ও যেন বহু দূরের একটা আলাদা জগতের মানুষ। সেখানে সব সাচ্চা মানুষ; সাচ্চা সহজ তাদের জীবন। এখানকার সব কিছুই যেন ওর নূতন ঠেকছে। না পারছে এখানকার জীবনকে মেনে নিতে, না পারছে তার সাথে নিজেকে খাপ খাওয়াতে। ওর রুচিতে বাধছে। বাধছে বলেই, এই অবস্থাটা বদলাবার জন্য ওর এই মৃত্যু-হীন চঞ্চলতা-হীন শান্ত গভীর পণ। মুখের রংটা হলদেটে, চোখের চার ধারে মিহি রেখা; গলার স্বরটা ভারী কোমল। হাত দুটি সর্বদা গরম থাকে। করমর্দন করার সময় পেলাগেয়া ভ্লাসফার পুরো হাতখানা যেন ওর আঙুলের আলিঙ্গনে জড়িয়ে নেয়। এই সমাদরে মায়ের মনটা যেন ঠাণ্ডা হ'য়ে যায়।

এইসব বৈঠকে অনেকেই আসে শহর থেকে। একটি মেয়ে আসে প্রায় প্রতিবার। লম্বা দোহারা চেহারা; ফ্যাকাশে মুখখানার মধ্যে প্রকাণ্ড বড় বড় দুই চোখ। নাম সাশা। চাল-চলন পুরুষালি। কালো মোটা ভ্রূ-জোড়াকে সাংঘাতিক ভাবে টেনে টেনে আর খাড়া নাকটার পাতলা বাঁশী দু'টি কাঁপিয়ে ও কথা বলে। এ-মেয়েই প্রথম ঘোষণা করল :

'আমরা—সমাজতন্ত্রী।'

শুনে একটা বোবা ভয়ে কাঁটা হয়ে মেয়েটির মুখের দিকে চাইল মা। মা শুনেছিল জার-কে এই সমাজতন্ত্রীরাই মেরেছে। বহুদিন আগের কথা সে। মায়ের তখন সবে জোয়ান বয়েস। ভূমি-দাসদের জার মুক্তি দেন, তাইতে নাকি জমিদারের দল পণ করেছিল জার-কে না মেরে তারা চুল ছাঁটবে না। ঐ জন্যই নাকি ওদের সমাজ-তন্ত্রী নাম। অতএব বুঝতে পারে না মা কেন তার ছেলে ও তার বন্ধুর দল নিজেদের সমাজতন্ত্রী বলে।

সবাই চলে গেলে পাভেলের কাছে উঠে আসে :

'খোকা, তুই নাকি সমাজতন্ত্রী?'

'হাঁ। কিন্তু কেন, জিজ্ঞাসা করছ কেন?' সোজা, শক্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে পাভেল জিজ্ঞাসা করে।

গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নীচু করে মা।

'সত্যি, পাভেল? কিন্তু তারা যে জারের বিপক্ষে! জারকে তারাই তো খুন করেছে!'

থুত্‌নিতে হাত বুলুতে বুলুতে ঘরময় পায়চারি করে পাভেল। তারপর সংক্ষিপ্ত একটুখানি হাসি হেসে জবাব দেয়, 'ও সব আমাদের উদ্দেশ্য নয়।'

তারপর অনেকক্ষণ বসে ধীরে ধীরে গম্ভীরভাবে মাকে বুঝিয়ে দেয় সব। মা মনে মনে ভাবে :

'আমার ছেলে অন্যায় কখনও করবে না, করতে পারে না।' এর পর থেকে সমাজতন্ত্রী...এই ভয়ংকর শব্দটা ও বার বার মনে মনে আওড়ায় যতক্ষণ না তার ধার আর ভার কেটে যায়। কথাটা বুঝতে পারে না এখনও। এমন তো কত কথাই ওরা ব্যবহার করে যা বোঝা যায় না, অথচ শুনতে শুনতে অভ্যেস হয়ে যায়। কিন্তু সাশাকে কেন জানি একটুও ভালো লাগে না। ও মেয়ে সামনে থাকলে বড় অস্বস্তি লাগে।

একদিন খখলের কাছে সাশার কথা তোলে মা। হোঃ হোঃ করে হেসে ওঠে খখল। বলে :

'ওরে বাপ্‌স্‌! ভারী জবরদস্ত মেয়ে ও। এটা কর ওটা কর বলে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবে সবাইকে। একেবারে হাকিমী চাল। কিহে পাভেল, তুমি কি বল?'

শুকনো জবাব দেয় পাভেল : 'চমৎকার মেয়ে।'

'তা বটে।' সায় দেয় খখল, 'কিন্তু মুস্কিল কি জানেন? করলে হয়,—পারি,—উচিত,—এসব ঢিলে ঢালা আয়েসী কথার ধার ধারে না ও মেয়ে। ও শুধু বোঝে—করনে হোগা। কি ফ্যাসাদ বলুন তো!'

মা লক্ষ্য করে, সাশার হাকিমী চালটা পাভেলের ক্ষেত্রেই বেশী। সময় সময় ধমক ধামক দিতেও কসুর করে না। কিন্তু পাভেল রাগ করে না। শুধু হাসে আর তাকিয়ে থাকে। চোখ দুটি তখন ওর ভারী কোমল হ'য়ে ওঠে। নাতাশার বেলায়ও অমনি হ'ত। মায়ের কেন জানি বিশেষ পছন্দ হয় না।

খবরের কাগজগুলোয় যে-দিন নানা-জায়গার দেশ-বিদেশের খবর থাকে, সে-দিন ওরা আনন্দে যেন ছেলেমানুষের মত নাচতে থাকে। ওদের চোখ থেকে যেন খুশির ফুলকি ঝরতে থাকে। প্রাণ খুলে হেসে, আদর ক'রে, পরস্পরের পিঠ চাপড়ে এক কান্ড ক'রে তোলে। মা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

কেউ চ্যাঁচায় : 'সাবাস্‌ জার্মান ভাইরা, সাবাস্‌!'

আবার একদিন হয়তো আওয়াজ ওঠে : 'ইতালীর শ্রমিক জিন্দাবাদ!'

অচেনা দূরের বন্ধুদের কাছে এ অভিনন্দন পৌঁছায় না। ভাষাও জানা নেই। তবু ওদের মনে হয় সেখানে গিয়ে পৌঁছেছে ওদের আওয়াজ। না-বোঝা ভাষায়ও বোঝাবুঝি হ'তে বাকী থাকে না।

একদিন খখল কথা তুলল : 'চলনা একটা চিঠি লিখে দি,' ওর চোখে বিশ্ব-ছাওয়া ভালোবাসা, 'তা'হলে ওরা জানবে, এই রাশিয়ায়ও ওদের বন্ধু আছে যারা

একই ধর্মে দীক্ষা নিয়েছে; একই লক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে পথ চলছে; যারা ওদের জয়ে আনন্দিত হয়।'

সহজ আত্মীয়তার সুরে ওরা ইংরেজ, ফরাসী, সুইডেনবাসীদের কথা বলে। যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু সব, ভালোবাসার জন। তাদের ওরা ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে, একই দুঃখ আনন্দের অংশী সব।

সারা দুনিয়ার শ্রমিকের মধ্যে আত্মিক রাখী-বন্ধনের মন্ত্র-পাঠ হয় ছোট্ট ঘর-খানার বন্ধ হাওয়ার মধ্যে। মার মনেও তার যাদু লাগে। অজানা এক বিশাল ভাবনার মধ্যে মায়ের প্রাণে পাভেল আর তার বন্ধুরা সব এক হ'য়ে গেল। কিন্তু মা বুঝলে না, কি এই ভাবনা। তবু তার মাতাল করা নতুন শক্তি, আশা আর আনন্দ মাকে যেন নতুন জীবন দিয়ে গেল।

একদিন খখলকে বলে মা : 'তোমরা সব কি বলতো! দুনিয়াশুদ্ধ সব্বাই তোমাদের দোস্ত—কোথায় ইহুদী, কোথায় আরমেনিয়ান, আর কোথায় অস্ট্রিয়ার মানুষ। সক্কলের সুখ দুঃখই তোমাদের আপন!'

'ঠিক্ বলেছ নেন্‌কো। একেবারে ঠিক। আমাদের সবার হাসি কান্না এক হ'য়ে গেছে।' উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে খখল; 'আমরা জাত-টাত জানিনে, শ্রেণী জানিনে। আমরা শুধু জানি দোস্ত আর দুশমন। সারা দুনিয়ার যত শ্রমিক সবাই আমাদের বন্ধু; আর বড়লোক আর সরকারের দল আমাদের শত্রু। দুনিয়ার দিকে তাকালে বুঝবে মা কত শ্রমিক আমরা আছি সারা পৃথিবীতে, আর কি শক্তি আমাদের। এ যদি দেখ, তোমার আনন্দের আর সীমা থাকবে না, প্রাণের মধ্যে স্রেফ ছুটির হাওয়া বইবে। জার্মান, ফরাসী, ইতালীর মানুষ—জীবনের দিকে তাকিয়ে সকলের ওই কথাই মনে হয়। আমরা সব এক মায়ের ছেলে—আমাদের কাছে সারা দুনিয়ার শ্রমিক ভাই ভাই। ওই আমাদের অক্ষয়-মন্ত্র। ওই মন্ত্র আমাদের বুকের বল, প্রাণের আগুন। ন্যায়ের আকাশে ওই সূর্যই জ্বলছে ঝল্‌মল্ ক'রে। সেই আকাশটা কোথায়, জান নেন্‌কো? শ্রমিকের বুকে, এই এইখানে। সমাজতন্ত্রী হ'লেই সে যেই হোক না কেন, সে আমাদের ভাই। এক ভাবনায় বাঁধা সত্যিকারের ভাই। কালের, আজকের, চিরকালের ভাই।'

শিশুর মত সরল অথচ দৃঢ় এই বিশ্বাস; দিনে দিনে আরো তার মহিমা বাড়ে। একটা বিরাট শক্তি হ'য়ে ওঠে। মা দেখে, আপনা থেকেই তার মনে হয়, ওই যে সূর্যটাকে চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে, এও অমনি সত্য অমনি বিরাট, অমনি কল্যাণকর।

প্রায়ই ওরা গান গায় গলা ছেড়ে, অতি সাধারণ সহজ গান যা সবাই বুঝতে পারে। খুশি যেন উপচে পড়ে ওদের স্বরে। কিন্তু কখনও আবার নতুন নতুন গান করে গম্ভীর সুরে গির্জার সঙ্গীতের মত চাপাগলায়। ভারী সুন্দর সুর, কিন্তু একেবারে নতুন। সাধারণ গানে এমন সুর হয় না। গাইতে গাইতে কখনও ওদের মুখ লাল হয়ে ওঠে, কখনও ফ্যাকাশে। গানের কথাগুলো ঝম্‌ঝমিয়ে বাজে হাওয়ায়। অদ্ভুত জোর প্রতিটি কথার মধ্যে।

বিশেষ করে একটা গান শুনে মা যেন পাগল হ'য়ে ওঠে। আশ্চর্য! ও গানে সন্দেহ-সংশয়ের ভুল-ভুলইয়ার মধ্যে পথ-খুঁজে-মরা জীবনের আর্তি শোনা যায় না, না শোনা যায় অনটন আর ভয়ের পাঁকে মুখ-থুব্‌ড়ে থেকে থেকে জীবনের জলুষ আর ব্যক্তিত্ব-খোয়ান মানুষের ফরিয়াদ। একটুখানি ফাঁকা জায়গার জন্য আঁধার

হাতড়ে-ফেরা শক্তিমান মানুষের দীর্ঘশ্বাসও নেই, মরীয়া মানুষের ভালো মন্দ সব কিছুর ওপর উদ্যত-মুষ্টি আস্ফালনও নেই। শুধু ভাঙতে পারে গড়তে পারে না এমন আক্কেল-হীন ঘাত-প্রতিঘাতের জ্বলুনি এ গানের একটি কথায়ও খুঁজে পাওয়া যায় না। এক কথায় গোলামী দুনিয়ার মন-মেজাজের কিচ্ছুটি নেই।

শুধু শক্ত শক্ত কথাগুলো আর ঝাঁঝালো সুরটা ভালো লাগে না মায়ের। কিন্তু ভারী জোরাল রকম কি যে একটা আছে ওই গানের মধ্যে যা তার শক্ত কথা আর কড়া সুরকে ছাপিয়ে যায়। মনের মধ্যে কী-যে একটা ঘটিয়ে দিয়ে যায় হাজার ভাবনা দিয়েও যার খেই-তালাশ পাওয়া যায় না। সেই 'কী-যে'-টাকে মা ওই ছেলে-মেয়ে-গুলোর চোখে মুখে দেখতে পান। ওটা যেন ওদের পাঁজরার তলায় বাসা বেঁধে আছে। এত তার শক্তি যে কথা-সুরের বাঁধন দিয়ে তাকে ধ'রে রাখা যায় না। মাকেও তার সামনে মাথা নোয়াতে হয়। প্রতিদিন আরো বেশী মন দিয়ে শোনেন। যতই শোনেন মনের মধ্যে ততই বেশী উথাল পাথাল করে।

অন্য গানের থেকে এ গানটাকে ওরা আরো বেশী নরম ক'রে গায়। কিন্তু এটাই বেশী জোরাল শোনায়। মার্চ-মাসের প্রথম বসন্তের হাওয়ার মত মানুষের মন-প্রাণ আচ্ছন্ন ক'রে দেয়।

ভেসভ্‌শিচকফ্‌ গোমড়া মুখে বলে : 'ও গান এখন আমাদের রাস্তায় বেরিয়ে গাওয়া দরকার।'

ভেসভ্‌শিচকফে্‌র বাবা আর একবার চুরি ক'রে জেলে গেলে ও বন্ধুদের বলল :

'এখন আমাদের বাড়ীতেই বৈঠক বসতে পারে।'

প্রায় প্রত্যেক দিন কারখানা ফেরতা পাভেলের সাথে ওর বন্ধুদের মধ্যে কেউ না কেউ আসে। এসেই বই পত্র নিয়ে বসে। এমনি মশগুল হ'য়ে যায় লেখায় পড়ায় যে নাবার খাবার কথা মনে থাকে না। চা জলখাবার খায় বই হাতে নিয়ে। মায়ের কাছে ক্রমশই সব বেশী হেঁয়ালী ঠেকে। কি অত বলা-কওয়া করে ওরা?

পাভেল প্রায়ই বলে : 'একটা খবরের কাগজ বের করতে হবে।'

উত্তেজনায় ব্যস্ততায় বিদ্যুতের গতিতে জীবন চলে। বইএর পর বই শেষ হয় তাদের সমান তালে।

ভেসভ্‌শিচকফ্‌ বলল একদিন : আমাদের কথা ওদের কানে গেছে। শিগ্‌গিরই হাতে দাঁড়ি পড়বে।'

খখল জবাব দেয় : 'মাছের জন্মই জালে পড়বার জন্য।'

মায়ের যেন প্রতিদিন ও ছেলেটাকে বেশী ক'রে ভালো লাগে। 'নেন্‌কো' ক'রে যখন ডাক দেয় মনে হয় ছোট্ট একটি শিশুর কচি হাতের আদর। রবিবার পাভেলের যদি সময় না থাকে, খখলটা এসে মাকে কাঠ কেটে দেয়। একদিন ঘাড়ে ক'রে একটা তক্তা নিয়ে হাজির। দরজার সিঁড়িটা পচে গিয়েছিল। নিজেই কুড়ুল বের ক'রে নিলে। দিব্যি সাফ হাতে নতুন একটা সিঁড়ি বানিয়ে বসিয়ে দিলে। আর এক দিন অমনি ক'রে এসে ভাঙ্গা বেড়াটা বেঁধে দিলে। যেন ঘরের ছেলে। কাজ করতে করতে সর্বদা ও ভারী সুন্দর ব্যথায় ভরা কি একটা সুর ভাঁজে শিস্‌ দিয়ে।

এক দিন ছেলেকে বললেন মা : 'খখল এসে থাকুক না এখানে। তোদের দু'জনেরই সুবিধে হবে, দেখা করার জন্য ছুটোছুটি ক'রে মরতে হবে না।'

'তোমারই কষ্ট বাড়বে।' পাভেল বলে।

'তা না হয় বাড়ল। চিরকাল কষ্টই ক'রে এলাম, কিন্তু তাতো সব ভস্মে ঘি

ঢেলেছি। এবার নয় একটা ছেলের মত ছেলের জন্যই কষ্ট করলাম একটু।' মা জবাব দেয়।

'তা দেখ! আমার তো ভালোই হয়।' পাভেল বলে। খখল উঠে আসে এ-বাড়ীতে।

আট

বস্তির এক প্রান্তের ওই ছোট্ট বাড়ীখানার ওপর সকলের দৃষ্টি। সংশয়ী চোখগুলো বাড়ীর দেয়ালটাকে অতি সাবধানে পরীক্ষা ক'রে দেখে। নিশ্চয়ই সাংঘাতিক কিছু লুকিয়ে আছে ওর পেছনে। কত রকম কাহিনী ছড়ায় চারদিকে। রাত্তির বেলা কেউ কেউ গিয়ে ওদের জানালায় আড়ি পাতে। কখনও বা জানালার কাঁচে টোকা মারে। পর মুহূর্তেই ভয়ে পালিয়ে আসে।

সেদিন শুঁড়ি-খানার মালিক বেগুনৎসফ্ ধরল মাকে। চমৎকার চেহারা এখনও বুড়োর; গায়ে সর্বদা একটা মোটা প্লাশ-এর জামা, থলথলে লাল গর্দানে কালো রেশমী রুমাল বাঁধা; খাড়া টিকলো পালিশ-করা নাকের ওপর টরটয়েস্-শেলএর চশমা আঁটা। ঐ জন্য লোকে ওর নাম দিয়েছে 'হাড্ডি-চোখা'। রাস্তার মাঝখানেই মাকে থামিয়ে বলা নেই কওয়া নেই আচম্কা সাত সতের কথা শুনিয়ে গেল :

'তারপর, চলছে বেশ! ছেলের খবর কি? বিয়ে-থাওয়া করবে না? বিয়ের যুগ্যি তো হ'লো। কচি খোকাটি তো আর নেই। বিয়ে-থাওয়া ক'রে সংসারী হ'লেই ভদ্রস্থ থাকবে। তাড়াতাড়ি ছেলের বিয়ে দিতে পারলে বাপ মা'রই রেহাই। আমি হ'লে কবে ওর বে' দিয়ে দিতুম। আজকালের ছেলে ছোকরারা, কারো কথা শুনে তো চলে না, কাউকে গ্রাহ্যি নেই। যা খুশি তাই করে। যা দিনকাল পড়েছে। চ্যাংড়াগুলোর ওপর একটু নজর রাখা দরকার। হতচ্ছাড়ারা সাত জম্মে গির্জায় যাবে না, আড্ডায় যাবে না। খালি ঘরের কোনায় আঁধারে ব'সে অষ্ট-পহর গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর। কিসের রে এত গুজুর গুজুর? হ্যাঁঃ? লোকের ধারপাশে আসবে না। কেনরে? ভয়টা কিসের? যা বলবার আড্ডায় এসো, সবার সুমুখে বলো। বাস্। আর সত্যি কিছু গোপন থাকে, বেশতো যাও গির্জায়। মনের মধ্যে ভেজাল থাকলেই এই সব আনাচে-কানাচে ফুসুর ফুসুর। যাক্ শরীর মন তোমার ভালো থাকুক, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি।'

তারপর সাড়ম্বরে মাথার টুপীটা খুলে, এতখানি হাত উঁচিয়ে সেটা তুলে হন্‌হনিয়ে চ'লে গেল বুড়ো। মা বেচারী হক্‌চকিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আর একদিন বাজারে দেখা ওদের প্রতিবেশী কামার-বৌ মারিয়া করসুনভার সাথে। কামার মারা গেছে, বিধবা তখন কারখানায় খাবার ফিরি ক'রে পেট চালায়। বললে সে ডেকে :

'ছেলের ওপর নজর রেখো গো, পেলাগেয়া।'

'কি বলছ?' মা শুধায়।

'বলব কি আর, মা!' ইঙ্গিত-পূর্ণভাবে বলে মারিয়া, 'কথাটা ভালো নয়।

আমি আর কি বলব, সবাই তো বলাবলি করছে। তোমার ছেলে নাকি কি সব গোপন দল টল গড়েছে 'খ্রিস্তি'দের মতো। ওরা নাকি সব 'খ্রিস্তি'দের মতো খুনোখুনি করে বেড়াবে*...'

'থাক হয়েছে, একটু সামলে...' মা বলে।

'সামলাবো কি আর মা, ধোঁয়া থাকলে আগুন থাকবেই।' মারিয়া টিপ্পনী কাটে।

মা এসে ছেলেকে বলে। ছেলে ভ্রূ কোঁচকায়, খখল তার গভীর নরম হাসিটি হাসে।

'মেয়েগুলোর চোখটাটানি হবেই! জোয়ান মরদ হয়েছিস, গতর খাটিয়ে খাস; মদ নেই নেশা নেই। অমন বরের জন্য তপস্যে ক'রে মেয়েরা। আর তোরা ওদিকে ফিরেও চাইবিনে। ওরা বলে কি জানিস্? শহর থেকে খারাপ মেয়ে-মানুষ সব নাকি আসে এখানে...' মা শোনায়।

বিরক্ত হয়ে বলে পাভেল, 'তাই নাকি?...'

খখল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে : 'আস্তাকুঁড়ে ভালো জিনিস পাবে কোথায়? তা নেন্‌কো, গাধাগুলোকে একটু বুঝিয়ে দিও বিয়ে করা কাকে বলে। তাহ'লে আর ও নিয়ে মাথা ঘামাবে না।'

'আমি বোঝাব?' মা বলে, 'নিজেরাই বেশ বোঝে! সে দিকে টন্‌টনে জ্ঞান আছে। শুধু বোঝে না দু'দিন পরে কপালে কি আছে।'

'তাই যদি বুঝতো, মা, তবে তো হিল্লে হতো একটা।' পাভেল বলে।

ওর কঠিন মুখটার দিকে তাকিয়ে থাকে মা।

'তুমিই বোঝাও না ওদের! যারা একটু চালাক চতুর তাদের এখানে ডাকো!'

'না, তা হয় না।' পাভেল বলে।

'কেন, চেষ্টা ক'রে দেখলে ক্ষতি কি? খখল জিজ্ঞাসা করে।

'ক্ষতি এই যে সব জোড়া বেছে নেবে। তারপর দু'দিন বাদে বিয়ে ক'রে সংসারী হবে। বাস্ খতম!' কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে পাভেল বলে।

মা চিন্তিত হয়। কি গোঁড়া ছেলে। যেন মুনি ঋষি। লক্ষ্য করেছে মা, ওর থেকে বয়সে বড় কমরেড্‌রাও ওর কাছ থেকে পরামর্শ নেয়। এমন কি খখলও। কিন্তু শুধু ওই গোঁড়ামির জন্য সবাই ওকে ভয় করে, ভালোবাসে না কেউ।

সে-দিন রাত্তিরে। মা শুতে গেছে। পাভেলরা পড়ছে। হাল্কা পার্টিশনের ও-দিক থেকে ওদের কথা-বার্তা শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ খখল ব'লে উঠল :

'নাতাশাটাকে আমার ভারী ভালো লাগে।'

একটু চুপ ক'রে থেকে পাভেল জবাব দেয় : 'তা জানি।'

মা শুনতে পায়, খখল ওঠে, খালি পায়ে মেজেতে পায়চারি করে। ধীরে ধীরে শিস্ দেয় আপন মনে। আবার বলে :

'কে জানে ও বুঝতে পেরেছে কিনা।'

পাভেল জবাব দেয় না।

'তোমার কি মনে হয়?' অত্যন্ত চাপা স্বরে জিজ্ঞাসা করে খখল।

'পেরেছে। তাইতো এখানে আসা ছেড়েছে।'

* রুশদেশের একটা গোঁড়া ধর্মীয় সম্প্রদায়কে বলা হত 'খ্রিস্তি'।

খখলের পা দ্'টো যেন ভারী হ'য়ে ওঠে। অবসন্ন ভাবে পায়চারি করে—আবার ওর শিসের কোমল স্বর ঘরের মধ্যে কে'পে কে'পে ফেরে। জিজ্ঞাসা করে :

'ওকে বলব?'

'কি বলবে?'

'বলব যে—আমি......' আস্তে আস্তে খখল আরম্ভ করে।

পাভেল বাধা দেয় : 'কেন? দরকারটা কি শ্বনি?'

মা শ্বনতে পায়, খখল থামল। চোখের সামনে যেন দেখতে পায়, হাসছে খখল।

'বাঃ একজনকে ভালোবাসবে আর বলবে না? তাহলে লাভটা কি হল?'

পাভেল সশব্দে বইটা বন্ধ করে। জিজ্ঞাসা করে :

'কি লাভটা চাও শ্বনতে পাই?'

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থাকে দ্'জনে। তারপর খখল বলে :

'তারপর?'

পাভেল বলে : 'দেখ আন্দ্রিয়েই, তুমি কি চাও সেটা তোমার ভালো ক'রে ব্ঝে দেখা দরকার। আমার মনে হয় না সে তোমায় ভালোবাসে। ধরেই নাও বাসে, এবং তোমাদের বিয়ে হ'য়ে গেল। ব্দ্ধিজীবী আর শ্রমিক। একেবারে রাজ-যোটক। তারপর ছেলেপ্লে হবে। তাদের খাওয়াতে হবে একা তোমায়। কি প্রাণান্তকর পরিশ্রম হবে ভেবে দেখ। এক ট্করো র্টির সংস্থান ক'রতে শির-দাঁড়া বে'কে যাবে। তার ওপর বাড়ী-ভাড়া, কাচ্চা-বাচ্চা... তোমায় তো খ্'জেই পাওয়া যাবে না। কাজ আর ক'রবে কখন। স্তরাং যে-ব্রত আমরা নিয়েছি তাতে শ্ধ্ তোমায় নয়, তোমাদের দ্'জনকেই আমরা হারাব।'

কারো ম্খে কথা নেই। থম্ থম্ করছে নিঃশব্দ রাত, শ্ধ্ ঘড়ির পেণ্ডুলামটার টিক্ টিক্ অতি স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

খখল বলে : 'আমার আধখানা মন ভালোবাসে, আর আধখানাতে ঘৃণা। একে তুমি মন বলবে?'

বইএর পাতা ওল্টানোর খস্খসানি শোনা যায়। হয়ত পাভেল পড়ছিল এতক্ষণ। ওর মা চোখ ব্ঝে নিথর হ'য়ে শ্য়ে আছে; যেন নিশ্বাস ফেলতেও ভয়। খখলের জন্য বড় মায়া হয়; কিন্তু ছেলের জন্য ব্কটা আরো বেশী টন্ টন্ করে। অভাগা ছেলে!

খখল হঠাৎ ব'লে বসে : 'তাহ'লে না বলাই ভালো, কি বল!'

শান্ত ভাবে জবাব দেয় পাভেল : 'আমার তো মনে হয় তাই ঠিক হবে।'

'বেশ তাই হবে,' খখল বলে। তারপর কয়েক সেকেণ্ড চুপ ক'রে থেকে ধীরে ধীরে বলে : 'এ অবস্থায় পড়লে তোমারও কষ্ট হ'ত পাভেল।'

'কষ্ট তো হ'চ্ছেই।'

দেয়ালের গা বেয়ে বেয়ে বাতাস শনশনিয়ে যায়। পেণ্ডুলামটা নির্ভুল ভাবে সময় মেপে চলে।

'ঠাট্টা নয়,' খখল বলে।

মা বালিশে ম্খ গ্'জে নিঃশব্দে কাঁদে।

ভোরবেলা মায়ের মনে হয় আন্দ্রিয়েই যেন কু'কড়ে ছোট হয়ে গেছে। আরো ভালো লাগছে ওকে। আর তার নিজের ছেলে তেমনিই আছে—সেই রোগা লিক্লিকে ঋজ্ব দেহ। তেমনি চুপ্চাপ। এতদিন খখলকে মা সম্মান ক'রে আন্দ্রিয়েই

ওনিসিমভিচ্ ব'লে ডেকে এসেছে। কিন্তু আজ ভোরবেলা নিজের অজান্তেই ব'লে ফেলল :

'আন্দ্রিউশা*, জুতোটা সেলাই কর, নইলে ঠাণ্ডা লাগবে।'

'মাইনে পেয়ে নতুন জুতো কিনব এক-জোড়া।' হেসে জবাব দেয় খখল। তারপর দুই হাতে মায়ের গলা জড়িয়ে ধ'রে বলে :

'হয়ত তুমিই আমার সত্যি মা। আমি কিনা তোমার কুচ্ছিৎ ছেলে, তাই স্বীকার করতে চাও না। তাই না মা?'

মা কথা না ব'লে আস্তে আস্তে ওর মাথায় হাত বুলোয়। আদর উথলে উঠতে চায়। কিন্তু দরদে কানায় কানায় ভ'রে আছে বুক; মুখ দিয়ে তাই কথা সরে না।

নয়

ঘরে ঘরে নীল কালিতে লেখা ইস্তাহার বিলিয়েছে সমাজতন্ত্রীরা। তাদের কথা বলাবলি করে বস্তির মানুষ। ইস্তাহারে কারখানার মালিকদের তীব্র ভাষায় সমালোচনা করা হয়েছে এবং পিটার্সবুর্গ আর দক্ষিণ রাশিয়ার ধর্মঘটীদের খবর আছে। নিজেদের স্বার্থরক্ষার খাতিরে শ্রমিকদের এক হবার ডাক এসেছে।

মধ্য-বয়সীর দল চটে গেল। কারখানায় বেশ দু'পয়সা কামাচ্ছিল তারা। 'শুধু হাঙ্গামা বাঁধানো। খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, তোদের কি মাথা-ব্যথা পড়েছে রে?' ইস্তাহারগুলি তারা ওপর-ওয়ালার হাতে তুলে দিল।

তরুণের দল সাগ্রহে পড়ে : 'সত্যি কথাইতো লিখেছে সব।' তারা বলে।

খেটে খেটে যাদের শরীর ঝাঁঝরা হয়ে গেছে তারাই মুখ বাঁকায় বেশী : 'ওঃ ভারী তো হবে ওতে! আমাদের চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার হ'য়ে যাবে!'

তবু, চারদিকে একটু সাড়া পড়ল। সপ্তাহ খানেক আর নতুন কোন ইস্তাহার আসে না। শ্রমিকেরা বলাবলি করে, কাগজ-ছাপান বুঝি বন্ধ ক'রে দিলে।

পরের সোমবার আবার নতুন কাগজ বেরুল। শ্রমিকদের মধ্যে আবার গুঞ্জন ওঠে। কারখানায়, আড্ডায় অচেনা নতুন লোক দেখা যায়। এরা চারদিকে চোখ রাখে, হাজার রকম কথা জিজ্ঞাসা করে, মানুষের ঘরের খবর নেয়, আগ বাড়িয়ে গিয়ে সকলের সব কিছুতে নাক সেঁধোয়; ওদের বাড়াবাড়ি দেখে লোকের সন্দেহ হয়।

মা বোঝেন তার ছেলের জন্যই চারদিকে এত হৈ হৈ। ওর দৌলতেই সব। কত লোক এসে ওর ছেলের চারদিকে জুটছে। গর্বও হয় আবার সাথে মিশে যায় ভাবনা।

একদিন মারিয়া করসুনভা সন্ধ্যার সময় এসে দরজা ধাক্কা দিল। মা খুলে দিলে তার কানে কানে ফিস্ ফিস্ ক'রে বলে মারিয়া :

'একটু সাবধান থেকো, পেলাগেয়া। আজ রাতে তোমাদের বাড়ী তল্লাসী হবে।

* রুশ ভাষায় আদর ক'রে ডাকবার এই ধরন, যেমন আমরা আদর ক'রে লীলাকে বলি লীলু, খোকাকে বলি খোকন। খুব ঘনিষ্ঠতার ক্ষেত্রেই অমন ডাক চলে।—অঃ

ভেসভ্‌শিচকভ্‌ আর মাজিনের বাড়ীও হবে।'

ওর মোটা ঠোঁট দ্‌টো যেন ঠক্‌ ঠক্‌ ক'রে বাজে। থল্‌থলে নাকটা দিয়ে গন্ধ শ্‌কে শ্‌কে কিসের যেন হদিস্‌ নিতে চায়; চোখের পাতা পিট্‌ পিট্‌ করে আর দ্‌ষ্টি ঘোরে এদিক ওদিক; কিন্তু রাস্তায় কে যেন দাঁড়িয়ে আছে সে-দিকে তাক ঠিক আছে।

'আর কিছ্‌ জানতে পারিনি। সারা দিন তোমায় দেখিনি, তাই বলতে পারিনি।' ব'লেই উধাও হ'য়ে গেল।

জানালাটা বন্ধ ক'রে মা একটা চেয়ারে ধপ্‌ ক'রে ব'সে পড়ে। ছেলের মাথার ওপর কি যে বিপদ ঘনিয়ে আসছে ব্‌ঝতে একট্‌ও দেরী হয় না। নিমেষে উঠে দাঁড়ায়। তাড়াতাড়ি কাপড় প'রে একটা শাল মাথায় জড়িয়ে ও ছ্‌টে আসে ফিওদর মাজিনের বাড়ী। অস্‌খ করেছে ফিওদরের—আজ কারখানায় যায়নি। জানালার পাশে বসে একটা বই পড়ছিল আর ডানহাতের ফোলা ব্‌ড়ো আঙ্গ্‌লটায় হাত ব্‌লোচ্ছিল। খবরটা শ্‌নে ওর ম্‌খ কালো হ'য়ে গেল। লাফিয়ে উঠল একেবারে।

পেলাগেয়ার সারা দেহ ঠক্‌ ঠক্‌ ক'রে কাঁপছে। কপালের ঘাম ম্‌ছতে ম্‌ছতে জিজ্ঞাসা করে : 'কি করা যায় এখন বলতো!'

ভালো হাতটা দিয়ে কোঁকড়া চুলগ্‌লো ম্‌খের ওপর থেকে সরিয়ে বলে ফিওদর : 'দাঁড়ান—অত ভয় পাবার কি আছে?'

'ভয় তো দেখছি তুমিই পেয়েছ,' মা বলে।

'আমি?' লাল হ'য়ে ওঠে ফিওদর, একট্‌ হাসে। বলে : 'সে যাই হোক, খবরটা পাভেলকে দিতে হচ্ছে। আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি কাউকে। আপনি বাড়ী যান। ব্যস্ত হবেন না। ধরে তো আর মারবে না!'

মা বাড়ী এসে সবগ্‌লি বই এক সাথে জড়ো ক'রে তুলে নিয়ে এদিক ওদিক খ্‌জতে থাকে কোথায় রাখা যায়—চুল্লীটার ভেতরে, তলায়, না জলের পিপের নীচে। ভেবেছিল তক্ষ্‌নি কারখানা থেকে ছ্‌টে আসবে পাভেল। কিন্তু এল না। ক্লান্ত হ'য়ে বেঞ্চির ওপর ব'সে পড়ে মা বইগ্‌লো চেপে। খখল, পাভেল বাড়ী এলে তবে ওঠে।

'শ্‌নেছিস্‌?' ওদের দেখা মাত্র জিজ্ঞাসা করেন।

পাভেল হেসে জবাব দেয় : 'হ্যাঁ শ্‌নেছি। তোমার ভয় করছে নাকি?

'বড় ভয় করছে আমার রে। বড় ভয় করছে...'

'ভয় পেওনা মা। তাতে তো স্‌বিধে হবে না। স্থির হও।' খখল বলে 'সে কি! চায়ের জলও তো চড়াওনি এখনও।'

'এগ্‌লির জন্য পারিনি!' অপরাধীর মত উঠে দাঁড়িয়ে বইগ্‌লো দেখায়।

পাভেল আর খখল হো হো ক'রে হেসে ওঠে। মা অনেকটা সহজ হ'য়ে ওঠে। পাভেল বেছে কয়েকখানা বই নিয়ে বাইরে চ'লে যায় ল্‌কিয়ে রাখতে।

সামোভার জ্বালাতে জ্বালাতে খখল বলে :

'ভয় পাবার কিছ্‌ নেই নেনকো! বরঞ্চ এতে লজ্জার কথা যে মান্‌ষ বাজে কাজে এমনি করে সময় নষ্ট করতে পারে। দেখবে কোমরে তলোয়ার ঝ্‌লিয়ে আর পায়ে রেকাব লাগিয়ে বাড়ী বাড়ী মেলাই মান্‌ষ আসবে। বিছানার তলা, চুল্লীর তলা, মাটির তলার ঘর, মাচান—তচ্‌নচ্‌ করে ফেলবে সব। তন্ন তন্ন ক'রে খ্‌জবে আর ঘোঁৎ ঘোঁৎ ক'রবে বিরক্ত হয়ে। শ্‌ধ্‌ বিরক্তই হবে না, লজ্জাও পাবে। আর তা ঢাকবার

জন্য মেলাই তর্জাবে গর্জাবে। খুব ভালো ক'রে জানে কি ঘেন্নার কাজ করছে ওরা। সেবার আমার ঘর খানাতল্লাসী করতে এসে অপ্রস্তুত হ'য়ে সব ফেলে চলে গেল। আর একবার আমায় ধ'রে নিয়ে গেল, চারটি মাস জেলে পুরে রেখে দিলে। কুটোটি নাড়তে হয় না জেলে, স্রেফ ব'সে থাকো। তারপর শমন আসে। সৈন্য-পরিবৃত হয়ে রাস্তা দিয়ে ঝমঝমিয়ে আদালতে হাজির হও। কর্তাদের মধ্যে কেউ তোমার জবান-বন্দী নেবে। তারপর আবার তেমনি মিছিল ক'রে জেলে ফিরে এসো। এই হবে কাজ। শুধু যাও আর এসো। বাস্। টাকাগুলো নিচ্ছে, কিছু কাজ দেখাতে হবে তো! এমনি ক'রে যাবে কিছু দিন, তারপর ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসো, আর কি!'

মা চেঁচিয়ে ওঠেন : 'কি কথা বলার ছিরি রে তোর, আন্দ্র্যুশকা!'

নীচু হ'য়ে আগুনে ফুঁ দিচ্ছিল। লাল-হ'য়ে-যাওয়া মুখটা একটু তুলে আন্দ্রিয়েই জবাব দেয় গোঁফ পাকাতে পাকাতে :

'কি ছিরি মা?'

'যেন ফুলের বাতাস দিয়ে তোকে সব পুজো করেছে?'

'গায়ে আঁচড় লাগেনি এমন কে আছে মা?' উঠে হাসি-ভরা মুখে মাথা নেড়ে বলে খখল : 'যত রকম ওদের জানা ছিল, সব রকমে অত্যাচার করেছে আমার ওপর। এত ক'রেছে যে গা-সওয়া হ'য়ে গেছে। করবে কি বল? উপায় তো নেই। তা ছাড়া ওসব কথা মনে করতে গেলে আর কাজ হয় না। শুধু সময় নষ্ট। এই তো আমাদের জীবন। প্রথম প্রথম মানুষের ওপর আমার ভারী রাগ হ'তো। তারপর দেখলাম মিছে রাগ করা। প্রত্যেকেই ভয়ে ভয়ে আছে, তার পাশের লোকটা তাকে ঠকিয়ে খাবে। সুতরাং বাগে পেলে আগে ভাগেই গিয়ে সে তার টুঁটি টিপে ধরে, এই তো হাল। বুঝলেগো, নেন্কো?'

ধীরে ধীরে মায়ের ভয় কেটে যায়। খখলের বড় বড় চোখ দুটি যেন হাসছে।

দীর্ঘ-নিশ্বাস পড়ে মায়ের। সমস্ত প্রাণ ঢেলে দিয়ে বলে : 'সুখী হ' তুই, আন্দ্রিউশকা! সুখী হ', ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি।'

খখল উঠে সামোভারের কাছে গিয়ে মাটিতে বসে প'ড়ে বলে : 'একটি কণা সুখও আমায় যদি কেউ দেয় ফেরাব না। তবে হাতও পাতব না কারও কাছে।'

পাভেল ফিরে আসে। বলে :

'এমন জায়গায় রেখেছি কেউ খুঁজে পাবে না।' তারপর হাত মুখ ধুয়ে, হাতটা মুছতে মুছতে মা'র দিকে তাকায় :

'ওরা যদি দেখে যে ভয় পেয়েছ, ঠিক বুঝবে ঘরে কিছু আছে। তুমি তো জানো আমরা কোন অন্যায় করছিনে। আমাদের দিকে রয়েছে ন্যায়। যতদিন দেহে জান আছে ন্যায়ের জন্য লড়ব—অন্যায় বলতো বল! ভয়টা কিসের আমাদের!'

'ভাবিসনে, খোকা, ঠিক সামলে নেব আমি।' বলেই সেই মুহূর্তেই আবার ভেঙ্গে পড়ে। 'ওঃ কতক্ষণ লাগাবে কে জানে...!'

সে রাতে পুলিশ আসেনি। সকাল বেলা মা ভাবতে ভাবতে ওঠে, ছেলেরা কত ঠাট্টা করবে। নিজেও মনে মনে হাসে : 'আগে থেকেই এত ভয় পেয়ে গেলাম!'

ভয়ে ভয়ে রাত্তিরটা কাটল। কিন্তু পুলিশ মাসখানেকের মধ্যে এল না।

সেদিন নিকলাই ভেসভ্‌শিচকফ এসেছে পাভেল আর আন্দ্রিয়েইকে দেখতে। ওদের কাগজটা নিয়ে তিনজনে কথাবার্তা চলছে। প্রায় মাঝরাত্তির গড়িয়ে গেছে। মা শুয়ে পড়েছে। আস্তে আস্তে কথা বলছে ওরা উদ্বিগ্নভাবে। তার চাপা আওয়াজ আসছে এদিকে। ঝিমুতে ঝিমুতে শোনে মা। আন্দ্রিয়েই চুপি চুপি উঠে এসে রান্নাঘরের দরজাটা বন্ধ করে দেয়। কি যেন একটা পড়ে ঝনঝনিয়ে ওঠে। দরজাটা খুলে যায়। খখল ছুটে এসে রান্নাঘরে ঢোকে। জোরে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে :

'ঘোড়ার খুরের শব্দ!'

মা লাফ দিয়ে বিছানা থেকে উঠে কাপড় সামলাতে চেষ্টা করে। থর থর করে হাত কাঁপে। পাভেল দরজার কাছে এসে শান্ত গলায় বলে :

'তুমি শুয়ে থাক, মা, তোমার শরীর ভালো নেই।'

গেটের কাছে একটা খস্‌ খস্‌ আওয়াজ শোনা যায়। পাভেল এসে ঠেলে দরজাটা খুলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করে : 'কে?'

মুখের কথা শেষ হতে না হতে সাদা পোষাক পরা লম্বা একটা লোক এগিয়ে এল। তার পেছনে আর একজন। দু'জন পুলিশ পাভেলকে এক ধাক্কা মেরে এসে দু'দিকে দাঁড়াল।

হেঁড়ে গলায় ঠাট্টা করে উঠল একজন : 'যার আশায় বসেছিলে চাঁদ, সে নয়।'

লোকটা একজন অফিসার—লম্বা লিক্‌লিকে চেহারা। এই এলাকারই একজন পুলিশ, নাম ফিদিয়াকিন। মায়ের বিছানার কাছে গিয়ে বলল এক হাতে টুপি ছুঁয়ে : 'এই যে ওর মা, হুজুর। আর ওই,' পাভেলের দিকে দেখিয়ে বললে : 'সেই লোকটা।'

'পাভেল ভ্লাসফ্‌?' জিজ্ঞাসা করে অফিসার চোখ মিটমিট করে।

পাভেল মাথা নেড়ে জানায়, সেই পাভেল ভ্লাসফ্‌। গোঁফে তা দিয়ে অফিসার বলে যায় : 'আমরা এ বাড়ী খানাতল্লাশী করব। কে ওখানে শুয়ে, এই ওঠ মাগী!'

দরজা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

'তোমার নাম?' ওঘর থেকে অফিসারের গলা শোনা যায়।

দু'জন লোক এসে ঢুকল। সাক্ষী। একজন কারখানার ঢালাই-খানায় কাজ করে, নাম ৎভোরিয়াকফ। আর একজন রীবিন, ওখানকার ফায়ারম্যান—ময়লা রং; পেটান শরীর; লম্বা চওড়ায় গাঁটা-গোঁট্টা যোয়ান। থাকে ৎভোরিয়াকফের বাড়ীতেই একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে। চাপা কর্কশ গলায় মাকে বলল :

'শুভ-সন্ধ্যা, নিলোভ্‌না।'

উঠে কাপড় জামা পরতে পরতে নিজের মনেই বক্‌বক্‌ করে মা সাহস বজায় রাখবার জন্য :

'সাতজন্মে এমন সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড-কারখানা দেখিনি। ঘুমুচ্ছে গেরস্ত, না মাঝ-রাত্তিরে দুয়ার ঠেলাঠেলি!'

এত মানুষ, ঘরে আর ঠাঁই নেই। সারা ঘর জুতোর কালির গন্ধে ভরে গেছে।

পুলিশ দু'জন আর মহল্লা-পুলিশের বড়-কর্তা তাক থেকে বইগুলো পেড়ে এনে অফিসারের সামনে টেবিলের ওপর জড়ো করে রাখল। আর দু'জন গিয়ে গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে দেয়ালগুলো দেখতে লাগল। একজন উঠল গিয়ে চুল্লীর মাথায়। খখল আর ভেসভ্শিচকফ এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে ঘেঁষাঘেষি হয়ে। নিকলাইয়ের বসন্তের দাগ-ওয়ালা মুখটা ক্ষণে ক্ষণে লাল হয়ে উঠছে। ওর ছোট্ট কটা চোখ দুটো যেন বিঁধে আছে অফিসারের ওপর। খখল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গোঁফ চুমরায়। মা ঘরে এলে ফিক্ করে একটু হেসে মাথা নেড়ে ইশারা করে : ভয় পেও না।

মা ভয় তাড়াবার জন্য সোজা হয়ে বুক চিতিয়ে জোরে জোরে পা ফেলে হাঁটে, স্বভাব মতো কাত হয়ে নয়। কিন্তু ভ্রূ দুটো কাঁপতে থাকে। ভারিক্কি ডোণ্ট্-কেয়ারি ভাবটা বেশ মজার লাগে দেখতে।

অফিসার তার ফর্সা হাতের রোগা রোগা আঙুলগুলো দিয়ে বই তোলে একটার পর একটা। নিপুণ হাতে তাড়াতাড়ি পাতা উল্টে-উল্টে একদিকে ছুঁড়ে ফেলে। কোন কোন বই মাটিতে পড়ে যায়। কারো মুখে কথা নেই। পুলিশেরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামায় আর হাঁপায়। তাদের হাঁপানোর শব্দ আর রেকাবের ঠক্ঠকানি শোনা যায় শুধু। আর মাঝে মাঝে প্রশ্ন :

'ওদিকে দেখা হয়েছে?'

পাভেলের পাশেই দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মা; ছেলের মতই বুকের ওপর হাত আড় করে রাখা। কটমট করে তাকিয়ে আছে পুলিশ দু'জনের দিকে। হাঁটু দুটো অবশ হয়ে আসে। চোখের সামনে সব ঝাপ্সা।

হঠাৎ ঘরের স্তব্ধতা ভেঙে যায়। কর্কশ গলায় নিকলাই বলে ওঠে :

'দেখবেন দেখুন, কিন্তু বইগুলো মাটিতে ফেলছেন কেন?'

মা চমকে ওঠেন। ৎভেরিয়াকফের মাথাটা যেন হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে নড়ে উঠল। রীবিন ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল। ওর স্থির দৃষ্টি যেন বিঁধতে লাগল নিকলাইকে।

অফিসার চোখ মিটমিট করে নিকলাইয়ের বসন্তের দাগ-ওয়ালা পাথরের মত কঠিন মুখটার দিকে একটা দৃষ্টি ছুঁড়ে মারে। আঙুলগুলো আরো তাড়াতাড়ি বইয়ের পাতা উল্টোতে আরম্ভ করে। মাঝে মাঝে ডাগর ডাগর কটা চোখগুলি কটমটিয়ে এমন করে চায় যেন অসহ্য কি একটা ব্যথায় ওর কলজেটা দুমড়ে মুচ্ড়ে যাচ্ছে; এক্ষুনি যেন রাগে ও কেঁদে ফেলবে। ভেসভ্শিচকফ চেঁচিয়ে ওঠে আবার : 'এই ব্যাটা সেপাই, বই তুলে রাখ বলছি।'

পুলিশেরা হক্চকিয়ে ফিরে প্রথমে ওর দিকে তারপর অফিসারের দিকে চায়। অফিসার মাথা তুলে নিকলাই-এর আপাদমস্তক দেখে নিয়ে নাকী স্বরে বলে : 'হুঁ তুলে রাখ বইগুলো।'

একজন পুলিশ নীচু হয়ে ছড়ান বইগুলো কুড়োতে লাগল।

মা পাভেলের কানে কানে বলে : 'নিকলাই চুপ করে থাকুক না বাবা, একটু!'

পাভেল কাঁধ ঝাঁকানি দেয়। খখল মাথা নীচু করে।

'বাইবেল পড়ে কে?'

'আমি পড়ি।' পাভেল জবাব দেয়।

'এ সব বই কার?'

'আমার'। পাভেল বলে।

'বেশ।' ব'লে অফিসার চেয়ারে হেলান দিয়ে আরাম করে টেবিলের নীচে পা

দ্যটো ছড়িয়ে দিয়ে বসে রোগা রোগা হাতের আঙ্যল মট্‌কায়। তারপর গোঁফ চুমরাতে চুমরাতে বলে নিকলাইকে :

'তোমারই নাম আন্দ্রিয়েই নিখোদকা?'

নিকলাই এগিয়ে এসে জবাব দেয় : 'হ্যাঁ।'

খখল ওকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলে :

'না, ও নয়, আমি...'

অফিসার হাত তুলে ভেসভশিচকফ-এর দিকে আঙ্যল নাচিয়ে বলে :

'যেখানে আছ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাক।' ব'লে নিজের কাগজপত্র দেখতে আরম্ভ করে।

জ্যোৎস্না রাত দেখা যায় জানালা দিয়ে; মনে হয় যেন কঠিন তুষার-শীতল ঔদাস্য ওই জ্যোৎস্নার। কে যেন চলে গেল বাড়ীর পাশ দিয়ে। তার পায়ের নীচে বরফগ্যলো মচ্‌মচিয়ে উঠল। অফিসার মাথা তোলে। 'হ্যঁ! নিখোদকা! তুমিই না ক'বার রাজনৈতিক কারণে জেল খেটেছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। একবার রস্তফ্‌-এ, আর একবার সারাতফ্‌-এ। কিন্তু সেখানকার প্যলিশরা এর চাইতে অনেক বেশী ভদ্র ছিল।'

ডান চোখটা বন্ধ করে একট্য রগ্‌ড়ে নিয়ে অফিসার বলে :

'বলতে পার কারখানায় অপরাধম্যলক কাগজ-পত্র কোন বদমাইশ ছড়াচ্ছে?'

খিল্‌ খিল্‌ করে হেসে ওঠে খখল। পায়ের আঙ্যলের ডগায় ভর করে শরীরটাকে একট্য দ্যলিয়ে জবাব দিতে যাবে, এমন সময় নিকলাইয়ের গলা ঝন্‌ঝন্‌ করে ওঠে :

'বদমাইশ! সবে তো আজ এই দেখছি এখানে।'

একটা নিথর নিস্তব্ধতা। এক ম্যহ্যর্ত সব স্থির নিস্পন্দ।

মায়ের ম্যখের কাটা জায়গাটা যেন সাদা হয়ে ওঠে, ডান ভ্র্য উঁচিয়ে তোলে মা। রীবিনের কালো দাড়ি অদ্ভুতভাবে কাঁপতে থাকে; দাড়ির মধ্যে একবার আঙ্যল চালিয়ে নিয়ে সে চোখ নীচু করে থাকে।

তারপর অফিসার হ্যকুম দেয় :

'কুকুরটাকে নিয়ে যাও এখান থেকে।'

প্যলিশেরা ওর ঘাড় ধরে ধাক্কা মারতে মারতে রান্নাঘরের দিকে নিয়ে চলল। নিকলাই ঘাড় বাঁকা ক'রে দাঁড়িয়ে রইল শক্ত হয়ে :

'দাঁড়া ব্যাটারা। ট্যপী-কোট প'রে নি।' এমন সময় দারোগা ঘরে ঢ্যকে বলল : 'চারদিক ভালো করে দেখে এসেছি, কোথাও কিছ্য নেই।'

'থাকবেও না, লোকটা তো বেশ ঝান্য।'

মা ভয়ে ভয়ে অফিসারের হলদেটে ম্যখের দিকে তাকায়, আর শোনে তার ক্ষীণ ভঙ্গ্যর স্বর। মনে হয় লোকটা ওদের দ্যশমন। ওর মায়া দয়া নেই। সাধারণ মান্যষের ওপর ওর রীতিমত আমিরী ঘৃণা। এমন মান্যষ বড় একটা দেখেনি ও, স্যতরাং এরা যে আবার সংসারে আছে সে কথাই প্রায় ভুলে গিয়েছিল ও। ভাবল : ইস্তাহার দেখে এরা ঘাবড়াবে না তো ঘাবড়াবে কে?

'আন্দ্রিয়েই ওনিসিমফ্‌, পদবী নাখোদকা; জারজ—তোমাকে গ্রেপ্তার করা হ'ল।'

শান্তভাবে খখল জিজ্ঞাসা করে : 'কেন?'

'পরে জানতে পারবে।' মধ্যর প্রলেপ-দেওয়া বিদ্বেষের সঙ্গে অফিসার জবাব দেয়। তারপর মায়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে : 'লিখতে পড়তে জানো?'

পাভেল জবাব দেয় : 'না।'

'চোপরাও! যাকে জিজ্ঞাসা করছি সে বলবে।' তীক্ষ্ম জবাব আসে। 'এই, শুনছ? জবাব দাও।'

ঘৃণায় মায়ের সমস্ত অঙ্গ যেন জ্বলে যেতে লাগল। হঠাৎ ভয়ংকর কাঁপতে আরম্ভ করল, যেন ধাক্কা খেয়ে ঠান্ডা জলে পড়ে গেছে। তারপর হঠাৎ একেবারে খাড়া হ'য়ে উঠল, ঘায়ের দাগটা তামাটে রং ধরল, ভ্রূ দুটো যেন নেমে এল চোখের ওপর।

হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললে মা : 'অত চ্যাঁচাচ্ছেন কেন? ওই তো চ্যাংড়া বয়স। মানুষের দুঃখ কষ্ট দেখেছেন কতটুকু?'

পাভেল ওকে থামাতে চেষ্টা করে : 'শান্ত হও মা, শান্ত হও।

'থাম্ পাভেল।' বলে মা ছুটে যায় টেবিলের কাছে। উত্তেজনায় চীৎকার করে ওঠে : 'কেন, কেন ধরে নেবে এদের?'

'চোপরাও! তোর কিরে মাগী?' ধম্‌কে ওঠে অফিসার। 'এই, নিয়ে আয় ভেসভ্‌শিচকফ্‌কে। সেও গ্রেপ্তার।'

তারপর নাকের কাছে ধরে কি একটা কাগজ পড়তে লাগল।

নিকলাইকে আনা হল। কাগজ পড়া থামিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে অফিসার : 'এই, টুপী উতারো।'

রীবিন মায়ের কাছে এসে তাকে সান্ত্বনা দেয় :

'ঘাবড়িও না, মা।'

অফিসারের কাগজ পড়ার শব্দ ডুবিয়ে নিকলাই ব'লে ওঠে :

'আমার হাত ধ'রে রেখেছে যে, টুপী খুলব কেমন করে?' টেবিলের ওপর কাগজখানা ছুঁড়ে ফেলে বললে অফিসার : 'সই কর।'

সকলে সই করে। মায়ের রাগ শান্ত হ'য়ে আসে, মনের আগুন নিবে যায়। অসহায় অপমানে চোখ জলে ভরে আসে। বিবাহিত জীবনের কুড়িটি বছর ধরে এমনি চোখের জল ফেলে এসেছে ও। কিন্তু শেষ ক'টা বছর তার তিক্ত স্বাদ ভুলে গিয়েছিল সে।

অফিসার তার দিকে তাকিয়ে বিরক্তির সঙ্গে মুখভঙ্গী করে :

'সব চোখের জল ফুরিয়ে ফেলো না এক্ষুণি। এর পরে কি ফেলবে? রাখো কিছুটা।'

আবার রাগে মা জ্বলে ওঠে। বলে :

'মায়ের চোখের জল ফুরোয় না গো! তোমার মা থাকলে সে বুঝবে।'

অফিসার তাড়াতাড়ি ঝক্‌ঝকে তালা লাগান নতুন ব্রিফ্‌-কেসটায় কাগজ-পত্রগুলো তুলে ফেলে। তার পর হুকুম দেয় :

'মার্চ!'

পাভেল শান্তভাবে গাঢ়স্বরে বলে : 'আন্দ্রিয়েই, নিকলাই, বিদায়।'

অফিসার একটা টুক্‌রো হাসি ছুঁড়ে মেরে বলে :

'ভয় নেই, শিগ্গিরই দেখা হবে।'

ভেসভ্‌শিচকফ জোরে জোরে নিশ্বাস নেয়। সমস্ত ঘাড়টা লাল হয়ে উঠেছে ওর। কঠিন ক্রোধে তার চোখে আগুন জ্বলছে। খখল একটুখানি হেসে, মাথা নেড়ে মাকে কি জানি বলে চুপি চুপি। মা তার ওপরে ক্রুশের চিহ্ন এ'কে বলে :

'ভগবান দেখবেন কার ন্যায় কার অন্যায়...'

অবশেষে রেকাব খট্‌খট্‌ করতে করতে চলে গেল সাদা উর্দি-পরা লোকগুলি। সবচেয়ে শেষে গেল রীবিন। যাবার সময় অনেকক্ষণ ধরে পাভেলের দিকে তাকিয়ে থেকে কি যেন ভাবতে ভাবতে বলল :

'আচ্ছা...তা...হ'লে...আ...সি...।' কাশতে-কাশতে বেরিয়ে গেল রীবিন।

মেঝে-ময় বই-পত্তর কাপড়-চোপড় ছড়ান। পেছনের দিকে হাত ক'রে ছড়ান জিনিসর ফাঁকে ফাঁকে পা ফেলে পায়চারি করে পাভেল বিমর্ষভাবে। আপন মনেই বলে : 'কাণ্ডটা দেখ একবার।'

চারদিক তচ্‌নচ্‌। মা দেখে, কিন্তু নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস হতে চায় না। বলে : 'নিকলাইয়ের অত বাড়াবাড়ি করার দরকারটা কি ছিল?'

'হয়ত ঘাবড়ে-টাবড়ে গিয়েছিল।' জবাব দেয় পাভেল।

হাত কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে আবার বলে মা : 'চমৎকার ব্যাপার! দুদ্দাড় ক'রে এল। কথা নেই বার্তা নেই বেঁধে নিয়ে চলে গেল!' নিজের ছেলে ধরা পড়েনি, অনেক শান্ত আছে মনটা। কিন্তু যে অভাবনীয় কাণ্ডটা ঘটে গেল ভাবতে গেলে মনটা অসাড় হয়ে যায়।

'টিট্‌কারি দিলে সেই পাঙ্গাশ-মুখোটা...আবার হুম্‌কী কত!...'

হঠাৎ যেন মন স্থির করে নেয় পাভেল। বলে : 'থাকগে, মা-মণি চল একটু গুছিয়ে-টুছিয়ে ফেলা যাক।'

সেই আদরের ডাক। মায়ের দিকে মনটা যখন বড় টানে ঐ ডাকেই ডাকে পাভেল। কাছে এসে মা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করে :

'তোকে কিছু ব রেনিতো রে?'

'করেনি মানে? আমায় ফেলে গেল। এ সহ্য করব কি করে? ওরা আমাকেও সাথে নিয়ে গেল না কেন?'

ছেলের চোখে যেন জল। ব্যথাটা খানিকটা বুঝতে পারে মা। একটু সান্ত্বনার ছলে বলে : 'ভাবনা কিরে? তোকেই কি ছাড়বে ভেবেছিস্‌?'

'তা ছাড়বে না জানি।'

মা মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হ'য়ে যায়।

'তোর প্রাণে কি একটুও মায়া দয়া নেই! যে-কথাগুলো বললাম, বলতে আমার বুক ভেঙে গেল। আর তুই কাটা ঘায়ে নুন ছিটোচ্ছিস্‌। একটু সান্ত্বনা দেবার জন্যই না হয় একটিবার একটু মিথ্যে কথা বললি!'

মার দিকে তাকায় পাভেল। কাছে এসে বলে :

'কিন্তু কেমন করে তা যে জানি না মা। এসব যে তোমার সইতেই হবে!'

দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ে। কান্নায় তোলপাড় হতে থাকে মায়ের বুকটা। গলা কাঁপে। সামলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করে :

'হাঁরে, খুব বেশী মারধোর করে নাকি ওরা? গায়ের মাংস নাকি টেনে টেনে ছেঁড়ে! শুনেছি মেরে হাড়গোড় ভেঙে দেয়। সত্যি রে? উঃ ভাবতে পারি না। কি সাংঘাতিক...'

'হাড় ভাঙা তো বরঞ্চ ভালো। মানুষের আত্মাকেই ভেঙে ফেলে ওরা। ওদের নোংরা হাত দিয়ে মুচ্‌ড়ে মুচ্‌ড়ে ভাঙে। সব চেয়ে সাংঘাতিক তো এইটে।'

পর দিন জানা গেল বুকিন, সাময়লফ্, সমফ্ এবং আরো পাঁচজনকে ধরেছে। ফিওদর মাজিন সেদিন সন্ধ্যেবেলায় এসে হাজির। তার ঘরেও তল্লাসী হয়েছে। ভারী খুশি মাজিন। ভাবছে একজন বাহাদুর হয়ে গেছে সে। মা শুধায় :

'ভয় পাস্‌নিরে, ফিওদর?'

মুখখানা কালি মেরে গেল ওর। চেহারাটা তীক্ষ্ন হয়ে উঠল। নাকটা কাঁপতে লাগল। বলল :

'বাব্বাঃ! ভয় আবার পাইনি। খালি মনে হচ্ছিল এই বুঝি ধরে মারে। কি মোটা অফিসারটা। কালো দাড়ি, আঙুলে ইয়া বড় বড় লোম। চোখে কালো চশমা, যেন চোখই নেই ব্যাটার, খালি গত্তটা আছে। গাঁক্ গাঁক্ ক'রে সে কি চেল্লায় আর মাটিতে পা ঠোকে! বলে কিনা গারদে পুরবে। মার-টার কি আর খেয়েছি সাতজন্মে! বাড়ীর এক ছেলে, সবে ধন নীলমণি! আদরে আদরে মানুষ।'

ঠোঁট চেপে, সেঁটে চোখ বন্ধ ক'রে থাকে খানিকক্ষণ। দুই হাত দিয়ে চুল-গুলোকে পেছনের দিকে সরিয়ে লাল চোখ দুটো পাভেলের দিকে তুলে বলল :

'দেখুক না একবার হাত ছুঁইয়ে। রক্ষে রাখব না। এমনি ঝাঁপিয়ে পড়ব চাকুর মতো—কামড়ে দাঁত বসিয়ে দেব। মরণ কামড়, জান থাকতে ও কামড় ছাড়ায় কার বাপের সাধ্যি!'

মা বলে : 'ওই তো হাড়গিলের মত চেহারা। উনি আবার লড়বেন।'

'দেখে নিও।' বলে ফিওদর চ'লে যায়।

পাভেলকে বলে মা : 'ওই খসবে সব চেয়ে আগে, দেখিস্।'

পাভেল চুপ করে থাকে।

অল্পক্ষণ পরেই আস্তে আস্তে রান্নাঘরের দরজা খুলে রীবিন ঢোকে। একটু হেসে বলে : 'কাল ওরা এনেছিল আমায়, আজ নিজেই এলাম।' বলে পাভেলের হাত ঝাঁকানি দিয়ে এসে মায়ের কাঁধে হাত রাখে।

'একটু চা পাব?'

পাভেল নিরীক্ষণ ক'রে ক'রে দেখে ওর দাড়ি-ছাওয়া চওড়া কালো মুখটা আর গভীর কালো চোখ। ওর ওই শান্ত চাহনির মধ্যে কিসের যেন ইঙ্গিত।

মা সামোভার চড়াবার জন্য রান্নাঘরে যায়। রীবিন এসে বসে টেবিলে কনুই ভর ক'রে; তাকিয়ে থাকে পাভেলের দিকে। যেন একটা পুরানো কথার জের টেনে বলতে শুরু করে :

'তোমার সাথে খোলাখুলি কথা কইতে চাই। পাশেই তো আছ; কদ্দিন থেকে দেখছি মেলাই লোকজন আসে তোমাদের বাড়ীতে। অথচ মদ খাওয়া নেই, মাতলামি নেই; বুঝতেই তো পারছো। একটু ভালোভাবে থাকারও জো নেই, অমনি লোকের চোখ টাটাবে। আমি একটু নিজের মত থাকি ব'লে তো লোকের চক্ষুশূল হয়েছি।'

কেমন যেন ভারী ভারী কথাগুলো, কিন্তু সহজভাবে ব'লে যায়। কালো হাতখানা দাড়িতে বুলোতে বুলোতে পাভেলের মুখের দিকে তীক্ষ্নভাবে তাকিয়ে থাকে।

'লোকে কত কি সব কইতে শুরু করেছে তোমায়। আমার বাড়ীওয়ালা বলছে কি জান? গির্জেয়-টির্জেয় তো যাও না! বলছে তুমি নাকি নাস্তিক। অবশ্যি আমিও যাইনে গির্জায়। তারপর ওই কাগজগুলো। তোমারই কর্ম নিশ্চয়ই!'

পাভেল উত্তর দেয় : 'হাঁ।'

মা আঁতকে ওঠে। রান্নাঘরের দরজায় মাথাটা বাড়িয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি বলেন : 'তুই তো আর একা করিস্নি!'

পাভেল হাসে, রীবিনও হাসে।

'বেশ-বেশ!' রীবিন বলে।

মায়ের কথা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলে না দেখে চটে যায় মা। মুখ আঁধার করে হন্‌হনিয়ে বেরিয়ে যায়।

'বেশ! খুব ভালো করেছ কাগজ বার করে। লোকগুলোর তবু একটু টনক নড়বে। উনিশখানা, না হে?'

'হ্যাঁ, উনিশটা।' পাভেল উত্তর দেয়।

'তাহলে দেখছ তো, সব কটাই আমি পড়েছি। কতগুলো জিনিস তেমন পরিষ্কার হয়নি। কতকগুলো অবান্তর। অবশ্য মেলা কিছু বলবার থাকলে একটু আধটু অমন হবেই। দু চারটা এদিক সেদিকের কথা এসে যায়ই। ঠেকান যায় না।'

রীবিন হাসে একটু। ওর শক্ত সাদা দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ে।

'তার পরেই, বুঝলে পাভেল! এই খানাতল্লাসীর ব্যাপার। তাইতেই আমার মনটা আরো এদিকে ঝুঁকল। তুমি, ওই খখল, আর নিকলাই, তোমরা...'

কথা খুঁজে পায় না রীবিন, চুপ করে বাইরের দিকে তাকিয়ে থেকে টেবিলের ওপর টক্ টক্ ক'রে টোকা মেরে চলে।

'হ্যাঁ, রাস্তা তোমরা দেখিয়ে দিয়েছ। বেশ, চল, এগিয়ে চল। তোমরা তোমাদের কাজ কর, আমরা আমাদেরটা করি। চমৎকার ছেলে ওই খখল। কারখানায় এক এক সময় ওর কথা আমি অবাক হয়ে শুনি। বাবা, ও কঞ্চি বড় দড় হে। ভাঙবে তবু মচকাবে না খখল। যমে মারে তো মারবে নইলে কারো বাপের সাধ্যি নেই। লোহার হাড্ডি। তুমি আমায় বিশ্বাস করতে পার, পাভেল?'

'কেন পারব না?' মাথা নেড়ে পাভেল বলে।

'ভাল। আমার দিকে একবার তাকাও দেখিনি! চল্লিশটি বছর বয়েস হল আমার! তোমার প্রায় দ্বিগুণ। দুনিয়াটাকে তোমার চাইতে অন্তত বিশগুণ বেশী দেখেছি। তিন বছর সেপাইগিরি করেছি। দু দু'বার বিয়ে করেছি। পয়লা বৌটা মরেছে, দ্বিতীয়টাকে তালাক দিয়েছি। ককেসাসে গেছি। সেখানে দুখবর্ত্‌সি-দের* দেখেছি। জীবনটাকে নিয়ে তারা যে কি করবে ঠিক পায় না। বুঝলে?'

মা আগ্রহভরে শোনে। কি ক্যাট্ ক্যাট্ কথা লোকটার। লাগাম, পালিশ, কিছু নেই। তবু ওই মাঝবয়সী লোকটা ওর ছেলের কাছে মন খুলে কথা কইছে দেখে বড় ভালো লাগে মায়ের। কিন্তু কি রুক্ষু ছেলেটা। এতটুকু গলে ভেজে না।'

ছেলের ত্রুটি পুরিয়ে নেবার জন্য নিজে সদয় হ'য়ে ওঠে মা :

'একটু কিছু এনে দি, মিখাইলো ইভানোভিচ?'

'থাক, মা থাক। আমি খেয়েই এসেছি। তাহ'লে পাভেল, তোমার মতে,

* একটা ধর্মীয় সম্প্রদায়—অঃ

যে ভাবে আমরা দিন কাটাচ্ছি, তার থেকে অনেক ভালো ক'রেই কাটতে পারে, না?'

পাভেল ওঠে, হাত পেছনে দিয়ে ঘরময় পায়চারি করে। বলে :

'দেখুন, ঠিক রাস্তায়ই মোড় ঘুরেছে। নইলে আপনি আজ এমন ক'রে মন খুলে কথা কইতে এলেন কি করে? ধীরে ধীরে সব হাতে হাত মেলাবে দেখবেন—এই আমাদের মত মেহনতী মানুষ সারা জীবন যারা শুধু খেটেই যায় তারা সব এক হ'য়ে যাবে। তারপর এমন সময় আসবে যখন সব মানুষ এসে জুটবে। কেউ বাকী থাকবে না। আমরা কি পাই! পাই অন্যায় আর জুলুম। ওই নিয়েই আমাদের জীবন! কিন্তু তাইতেই তো আমাদের চোখ খুলছে! কঠিন সত্যটা তাই দেখতে পাচ্ছি। কি ক'রে তাড়াতাড়ি মুস্কিল আসান হবে, তার নিশানাও সেখান থেকেই আসছে।'

'ঠিক বলেছ,' রীবিন বলে, 'আগা-পাছ-তলা বদলানো দরকার আমাদের। কিন্তু গায়ে ছেৎলা ধরলে না হয় মানুষটাকে ঘ'সে মেজে সাফ কাপড় জামা পরিয়ে দুরস্ত করিয়ে নিয়ে এলে। মনের ময়লা ঘোচাবে কি ক'রে বলতো? আসল ফ্যাসাদ তো সেখানেই!'

পাভেল উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে। কারখানা, আর কারখানার মালিকদের সম্বন্ধে; অন্যদেশের শ্রমিকরা কেমন ক'রে দাবির লড়াই লড়ছে সে সম্বন্ধে বলতে বলতে আরো মেতে ওঠে। রীবিন মাঝে মাঝে টেবিল চাপড়ে ব'লে ওঠে : 'ঠিক, ঠিক বলেছ!'

একবার একটুখানি হেসে শান্তভাবে বলে :

'এখনও কাঁচা বয়স হে ছোকরা, মানুষ চিনতে দেরি আছে এখনও।'

পাভেল ওর সামনে এসে দাঁড়ায়, গম্ভীর হ'য়ে বলে :

'দেখুন, বয়স কম বেশী নিয়ে কথা নয়। ওসব কথা ছাড়ুন। মোদ্দা কথা—কার চিন্তাধারা ঠিক—'

'তাহ'লে তুমি বলতে চাও, ভগবান টগবান দিয়ে ওরা আমাদের শুধু ভুলিয়ে রেখেছে! সত্যি আমিও দেখছি ও সব ধর্ম-টর্ম কোনো কাজের নয়।'

এমনি সময় বাধা দেয় মা। ভগবানে বিশ্বাসটুকুকে নিবিড় শ্রদ্ধায়, একান্ত নিষ্ঠায় পুরে রেখেছে সে বুকের মধ্যে। ছেলে যখন উল্টো কথা বলে, বড় বাজে। নীরব দৃষ্টিখানি শুধু তুলে ধরে ছেলের মুখের পরে; নীরব মিনতি ঝরে ঝরে পড়ে : ওরে অমন কঠিন কথা ব'লে আমায় আঘাত দিস্‌নেরে, দিস্‌নে। কিন্তু অবিশ্বাসী ছেলের অবিশ্বাসের পেছনে কি যেন মস্ত বড় আরেকটা বিশ্বাস লুকিয়ে আছে, মায়ের প্রাণে তার খবর পৌঁছায়। তাতেই সান্ত্বনা মেলে। নিজের মনে ভাবে :

'ওর মনের কথা আমি কেমন ক'রে বুঝব?'

প্রথমটায় মনে হয়েছিল ছেলের কথায় আধাবয়েসী লোকটাও বুঝি চটেছে। কিন্তু লোকটার বেয়াড়া প্রশ্ন আর সইতে পারে না মা। বলে :

'দেখ, ও কথাগুলো একটু রয়ে-সয়ে ব'লো তোমরা।' গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। আবেগে কথা আরো ভারী হ'য়ে ওঠে : 'তোমাদের মনে মনে যা খুশি থাক। কিন্তু আমার কথা ভেবো একবার। আমি যে বুড়ো মানুষ। আমার দুঃখের মধ্যে ঐ টুকুই তো ভরসা। ভগবানকে যদি আমার কাছ থেকে কেড়ে নিস তোরা, কোথায় দাঁড়াব আমি, বল্‌তো?'

চোখে জল উথলে ওঠে। বাসন ধুতে ধুতে আঙুলগুলো থরথর ক'রে কাঁপে।

'তুমি বুঝতে পারোনি মা আমাদের কথা,' পাভেল বলে। রীবিন তার স্বভাব-মন্থর গভীর স্বরে বলে : 'কিছু মনে ক'রো না, মা।' সংক্ষিপ্ত এক টুকরো হাসি খেলে যায় ওর মুখে। পাভেলের দিকে চায়।

'আমি ভুলেই গিয়েছিলাম তোমার এ বুড়ো বয়সে ঐ বিশ্বাসটুকু বাদ দেওয়া চলে না।'

পাভেল আবার বলে : 'মা, তোমার ভগবান দয়াল। তাঁর কথা বলিনি আমি। ব'লেছি আমাদের ধর্মের পাণ্ডা পুরুতরা যে রাক্ষুসে ভগবানকে খাড়া করেছেন তার কথা। সে তো ভগবান নয়, জুজু। ওই জুজুর ভয় দেখিয়েই তো ওরা জন-কয় মানুষ আমাদের এতগুলোকে পায়ের তলায় দাবিয়ে রেখেছে!'

রীবিন টেবিল চাপড়ে চীৎকার ক'রে ওঠে : 'ভগবান না আরো কিছু! গিল্টি-করা বন্ধকী মাল চাপিয়েছে আমাদের মাথার ওপর। আর হাতের কাছে যা পায় তাই দিয়ে আমাদের মারে। আচ্ছা বলতো মা, ভগবান তো মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন নিজের মূর্তির আদলে, তাই না? তাহ'লে দাঁড়াচ্ছে এই : মানুষ যখন ভগবানের মত, তিনিও কাজে কাজেই মানুষের মত। কিন্তু সে মিল আর কোথায়? বুনো জানোয়ারের সাথেই তো দেখছি আমাদের আদল বেশী। গির্জাগুলোর বেদীতে ভগবান কোথায়? সেতো কাক-তাড়ুয়া! আমাদের ভয় দেখানর জন্য রেখে দিয়েছে! সুতরাং ওই ভগবানকে আমাদের পাল্টে নিতে হবে। আচ্ছা ক'রে ঘসে মেজে সাফ ক'রে না নিলে চলছে না, এমনি মিথ্যের পোষাক পরিয়ে রেখেছে ও ব্যাটারা। আমাদের আত্মাকে হত্যা করার জন্য তাকেও তারা অমন বিকৃত করে ছেড়েছে।'

কথাগুলো অত্যন্ত ধীরে নরম করেই বলছিল রীবিন। কিন্তু মার বুক ভেঙে যেতে লাগল। ওই কালো দাড়ির ফ্রেমে আঁটা মস্ত বড় গম্ভীর মুখখানার দিকে তাকিয়ে ভয় পেয়ে যায় মা। চোখে কি অদ্ভুত কালো দীপ্তি। সইতে পারে না মা। ব্যথার মত কি যেন একটা ভয় বুকের মধ্যে তোলপাড় করতে থাকে।

মাথা নেড়ে অস্থিরভাবে বলে : 'না না আমি চ'লে যাই তারপর তোমরা যা খুশি ব'লো। এসব কথা শুনবার মত শক্তি আমার নেই আর।'

মা একরকম ছুটেই নিজের ঘরে চলে গেল। রীবিন বলে পাভেলকে :

'বুঝলে, পাভেল, ওসব মগজের কম্ম নয় খালি। কলজে চাই, কলজে। মানুষের আত্মাটার মধ্যে কলজের একটা খাস তালুক আছে। সেখানে ওই একটি জিনিস ছাড়া আর কিছু গজায় না।'

পাভেল দৃঢ়কণ্ঠে বলে : 'যতক্ষণ না মানুষের যুক্তি দিয়ে বিচার করবার ক্ষমতা হবে ততক্ষণ মুক্তি নেই তার।'

'না হে না।' রীবিন চেঁচিয়ে বোঝাতে যায় : 'যুক্তি দিয়ে বুঝতেই পারো, কিন্তু তাতে তাকত মেলে না। তাকত মেলে এই বুকটার মধ্য থেকেই, মগজ থেকে নয়।'

কাপড় ছেড়ে শুতে যায় মা। সেদিন আর প্রার্থনা করা হয় না। কেমন বিশ্রী একটা অনুভূতি ওকে হিম করে তুলেছে। রীবিন তো আগে বেশ লোক ছিল; বুদ্ধি শুদ্ধি ঘটে ছিল। কিন্তু আজ ওর কথা মনে হলেই মনটা বিগড়ে যাচ্ছে।

'নাস্তিক! বিদ্রোহী! এখানে মরতে এল কেন?'

ধীর শান্ত আত্ম-বিশ্বাসের সাথে বলে চলে রীবিন :

'কিন্তু ধর্মের জায়গাটা তো আর ফাঁকা রাখা যাবে না। মানুষের হৃদয়ে ওটা ভারী বেয়াড়া জায়গা। ভগবানকে যদি বিলকুল বার করে দাও, তবে এই এত্ত বড়

দগ্‌দগে ঘা হ'য়ে থাকবে ওখানটায়। কাজেই আমাদের মতো করে নতুন ধর্ম একটা বার টার করে নিতে হবে হে, পাভেল। আমাদের ভগবান হবেন মানুষের দোস্ত।'

পাভেল উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে : 'কেন আপনাদের যীশুই তো আছেন!'

'কোন আধ্যাত্মিক সাহসই ছিলনা লোকটার! এদিকে বললেন, আমার এই বাটিটাও চলে যাক—ওদিকে সীজারকে মেনে নিলেন। নিজের দুনিয়ায় মানুষের খবরদারী তো আর ভগবান মানতে পারেন না? তিনি নিজেই সর্বশক্তিমান। কাজেই এটা মানুষের আর এটা ভগবানের—এমন-ধারা ভাগাভাগি করবেন কি করে তিনি? কিন্তু যীশুখৃষ্ট ব্যবসা, বিয়ে সবই স্বীকার করেছেন। ওদিকে ফল হয় না ব'লে ডুমুর গাছটাকে শাপ-মন্যি করলেন। আরে ফল হয় না, সে কি আর গাছটার দোষ? তেমনি মানুষও যদি ভালো না হয়, সে দোষ তার নয়। আমিই তো আর গিয়ে আমার মনের মধ্যে মন্দের বীজ পুঁতে রাখতে যাইনি!'

তুমুল তর্ক বেধে ওঠে। পাভেল অস্থিরভাবে পায়চারি করতে থাকে। কাঠের মেঝেটা মচ্‌মচ্‌ ক'রে ওঠে। ও যখন কথা বলে—চারদিকের আর কোন কিচ্ছুর আওয়াজ শোনা যায় না। কিন্তু শান্ত গভীর স্বর রীবিনের—পেণ্ডুলামটার ক্ষীণ টিক্‌ টিক্‌, বাইরে পাঁচিলের গায়ে তুষার ঝরার মিহি খস্‌খসানিটুকু অবধি শুনতে পায় মা।

'দেখ,' রীবিন বলে, 'আমি আগুন-খোঁচানোর কাজ করি কারখানায়। আগুন নিয়েই আমার কারবার। আমার মনে হয় কি জান? ভগবান হচ্ছেন জ্বলন্ত আগুন। এই কলজেটার মধ্যেই তাঁর আস্তানা। বলে না—পয়লা ছিল শুধু কথা। কথাই শব্দ। শব্দ-ব্রহ্ম, তাই বলে না? ওই শব্দই আমাদের আত্মা।'

'না—আমাদের বিচারবুদ্ধির নাম কথা।' জোর দিয়ে বলে পাভেল।

'বেশ তো, ভায়া, তাই না হয় হ'ল। তাহ'লে ভগবান বুকেও আছেন, বিচার-বুদ্ধিতেও আছেন। কিন্তু খাঁটি কথা বাবা,—গির্জায় নাই দেবতাটি। গির্জা তো তাঁর মন্দির নয়—কবর!'

মা ঘুমিয়ে পড়ে। কখন যে গেল রীবিন টের পায়নি।

কিন্তু এর পর থেকে নিয়ম-মতো রোজ আসে ও। পাভেলের বন্ধু বান্ধবরা কেউ থাকলে—এক কোণে চুপ করে ব'সে থাকে ও। মাঝে মাঝে কথার পিঠে বলে : 'এটি হ'ল আসল কথা।'

একদিন বসে বসে আসরের প্রত্যেকের মুখ নিরীক্ষণ করে করে দেখল। তারপর একটু গরম হয়ে বলল :

'দেখ এখনকার অবস্থাটা নিয়েই কথা বল। পরে গিয়ে কি হবে না হবে তা নিয়ে এখন থেকে মাথা ঘামিয়ে কি হবে? তখন কি অবস্থা হবে কে বলতে পারে? গোলামীর শেকল ভেঙে মানুষ যখন ঝাড়া হাত পায়ে দাঁড়াবে—তখন তাদের ভালো মন্দ সব তারাই ঠিক করে নেবে। ওদের মগজগুলোয় সব আছে। খালি দু'দণ্ড ব'সে একটু ভাবার ফুরসুৎ চাই। হয়ত পুরানো দিনের সব কিছুই ওরা ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাইবে—মায় নিজেদের বিদ্যে-সাধ্যি—নিজেদের যা কিছু। হয়তো ভাববে গির্জের দেবতাটিকে পেছু লাগিয়ে যেমন দুশ্‌মনি করেছে, তেমনি গোলামী কালের এতটুকু কিছু থাকলেও তাকেই হাতিয়ার করে ওদের জব্দ করবে দুশমনেরা। মানুষ-গুলোর হাতে বই পুঁথি তুলে দাও; দেখবে নিজেরাই হদিশ-ফিকির ক'রে নেবে। বুঝলে? এটি হ'ল আসল কথা।'

পাভেল আর রীবিন যদি একা থাকে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠাণ্ডা মেজাজে আলোচনা চলে। কখনও কারো মেজাজ গরম হয় না। মা ব্যগ্র হ'য়ে প্রত্যেকটি কথা শোনে। প্রত্যেকটি কথা বুঝতে চেষ্টা করে। ওর মনে হয়—এই চওড়া-কাঁধ, কালো-দাড়িওয়ালা লোকগুলো, নিজের ওই দীর্ঘ-দেহ তাগড়া জোয়ান ছেলে—সবাই যেন আঁধার ঘরে হাতড়ে মরছে—পথ পাচ্ছেনা। হেথা যায়, হোথা যায়, মাথা ঠোকে, হোঁচট খায়, হাত পায়ের ঠেলা লেগে জিনিসপত্র পড়ে যায় ঝন্ ঝন্ ক'রে, পায়ের তলায় পিষে যায়; তবু পায় না পথ। এটা হাতে নেয়, ছুঁড়ে ফেলে; ওটা হাতে নেয় ছুঁড়ে ফেলে; ঠিক জিনিসটি মেলে না। কিন্তু ওদের নিষ্ঠা বল, আশা বল, কিছুরই কমতি নেই।

মা এখন সব রকম কথা শুনতে শিখেছে। যতই সাংঘাতিক হোক, যতই বে-আব্রু হোক, মনের মধ্যে গিয়ে আগের মত ধাক্কা দেয় না। শুনতেও শিখেছে, ঝেড়ে ফেলতেও শিখেছে। ওরা যখন ঈশ্বরকে অস্বীকার করে, মা স্পষ্ট দেখতে পায়—ওটা আসলে বাইরের খোলস। বাইরে দেখতেই অবিশ্বাস। কিন্তু ওর মধ্যে কি যেন একটা গভীর বিশ্বাস আছে। শান্তভাবে স্নিগ্ধ ক্ষমার হাসি হাসে মা। রীবিনকে এখনও মাঝে মাঝে কেমন জানি লাগে। ভালো লাগে না। কিন্তু আগের মত রাগও হয়না আর।

প্রতি সপ্তাহে খখলের জন্য বই আর জামা-কাপড় নিয়ে জেলে যায় মা। এক দিন সাক্ষাতের অনুমতিও পাওয়া গেল। ফিরে এসে বলল :

'ঠিক সেই রকমই আছে ছেলে। সকলের সাথে বেশ খাতির জমিয়ে নিয়েছে। খুব ঠাট্টা মশ্করা করছে সবাই দেখলাম। কিন্তু বুঝতে পারছি খুব কষ্ট হচ্ছে ওর। যতই হোক সে কি আর মুখ ফুটে বলবে! সেই ছেলেই নয়!'

'ঠিকই তো করে।' রীবিন বলে, 'দুঃখটা তো আমাদের বাইরের চামড়া। আমরা এই খোলটার মধ্যে থাকি। রোজ্কার জল-ভাতের মত দুঃখু ধান্দা আমাদের গতর-সওয়া হয়ে গেছে। ও নিয়ে গুমর করার কি আছে গো? সক্কলকার চোখেই তো আর ঠুলি পরান নেই। কেউ কেউ ইচ্ছে করে চোখ বন্ধ ক'রে অন্ধ সেজে থাকেন। তা আমরা যদি বেকুব হই, তাহ'লে আর কার দোষ! কিচ্ছুটি বলো না, দাঁত বার করে হাসো, আর চুপটি করে পিঠ পেতে মার খাও।'

বার

ভ্লাসফ্দের খুদে সাদা বাড়ীটা আর হেলা ফেলার জিনিস নয় এখন। বস্তির সকলেরই নজর পড়েছে ওদিকে। লোকের সন্দেহও হয়, হিংসেও থাকে মনের মধ্যে লুকিয়ে, কৌতূহলও আছে; আবার বিশ্বাসও হ'তে চায়। এক এক সময় হঠাৎ কেউ আসে, চুপি চুপি চার দিকে চেয়ে শুধায় পাভেলকে :

'দেখ ভাই, তুমি তো মেলাই পুঁথি পড়েছ; আইন-কানুন জানো। আমায় একটু ব'লে দেবে যে...?'

পুলিশী জুলুম, অথবা মালিকের অন্যায় ব্যবহারের খবর নিয়ে এসেছে হয়তো বেচারা। গোলমেলে ব্যাপার হলে পরিচিত কোনো উকিলের কাছে চিঠি দিয়ে দেয়

পাভেল। কিন্তু যতদূর পারে নিজেই একটা সমাধান করে দেয়।

নেহাত অল্প বয়স হলেও গম্ভীর প্রকৃতির এই ছেলেটির উপর ক্রমশই লোকের শ্রদ্ধা বেড়ে যায়। কি সুন্দর কথা বলে, চাল নেই, ভয় ডর নেই; যা ধরবে তাই করে ছাড়বে। চোখ কান সব খোলা—সব জানছে, বুঝছে। কোথাও কোনো ঝগড়া-ঝাঁটি হলে খুঁজে বের করবেই মিলের কোন পথ খোলা আছে কিনা—যাতে ঐক্যের সূত্র ছিন্ন না হয়।

একটা ব্যাপারে পাভেলের খুব মর্যাদা বেড়ে গেল।

কারখানার চারধারে একটা জলা ছিল। জঙ্গলে ভর্তি হয়েছিল জলাটা। গ্রীষ্ম-কালে হলদে রঙের গ্যাস উঠতো, আর মশার ডিপো হয়ে থাকত। গোটা বস্তিতে ঘরে ঘরে জ্বর লেগে থাকত ওই কারণে। জলাটা কারখানারই সম্পত্তি। সেবার নতুন ডিরেক্টর এলেন। তিনি দেখলেন ওটার জল-নিকাশের বন্দোবস্ত হলে প্রচুর জ্বালানি ঘাস পাওয়া হবে এবং বেশ দু'পয়সা মুনাফা হবে। সুতরাং বস্তি-উন্নয়নের জিগির তুলে জল-নিকাশের খরচ বাবদ শ্রমিকদের মজুরির রুব্‌ল পিছু এক-কোপেক কাটার হুকুম দিয়ে ফরমান জারী করলেন।

শ্রমিকরা ক্ষেপে গেল। বিশেষ করে আরো ক্ষেপল ট্যাক্সটা দিতে হবে শুধু শ্রমিকদের, কর্তারা আর বাবুরা মাপ।

নোটিশটা বেরুল শনিবার। পাভেল সেদিন কারখানায় আসেনি, শরীর ভালো ছিল না। সুতরাং কিছুই জানতে পারেনি ও। পরের দিন ওর কাছে এল কারখানার ঢালাই-খানার পুরানো কর্মী বুড়ো সিজভ—মানী লোক; আর এল লম্বা চেহারা মেজাজী মেকানিক মাখোতিন। তাদের কাছেই শুনল ও ব্যাপারটা।

উত্তেজিত হয়ে বলে সিজফ : 'আমরা পুরানোরা বৈঠক করে ব্যাপারটার আলোচনা করেছি। তুমি সব জান শোন, তাই তোমার কাছে পাঠান হয়েছে আমাদের জানবার জন্য যে ডিরেক্টররা আমাদের কড়ি দিয়ে মশা মারতে পারবেন এমন কোন আইন আছে কিনা।'

মাখোতিন কুতকুতে চোখ লাল করে বলে : 'চার বছর আগে শালারা টাকা নিয়েছে গোসলখানা ক'রবে বলে। আটত্রিশ শ' রুব্‌ল উঠেছিল। সে শালার গোসলখানার টিকিটিও চোখে দেখলুম না আজ অবধি।'

ব্যাপারটা যে কত বড় অন্যায় বুঝিয়ে দিলে পাভেল। তা ছাড়া ওই জ্বালানি ঘাস বেচেও মস্ত মুনাফা লুটবে কারখানার মালিকেরা। রাগে গোঁ গোঁ করতে করতে চলে গেল দু'জনে। মা ওদের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ছেলের কাছে ফিরে এসে বলে হেসে :

'তুই দেখি বুড়োদেরও বুদ্ধি যোগাস্ রে!'

পাভেল জবাব দিলে না। টেবিলে গিয়ে খস্ খস্ করে কি একটা লিখে মাকে ডেকে বললে :

'একটা কাজ করবে মা? এক্ষুনি এই চিঠিটা শহরে নিয়ে যাবে এক জায়গায়?'

'বিপদ টিপদ আছে?'

'আছে বৈকি! এটা যাবে আমাদের কাগজ ছাপা হয় যেখানে। কারখানার আমাদের সেই মাইনে কাটার ব্যাপারটা এবারকার কাগজে বের করতেই হবে।'

'এক্ষুনি যাচ্ছি আমি।'

এই প্রথম কাজের ভার পাওয়া ছেলের কাছ থেকে। কিছু গোপন না রেখে

মন খুলে ব্যাপারটা বুঝিয়েও দিয়েছে। খুশিতে মায়ের মনটা ভরে উঠল।

তৈরী হতে হতে বলে: 'আমি বুঝতে পেরেছি, খোকা, কি ভাবে শুষছে ওরা। হ্যাঁ, কি নাম বললি? ইয়েগর ইভানোভিচ্, না?'

মায়ের ফিরতে রাত হল। অত্যন্ত ক্লান্ত হলেও মনটা খুশিতে নাচছে।

'সাশাকে দেখলাম রে ওখানে। তোকে ওর কথা বলতে বলেছে। ইয়েগর ইভানোভিচ্ ভারী সাদাসিধে মানুষ। খুব ফুর্তিবাজ। মজা করে কথা বলে।'

পাভেল আস্তে আস্তে বলে: 'তোমার তাহলে ভালো লেগেছে ওদের, বেশ ভালো।'

'কি সাদা-সিধে রে ওরা। মানুষের চাল থাকলেই মুস্কিল। তোকে ওরা সকলেই খুব মানে দেখছি...'

শরীরটা সারেনি ভালো করে, সোমবারও পাভেল কাজে যেতে পারল না। দুপুরে খাবার ছুটির সময় ফিওদর ছুট্তে ছুট্তে এসে উপস্থিত। ভারী উত্তেজিত। হাঁপাচ্ছে। কিন্তু খুব খুশি খুশি দেখাচ্ছে।

'শিগগির চল,' চেঁচিয়ে বলল ও, 'সারা কারখানায় আজ কি কাণ্ড হচ্ছে। সিজফ ও মাখোতিন তোমায় ডাকতে পাঠালো। তুমিই সব চেয়ে ভালো করে বুঝিয়ে দিতে পারবে কিনা। শিগগির এসো, দেখবে।'

একটিও কথা না বলে পাভেল জামা কাপড় পরতে শুরু করে দিল।

'মেয়েরাও সব এসে জোর চেঁচাচ্ছে।'

মা বললে: 'দাঁড়াও আমিও আসছি। কি হয়েছে রে ব্যাপার?'

পাভেল বলে: 'চলো মা।'

এক রকম দৌড়েই চলে ওরা। কারো মুখে কথা নাই। উত্তেজনায় মায়ের যেন দম বন্ধ হ'য়ে আসছে। কেন জানি মনে হয় খুব বড় একটা কিছু ঘটবে। কারখানার দরজায় একদল স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে চীৎকার আর কোঁদল করছে। ইয়ার্ডে ঢুকে ওরা তিনজন গিয়ে পড়ল একটা উত্তেজনামুখর ঘন জটলার মধ্যে। মা দেখল দেয়ালের দিকে পিঠ করে একটা পুরানো লোহালক্কড়ের স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে আছে সিজফ্, মাখোতিন, ভিয়ালফ্, আরো জন পাঁচ-ছয় শ্রমিক। এদের কিছুটা প্রভাব প্রতিপত্তি আছে শ্রমিক মহলে। সকলেরই মুখ এদিকে।

কে একজন চেঁচিয়ে উঠল: 'এই যে ভ্লাসফ্ আসছে।'

'ভ্লাসফ্! এদিকে, এদিকে চলে এসো হে!'

চারদিক থেকে চীৎকার ওঠে: 'এই চুপ চুপ। গোল ক'রোনা।'

কাছেই কোথা থেকে রীবিনের নিস্তেজ স্বর শোনা যায়:

'এ আমাদের হকের লড়াই, ভাইসব। কানা কড়ির জন্য লড়তে আসিনি। পয়সাটার জন্য হেদিয়ে মরছি না আমরা—আমাদের পয়সাটা তো আর মালিকদের পয়সার চাইতে গোল বেশি নয়। তবে হ্যাঁ, ওজনে ভারী বটে। বড় সাহেবের রুব্‌লের কাঁড়ির চাইতে আমাদের একটি কোপেকের ওজন বেশি—খুনের ওজন কিনা। আমাদের মজদুরদের কলজে-খালি-করা খুন আছে ওতে। ওজনটা ওই খুনের। বুঝলে কিনা!'

ভীড়ের মধ্যে উত্তেজিত কোলাহল ওঠে:

'হক্ কথা কইছ, দোস্ত! হক্ কথা কইছ।'

'বাঃ খাসা। জবর বলা বলেছ।'

• 'এই যে ভ্লাসফ্ এসেছে। ভ্লাসফ্!'

সকলের কণ্ঠ এক হয়ে মিশে শব্দের ঘূর্ণি ঝড় ওঠে। তলিয়ে যায় মেশিনের ঘর্ঘর্, বাষ্পের ভস্ভসানি, তারের ঝন্ঝনানি। চারদিক থেকে লোক ছুটে আসে হাত তুলে, আগুন-ছড়ানো তীক্ষ্ণ ভাষায় পরস্পরকে উত্তেজিত ক'রে। মানুষগুলোর শ্রান্ত পাঁজরার তলায় গোপনে আজন্ম অসন্তোষ গুমরে ছিল। আজ নাড়া খেয়ে যেন তাই আগুন হয়ে উঠেছে; জয়ের উল্লাসে হাজার শিখা তুলে নাচতে নাচতে আকাশ পানে উঠছে, ছড়িয়ে পড়ছে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে; দুর্নিবার এক শক্তির টানে মানুষকে ডুবিয়ে ভাসিয়ে ছিনিয়ে টেনে নিয়ে চলেছে রূপান্তরের জ্বলন্ত অগ্নিশিখায়, আছড়ে ফেলছে পরস্পরের গায়ে। জটলার ঠিক মাথায় উঠেছে ধুলো আর ঝুলকালির মেঘ, ঘর্মাক্ত মুখগুলো উত্তেজনায় জ্বলে উঠছে, গাল ভিজে গেছে চোখের কালো জলে, কালো কালো মুখের মধ্যে ঝলকে উঠছে চোখ আর দাঁতগুলো।

পাভেল সিজফ্ আর মাখোতিনের পাশে দাঁড়াল গিয়ে। লোহার স্তূপের উপর।

'বন্ধুগণ!' ডাক দিল ও।

মায়ের চোখ এড়ায় না, পাভেলের মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে; ঠোঁট কাঁপছে প্রবলভাবে। অজান্তেই কখন ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসে মা।

বিরক্ত চীৎকার ওঠে : কে ঠেলছে অমন করে?' মা ধাক্কা দেয় ধাক্কা খায়। কিন্তু থামলে চলবে না। এগিয়ে যেতে হবে, দাঁড়াতে হবে ছেলের পাশে। কনুই দিয়ে কাঁধ দিয়ে ঠেলে সামনে এগিয়ে আসে মা।

উদাত্ত স্বরে, বুক ভরে পাভেল ডাকে : কম্রেড্স্! এক উন্দাম আনন্দ যেন ঢেউ দিয়ে উঠছে ভেতর থেকে। কথাটার যেন কী এক গভীর অর্থ খুঁজে পায় সে। ওর গলা বন্ধ হয়ে আসে। ইচ্ছে হয় হৃৎপিণ্ডটাকে উপড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় ওই গণদেবতার সামনে; ওর স্বপ্ন-দেখা প্রাণ...ন্যায়ের স্বপ্ন দেখেছে। আবার হাঁকে : 'কমরেড্স্!!'

এ-ডাকে বুকে শক্তি আসে। আনন্দের জোয়ার জাগে।

'কমরেড্স্, আমাদেরই দৌলতে দুনিয়া বেঁচে আছে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমরাই সবার রুটি জোগাই। আমরা গির্জা গড়ি, কারখানা গড়ি; শেকল গড়ি; টাকাও বানাই আমরাই।

'ঠিক বলেছ,' চীৎকার করে ওঠে রীবিন।

'খাটবার বেলা আমরা; কিন্তু বিচার বিবেচনা আমাদের জন্য নয়। কে ভাবে আমাদের কথা? আমাদের ভালোর জন্য কখনও কিছু করেছে কেউ? কেউ কি আমাদের মানুষ বলে গণ্য করে? না, কেউ—না, কেউ—না।'

প্রতিধ্বনির মত কে একজন বলে উঠল, 'কেউ না!'

বলতে বলতে ক্রমশ পাভেলের স্বর সহজ শান্ত হ'য়ে আসে। ভিড় ওর দিকে এগিয়ে আসে। অগণিত এই মানুষের দল আজ আর আলাদা নয়। সব মিলে মিশে এক-দেহ হয়ে সহস্র-শীর্ষ গণ-দেবতার রূপ ধরেছে আজ। সহস্র ব্যগ্র চোখের নিবিষ্ট দৃষ্টি বক্তার মুখের ওপর তুলে ধরে তার প্রতিটি কথা যেন নিঃশেষে পান করছে জনতা।

'যতদিন না আমরা মনে প্রাণে জানব যে আমরা সবাই ভাই, এক পরিবারের মানুষ, একজোট হ'য়ে দাবির লড়াইয়ে হাত মেলাবার শপথ নিয়েছি, ততদিন আমাদের ভাগ্য ফিরবেনা।'

একটা কর্কশ গলায় চীৎকার ওঠে : 'বাবা, ভণিতা ছেড়ে আসল কথায় এস!' মায়ের পাশেই দাঁড়িয়েছিল লোকটা।

দু'দিক থেকে দুটি প্রতিবাদের ধমক শোনা যায় :

'ফোঁড়ন দিও না বলছি!'

কেউ কেউ কপাল কোঁচকায়, চোখে তাদের অবিশ্বাস। চিন্তান্বিতভাবে অনেকে আবার পাভেলের মুখ দেখে সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে। কেউ-বা বলে : "লোকটা সমাজ-তন্ত্রী। কিন্তু ভারী সেয়ানা হে!"

এক-চোখো একটা ঢ্যাঙ্গা লোক বলে : 'না হে, বেশ বলেছে। খাঁটি কথা বলেছে।'

'আর দেরী নয়, কমরেড্‌গণ! একটু বুঝে দেখুন সবাই। আমাদের সাহায্য করতে একটা আঙুলও উঠবে না। আমাদের সহায় আমরা নিজেরা। শত্রুকে দাবাতে যদি চাই তবে আমাদের এক শপথ নিতে হবে—সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।'

মাখোতিন শূন্যে বদ্ধ-মুষ্টি আস্ফালন করে বলে :

'বন্ধুগণ, শুনুন, হক কথা বলেছে পাভেল।'

পাভেল বলে চলে : 'কোথায় ডিরেক্টর সাহেব? তাকে ডাকো এখানে।'

জনতার ওপর দিয়ে আচম্‌কা যেন একটা ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটা বয়ে গেল। চঞ্চল হয়ে উঠল সহস্র-শীর্ষ গণ-দেবতা। গোটা দশ বারো কণ্ঠ এক সাথে হাঁকিল :

'ডাকো ডিরেক্টরকে, ডাকো।'

'একটা প্রতিনিধিদল পাঠান হোক তার কাছে।'

মা ঠেলেঠুলে পথ করে আরও সামনে আসে। ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে গর্বে বুক ভরে ওঠে। পাভেল! আমার পাভেল! তার কথা শুনছে এই অগুন্তি মানুষ, তার মধ্যে গুরুজনস্থানীয়েরাও আছেন। তাঁরা শুনছেন, মানছেন ওই এতটুকু ছেলের কথা। অন্যদের মত পাভেলের মাথা গরম হয়নি, ভাষায় এতটুকু খারাপ কিছু নেই; দেখে মায়ের বড় ভালো লাগে।

গালিগালাজ, ক্রুদ্ধ চীৎকার চারধার থেকে চোখা চোখা হয়ে ছোটে, যেন টিনের চালে শিলা বৃষ্টি হচ্ছে। পাভেল তার ডাগর ডাগর চোখ দুটো দিয়ে যেন জনতার মধ্যে কি খোঁজে।

'প্রতিনিধি পাঠান হোক, প্রতিনিধি!'

'সিজভ্‌!'

'ভ্লাসফ্‌!'

'রীবিন, রীবিন। দাঁতের পাটি শক্ত আছে হে রীবিন্‌-এর।'

হঠাৎ চীৎকার থেমে একটা চাপা আওয়াজ ওঠে।

'নিজেই আসছে, নিজেই আসছে...'

'ডিরেক্টর সাহেব...!'

লম্বা-কাটের মুখ, সূক্ষ্মাগ্র দাড়ি, দীর্ঘকায় একজন কাকে যেন পথ করে দেয় ভিড়ের মানুষ—সে শুধু দুই হাত দুই দিকে লোক সরানোর ভঙ্গিতে একটু একটু নেড়ে নেড়ে চলছে, কারো গায়ে যেন হাত না ঠেকে। দুনিয়া-দেখা পাকা লোকের পাকা দৃষ্টি দিয়ে চোখ কুঁচকে মানুষগুলোর মুখ নিরীক্ষণ করতে করতে চলেছে। আপনা থেকে সবার হাত চলে যায় মাথায়, টুপি খুলে ফেলে, মাথাগুলো নুয়ে যায়। কিন্তু সে লোকটি কারো দিকে চায় না, অতগুলো নোয়ান মাথার জবাব নেই ওর কোন

ভঙ্গিতে। শুধু দুহাতে যেন যাদুর মন্ত্র ছড়িয়ে যায় আর ওরা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বোবা হয়ে যায়, অপ্রস্তুতের মত বোকাটে হাসি হাসে, আর দুষ্টুমি করতে করতে ধরা-পড়ে-যাওয়া দুষ্টু ছেলের মত 'আর করবোনা' গোছের মুখ ক'রে চেয়ে থাকে।

মায়ের পাশ দিয়ে যেতে যেতে লোকটার কঠিন দৃষ্টি মায়ের মুখের উপর দিয়ে পিছলে গিয়ে পড়ে সেই লোহা-লক্কড়ের স্তূপটার সামনে। কেউ একখানা হাত বাড়িয়ে দিল উঠতে সাহায্য করার জন্য। কিন্তু সেদিকে তাকালও না সে, জোর একটা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল পাভেল আর সিজফ এর সামনে।

'কি ব্যাপার কি? এ কিসের মিটিং হচ্ছে? কাজ বন্ধ রেখেছ কেন সব?'

কয়েক সেকেণ্ডের জন্য সব নিঝুম। গণ-দেবতার হাজার মাথা নড়ছে, যেন ক্ষেত-ভরা গমের শীষে হাওয়ার দুলুনি লেগেছে। সিজ্‌ফ টুপি খুলে, একটু কাঁধ-ঝাঁকানি দিয়ে মাথাটা নীচু করল।

'জবাব দাও,' ডিরেক্টর চীৎকার করে ওঠে।

পাভেল সামনে এসে দাঁড়ায়। সিজফ আর রীবিনের দিকে দেখিয়ে দিয়ে বললে: 'আপনার কাছে আমাদের দাবি পেশ করবার জন্য সহকর্মীরা আমাদের তিনজনকে প্রতিনিধি নির্বাচন করেছেন। আমাদের দাবি, পয়সা-কাটার যে হুকুম জারী করা হয়েছে তা প্রত্যাহার করতে হবে।'

পাভেলের দিকে না তাকিয়েই জবাব দেয় বড় সাহেব: 'কেন?'

পাভেল জোর গলায় বলে: 'কারণ আমরা মনে করি ওটা অন্যায় ট্যাক্স।'

'তোমরা কি মনে কর জলার জল-নিকাশের প্রস্তাবটা আমাদেরই স্বার্থে, মজুরদের লুটবার জন্য, তোমাদের ভালোর জন্য নয়?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' পাভেল জবাব দেয়।

রীবিনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে বড়-সাহেব: 'তোমারও ওই মত?'

'আমাদের সকলেরই এক মত।'

সিজফের দিকে তাকিয়ে বলে: 'তুমি? তোমার মতটা কি শুনি?'

"আমারও ঐ মত। আমাদের পয়সাটা না-হয় নাই কেড়ে নিলেন।" সিজফের মাথাটা যেন আরও ঝুঁকে যায়, মুখে একটা অপরাধের হাসি।

ধীরে ধীরে সমস্ত জনতাকে একবার দেখে নিয়ে বড় সাহেব কাঁধ ঝাঁকুনি দেয়, পাভেলের মুখের দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে:

'তুমি তো কিছু লেখাপড়া জান মনে হয়। তুমিও বুঝতে পারছ না জলাটা পরিষ্কার হলে কত উপকার হবে?'

সকলে শুনতে পায় এমনি গলায় বলে পাভেল: 'কারখানার খরচায়ই জল-নিকাশের বন্দোবস্ত হলে সবাই বুঝতে পারত কতখানি উপকার হতে পারে।'

শুক্‌নো জবাব আসে: 'কারখানা তো আর দান-সত্র খুলে বসেনি হে! আমার হুকুম, এই মুহূর্তে সকলে কাজে ফিরে যাও।'

কোনো দিকে না চেয়ে সাবধানে লোহা-লক্কড়ের খোঁচা বাঁচিয়ে নেমে পড়তে যান বড় সাহেব।

ভিড়ের মধ্যে অসন্তোষ গুন্‌গুনিয়ে ওঠে। বড় সাহেব থেমে প'ড়ে হাঁকেন: 'এর মানে?'

স্তব্ধতা ভেঙে একটা একক কণ্ঠ গর্জে ওঠে:

'নিজেই কাজ করোগে যাও!'

শুকনো ধারাল গলায় ডিরেক্টর বলেন : 'পনের মিনিটের মধ্যে যদি সবাই কাজে হাত না দিয়েছ, প্রত্যেকের জরিমানা হবে, আমার হুকুম।'

আগের মতই পথ ক'রে চলে যান বড় সাহেব ভিড়ের মধ্য দিয়ে। পেছন পেছন একটা চাপা গর্জন ওঠে। যতই যান গর্জনটা উঁচু পর্দায় চড়ে।

'আর যাবে কথা বলতে ওর সাথে?'

'হলো তো, খুব হক হ'য়েছে! হায়রে অদৃষ্ট!'

পাভেলের দিকে ফিরে চীৎকার করে জিজ্ঞাসা করে জনতা :

'এবার কি করতে হবে বল, চট্‌পট্‌ করে।'

'বেড়ে বলেছ হে পাভেল। বড়-সাহেব ব্যাটাকে এনে ছেড়েছ!'

চারদিক থেকে প্রশ্ন—এবার তারা কি করবে।

জবাব দেয় পাভেল : 'আমার প্রস্তাব, যতদিন না আমাদের দাবি আদায় হয়, আমরা কাজ বন্ধ রাখব।'

চার দিক থেকে উত্তেজিত টিকা-টিপ্পনি ওঠে :

'বোকা পেয়েছ আমাদের?'

'তার মানে, ধর্মঘট বলতে চাও?'

'দুটো কড়ির জন্য?'

'কেন, ধর্মঘট নয় কেন?'

'আমাদের সবাইকে জবাব দিয়ে দেবে।'

'তাহ'লে কাজ করবে কে শুনি?'

'ওঃ মেলা লোক মিলবে। হা পিত্যেশ ক'রে ব'সে আছে কত!'

'ছুঁচোর দল!'

তেরো

পাভেল নেমে এসে মায়ের পাশে দাঁড়ায়। জনতা উত্তেজিত, ওদের উত্তেজিত কথা-কাটাকাটি শোনা যায়।

রীবিন পাভেলের কাছে সরে আসে। বলে : 'স্ট্রাইক করবে এরা? সে আশাই করোনা। যত সব হাড় হা-ভাতের দল। শ' তিনেক যদি আসে তা হলেই বেশী। একবারেই কি আর এতদিনকার সব জঞ্জাল সাফ হবে?

পাভেল নীরব। গণ-দেবতার সহস্র-শির ওর চোখের সামনে দোলায়মান; ওর চোখের দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তার সহস্র-চক্ষু। কি যেন দাবি ওই দৃষ্টিতে। ভয়ে ওর বুকটা ধড়ফড় করে। এত যে কথা, এত বোঝান, সব কি হাওয়ায় উড়ে গেল? চিহ্নও নেই কোথাও! তিয়াসী মাটির ওপর ছিঁটে-ফোঁটা বৃষ্টির মতই একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল?

বড় ক্লান্ত, আর মন মরা হয়ে বাড়ীর দিকে ফেরে। মা আর সিজফ্‌ পেছনে। রীবিন পাশে, কানের কাছে কি যেন বক্‌ বক্‌ করতে করতে চলেছে।

'বক্তৃতাগুলো বেশ তোমার, কিন্তু ঠিক ওদের মনের মধ্যে ঢোকেনি। বুঝলে হে?'

রীবিন বলে, 'একেবারে ওদের কলজের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে। খালি যুক্তি-তর্ক দিয়ে ওদের বোঝান যাবেনা। একেবারে ভিতর তাক্ করে ছুঁড়ে দিতে হবে আগুন। একটুখানি পা, তার মধ্যে এত বড় জুতোটা লাগবে কেন?'

সিজফ্ বলে মাকে : 'তা আমরা বুড়োরা তো কবরে পা ঠেকিয়েই বসে আছি। এখন সব নতুন কালের নতুন ধাঁচের মানুষ। এই তোমার-আমার মত মানুষের দিন কি ভাবে কেটে গেছে? বলতে গেলে হাঁটু নুয়ে। ওপর-ওলাকে সেলাম ঠুকতে ঠুকতে কপালটা বুঝি ক্ষয়ে গেছে। আর আজকাল! জানিনে বাবা আজকালের ছোঁড়াদের হয়তো মগজ খুলেছে—কিম্বা হয়তো আরও বেশী ভুল করছে তারা। মোট কথা, আমাদের মত নয় ওরা। বাবাঃ, কি সাহস ছেলেগুলোর। বড় সাহেবের মুখের উপর সমানে সমানে জবাব দিয়ে এল...। যাক্। বাবা পাভেল, তা হলে পরে দেখা হবে'খন। যে ভাবে সবার হয়ে লড়ছ, খুব ভালো। ভগবান তোমার সহায় হবেন। তিনিই পথ বাতলে দেবেন!'

চলে গেল সিজফ্। রীবিন গজ্ গজ্ করে, 'যাও, মরোগে যাও। উঃ এরা আবার মানুষ! মানুষ নয়, পুটিং! পুটিং! ছেঁদা বোজাবার পুটিং। ডেলিগেট ডেলিগেট করে কারা চেঁচিয়েছিল জান পাভেল? ওরাই রটিয়ে বেড়িয়েছিল তুমি সমাজতন্ত্রী, আর যত গোলমাল বাধাচ্ছ তুমি। এখন মনে মনে নাচছে : চাকরি যাবে ছোঁড়াটার, যেমন কুকুর তেমনি মুগুর।'

পাভেল জবাব দেয় : 'ওদের দিক থেকে যদি দেখা যায় তো ঠিকই করেছে বলতে হবে!'

'তা বইকি! নেকড়েরা যখন নেকড়ের মাংস ছিঁড়ে খায়, ঠিক করে বইকি।' রীবিনের মুখ আঁধার, স্বরে অদ্ভুত উদ্বেগ।

'শুধু কথায় চিঁড়ে ভিজবেনা হে! শুধু কথা শুনবেনা কেউ। কষ্ট সইতে হবে, রক্ত দিয়ে কথা ভেজাবে তবে...'

সারাদিন ছন্ন-ছাড়ার মত ঘুরে বেড়ায় পাভেল; ক্লান্তিতে যেন দেহ চলেনা; মনটা ভারী হ'য়ে আছে, ওর জ্বালা-ধরা চোখ দুটো চারদিকে কি যেন খুঁজে খুঁজে বেড়ায়। মা লক্ষ্য করে।

'কি হয়েছে রে পাশা?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করে।

'মাথা ধরেছে একটু।'

'একটু শো'গে যা। আমি ডাক্তারের কাছে খবর দিই।'

'না মা, ব্যস্ত হয়োনা তুমি।' তাড়াতাড়ি বলে ওঠে সে। তারপর মৃদু গলায় বলে, 'আমার বয়েস কম, জোরও নেই তেমন। সেই হয়েছে মুস্কিল! ওরা আমায় বিশ্বাস করেনি, আমার পাশে এসে দাঁড়াল না, মানে, কি ভাবে ব্যাপারটাকে হাজির করা দরকার বুঝতেই পারি নি। আমার এত বিশ্রী লাগছে! নিজের ওপরই নিজের রাগ হচ্ছে।'

উদ্বিগ্ন মুখখানার দিকে তাকিয়ে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে মা :

'একটু সবুর কর! আজ যা বোঝেনি কাল তা ওদের বুঝতে হবেই, জেনে রাখিস!'

উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে পাভেল : 'বুঝতেই হবে ওদের!'

'হ্যাঁ, আমি পর্যন্ত বুঝতে পারছি কিছু ভুল করিসনি তুই, ঠিকই করেছিস।'

পাভেল উঠে মায়ের কাছে আসে :

'তুমি এক আশ্চর্য মানুষ, মা!' বলেই চলে যায়। চমকে ওঠে মা। ছেলের শান্ত কথাগুলি যেন হঠাৎ আগুনের ছোঁওয়া লাগিয়ে দিল গায়ে। হাত দুখানি বুকের ওপর উঠে আসে, ছেলের এই গভীর আদরে যেন আবেশ লাগে।

সেই রাত্তিরেই আবার পুলিস এল। মা ঘুমিয়ে পড়েছে। পাভেলও শুয়ে পড়েছিল। ঘরে বাইরে ওপরে নীচে সারা বাড়ীটা ওরা আক্রোশের সঙ্গে তচ্‌নচ্‌ করে ফেলল। সেদিনকার সেই হলদে-মুখো অফিসার—ঠিক সেদিনের মতই ঠাট্টা, টিট্‌কারি, অপমান আর আঁতে-ঘা দিয়ে কথা, তেমনি ওর নিষ্ঠুর উল্লাস। মা এক কোণে চুপ করে বসে আছে। চোখ রয়েছে ছেলের দিকে। অফিসারটা যখন উপহাস করছে হাতখানা তার নিস্‌পিস্‌ করছে। মা বুঝছে কি কষ্টে ছেলে জবাব না দিয়ে চুপ করে আছে, পুলিসের ওই রসিকতা মুখ বুজে সহ্য করে যাচ্ছে। প্রথমদিনকার মত আজ আর ততো ভয় করেনি মার। আজ এই সাদা উর্দি-ঢাকা নিশাচরগুলোর ওপর রাগের চেয়ে ঘৃণা হয় বেশী। এই ঘৃণাই তার ভয় ঘুচিয়ে দিয়েছে।

পাভেল এক ফাঁকে মায়ের কানে কানে বলে : 'আমায় নিয়ে যাবে।'

'জানি।' মাথা নীচু করে স্তিমিত স্বরে বলে মা।

বুঝতে বাকী ছিলনা মায়ের, সকাল বেলায় মজুরদের কাছে পাভেল যা বলেছে তাতে তার ছেলের এবার বাইরে থাকার মেয়াদ ফুরিয়েছে। কিন্তু ওর সাথে সায় তো ছিল প্রত্যেকেরই। তারা সবাই কেন লড়বেনা পাভেলের জন্য। তাহ'লে আর বেশী দিন ওকে আটকে থাকতে হবেনা নিশ্চয়ই...

ছেলের গলা জড়িয়ে ধরে একটু কাঁদার জন্য বুকটা আকুলি বিকুলি করে। কিন্তু অফিসারটা সামনে দাঁড়িয়ে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে আছে। ওর ঠোঁট আর গোঁফের বাঁকা ভঙ্গিতে বেশ বোঝা যাচ্ছে লোকটা চায় মা কেঁদে ভাসাবে, ওর হাত-পা ধরে কাকুতি মিনতি করবে। শক্ত হয়ে বুক বেঁধে দাঁড়ায় মা। হাত ধরে ছেলের। দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়, তবু বলে অতি ধীরে, অতি নরম সুরে :

'আচ্ছা, আয় তবে খোকা। দরকারী জিনিস নিয়েছিস্‌ তো সব?'

'হ্যাঁ মা, সব নিয়েছি। মন-টন খারাপ করোনা কিন্তু তুমি।'

'ভগবান তোর সহায় হোন...'

পাভেলকে নিয়ে চলে গেল। একটা আর্ত চাপা কান্নায় ঐ খানেই বেঞ্চির ওপর ভেঙে পড়ে মা। দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে। অমনি করেই এইখানে বসত ওর স্বামী। গভীর ব্যথা আর অসহায়তায় দেহটা যেন শক্ত হয়ে গেছে। মাথাটা এলিয়ে আসে দেয়ালে। ধীরে ধীরে অস্ফুট স্বরে অনেকক্ষণ ধরে অনেক কান্না কাঁদল। আহত হৃদয়ের সবখানি ব্যথা যেন গলে গলে বেরিয়ে এল কান্না হয়ে। আর চোখের সামনে ঘুরে বেড়াতে লাগল পুলিশ-কর্তার স্থির নিশ্চল পিঙ্গল মুখখানা, তার বিরল-কেশ গোঁফ আর উল্লাসে ডগমগ বাঁকা চোখ। কেবলি মায়ের বুকের মধ্যে জমে ওঠে গভীর কালো ঘৃণার মেঘ। যারা অমন করে সন্তান কেড়ে নেয় মায়ের বুক শূন্য করে, তাদের প্রতি অসীম ঘৃণায় ওর মন বিষিয়ে ওঠে। ছেলেদের অপরাধ কি? তারা শুধু ন্যায়বিচার চেয়েছিল।

বাইরে বড় ঠাণ্ডা। বৃষ্টি পড়ছে। মায়ের যেন মনে হয়, সাদা পোশাক-পরা কারা যেন সব রেকাব বাজিয়ে পাহারাওলার মত করে বাড়ীর চারদিকে ঘুরছে। এত বড় লম্বা ওদের হাত, লাল চক্‌চকে মুখের মধ্যে চোখের চিহ্ন নেই কোথাও।

কেবলি বুকের মধ্যে ঠেলে ওঠে : 'আমাকেও কেন নিয়ে গেল না?'

কারখানার বাঁশী বাজে, কাজের ডাক আসে। আজ যেন ওই শব্দটার মধ্যে জোর নেই। আওয়াজ ভেঙে গেছে। দরজা ঠেলে ঢোকে রীবিন। মায়ের সামনে এসে দাঁড়ায়। দাড়ির জল ঝাড়তে ঝাড়তে মাকে জিজ্ঞাসা করে :

'নিয়ে গেছে ওকে?'

'নিয়ে গেল গো সর্বনেশেরা।'—নিশ্বাস ফেলে বলল মা।

একটু হেসে বলল রীবিন, 'ওতো জানাই ছিল। আমার বাড়ীও তল্লাসী হয়েছে কাল। পাঁতি পাঁতি করে সব দেখেছে। অনেক গালাগালও করেছে—তবে ক্ষতি করেনি কিছু। তাহ'লে নিয়ে গেল পাভেলকে! চমৎকার ব্যাপার! আমাদের বড় সাহেব চোখ ইশারা দিলেন, পুলিশ মাথা নাড়ল, আর একটা লোক গারদে চলে গেল! জোট মিলেছে ভালো—একজন শিং ধ'রে দাঁড়িয়ে থাকেন, আর এক জন দুইতে দুইতে রক্ত বের করেন।'

মা উঠে দাঁড়ায়। উত্তেজিত হয়ে বলে : 'তোমাদের ওর পক্ষ হয়ে লড়া উচিত। ও তো নিজের জন্য কিছু করেনি, তোমাদের জন্যই করেছে।'

'কে লড়বে?'

'কেন, সবাই?'

'হুঃ। তাই ভাবছ বসে? সে গুড়ে বালি!'

হেসে বেরিয়ে যায় রীবিন। ওর কথা শুনে মা যেন আরও মুষড়ে পড়ে।

'ওকে যদি মারে ওরা—যদি খুব অত্যাচার করে...'

কল্পনার চোখে ভেসে ওঠে ছেলের ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত দেহটা... ভয়ে যেন হিমের স্রোত বয় বুকটার মধ্যে।

না জ্বলল উনান, সারাটা দিন না পড়ল মুখে জল। এক ফোঁটা চা'ও নয়। রাত্তির বেলা এক টুকরো রুটি চিবিয়ে শুয়ে পড়ল। দুনিয়া যেন শূন্য হয়ে গেছে। এত খালি এত একলা তো কোনো দিন লাগেনি। বিশেষ ক'রে এদিকের এই কটা বছর বিচিত্রভাবে কেটেছে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা কিছু, অত্যন্ত সুন্দর একটা কিছু ঘটবে, এমনি একটা আশায় প্রতি মুহূর্ত ভরে থাকত। কত ছেলে-মেয়ে বাড়ীখানা ভরে থেকেছে, তাদের কাজ, কথা আর হাসি-হুল্লোড়ে ঘিরে ছিল ও। চেয়ে চেয়ে শুধু দেখেছে ছেলের মুখ—মায়ের বাহাদুর ছেলে—বুক পেতে বিপদ নিলো যে সবার কল্যাণের জন্য। চলে গেছে সে... সব নিয়ে গেছে সাথে। দুনিয়া ফাঁকা হয়ে গেছে মা'র।

চৌদ্দ

সারাদিন আর নিদ্রাহীন রাত যেন কাটতে চায় না। পরের দিনটাও যেন পায়ে পাথর বেঁধে চলল। আশা করে ছিল মা, কেউ না কেউ আসবেই, কিন্তু কেউ এল না। সন্ধ্যে হয়, তার পর রাত্রিও হয়। বাইরে বৃষ্টির দীর্ঘশ্বাস; দেয়ালের গায়ে গায়ে তার রিমঝিম কান্না। চিমনির ভেতর শোঁ শোঁ করছে বাতাস। মেজের তলা দিয়ে কি যেন সুড়সুড়িয়ে চলে যাচ্ছে। ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে ছাদ থেকে।

ঘড়িটার টিক্‌টিকের সাথে অদ্ভুতভাবে মিশে যাচ্ছে বৃষ্টির টিপ্‌টিপানি। সারা বাড়ীটা যেন দুলছে আস্তে আস্তে। বেদনার্ত মনে রোজকার চেনা পরিবেশকে মনে হয় এক অচিন পুরী; নিথর মৃত্যুর পুরী।

কে যেন ঘা দিল জানালায়। একবার, দু'বার। এ তো হামেশাই চলত। ভয় পায়নি কোন দিন। কিন্তু আজ চমকে উঠল মা। একটা খুশি যেন খচ্‌ করে উঠল বুকের মধ্যে। কিসের যেন একটা প্রত্যাশা...। উঠে দাঁড়ায় মা। তাড়াতাড়ি একটা শাল জড়িয়ে নিয়ে দরজা খুলে দেয়।

সাময়লফ্‌। তার পেছন পেছন কে আর একজন। কোটের ওল্টানো কলার আর কপাল-ঢাকা টুপিতে প্রায় সবখানা মুখ আড়াল করা।

'ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম নাকি?' সরাসরি জিজ্ঞাসা করে সাময়লফ্‌ শুধু নমস্কার-টুকু সেরেই। ওর স্বরটা উদ্বিগ্ন, কেমন যেন ভারী ভারী। এ-রকমটা ওকে বড় একটা দেখা যায় না।

'না, ঘুমুইনি আমি।' জবাব দেয় মা, তারপর কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

সাময়লফের সাথীটি জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলে। টুপি খুলে খাটো মোটা হাতখানা মায়ের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বহুদিনকার বন্ধুর মত সহজভাবে বলে :

'আরে, মা যে আমায় চিনতেই পারলেন না!'

হঠাৎ খুশি হয়ে ওঠে মা। বলে : 'আরে তুমি, ইয়েগর ইভানোভিচ্‌?'

'হ্যাঁ, মা, আমি ইয়েগর।' গির্জার স্তোত্রপাঠকদের মতো লম্বা লম্বা চুলওয়ালা মস্ত বড় মাথাটা মায়ের সামনে ঝুঁকিয়ে বলে। মুখখানা হাসি-হাসি, ক্ষুদে কটা চোখ দুটি কোমল দৃষ্টিতে মায়ের দিকে তাকিয়ে আছে। গোলগাল খাটো মোটা মানুষটি দেখতে ঠিক একটা সামোভারের মত। মোটা গর্দান; খাটো মোটা হাত। মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, সাঁই সাঁই করে নিশ্বাস ফেলে, বুকের মধ্যে একটা ঘড়ঘড়ানি আওয়াজ।

মা বলে : 'একটু ও-ঘরে যাও বাছা, আমি কাপড়টা পরে নি।'

ভুরুর নিচ দিয়ে তাকিয়ে সাময়লফ্‌ উদ্বিগ্নভাবে বলে : 'মা, আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করার আছে যে!'

ইয়েগর পাশের ঘরে গিয়ে সেখান থেকেই ডেকে ডেকে কথা বলতে লাগল :

'নিকলাই ইভানোভিচ্‌কে জানেন তো? সে আজ জেল থেকে বেরিয়েছে...'

মাঝখানেই মা বলে ওঠে : 'তাই নাকি? সেও জেলে ছিল? কই জানিনে তো!'

'দু'টি মাস এগার দিন। সেখানে পাভেল, খখলের সাথে ছিল। ওরা দু'জন তোমায় ভালোবাসা জানিয়েছে। আর পাভেল তোমায় ভাবতে বারণ করেছে। আর বলেছে যে এ-পথ যারা বেছে নিয়েছে, মাঝে মাঝেই এমনি ছুটি মিলবে তাদের। ছুটি কাটাবার তোয়াজী ব্যবস্থাও হয়ে আছে গারদের লোহার শিকের পেছনে। আমাদের মালিকেরা পাকা বন্দোবস্ত করে রেখেছেন। সুতরাং ভাবনা করে লাভ কি? যাক এবারে কাজের কথায় আসি। কাল কত লোক গ্রেফ্‌তার হয়েছে জানেন?'

'সে কি? আমি তো ভেবেছি পাভেল একাই—!'

'ওর আগেই ধরা পড়েছে আটচল্লিশ জন।' শান্তভাবে ইয়েগর বলে, 'আরও অনেককেই ফাঁসাবে মালিকেরা। সাময়লফও রক্ষা পাবেনা।'

একটু বিমর্ষভাবে সাময়লফ্‌ বলে : 'আমায়ও ছাড়বে না।'

মায়ের যেন বুকটা একটু হালকা হয়ে সহজভাবে নিশ্বাস পড়ে। তাহ'লে একা নয় পাভেল!

কাপড় পরে মা ফিরে আসে, হাসতে হাসতে বেশ খুশিতে হালকা হয়ে। বলে : 'এত লোককে যখন ধরেছে, তখন বেশীদিন আর আটকে রাখবে না।'

'হ্যাঁ তা ঠিক,' ইয়েগর বলে, 'তবে যদি আমরা কোনো মতে ওদের এই কারসাজি নষ্ট করতে পারি, তবে ল্যাজ গুটিয়ে সব পালাবে দেখবেন। আসল কথা, এখন যদি কারখানায় কাগজ যাওয়া বন্ধ হয়ে যায় তবে পাভেল এবং আর যে ক'জন মহৎপ্রাণ কমরেড আটক আছে, পুলিশের হাতে কি আর ওদের রক্ষে আছে?'

মা ভয়ে প্রায় চীৎকার করে ওঠে : 'সে কি, কি বলছ?'

'এতো অতি সহজ কথা, মা!' ইয়েগর শান্তভাবে বলে; 'অনেক সময় পুলিশের লোকও কার্যকারণ সম্পর্কটুকু ধরতে পারে। আচ্ছা, দেখুন—পাভেল বাইরে ছিল, কাগজও ছিল। ও নেই কাগজও নেই। সুতরাং! আর পুলিশ কি অমনি ছাড়ে! পুলিশের একটা স্বভাব হচ্ছে এই, এমনভাবে সবাইকে গ্রাস করতে শুরু করে যে দু-একজন চুনোপুটি ছাড়া আর কেউ বাদ পড়ে না।'

'বুঝলাম সব, কিন্তু উপায়!' কাতরভাবে বলে মা।

রান্নাঘর থেকে সাময়লফের গলা শোনা যায়। 'শালারা কাউকে কি আর বাকী রেখেছে? সব্বাইকে ধরেছে। কিন্তু কাজ যে ক'রে হোক চালু রাখতেই হবে। নইলে জেলে যারা আছে তাদেরও বাঁচানো যাবে না, আর আমাদেরও সব উদ্দেশ্য পণ্ড হয়ে যাবে।'

ইয়েগর একটু হেসে বলে : 'জিনিস তো মেলাই আছে। ভালো ভালো কাগজ বই সব আছে। সব মেহনত করে নিজের হাতে তৈরি করেছি। কিন্তু কারখানায় নিয়ে যাবার লোক নেই। ভারী ফ্যাসাদে পড়েছি।'

'সকলকে গেটে তল্লাসী করে তবে কারখানায় ঢুকতে দিচ্ছে।' সাময়লফ্ বলে।

মায়ের কেমন মনে হয়, ওরা যেন কিছু আশা নিয়েই ওর কাছে এসেছে। সাময়লফের কথা শেষ না হ'তেই বলে মা : 'তাহলে?'

সাময়লফ্‌কে দরজার কাছে দেখা যায়। বলে :

'সেই যে খাবার ফিরি করত, করসুনভা, তার সাথে জানা আছে আপনার মা?'

'হ্যাঁ আছে তো! তার কি?'

'তাকে একটু বাজিয়ে দেখুন না, যদি সে পারে?'

মায়ের পছন্দ হয় না। মাথা নাড়ে:

'ওর দ্বারা হবে না। ও মেয়ের পেটে কি কথা থাকে? শেষে যদি বেরিয়ে যায় যে কাগজ-পত্র এখান থেকে যাচ্ছে! না না ওকে ছেড়ে দাও।'

হঠাৎ যেন প্রেরণা আসে, বলে ওঠে :

'আমায় দাও, আমায়। ঠিক নিয়ে যাব। মারিয়াকে বলব আমায়ও ওর সাথে কাজে নিতে। নিজের পেট তো চালাতে হবে! ওর সাথে আমিও খাবার নিয়ে যাব কারখানায় বেচতে। আমি ঠিক করে নেব, দেখো তোমরা।'

বুকের ওপর হাত চেপে ধরে গড় গড় করে অনেকগুলো কথা বলে যায়। ভরসা দিয়ে বলে যে সে-ই সবকিছু করবে, ভালোভাবেই করবে; শেষ কালে উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে বলে ওঠে : 'দেখুক ওরা, জেল থেকেও হাত চলে আমার পাভেলের। দেখুক ভালো করে দেখুক।'

তিন জনেরই মুখ আলো হয়ে উঠল। ইয়েগর হাতে হাত ঘষতে ঘষতে হেসে বলে :

'চমৎকার, চমৎকার মা। কি ভালোই যে হবে আপনি জানেন না। সত্যি মস্ত একটা কাজ হবে।

সাময়লফও হাত কচলাতে কচলাতে বলে : 'যদি এটা করাই যায় তাহলে জেলে যেতেও আমার আর কষ্ট নেই, মনে হবে আরাম করে গদি আঁটা বিছানায় শুতে যাচ্ছি।'

ইয়েগর তার মোটাগলায় উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে :

'তোমার মত এমন মা কোথায় পাব দুনিয়ায়। অদ্ভুত মা তুমি।'

মা মৃদু হাসে। বুঝতে পারে কাগজ-বিলি যদি চালু থাকে কারখানায় তবে পুলিসের সন্দেহ একা পাভেলের ওপরেই পড়বেনা। কোথা থেকে মনের মধ্যে জোর আসে—হবেই হবে, পারবে এ কাজ করতে। আনন্দে যেন ছলছলিয়ে ওঠে সারা মন।

ইয়েগর বলে : 'পাভেলের সাথে জেলে দেখা হলে বলো সাময়লফ্ তাকে, তার মায়ের জুড়ি নেই। মায়ের সেরা মা তার।'

হাসতে হাসতে সাময়লফ্ বলে : 'আমারই সব চাইতে আগে দেখা হবে তার সাথে।'

'ওকে ব'লো কাজ পড়ে থাকবে না, যা কিছু করা দরকার আমি নিশ্চয়ই করব।' মা বলে।

ইয়েগর শুধায়, 'সাময়লফকে যদি না ধরে?'

'ধরবেই, না ধরে যাবে কোথায়?' মা বলে।

দু'জনেই হেসে ওঠে। মা বুঝতে না পেরে অপ্রস্তুত হয়ে ওঠে। তারপর হঠাৎ বুঝতে পেরে নিজেও দুষ্টুমির হাসি হেসে ওঠে ওদের সাথে। চোখ নীচু করে বলে : 'নিজের দুঃখের সময় অন্যের দুঃখের কথাটা মনে থাকে না।'

ইয়েগর সান্ত্বনা দেয় : 'তাই হয় মা। খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু আপনি যেন আবার পাভেলের কথা ভেবে মনটন খারাপ করবেন না। দেখবেন ও বাইরে যা ছিল তার চেয়েও ভালো হয়ে আসবে জেল থেকে। আমাদের মত মানুষের বাইরে থাকলে বিশ্রামই বা কোথায়। পড়া শোনার সময়ই বা কোথায়। এক জেলে যেতে পারলেই দেহটাও বিশ্রাম পায়, পড়া শোনারও প্রচুর সময় থাকে। তিনবার আমার শ্রীঘর দর্শন হয়ে গেছে মা। প্রত্যেকবার দেহে মনে অনেক লাভ হয়েছে। অবশ্যি জেলে থাকাটা সুখের নয় মোটেই তবু।'

'তোমার তো নিশ্বাসের বড় কষ্ট হচ্ছে, বাবা!' ইয়েগরের সরল মুখখানার দিকে তাকিয়ে মা বলে।

একটা আঙুল তুলে জবাব দেয় ইয়েগর : 'ও ছেড়ে দিন মা। একি অমনি অমনি হয়েছে! আচ্ছা তাহ'লে সব কথা ঠিক, কেমন? কাল জিনিস-পত্র সব পাবেন। আবার চাকা ঘুরবে মা; কত কাল থেকে তাল তাল সব আঁধার জমেছে। সব গুঁড়িয়ে যাবে ওই চাকার তলায়। আমাদের কথা বলার স্বাধীনতা জিন্দাবাদ, মায়ের প্রাণ জিন্দাবাদ! আচ্ছা মা আসি তাহ'লে, কাল দেখা হবে।'

মায়ের করমর্দন করে সাময়লফ্ বলে : 'আসি মা। বাবাঃ আমার মায়ের কাছে এ-ধরনের কথা তো উচ্চারণই করতে পারতাম না।'

মা উৎসাহ দিয়ে বলে : 'ভাবনা নেই, বাবা। একদিন সবাই বুঝবে।'

ওরা চলে গেলে দরজা বন্ধ করে ফিরে আসে মা। ঘরের মাঝখানে নতজানু হয়ে বসে পড়ে। বৃষ্টির রিমঝিম্-এর সাথে দেবতার দুয়ারে প্রাণের আকুতি মিশে যায়। ভাষাহীন, ধ্বনিহীন সে আরাধনা রূপ নিল আজ কতগুলো মানুষের জন্য একান্ত উৎকণ্ঠায়, যাদের পাভেল টেনে নিয়ে এসেছে তার জীবনের মধ্যে। সরল, নেহাত সাধারণ মানুষগুলি, কিন্তু কী অদ্ভুত ঘনিষ্ঠতায় গা ঘেঁষাঘেঁষি করে আছে। তবুও বড় একা। আজ ওই দেবতার মূর্তির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ওরা। মা আর তার দেবতার মাঝখানের সমস্ত অবকাশ ওরা ভ'রে দিয়েছে।

ভোরবেলা উঠে মারিয়া কর্সুনোভার কাছে গেল।

যেমন স্বভাব, সোরগোল তুলে অভ্যর্থনা করে মারিয়া। দরদে ভরে শুধায় ময়লা হাতটা দিয়ে মায়ের পিঠ চাপড়ে : 'কি গো, মনটা ভারী খারাপ লাগছে, না? মন-টন খারাপ করো না। ধরে নিয়েছে ব্যাটারা তোমার ছেলেকে? নিক না! এতে লাজের কি আছে? এতদিন চোর ডাকাত ধরেছে। এখন মুখ-পোড়ারা হক্কের পাওনা চাইছে বলে ভালোমান্‌ষের-ব্যাটাদের ধ'রে ধ'রে গারদে পুরছে। তা পাভেল হয়ত গুছিয়ে বলতে পারেনি। কিন্তু ওতো আর ওর একলার জন্য করেনি, বেবাক মান্‌ষের জন্যই করেছে। মনে মনে সবাই একথা জানে। কাজেই ভাবনা করোনা তুমি। কবুল করুক আর না করুক সবাই জানে দোষটা কার। এই তোমার কাছে আসব আসব ক'রে, সময় কি আর পাই? একলা হাত, বুঝতেই তো পার। কাঁড়ি কাঁড়ি রান্না তারপর মাথায় নিয়ে ঘোরা। গতর গেল। কিন্তু তাও তুমি দেখে নিও, আমায় ভিক্ষে মেগে গাছতলায় পড়ে মরতে হবে। কড়ির মুখ কি দেখতে পাই আমার নাগরদের জ্বালায়! যেখানেই যাই না কেন, রেহাই নেই—ছোঁ মারবার জন্য ঠিক ওৎ পেতে আছে। গোটা দশেক রুবল কোন মতে যদি জমল কোত্থেকে কোন বেজন্মা এসে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। আমায় ওরা ছিঁড়ে খাবে হাড়-মাস অবধি। বাবাঃ মেয়ে-মানুষ হ'য়ে কেউ যেন জন্মায়না। আর জন্মেছ, তো একলা থাক। নাগর কি মরেছ।'

মাঝপথে থামিয়ে পেলাগেয়া বলে : 'একটা কাজে এসেছিলাম তোমার কাছে। তুমি তো একা একা পারছনা, আমায় নাওনা! তোমার সাহায্য করতে পারব।'

মারিয়া জিজ্ঞাসা করে : 'কি বলছ? বুঝতে পারছিনা।' মা খুলে বললে মাথা নাড়ে মারিয়া। বলে :

'এ আবার বলতে হয়! আমার ভাতারের কাছ থেকে কি বাঁচন আমায় বাঁচিয়েছিলে। কত ক'রে লুকিয়ে রেখেছিলে আমায়। আর এখন আমি তোমায় না খেয়ে মরতে দেব? সকলেরই তোমায় দেখা উচিত। সবার ভালো করতে গিয়েই তো তোমার ছেলেকে জেলে যেতে হল। বড় ভালো ছেলেটা তোমার, সব্বাই বলে। সব্বাই কত দুঃখ করে ওর জন্য। এই যে সব ধরপাকড় করছে, কর্তাদের এতে ভালো হবে ভেবেছ? কক্‌খনও ভালো হবে না, এই আমি ব'লে দিলাম। দু'দিন সবুর কর, দেখই না কারখানায় কি হয়। বড় সুবিধে হবেনা চাঁদদের বুঝেছ? কর্তারা ভাবছেন, ঠ্যাঙে দড়ি কষলেই বুঝি মানুষ খোঁড়া হলো। কিন্তু মুখপোড়াদের কি হুঁশ থাকে? একজনকে মারতে গিয়ে দশজনকে মারে আর একশো জনকে খেপিয়ে তোলে।'

এই কথাবার্তার ফলে পরের দিন দুপুরবেলা মারিয়ার খাবারের ঝুড়ি মাথায় নিয়ে কারখানায় এল পেলাগেয়া। আর মারিয়া গেল বাজারে সওদা নিয়ে।

কারখানায় ঢুকতেই এই নতুন পসারিনী শ্রমিকদের চোখে পড়ে যায়। উৎসাহের সঙ্গে মাথা নেড়ে বলে : 'কাজে নেমেছে? তা বেশ।'

'দেখো, ছেলে তোমার বেরুল ব'লে' : সান্ত্বনা দেয় কেউ। কেউ দুটো দরদের কথা বলে। কেউ বা চুটিয়ে গাল দেয় বড় সাহেব আর পুলিশকে। মায়ের নিজের মনেও তার প্রতিধ্বনি জাগে। কারো বা চোখে নিষ্ঠুর উল্লাস। সময়-রক্ষক ইসাই গরবফ্ দাঁত কড়মড় করে বলে :

'আমার হাতে যদি ক্ষমতা থাকত, তোর ছেলেকে ফাঁসি কাষ্ঠে লটকাতাম। বের ক'রে দিতাম মানুষ ক্ষ্যাপানো।'

এই ভয়ংকর শাসানি শুনে ভয়ে মার হাড়ের ভেতরে পর্যন্ত শিরশির করে ওঠে। কোনও জবাব না দিয়ে শুধু লোকটার ছোট্ট মেচেতা-ধরা মুখটার দিকে তাকিয়ে থাকে নিঃশব্দে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ নামিয়ে নেয়।

কারখানার শান্তি টুটেছে। এখানে সেখানে জটলা পাকিয়ে শ্রমিকেরা নিজেদের মধ্যে ফিস্‌ফিসিয়ে কথা কয়। ফোরম্যান অস্থির হয়ে ওঠে। টিক্‌টিকির মত ওদের পেছন পেছন ফেরে। পেছন থেকে টিট্‌কারি, আর গালিগালাজ ছোটে।

মায়ের পাশ দিয়ে সাময়লফ্‌কে ধরে নিয়ে গেল পুলিশ। ওর একটা হাত ছিল পকেটে আর একটা হাত লাল-চুলগুলো ঠিক করছিল। পেছন পেছন প্রায় শ'খানেক শ্রমিক, পুলিশদের টিট্‌কারি আর গাল দিতে দিতে চলেছে।

কে যেন চেঁচিয়ে বললে : 'কি হে সাময়লফ্, ছুটিতে চললে বুঝি?

আর একজন বললে : 'ভারী ইজ্জত করছে আমাদের আজকাল। দু-পা বেরোলেই সেপাই-শান্ত্রী আগে পাছে চলে।'

কে একজন কুৎসিত ভাষায় গাল দিয়ে উঠল।

এক-চোখো ঢ্যাঙা একজন শ্রমিক বললে : চোর ডাকাত ধরে পেট পোষাচ্ছেনা ওদের, মনে হচ্ছে। তাই, ভাল-মানুষের ব্যাটাদের ধরতে লেগেছে।'

'এ্যাদ্দিন তবু খানিকটা চোখের চামড়া ছিল, রাতের আঁধারে ধরপাকড় করত। কিন্তু এখন দেখছি, বেজম্মার দল দিন দুপুরেই ধর পাকড় চালিয়েছে।' আর একজন কে বলে।

পুলিশেরা ভুরু কুঁচকে থাকে, চেষ্টা করে কোন কিছুর না দেখার, ভান করে যেন তাদের উদ্দেশে বলা এই সব গালাগালি কানে ঢুকছে না।

তিন জন শ্রমিক মস্ত বড় একটা ধাতুর পাত এনে ধরে বলল :

'পুল গো, জেলে-সাঙাতরা! পুল পেরিয়ে যাও।'

মায়ের পাশ দিয়ে যেতে যেতে সাময়লফ্ নমস্কারের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে যায়। হাসতে হাসতে বলে : 'চলছি, মা।'

নীরবে মাথা ঝুঁকিয়ে স্বীকৃতি জানায় মা। জোয়ান ছেলেগুলো কেমন হাসতে হাসতে জেলে যাচ্ছে। মনের ভিতরটা ভীষণভাবে নাড়া খায়। দরদে স্নেহে মায়ের বুকে বানের ঢল নামল।

কারখানা থেকে ফিরে সারা দিন মারিয়ার ওখানে কাটল তার কাজের সাহায্য করে আর তার বক্‌বকানি শুনে। বাড়ী ফিরতে রাত গাড়িয়ে গেল। শূন্য হিম, নিরানন্দ পুরী খাঁ খাঁ করে। অনেকক্ষণ ধরে এঘর ওঘর করে মা; অশান্ত মন,

কি যে করবে নিজকে নিয়ে ভেবে পায়না। রাত বাড়ে। কই ইয়েগর ইভানোভিচ্ তো এলনা এখনও কাগজপত্র নিয়ে। ভাবনায় অস্থির হয়ে ওঠে মা।

বাইরে সাদা সাদা চাপ চাপ বরফ পড়ে; জানলার শার্সিতে লেগে থাকে আলতো হয়ে। কখন গলে নিঃশব্দে বেয়ে বেয়ে পড়বে, পেছনে থাকবে শুধু একটা ভিজে দাগ। মনে পড়ে যায় ছেলের কথা...

একটা চাপা টোকা পড়ে দরজায়। মা দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে দেয়। সাশা। বহুদিন মেয়েটার দেখা পাওয়া যায়নি। মায়ের মনে হয় বড্ড বেশী মোটা হয়ে গেছে সাশা।

'শুভ-সন্ধ্যা, সাশা! বহুদিন দেখিনি। ছিলে না বুঝি এখানে?' বড় খুশি মা। অন্তত খানিকক্ষণ তো একা থাকতে হবে না!

মৃদু হেসে বলে সাশা: 'না মা। জেলে ছিলাম। নিকলাই ইভানোভিচ্‌কে মনে আছে? তারই সাথে একসাথে ছিলাম।'

'মনে আছে বৈকি!' উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে মা, 'ইয়েগর ইভানোভিচ্ বলেছিল বটে যে নিকলাই জেলে আছে। কিন্তু তোমার কথা তো জানতাম না মা...। কেউ তো বলেনি...!'

'তাতে আর কি হয়েছে। ইয়েগর ইভানোভিচ্ আসবার আগে আমার জামা কাপড় বদলে নিতে হবে যে মা।' চারদিকে তাকিয়ে সাশা বলে।

'একেবারে ভিজে গেছ দেখছি।'

'কাগজপত্র নিয়ে এসেছি...'

চঞ্চল হয়ে ওঠে মা: 'কোথায়! কোথায় জিনিস! দাও শিগগির।'

সাশা কোটের বোতাম খুলে গা ঝাড়া দেয়। ঝরা পাতার মত চার দিকে ছড়িয়ে পড়ে কাগজ। মা খিল্ খিল্ করে হাসে আর কুড়োয়।

'তাই বল! আর আমি ভাবছিলাম অত মোটা হলে কেমন করে। হয়তো বিয়ে থাওয়া করেছ, ছেলেপুলে হবে। সর্বনাশ, কত কাগজ এনেছ! আর এই বোঝা নিয়ে এতটা পথ হেঁটে এলে!'

'হ্যাঁ হেঁটেই এসেছি।' সেই দীর্ঘ তনুদেহা সাশা। মুখটা যেন রোগা রোগা দেখাচ্ছে। ডাগর চোখ দুটো আরো ডাগর দেখায় রোগা মুখটার মধ্যে। চারদিকে তার এই এতখানি কালো।

'কি করছ মা! এই জেল থেকে বেরিয়ে এলে, একটু বিশ্রাম দরকার যে। মরবে নাকি?' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে মা।'

ঠাণ্ডায় কাঁপে হিহি ক'রে সাশা। বলে:

'কি করব উপায় নেই। পাভেলের কথা বলুন, মা। গ্রেফ্‌তার হবার সময় খুব ঘাবড়ে গিয়েছিল?' মাথা নীচু করে জিজ্ঞাসা করে সাশা, মায়ের দিকে তাকাতে পারে না। কম্পিত আঙুল দিয়ে চুলগুলো নাড়াচাড়ি করে।

মা জবাব দেয়: 'না বিশেষ নয়। সে ছেলেই নয়।'

'শরীরটা ঠিক আছে তো?' কোমলভাবে জিজ্ঞাসা করে সাশা।

'জন্ম অবধি তো অসুখ-বিসুখ করেনি কখনও। তা বড্ড কাঁপছ যে মা! দাঁড়াও তোমায় চা করে দিচ্ছি, আর একটু রাস্‌প্‌বেরীর মোরব্বা।'

'দিন দিন! বাঃ চমৎকার। কিন্তু এত রাত্তিরে বড্ড কষ্ট হবে যে আপনার। দিন আমিই করে নিচ্ছি।'

মা সামোভারটায় আগুন দিতে দিতে একটু রাগের ভান করে বলে : 'হ্যাঁ, পরিশ্রমটা তোমার বড্ড কম হয়েছে কিনা?' সাশা সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘরে এসে একটা বেঞ্চির ওপর ব'সে পড়ে একখানা হাত মাথায় দিয়ে।

'উঃ জেলে গেলে মানুষের আর কিছু থাকে না। সারা দিন হাত-পা কামড়ে বসে থাক। কিচ্ছু কাজ নেই। অথচ বাইরে কত কাজ...খাঁচায়-পোরা জন্তুর মত বসে ছট্‌ফট্ কর...'

'কিন্তু মা, এত তো কষ্ট করছ। তার পুরস্কার কে দেবে তোমাদের।' মা শুধায়। তার পর গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নিজেই জবাব দেয় :

'কেউ দেবে না, এক ভগবান ছাড়া। কিন্তু তোমরা তো আবার ভগবানেও বিশ্বাসও কর না।'

মাথা নেড়ে সংক্ষিপ্ত জবাব দেয় সাশা : 'না।'

আবেগেভরে মা বলে : 'বিশ্বাস করি না তোমার ও-কথা।' তারপর হাতের ছাই-কালি এপ্রনে মুছে গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে বলে :

'বিশ্বাস কর, কিন্তু নিজেই জান না তা। ভগবানে বিশ্বাস যদি নাই থাকে, তবে এ পথে এলে কেমন করে?'

কার যেন নিচু গলা আর পায়ের শব্দ শুনতে পাওয়া যায় দরজার কাছে। মা ত্রস্ত হয়ে ওঠে; সাশাও লাফিয়ে ওঠে।

'দাঁড়ান, দরজা খুলবেন না,' ফিসফিস করে বলে সাশা, 'কে জানে কে। যদি পুলিশ হয়, তাহলে মনে থাকে যেন আপনি আমায় চেনেন না। অন্ধকারে ভুল করে এখানে এসে পড়েছি। দরজার কাছে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। আপনি আমায় তুলে এনেছেন। ভিজে কাপড়-চোপড় ছাড়াবার সময় এই কাগজগুলো বেরিয়ে পড়েছে। বুঝতে পারলেন তো?'

'ওরে আমার মেয়ে? রাখো মাস্টারি। আমি অমন কথা বলতে যাব কেন?' মনটা মায়ের গভীরভাবে দুলে ওঠে।

সাশা কান পেড়ে আছে দরজার পানে। বলে :

'দাঁড়ান দাঁড়ান...বোধহয় ইয়েগর...'

সে-ই বটে। শ্রান্ত ক্লান্ত, ভিজে কাক হ'য়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকল সে।

'আরে সামোভার একেবারে রেডি যে। সামোভারের শোঁ শোঁ শব্দ শুনলে মরা মানুষ শুদ্ধ চাঙ্গা হয়ে ওঠে মা। আরে সাশা! তুমি এসে গেছ!'

মস্ত বড় ভারী কোটটা খুলতে খুলতে অনর্গল কথা ব'লে চলল ইয়েগর। রান্না ঘরটা ওর হাঁপানীর সাঁই সাঁই শব্দে ভরে উঠল।

'মা, এই যে ক্ষুদে মহিলাটিকে দেখছেন, এঁকে কিন্তু কর্তারা বিশেষ পছন্দ করেননা। জানেন ওর কীর্তি? জেইলার নাকি কি বলেছিল। মেয়ে হাঁক দিলে, চাও ক্ষমা, নইলে এই রইলুম উপোস করে। যেমন কথা তেমনি কাজ। আটটি দিন জলস্পর্শ করলেন না। আমাদের মায়া ছেড়ে গিয়েছিল আর কি। প্রাণটুকু কোন মতে ধুকপুক্ করছিল। মন্দ হ'তো না, কি বল!—আমার মতো এমনি একখানা ভুঁড়ি দেখেছ?'

বলে নিজের ঢাকের মত পেটটায় হাত বুলোতে বুলোতে পাশের ঘরে চলে গেল। দরজা বন্ধ করে ওদিক থেকে ওর কথা চলে অনর্গল।

অবাক হয়ে মা শুধায় : 'সত্যি আটদিন খাওনি?'

'কি করা যাবে বলুন। ক্ষমা না চাইলে তো ছাড়তে পারিনে!' জবাব দেয় সাশা। শীতে কাঁপুনি ধরে হঠাৎ। মায়ের মনে হয়, কি কঠিন নির্বিকার জবাব। যেন তিরস্কার রয়েছে ওই কাঠিন্যে। মনে মনে ভাবে অবাক হয়ে, বাহাদুর মেয়ে বটে। জিজ্ঞাসা করে :

'মরে গেলে কি হত?'

'কি আবার হত! গেলে যেতাম। কিন্তু ক্ষমা চাইলে শেষ পর্যন্ত। ওদের হাতে পড়েছি বলে যা খুশি তাই করবে, তা তো আর হতে পারে না।' অত্যন্ত নরম সুরে বলে আশা।

'হুঁ। পুরুষরা তো ওই করে আমাদের ওপর। মেয়ে ব'লে হামেশাই তার সুযোগ নিচ্ছে।'

দরজা খুলে বেরিয়ে আসে ইয়েগর, বলে, 'যাক্, বোঝাটা নামানো গেছে। কই সামোভার রেডি? দাঁড়ান দাঁড়ান আমি তুলছি ওটা!'

পাশের ঘরে নিয়ে এল সামোভারটা তুলে :

'আমার বাবা দিনে কয় গ্লাস চা খেত জানেন? বিশ গেলাসের কম নয়। ওই চা খেয়েই বাবা সুখে শান্তিতে সুস্থ সবল থেকে জীবন কাটিয়ে গেছেন তিয়াত্তরটি বছর পর্যন্ত। এবং পুরোদস্তুর কাজকর্ম চলা-ফেরা করে। ঐ বয়সেও ভস্ক্রেসেন্স্ক শহরের গির্জায় ডিকনের কাজ করে গেছেন দিব্যি।

মা চেঁচিয়ে ওঠেন : 'তুমি কি ফাদার ইভানের ছেলে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ! বাবাকে আবার আপনি কি করে চিনলেন?'

'আমার বাড়ীও যে ঐ শহরেই!'

'ঐ শহরেই! কার মেয়ে আপনি?'

'তোমার একেবারে পাশের বাড়ী। সেরিয়োগিনের মেয়ে আমি।'

'আরে সেই খোঁড়া নিল্? খুব জানি তাঁকে। বহুবার তাঁর কান-মলা খাবার সৌভাগ্য হয়েছিল।

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে দুজনে। হাসছে আর হাজারটা প্রশ্ন করছে। সাশা চা তৈরি করে। পেয়ালার ঠুন্ঠুন শব্দে চমকে সজাগ হয়ে ওঠে মা।

'কিছু মনে করো না। কি রকম যেন খেয়াল ছিল না। নিজের দেশের মানুষ দেখতে পেলে কি ভালোই যে লাগে!'

'আমারই তো ক্ষমা চাওয়া উচিত। কাউকে আর কথা বলতে দিচ্ছিনে। একাই আসর গুলজার করছি। কিন্তু রাত যে এগারটা বাজল। হাঁটতেও হবে যে এখন অনেকটা।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে মা। 'কোথায় যাবে? শহরে?'

'হাঁ।'

'কিন্তু কেন? এই অন্ধকার, জল পড়ছে। আর দেহটাও তো তোমার দেখছি ভারী ক্লান্ত। রাতটা না হয় এখানেই থাকো। ইয়েগর রান্নাঘরে শোবে। তুমি আমি এখানে শোব'খন।'

সাশা শুধু বলে, 'না মা, উপায় নেই, যেতেই হবে আমায়।'

'চ'লেই যাক, মা। এখানে সবাই চেনে ওকে। কাল সকালে যাবার সময় পুলিশের চোখে পড়তে পারে। ঠিক হবে না ওটা।' ইয়েগর বলে।

'কিন্তু যাবে কি করে? একা?'

একটুখানি হেসে বলে ইয়েগর : 'হ্যাঁ মা, একাই।'

সাশা নিজেই এক বাটি চা ঢেলে এক টুকরো কালো রুটিতে নুন লাগিয়ে নিয়ে খেতে আরম্ভ করে। খেতে খেতে চিন্তিত মুখে মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে।

'কি ক'রে এত রাতে একা যাওয়া-আসা কর তোমরা? নাতাশাকেও দেখেছি এইরকম। কি করে কর? আমার তো ভয় করে। 'বলে পেলাগেয়া।

ইয়েগর জবাব দেয় : 'ওরও ভয় করে মা। তাই না সাশা?'

'করে আবার না।' সাশা বলে।

মা একবার ওর দিকে আর একবার ইয়েগরের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে : 'মায়া দয়া নেই বাপু তোমাদের।'

চা শেষ করে সাশা নীরবে ইয়েগরের করমর্দন করে রান্নাঘরের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে যায়। মা সঙ্গে সঙ্গে যায়। দরজার কাছে গিয়ে সাশা বলে :

'পাভেল মিখাইলোভিচের সাথে যদি দেখা হয়, তাকে আমার নমস্কার জানাবেন। ভুলবেন না কিন্তু মা।'

প্রায় দরজার বাইরে পা দিয়েছিল, হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে বলে :

'আপনাকে চুমু খাই, মা?'

মা নীরবে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে গভীরভাবে ওকে চুমু খায়।

'ধন্যবাদ।' বলে মাথাটা একটু নোয়ায়, তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায় সাশা। মা ঘরের মধ্যে এসে উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে বাইরে তাকায় জানালা দিয়ে। অন্ধকার চারদিক। অঝোরে ঝরছে ভেজা ভেজা বরফের ফুলঝুরি।

ইয়েগর জিজ্ঞাসা করে : 'প্রজরফদের মনে আছে, মা?' পা ছড়িয়ে বসে শব্দ করে চা খায় ইয়েগর। মুখখানা লাল, সরস। তৃপ্তির ছায়া ছড়িয়ে আছে তাতে। 'তা আছে বৈকি!' ব'লে কি ভাবতে ভাবতে এগিয়ে আসে মা টেবিলের কাছে। বসে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে ইয়েগরের দিকে। চোখ দুটো যেন ব্যথায় টন টন করে। বলে :

'আহারে, সাশা পৌঁছুবে কি ক'রে শহরে!'

ইয়েগর সায় দেয় : হ্যাঁ, ভারী কষ্ট হবে। জেলই ওকে শেষ করে দিয়েছে। এর থেকে অনেক ভালো ছিল আগে শরীর। তাছাড়া সুখে মানুষ হয়েছে...বোধহয় ফুস্‌ফুসে দাগও পাওয়া গেছে একটা...'

কোমল স্বরে বলে মা : 'ও কে বল তো!'

'গাঁয়েরই এক বড় গৃহস্থের মেয়ে। বাপটা নাকি মানুষ নয়, ও বলে। ওরা বিয়ের ঠিক করেছিল, জানেন?'

'ওরা মানে কারা?'

'সাশা আর পাভেল। কিন্তু হতে পারল কই! সে বাইরে তো ইনি জেলে। আর ইনি বাইরে তো তিনি জেলে।'

একটু থেমে বলে মা : 'আমি জানতাম না। খোকা তো নিজের কথা কিছুই বলে না।'

মেয়েটার জন্য আরো কষ্ট হয়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে মনটা। অতিথির দিকে ফিরে বলে :

'একটু পৌঁছে দিয়ে এলে না কেন বেচারীকে?'

'কি করে দিই বলুনতো! কাল এখানে আমার কত কাজ। সক্কাল বেলা উঠে বেরিয়ে যাব। কত জায়গায় যেতে হবে। তার ওপর বুকের কলকব্জাগুলো

দেখছেন তো!'

'বড় ভালো মেয়ে!' মা বলে। ইয়েগরের কাছ থেকে এইমাত্র শোনা খবরটাই মনের মধ্যে ঘোরা-ফেরা করে। প্রাণটা বড় চোট খেয়েছে; এত বড় খবরটা কিনা শুনতে হল বাইরের লোকের কাছ থেকে। ভ্রূ কুঁচকে, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে মুখখানা কেমন হ'য়ে ওঠে।

'সত্যি ভালো মেয়ে,' ইয়েগর বলে, 'আপনারও কষ্ট হচ্ছে মেয়েটার জন্য বুঝতে পারছি। কিন্তু কত দুঃখ করবেন! আমাদের মত ছন্নছাড়াগুলোর জন্য যদি দুঃখ করতে বসেন কূল তো পাবেন না। আপনার কলজেটাই ক্ষয়ে যাবে দুঃখ করে করে। আর সত্যি কথা স্বীকার করতে হলে, আরামে সত্যি থাকিনে মা আমরা। আমাদের একজন কম্‌রেড হালে এসেছে নির্বাসন থেকে। ও নামল নিজ্‌নি নভগরদ-এ, আর তার বৌ-ছেলে তার জন্য দাঁড়িয়ে আছে স্মলেন্‌স্ক্‌ ইস্টিশনে। তারপর সে যখন এল স্মলেন্‌স্ক্‌-এ বৌ-ছেলে ততক্ষণে মস্কোর গারদে। ওতো ফিরল, কিন্তু বৌ-এর পালা পড়ল। সে গেল সাইবেরিয়ায়। আমারও বউ ছিল। বড় চমৎকার ছিল। কিন্তু অমন করে সে আর বেশী দিন বাঁচল না। পাঁচ বছরের মধ্যেই কবরে আশ্রয় নিতে হল বেচারাকে।'

গপ্ করে একবারে বাকী চা-টা গিলে ফেলে। তারপর বলে যায় ওর জীবনের কাহিনী। কতবার কারাদণ্ড ও নির্বাসন হয়েছে সে-কথা শোনায়। মার খেয়েছে জেলে: উপোস করে, আধপেটা খেয়ে কেটেছে সাইবেরিয়ায়। এমনি আরো কত দুঃখের ইতিহাস। মা ওর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অবাক হয়, এসব কথা শুনলে মানুষের বুক ফাটে আর এ ছেলেটা অমন ঠাণ্ডা হয়ে বলছে কি করে, যেন কিচ্ছুটি নয়...

'চুলোয় যাক্‌গে ওসব কথা। আসুন দেখি এবার কাজের কথা পাড়া যাক।'

স্বরটা বদলে গেল, মুখ আরও গম্ভীর হয়ে উঠল। কাজের কথা আরম্ভ হল এবার। কারখানায় কাগজপত্র তো মা নেবে, কিন্তু কি করে, কিছু মতলব টতলব ঠিক করেছে কি? মা অবাক হয়ে যায়, কারখানার প্রতিটি ছিদ্রের অবধি হিসাব ওর নখাগ্রে। কেমন করে জানে এত?

কাজের কথা শেষ হয়ে গেলে আবার ওঠে নিজেদের শহরের কথা। হাসতে হাসতে হালকা করেই বলে ইয়েগর। কিন্তু মায়ের মন ততক্ষণ পাড়ি জমিয়েছে পেছন-পানে। ওই হোথায় ফেলে-আসা জীবনটা যেন একটা জলা। মাঝে মাঝে মাথা উঁচিয়ে আছে মাটির ঢিবি। তার ওপর দাঁড়িয়ে আছে, ছোট ছোট ফার্ গাছ, সাদা রং-এর বার্চ আর সরু সরু লম্বা লম্বা আসপেন্ গাছের ঝাড়। কি একটা ভয়ে থরো-থরো কাঁপছে তারা। বার্চগুলো বড্ড ধীরে ধীরে বাড়ে। পাঁচ বছরের মধ্যে পচা মাটির পচা রসে তারা ঝ'রে শুকিয়ে গেল।...বসে বসে স্বপ্ন দেখে মা। বুকের মধ্যে ঢেউ দিয়ে ওঠে গভীর দরদ। আবার চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটি ডাগর মেয়ের ছবি—ঋজু ধারালো একটি মুখ। তুষার-ঝরা আঁধার রাত্তিরে ক্লান্ত দেহটাকে টেনে টেনে একলা পথ ভাঙছে অভাগা মেয়েটা..মায়ের বুকের ধন ছেলেটা গারদে। হয়ত-বা চোখের পাতা তার এক হয়নি। শুয়ে শুয়ে ছটফটিয়ে এ পাশ ও পাশ করছে আর ভাবছে...না, মায়ের কথা নয়, মায়ের কথা ভাবছে না সে। ভাবার লোক তার আর একজন আছে। তারি কথা ভাবছে।...টুক্‌রো টুক্‌রো ছেঁড়া-মেঘের মত ওই ভাবনাগুলো এসে আঁধার করে ছেয়ে ফেলে মনটাকে...

ইয়েগর হেসে বলে : 'মায়ের দেহ আর বইছে না। চলুন, শুয়ে পড়া যাক।'

বুকের মধ্যে বিশ্রী রকম তেতো হয়ে ওঠে। জ্বালা করে। সাবধানে ধীরে ধীরে উঠে শুভরাত্রি জানিয়ে রান্নাঘরে চলে যায় মা।

সকাল বেলায় খাবার সময় ইয়েগর বলে :

'যদি পুলিশে ধরে আর জিজ্ঞাসা করে, কোত্থেকে পেলেন এসব অধার্মিক কাগজপত্র, কি বলবেন, বলুন তো!'

'বলব, যেখান থেকে খুশি পেয়েছি। তোদের কিরে?'

'কিন্তু ওকথা বললে ছাড়বে কেন? জেরা করে করে জেরবার করে ছাড়বে। চৌদ্দ পুরুষ ধরে ওই করছে ওরা।'

'বলব না তবু।'

'ধরে নিয়ে গিয়ে গারদে পুরবে।'

'পুরুক। তবু জানব আমি অন্তত ঐটুকু পারি।' তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে : 'আমায় তো চায় না কেউ। আর তা'ছাড়া ওরা আমার ওপর অত্যাচার করবে না।...'

মায়ের দিকে তীক্ষ্নভাবে তাকিয়ে ইয়েগর বলে : 'তা করবে না ঠিকই। কিন্তু কাজের লোকদের একটু নিজেদের বাঁচিয়ে চলাই উচিত।'

'থাক্, আর যেই বলুক, তুমি বলতে এসো না।' একটুখানি হেসে বলে মা।

'আমি জানি ভারী কঠিন আপনার পক্ষে।'

'শুধু আমার পক্ষে কেন, সকলের পক্ষেই।' হাত নেড়ে মা বলে, 'হয়তো পারে যারা বোঝে তাদের কাছে কিছুই না। আমিও এখন বুঝতে পারি একটু একটু, কিসের জন্য তোমরা লড়ছ।'

'বুঝে নিলেই তো হয়ে গেল। তখন দেখবেন সবখানে আপনার দরকার আছে, প্রত্যেকটি মানুষের।' গম্ভীরভাবে বলে ইয়েগর।

ওর দিকে তাকিয়ে হাসে মা।

দুপুর বেলা কাগজপত্র জামার মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে কারখানায় যাবার জন্য তৈরী হয়ে নিল। ইয়েগর পরীক্ষা করে দেখতে দেখতে জিভ দিয়ে একটা খুশির শব্দ করে বলে :

'খাসা হয়েছে। ৎসের গুৎ! জান—প্রথম গেলাস বীয়ার খেয়ে জার্মানরা বলে ৎসের গুৎ! অতগুলি কাগজ ঠুসেছ, কিন্তু কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না। ঠিক যেমনটি ছিলে তেমনি—আধ বয়সী, ঢ্যাঙ্গা মানুষটা, একটু মোটাচ্ছ—এই যা। আজ এই শুরুর দিনে তোমার যেখানে যত দেবতা আছেন তোমায় আশীর্বাদ করুন, এই প্রার্থনা করছি।'

আধ ঘণ্টাটেক পরে দেখা গেল বোঝার ভারে কুঁজো হয়ে কারখানার গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে মা শান্তভাবে। মনের মধ্যে আত্ম-বিশ্বাসের জোর। দু'জন রক্ষী নিতান্ত অভদ্র ভাবে সকলের জামা কাপড়ের ওপরে হাত দিয়ে চেপে চেপে দেখে তবে ঢুকতে দিচ্ছে। তার বদলে ইনাম পাচ্ছে শ্রমিকদের হাসি-টিট্কারি, আর গালি-গালাজ। খানিক দূরে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা-ঠ্যাং, লাল-মুখো একজন পুলিশ; খুদে খুদে চঞ্চল দুটি চোখ। মা বাঁকটাকে কাঁধ বদলায় আর চোখ নীচু ক'রে দেখে লম্বা-ঠ্যাংকে। কেন জানি মনে হয় লোকটা টিক্‌টিকি।

একজন লম্বা, কোঁকড়া-চুলওয়ালা শ্রমিককে রক্ষীরা তল্লাসী করছিল; শ্রমিকটি

বলে, 'আমাদের পকেট তালাস করে তো জুত হবেনা; মাথাটা তালাস করতে পার তো কাজ হবে।'

রক্ষী জবাব দেয় : 'মাথার মধ্যে উকুন ছাড়া আছে কি রে শালা?'

পালটা জবাব দেয় শ্রমিক : 'শালা, যা উকুনের ল্যাজে দৌড়ো!'

টিক্‌টিকিটি ক্ষিপ্র-দৃষ্টিতে একবার ওদিকে তাকিয়ে ঘৃণায় থুথু ফেলে মাটিতে।

মা বলে, 'বুড়ো মানুষ, ছেড়ে দে বাবারা, বোঝার ভারে পিঠ বেঁকে যাচ্ছে!'

বিরক্ত হয়ে রক্ষীরা জবাব দেয় : 'যাও যাও, ভাগো। তুমিও দেখছি বচন না শুনিয়ে যেতে পার না!'

ভেতরে নির্দিষ্ট জায়গায় এসে বোঝা নামিয়ে, কপালের ঘাম মুছে চারদিকে তাকায়।

গুসেভ্‌রা দু'ভাই ছুটে এল। দু'জনেই মেকাজিক।

'পিরোগি আছে, পিরোগি?' বড় ভাই ভাসিলি কপাল কুঁচকে জিজ্ঞাসা করে।

'কাল এনে দেব।' মা বলে।

ওদের সংকেত। ডগমগ হয়ে ওঠে দু'ভাইয়ের মুখ।

'ও মাগো মা, আমার মা।' আনন্দে ফেটে পড়ে ইভান।

ভাসিলি মাটিতে থেব্‌ড়ে বসে খাবারের ঝুড়ি খোঁজে। চোখের পলকে এক পুলিন্দা কাগজ এসে ওর বুকের মধ্যে ঢোকে।

'আর দুপুরে খেতে বাড়ী যাব না রে ইভান! এখান থেকেই কিনে খাওয়া যাবে,' বলতে বলতে আর এক পুলিন্দা কাগজ নিয়ে জুতোর মধ্যে রাখল। 'বেচারীকে আমরা উৎসাহ না দিলে কে দেবে?'

'তাইতো!' হাসতে হাসতে ইভান বলে।

মা সাবধানে চারদিকে তাকিয়ে হাঁকে :

'সুপ, সুপ্‌, চাই গরমাগরম খাবার চাই!' আর পুলিন্দা পুলিন্দা কাগজ পাচার করে দু'ভাই-এর হাতে। প্রত্যেকটি পুলিন্দা দেবার সময় পুলিসের বড় কর্তার হলদে মুখটা যেন চোখের সামনে দেশলাইয়ের কাঠির মত ফস্‌ করে জ্বলে ওঠে। উল্লাসে আটখানা হয় মা।

'এই নাও বাছা, এইটি নাও!' তারপরে আর-এক পুলিন্দা। 'এই নাও!'

শ্রমিকরা বাটি নিয়ে খাবার কিনতে আসে। কাউকে দেখলেই গুসেভ্‌রা জোরে জোরে হাসে। সংকেত বোঝে মা। কাগজের পুলিন্দা থেকে হাত সরে এসে খাবারের ঝুড়িতে লাগে।

'হাত দু'খানা তোমার খাসা সাফাই গো পেলাগেয়া নিলোভনা।' হাসতে হাসতে দু'ভাই বলে।

একজন স্টোকার বলে : 'আহা অভাবে পড়েই না আজ এই কাজে আসতে হয়েছে গো! রোজগেরে ছেলেটাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল বেজম্মারা। এই যে গো মেয়ে, তিন কোপেকের নুড্‌ল্‌ দাও দেখি! যাক্‌গে মা, ভাবনা করো না। গতর খাটাচ্ছ যখন, চলে যাবে এক রকম।'

মা মৃদু হেসে জবাব দেয় : 'তবু দু'টো দরদের কথা শুনে প্রাণটা ঠাণ্ডা হ'ল। ধন্যবাদ গো ধন্যবাদ।'

যেতে যেতে বলে স্টোকার : 'ট্যাঁকের কড়ি তো আর খরচ হয় না, দু'টো মিঠে কথা বলব তার আর কি!'

'গরম সুপ, খাবার চাই, খাবার।'

মনে মনে ভাবে, কি-ভাবে ছেলের কাছে আজকের এই দিনটির কথা বলবে; ওর জীবনের প্রথম কাজের দিন। সব ছাপিয়ে ভেসে ওঠে চোখের সামনে সেই ডাল-কুত্তাটার রাগে-ফোলা হলদে মুখ। বোকা বনে হক্‌চকিয়ে গেছে লোকটা; কালো গোঁফজোড়া পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে কি করবে ঠিক না পেয়ে। আর ওল্টানো ঠোঁট জোড়ার ফাঁক দিয়ে ঝলক্‌ দিয়ে দিয়ে উঠছে ওর সাদা সাদা কড়ম্‌ড়্‌-করা দাঁতগুলো। মায়ের বুকের মধ্যে খুশি যেন গান গেয়ে যায় সুরেলা পাখীর মত।

সওদা বেচতে বেচতে চতুরভাবে ভুরু নাচিয়ে নিজের মনেই সে বলতে থাকে : 'ধর ধর! শিগগির ধর!'

ষোল

সন্ধ্যাবেলা ঘরে বসে চা খাচ্ছে মা। এমন সময় বাইরে কাদার মধ্যে পায়ের ছপ্‌ছপানি শোনা গেল। তারপরেই একটা চেনা গলার ডাক। লাফ দিয়ে উঠে ছুটে গেল দরজার দিকে। ততক্ষণে পায়ের শব্দটা বাড়ীর দোর-গোড়ায় এসে পেঁাছে গেছে। চোখের সামনে সব আঁধার হয়ে এল। পা দিয়ে ঠেলে দরজাটা খুলে দিয়েই খুঁটি ভর করে সামলে নেয় নিজেকে।

পরিচিত গলাটা বলে ওঠে : 'শুভ-সন্ধ্যা নেন্‌কো।' তার পরেই রোগা লম্বা দু'খানা হাত এসে গলা জড়িয়ে ধরে। হতাশায় মুষড়ে গেল বুকটা; আবার ওদিকে আন্দ্রিয়েইকে দেখে আনন্দেরও সীমা নেই। হতাশা আর আনন্দে মিলে এক বিপুল কূলপ্লাবী আবেগের ঢল নামল। তার উষ্ণ স্রোতের মাঝে হাবুডুবু খেতে খেতে অবশেষে ঢেউয়ের ঠেলায় উপর পানে উঠে ছিট্‌কে পড়ল আন্দ্রিয়েইর কাঁধের ওপর। আন্দ্রিয়েইর হাত কাঁপে, সেই হাতেই শক্ত করে জড়িয়ে ধরল মাকে। বুক-চাপা কান্না কাঁদে মা অঝোরে। আন্দ্রিয়েই তার চুলে হাত বুলিয়ে বলে :

'ছিঃ নেন্‌কো, অমন ক'রে কাঁদতে নেই। মন খারাপ করছ কেন? আমি তোমাকে এই বলে দিলাম, দেখো ওকে শিগগিরই ছেড়ে দেবে। ওর বিরুদ্ধে কিছু পায়নি পুলিশ, কেউ একটা কথাও বলেনি। সবাই ভিজে বেড়ালটির মত বোবা বনে বসেছে।...'

দুই হাতে জড়িয়ে ধরে মাকে পাশের ঘরে নিয়ে গেল। মা ওর কাছটিতে বসে। ঝরঝরিয়ে চোখের জল পড়ে; কাঠবেড়ালীর মত ক্ষিপ্র হাতে চোখ মুছতে মুছতে শোনে, লোভীর মত দুই হাতে যেন পান করে প্রতিটি কথা।

'পাভেল তোমায় ভালোবাসা জানিয়েছে। বেশ ভালো আছে শরীর, মনও যতদূর ভালো থাকা যায় আছে। প্রচুর লোক ওখানে! কম হলে প্রায় শ'খানেককে ধরেছে। কারখানা থেকে তো আছেই, শহর থেকেও অনেককে এনেছে। এক একটা সেলে তিন চার জন করে রেখেছিল। জেলের লোকগুলো বেশ ভালো। শয়তান পুলিশগুলো তাদের ওপর যত কাজের বোঝা চাপিয়েছে তাতেই তারা নাজেহাল। খুব বেশি কড়াকড়ি ছিল না, আমাদের বলতো, দোহাই আপনাদের,

একটু চুপচাপ থাকবেন। নইলে আমরা বিপদে পড়ব। আর কোন অসুবিধা ছিল না। মেলা-মেশা, গাল-গল্প, বই খাবার দেয়া-নেয়ায় কোনও অসুবিধা ছিল না। বেশ ছিলাম। জায়গাটা একটু নোংরা এই যা। তবে কড়া নিয়ম-কানুন কিছু নেই। সাধারণ কয়েদীরাও ভারী চমৎকার। অনেক সাহায্য করেছে আমাদের। আজ বুকিনকে, আমায়, আর চার জনকে ছেড়েছে। পাভেলও এল বলে বেরিয়ে। ভেসোভশ্চিকফ্‌কে শিগগির ছাড়ছে না। ওখানে গিয়েও সেই ওর নিজমূর্তি। পুলিশ তো ওর ওপর বিষম খাপ্পা। একদিন হয় ধরে ঠ্যাঙগাবে, নয়তো আদালতে নিয়ে হাজির করবে ঠিক। পাভেল ওকে সামলাতে কত চেষ্টা করে। বোঝায়, শত গাল দিলেও কিছুই হবে না, গন্ডারের চামড়া। সে কিন্তু সমানে চেঁচাতে থাকে, ঘায়ের খোসার মতো তুলে দেব বেটাদের এ-দুনিয়া থেকে! পাভেলের ব্যবহার খুব ভালো। ওকে ছাড়বেই শিগগির দেখো...'

'শিগগির!' একটু আশ্বস্ত হয়ে কোমল হাসি হেসে মা আওড়ায় কথাটা। 'হবে!'

'তাহলে আর কান্নাকাটি কেন? আমায় একটু চা টা দাও, আর এত দিন কি করলে কেমন ছিলে সব শোনাও দেখি।'

সারা অঙ্গে অঙ্গে স্নিগ্ধ হাসি ভ'রে মায়ের দিকে তাকায় ও; ভারি দরদ ও কোমলতায় ভরা সে-চাউনি। ভালোবাসা আগুনের ফুলকির মত ঝিলমিলিয়ে ওঠে ওর বিষাদ-ছাওয়া চোখের তারায়।

'কত ভালোবাসি তোকে আন্দ্রিউশা, জানিসনে তুই।' দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলে মা। নিরীক্ষণ ক'রে দেখে ওর ক্ষীণ মুখটা। মস্ত বড় বড় কালো দাড়ির জঙ্গলে কেমন মজার হয়ে আছে চেহারাটা।

চেয়ারে বসে দুলতে দুলতে বলে : 'না, মা, আমার অতোয় দরকার নেই। একটু-খানি পেলেই আমি খুশি। আমি জানি তুমি আমায় কত ভালোবাস; তোমার মস্ত বড় বুকখানায় সবার জন্যই ঠাঁই আছে।'

'না রে না। সবার সাথে তোর কথা নয়। তুই একলাই আমার অনেকখানি জুড়ে আছিস। তোর যদি মা থাকত তোর মত অমন ছেলের জন্য সবাই তাকে হিংসে করত।'

মাথাটাকে ঝাঁকায় খখল, আর দুই হাত দিয়ে জোরে জোরে ঘষে।

'মা আমার আছে। কিন্তু কোথায় কে জানে!' স্বরটা কেমন নিবে আসে।

'জানিস আজ কি করেছি?' হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে ওঠে মা। তারপর শোনায় কারখানায় কাগজ-পত্র বিলোবার কাহিনী। আনন্দে ব্যগ্রতায়, উত্তেজনায় একটা ঘটনা দশখানা হয়ে ওঠে।

'সাবাস্! সাবাস্! আচ্ছা বাহাদুর মেয়ে তো তুমি, নেন্‌কো! তা খুব ভালোই হয়েছে সকলের পক্ষে, বিশেষ ক'রে পাভেলের। শুনে কী খুশিই যে হবে পাভেল!'—ব'সে ব'সে ওর সারা দেহটাকে দোল দেয় আর আঙুল মটকায়, মনের আনন্দে শিস্ দেয়। ওর প্রাণের খুশির বিচ্ছুরণে মায়ের পূর্ণ প্রাণের সাড়া জাগে—তেমনি প্রবল, তেমনি বিশাল হয়ে।

বুকের কপাটটা খুলে গেল মায়ের। কলকলিয়ে কথার ঝরণা ছুটল নেচে নেচে জল ছিটিয়ে, খুশির আলোয় ঝিলমিলিয়ে।

'দেখ, যখন নিজের জীবনটার কথা ভাবি...হায় ভগবান! কেন যে বেঁচে

ছিল্ম জানিনে। খেটেছি...মার খেয়েছি...স্বামী ছাড়া আর কোন জন-মনিষ্যির মুখ দেখিনি...খালি ভয়ে ভয়ে থেকেছি, ভয় ছাড়া আর কিছু জানিনি। স্বামী যতদিন বে'চে ছিল, পাভেল যে কোথা দিয়ে কেমন করে বড় হলো, সে খেয়ালও রাখতে পারিনি; ছেলেটাকে ভালবাসতুম কি না তাও জানতুম না। দিন রাত্তিরের এক কাজ আর এক চিন্তা ছিল কি ক'রে ভালো ভালো খাবার দিয়ে পাষণ্ডটার উদরটি ঠুসব, তার মন যুগিয়ে চলব। পান থেকে চুণ খসলেই তো ধরে মারবে। উঃ অষ্টপ্রহর কি যে ভয়ে ভয়ে থাকতে হত! একদিনও ভালো মুখে একটা কথা বলেনি। কি মার মারত। বৌকে অমন করে মারতে কখনও দেখিনি। আর দুনিয়াশুদ্ধ সকলের ওপর ছিল বিষ-নজর। বিশটি বছর অমনি করে কেটেছে। বিয়ের আগে যে কেমন ছিলুম তা স্রেফ্ ভুলে গিয়েছিলুম। যখন সেই সব দিনের কথা ভাবতে চেষ্টা করি, কিছু মনে পড়ে না, সব ঝাপসা হয়ে গেছে। মনে হয় আমার চোখই অন্ধ হয়ে গেছে। ইয়েগর ইভানোভিচ এসেছিল। আমরা এক শহরেরই মানুষ। কত কথা বলল ও এটার সেটার...আমার শুধু বাড়ীগুলোর কথা মনে আছে। মানুষগুলোর কথা মনে আছে। বাস্ ঐ পর্যন্ত। কিন্তু তারা যে কি বলত, কি করত, কেমন করে থাকত, তাদের কার কি হল কিছু মনে পড়ে না। শুধু মনে পড়ে যেন—একটা আগুন! একটা নয়, একটা, দুটো। সেই আগুনে আমার সব কিছু যেন জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেল। আমার আত্মাটাকে একেবারে কুলুপ-এ'টে দিলে...আমি বন্ধ কালা, অন্ধ হয়ে রইলুম...'

ডাঙ্গায়-তোলা মাছের মত হাঁপাতে থাকে মা। সামনের দিকে ঝু'কে স্বরটাকে আরো নীচু ক'রে আবার বলতে আরম্ভ করে :

'স্বামী মারা গেলে তবে আমি খোকার দিকে চোখ তুলে চাইবার ফুরসত পেলাম। কিন্তু ততদিনে সে তো আর আমার খোকাটি নেই। সে তখন এইসব কাজে ভিড়েছে। আমার কি যে কষ্ট হত কি বলব। ওর জন্যও বড় দুঃখ হত। কেবলি ভাবতুম, ওর কিছু হলে আমি থাকব কেমন করে? সারাক্ষণ ভয়ে আমার বুক কাঁপত। ওর কপালেও যে কি আছে ভাবতে আমার বুক ফেটে যেত...'

কয়েক মিনিট থেমে, মাথাটাকে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে :

'আমাদের মেয়েদের ভালোবাসা সত্যিকার ভালোবাসা নয়। আমরা শুধু ভালোবাসি নিজেদের যেটুকু দরকার, তার ওপরে যেতে পারিনে। কিন্তু তোমার দিকে যখন তাকাই—নিজের মায়ের জন্য কত কষ্ট তোমার মনে, কতখানি হয়ে আছে সে তোমার কাছে। তারপর আরো তোমাদের যে-সব ছেলেরা জেলে পচছে, সাইবেরিয়ায় যাচ্ছে, কেন? না দুনিয়ার মানুষের জন্য...জান দিচ্ছে সব...কচি কচি মেয়েগুলো হিমের রাত্তিরে জল-কাদা-বরফ ভেঙ্গে ক্রোশের পর ক্রোশ একলা হে'টে শহর থেকে এখানে আসছে...। কেন? কেন এত কষ্ট সয় ওরা? কে এসব করায় ওদের? না ওদের বুকের মধ্যে আছে খাঁটি ভালোবাসা। তারপর আছে ওদের গভীর বিশ্বাস। আমি ও ভালোবাসা কোথায় পাব রে, আন্দ্রিউশা! আমি শুধু আমার টুকুনি ভালোবাসি, যা আমার বুকের কাছটিতে আছে। অমন করে ভালোবাসতে তো আমি পারিনে!'

'পার গো পার। কে বললে পার না!' হাত দিয়ে মাথা গাল চোখ ঘষতে ঘষতে বলে খখল। 'সবাই তার কাছের জিনিসটাকে ভালোবাসে। কিন্তু কলজে যার মস্ত বড় সে যে দূরের জিনিসকে কাছের করে নিতে জানে। তুমি অনেক

কিছু করতে পারো মা, অনেক বড় কাজ। তোমার মধ্যের মা-খানি তো এইটুকু নয়। তোমার ওই ছোট্ট বুকটুকু জুড়ে আছে বিশাল মাতৃস্নেহ।'

'তাই হোকরে, তাই হোক।' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে মা। 'আমি বুঝতে পারছি এখন, এই হল আসল বাঁচার রাস্তা। আন্দ্রিয়েই, তোকে সত্যি আমি ভালোবাসি, হয়তো পাভেলের চাইতেও বেশী। কিন্তু ও যে নিজের মধ্যেই ডুব মেরে থাকে। দেখনা, সাশাকে বিয়ে করতে চাইছে, তা যদি আমাকে একটা কথা বলে মুখ ফুটে। আমি তো ওর মা...'

আপত্তি করে খখল : 'না, মা ভুল! হ্যাঁ এটা ঠিক যে ওরা দু'জনে দু'জনকে ভালোবাসে। আমি জানি ভালো করে। কিন্তু বিয়ে ওদের কস্মিনকালে হবে না। সাশা চাইলেও চাইতে পারে। কিন্তু শ্রীমান্ রাজী হবেন না।'

'সত্যি?' বিষণ্ণ চোখ দু'টি খখলের দিকে তুলে চিন্তিত ভাবে বলে মা, 'নিজের সুখ-শান্তিও ডালি দিচ্ছে এরা!'

'পাভেলের মতো মানুষ হয় না! লোহার মতো শক্ত মন ওর।'—খখলের গলার স্বরে নরম শোনায়।

মা চিন্তিতভাবেই বলে চলে : 'এখন তো জেলে বসে আছে খোকা। ভাবতে সত্যি ভয় করে, কিন্তু আগের মত ততটা নয়। এখন জীবনই অন্য রকম হয়ে গেছে, আমার ভয়-ডরের চেহারাও বদলে গেছে। এখন আমার সবার জন্যই ভয় করে। আমার মনই অন্যরকম হয়ে গেছে যে। আমার আত্মা আমার বুকটাকে একেবারে বেবাক খুলে দিয়েছে। সেই খোলা দুয়ার দিয়েই তো বাইরের পানে তাকাচ্ছে আজ চোখ দু'টো। মনটা বড় ভারী হয়ে যায়, বড় সুখও লাগে। অনেক কিছুই বুঝিনে আমি। তোরা যে ধর্মে বিশ্বাস করিসনে, বড় প্রাণে লাগে আমার। কিন্তু কি করব? তা ছাড়া তোরা সব হীরের টুকরো ছেলে। মানুষের জন্য সত্যের জন্য দুনিয়ার দুঃখ মাথায় তুলে নিয়েছিস। তোদের বলব কি! কোন্ সত্যের পেছনে যে তোরা ছুটছিস্, কতক কতক বুঝি এখন তা। বুঝি বড়লোকগুলো যদ্দিন আছে, কিছু পাবে না সাধারণ মানুষেরা—না একটু আনন্দ, না পাবে তার হক্কের পাওনা। কিচ্ছুটি না। এখন তো তোদের মধ্যে আছি; মাঝে মাঝে রাত্তির বেলা পুরানো কথা সব মনে হয়। ভাবি আমার জোয়ান বয়সের সব শক্তি একজনের বুটের তলায় থেঁতলে গেল। আমার কচি প্রাণটুকু তার মুঠোর চাপে গেল গুঁড়িয়ে। ভারী কষ্ট হয় নিজের জন্য। মনটা তেতো হয়ে ওঠে। কিন্তু আজকাল জীবনটা আমার অনেক সহজ হয়ে উঠেছে। একটু একটু করে যেন বুঝতে পারছি আমারও দাম আছে...'

খখল চিন্তিতভাবে উঠে দাঁড়ায়। তার শীর্ণ দীর্ঘ দেহটা ঘরের মধ্যে নিঃশব্দে পায়চারি করে বেড়ায়। চাপা স্বরে আবেগভরে বলে ওঠে :

'কি চমৎকার করে সব পরিষ্কার করে দিলে, মা। একটি ইহুদী ছেলে ছিল কার্চ্-এ, জানো! সে কবিতা লিখত। একদিন লিখলে :

খুন হলো যেথা নিষ্পাপ যত কাঁচা প্রাণ
জীবন-সত্যে বাজে শোন্ তার পুনরুত্থান-গান।

'কার্চেইও মারা গেল পুলিশের হাতে। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। আসল হ'ল, সত্যকে ও চিনেছিল; সত্যের বীজ ছড়িয়ে গেছে ও সমস্ত মানুষের মধ্যে। বিনা-দোষে যারা খুন হয়েছে, তুমিও তাদের একজন মা...'

মা আবার বলে : 'এখন আমারও মুখ খুলেছে। নিজের কথা আমি কান পেতে শুনি। নিজের কানকে যেন বিশ্বাস হতে চায় না। সারাটা জীবন কেবল এই ভাবনাই ভেবেছি যে, রাত ভোর হলেই যে নতুন দিনটি আসে, কি করে তার আলো থেকে নিজেকে আড়াল ক'রে রাখব, কি করে গুটি সুটি হয়ে মুখটি গুঁজে ওর মধ্যে প'ড়ে থাকব সবার চোখের আড়ালে, যাতে কেউ আমার ধার পাশ দিয়ে না আসে। কিন্তু এখন আর তা ভাবিনে, এখন শুধু ভাবি অন্য মানুষের কথা। তারাই আমার মন জুড়ে থাকে। হয়তো তোদের কাজ-কর্ম বুঝিনে আমি। কিন্তু তোদের ভালোবাসি। তোদের সবার জন্য ভাবি। অহোরহ এই কামনা করি তোরা সব্বাই যেন সুখী হোস্। বিশেষ ক'রে তুই, আন্দ্রিউশা।'

মায়ের কাছে আসে আন্দ্রিয়েই। তার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরে। শুধু বলে : 'ধন্যবাদ, মা।' তারপর তাড়াতাড়ি সরে যায়। মনের মধ্যে এত ঢেউ-ভাঙানিতে অবসন্ন হয়ে পড়ে মা। অবশ হাতে পেয়ালা ধোয়। বুকের মধ্যে আনন্দের এক নীরব শান্ত স্রোত তির্ তির্ ক'রে বয়ে চলে।

খখল পায়চারি করতে করতে বলে : 'নেন্কো, ভেসভ্শিচকফটাকেও একটু ভালোবেসো। ওর বাপটা চিরকেলে পাঁড় মাতাল, জেল খাটছে এখন। জানালা দিয়ে তাকে দেখল কি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল ছেলে। আরম্ভ করল গালাগালি। মনটা বড় ভালো নিকলাইয়ের। কুকুর, বেড়াল, ইঁদুর সব ভালোবাসে, ঘেন্না করে শুধু মানুষকে। দেখলে তো মানুষ ঘটনা-চক্রে কি হয়?'

মা নিজের মনেই বলতে থাকে : 'হ্যাঁ, মা'টা গেছে...বাপটা চোর, মাতাল...'

শুতে যায় আন্দ্রিয়েই। অলক্ষ্যে মা তার উদ্দেশ্যে শূন্যে ক্রুশের চিহ্ন আঁকে। আধ ঘণ্টাখানেক পরে ডাকে :

'ঘুমিয়েছিস্, আন্দ্রিউশা?'

'না, কেন?'

'শুভ-রাত্রি।'

'ধন্যবাদ, নেন্কো! ধন্যবাদ!' কৃতজ্ঞ-চিত্তে বলে আন্দ্রিয়েই।

সতের

পরের দিন পেলাগেয়া কারখানার গেটে এলে রক্ষীরা হুকুম দেয় : 'নামাও সব, তল্লাশী করব।'

'সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে যে!' শান্তভাবে প্রতিবাদ করে মা। রক্ষীরা হাত দিয়ে অনুভব ক'রে ক'রে দেখে ওর সারা দেহ।

'চুপ কর!' হুম্কি দিয়ে ওঠে একজন রক্ষী।

আরেকজন ওর কাঁধ ধ'রে একটু ঠেলে দিয়ে বলে : 'বোধহয় পাঁচিলের ওপর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে।'

মা ভেতরে এলে, সিজভ্ এগিয়ে এল প্রথম। চারদিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করে :

'শুনেছ মা?'

'কি?'

'আবার সেই সব কাগজ। রুটির ওপর নুন ছিটোনর মত চারদিকে ছড়িয়ে রেখেছে কারা যেন। কত তল্লাসী, কত ধর-পাকড়! আমার ভাইপো মাজিনটাকে নিয়ে গেল, তোমার ছেলেটাকেও। তখন তো কত হাঁক-ডাক ক'রে সব ধরা। এখন? এখন তো চোখ দিয়ে দেখতে পেলি ব্যাটারা, যে মিছেমিছি ছেলেগুলোকে হেস্তনেস্ত করেছিস্।'

একটু সন্দিগ্ধভাবে মায়ের দিকে তাকিয়ে আবার বলে: 'আমার সাথে একটু দেখা করবে? একেবারে একা কিন্তু...'

ধন্যবাদ দিয়ে মা সওদা হাঁকে আর চারদিক নিরীক্ষণ করে। কি একটা ব্যস্ততা। অমনতর তো দেখা যায় না! সবাই যেন ভয়ানক উত্তেজিত। এই জটলা পাকাচ্ছে। এই আবার ছড়িয়ে যাচ্ছে, এখান থেকে সেখানে ব্যস্তভাবে ছুটোছুটি; কেউ টিট্‌কারি দেয়, কেউ সাবাসি দেয়। জবরদস্ত রকম কিছু একটা ঘটে গেছে, কারখানার তেলচিটে হাওয়ায় যেন তার গন্ধ পায় মা। বয়স্ক শ্রমিকরা কেমন যেন অর্থপূর্ণভাবে হাসে। ওপর-ওয়ালারা এদিক-ওদিক করছে। ভারী চিন্তিত দেখাচ্ছে ওদের। পুলিশেরা ছুটোছুটি করছে। দূর থেকে দেখতে পেলেই, যারা জটলা করছে, তারা সরে যায়, অথবা চুপ করে যায়; নিঃশব্দে ওদের বিরক্ত ক্রুদ্ধ মুখের দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

দেখে মনে হয় সবাই যেন এইমাত্র স্নান করে এসেছে। ওদিক দিয়ে বড় গুসেফ যায়। ছোট গুসেফ হাসতে হাসতে তার পেছন পেছন চলেছে।

ছুতোর-খানার ফোরম্যান ভাভিলফ্ যায়। সাথে তার সময়-রক্ষক ইসাই। খুদে মানুষ— ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে চারদিক দেখে আর ভাভিলফের লম্বাচওড়া মুখের দিকে তাকিয়ে তার ছাগল-দাড়ি নেড়ে আলাপ করতে করতে পথ চলে। ওদের কথার কিছু কিছু কানে আসে:

'ভারী তামাশা পেয়েছে ওরা, বুঝলেন ইভান্ ইভানোভিচ! এমনি করলে রাষ্ট্র আর কদিন থাকবে বলুন। বলেইছেন তো বড় সাহেব। অথচ যেন ফূর্তি পেয়েছে ব্যাটারা। এখন আর বাছা-কোছা নয়। একেবারে চষে দাও সব সমান করে...'

হাত পেছন দিকে রেখে এগিয়ে চলেছে ভাভিলফ। আঙুলগুলো শক্ত করে পরস্পরের সাথে জড়ান। উঁচু গলায় বলে:

'আরে শালারা, ছাপ্‌গে না তোদের যা খুশি। কিন্তু আমায় নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া করেছিস তো...'

ভার্সিলি গুসেফ্ মায়ের কাছে আসে:

'আরেকবার খেতে এলুম গো মা। বড় ভালো জিনিস তোমার।' তারপর স্বরটা আরো নামিয়ে বলে:

'খুব হয়েছে ব্যাটাদের। ঘায়ের জায়গাতেই নুনের ছিটে পড়েছে। তোমার আছে বলতে হবে।'

হৃভরে মাথা নাড়ে মা। বড় ভালো লাগছে। সারা বস্তির মধ্যে শয়তানীতে এ লোকটার জুড়ি নেই। অথচ কি সম্মান করেই না আজ কথা বলছে। তারপর এই উত্তেজনা তাতেও মা বড় খুশি। মনে মনে ভাবে:

আমার জন্যই তো...'

তিনজন অদক্ষ শ্রমিক একটু দূরে দাঁড়িয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলছে, মা শুনতে পায় :

'কোত্থাও পেলাম না...'

আরেক জন বলে, 'একটু শুনতাম কি আছে ওর মধ্যে, পড়তে তো পারিনে নিজে। কিন্তু যাই বল বাবা, খুব তাগ্ করে ঠিক জায়গাটিতে মেরেছে।'

তৃতীয় জন চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলে :

'চল আমরা বয়লারের ঘরে যাই।'

গুসেফ মায়ের দিকে তাকিয়ে চোখ-ইশারা করে :

'কি হচ্ছে দেখছ তো!'

খুশি মনে বাড়ী ফেরে পেলাগেয়া। আন্দ্রিয়েইকে বলে :

'লেখা পড়া জানে না বলে এখন কত পস্তাচ্ছে সবাই। ছোট-বেলায় আমিও পড়তে জানতাম। কিন্তু এখন ভুলে গেছি।'

'শেখনা কেন আবার?' খখল বলে।

'এই বয়সে? হাসবি যে তোরা!'

তাক থেকে একটা বই তুলে নেয় আন্দ্রিয়েই। মলাটের ওপরকার লেখা থেকে একটা অক্ষর দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করে : 'এটা কি বলতো!'

'আর্'

'এটা?'

'এ।'

বড় লজ্জা করে মা'র। মনে হয় আন্দ্রিয়েইয়ের চোখ দুটি চুপি-চুপি হাসছে। তাকাতে পারে না ওর দিকে মা। কিন্তু না, ওর মুখ গম্ভীর, স্বর শান্ত ধীর।

জোর করে একটু হেসে বলে : 'আমায় সত্যি শেখাতে চাস নাকিরে?

'দোষ কি?' জবাব দেয় আন্দ্রিয়েই, 'আগে যদি কিছু শিখে থাক, সহজেই মনে পড়বে আবার। সত্যি যদি শিখতে পার—আমাদের জিত। যদি না পার, মহাভারত অশুদ্ধ হবে না।'

'জানিস তো একটা কথা আছে—ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে থাকলেই ঠাকুর হওয়া যায় না।'

মাথা নেড়ে খখল বলে, 'হুঁ, তা যদি বলো, অনেক কথাই তো আছে। যেমন, ধরো—যতো কম জানা যায় ততোই মনের শান্তি। কথাটা শুনতে খারাপ শোনায় না। কিন্তু এসব কথা হচ্ছে আয়েশীদের কথা। এসব কথা বলে ওরা আত্মাকে বেঁধে রাখতে চায় এবং কথাগুলোকে ওরা ধরাবাঁধা রাস্তায় চলবার যুক্তি হিসেবে খাড়া করে। এখন বল, এটা কি?'

'এল্।'

'বাঃ বেশ। দেখতো কেমন সুন্দর এক লাইনে সব দাঁড়িয়ে আছে! আচ্ছা বলতো, এটা কি?'

প্রাণপণ করে ভুলে-যাওয়া অক্ষরগুলি মনে করতে চেষ্টা করে। অল্পক্ষণের মধ্যেই চোখ জ্বালা করতে আরম্ভ করে। জল আসে চোখে। কিন্তু তারপর সত্যি সত্যি কান্না এসে যায়। নৈরাশ্যের কান্না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলে :

'শিখবে, লেখাপড়া শিখবে! চল্লিশ বছর বয়েস, এখন বসে এ, বি, সি কর।'

সান্ত্বনা দেয় খখল : 'কেঁদোনা! তোমার কি দোষ। তোমার তো হাত ছিল না!

কিন্তু ওরকম জীবন যে কি সাংঘাতিক বিশ্রী, অন্তত ওটুকু যে তুমি বুঝতে পেরেছ এও তো কম নয়। সবাই যদি পারত তাহ'লে কি আর কথা ছিল! কিন্তু বুঝতে অনেকেই পারে না। থাকে জানোয়ারের মত। আর তাই নিয়ে তাদের গর্ব কত! আজ দেখছি একটা মানুষ খাটছে খাচ্ছে। কালও তাই। সারাজীবনই ঐ করবে। কিন্তু তাতে লাভ কি হ'ল! এক সময় তারা বিয়েও ক'রবে, ছেলেপুলেও হবে; আর ছেলেপুলেদের আদরও করবে। কিন্তু যেই তারা বড় হয়, মুখ বাড়ে, পেট বাড়ে, আরও নানানটা আবদার করে। তখনই ফ্যাসাদ বাধে। বাপের মুখের হাসি উবে যায়। তখন আরম্ভ হয় গালিগালাজ আর শাপ-মন্যি। সারাদিন চ্যাঁচায়: শুয়োরগুলোকে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াব আর ক'দিন। যা খেটে খেগে যা! ছেলে-পুলে তো নয় যেন খুঁটিতে বাঁধা পোষা জন্তু। কি আর করবে বল, কচি বয়সেই খাটতে যায় পেটের ধান্ধায়। এই তো হলো জীবন। শিরীষের আঠার মত টেনে টেনে লম্বা করা কোন মতে। মানুষের মনের এই যে দাসত্বের শেকল, এই শেকল ভাঙার ব্রত যারা গ্রহণ করে, আসল মানুষ তারাই। তুমিও তো এই কাজই হাতে তুলে নিয়েছ মা, তোমার যতটুকু শক্তি...'

'আমি? আমি কিইবা করতে পারি।'

'ওকথা বলছ কেন? আমরা সবাই বৃষ্টির মত। বৃষ্টির প্রতিটি ফোঁটা ফসল ফলাবার কাজে লাগে। বুঝেছ! পড়তে একবার আরম্ভ কর দেখি...' হোঃ হোঃ করে হেসে ওঠে। তারপর উঠে প'ড়ে পায়চারি করতে আরম্ভ করে।

'দেখ, শিখতেই হবে তোমায়। দুদিন পরে পাভেল আসবে। তখন—ওহোঃ'

'আন্দ্রিউশা, বয়স কম থাকলে সব সহজে হয়। কিন্তু তারপর, নানা চিন্তা ভাবনা, শক্তিও কমে আসে, আর মগজ তো একেবারেই যায়...'

আঠার

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় খখল গেছে বাইরে। মা বাতি জ্বালিয়ে মোজা বুনতে বসল! কিন্তু মন বসে না। উঠে পড়ে ঘরের মধ্যে বেড়াল খানিক, তারপর গিয়ে রান্না-ঘরের দরজাটা বন্ধ করে আবার ফিরে এল ভ্রূ কোঁচকাতে কোঁচকাতে। জানালার পরদাগুলো টেনে দিয়ে তাক থেকে একখানা বই পেড়ে নিল। তারপর টেবিলে গিয়ে বসল। চারদিক বন্ধ, তবু ভয়ের অন্ত নেই। কয়েকবার চারদিকে তাকিয়ে বই খুলে নিয়ে ঝুঁকে প'ড়ে পড়তে আরম্ভ করল। বাইরে সামান্য শব্দ হলেও ও চমকে উঠে বই ঢাকে আর এদিক ওদিক তাকিয়ে কান পাতে। আবার আরম্ভ করে ফিস্ ফিস্ করে।'

'ল-য়ে লাঠি, ব-য়ে বাক্স...'

দরজা ধাক্কায় কে। বইটা তাকের ওপর ছুঁড়ে ফেলে সন্ত্রস্ত হয়ে শুধায়, 'কে?'

'আমি।' রীবিন এল দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে।

'আগে তো কে জিজ্ঞাসা করতে না! ও, একা আছ? ভাবলাম খখলটা আছে। আজ দেখলুম কিনা ওকে। তা জেলে থেকে কিছু কমতি হয়নি ওর, তেমটিই

আছে দেখেছি।'

বসে মাকে বলে : 'ব'সো, ব'সো, কথা আছে।'

লোকটার দৃষ্টিতে একটা হেঁয়ালি। মায়ের কেমন যেন ভয় করে। ভারী গলায় আরম্ভ করে রীবিন :

'দুনিয়ার সবই তো কড়ির খেলা। জন্মাতেও কড়ি, মরতেও কড়ি। বিনি পয়সায় কিচ্ছুটি পাবে না, এই এত যে সব বই-পত্তর এর কড়ি আসে কোত্থেকে বলতে পারো?'

মা আঁচ ক'রে নেয়, কিছু আছে পেছনে। আস্তে আস্তে বলে :

'না, আমি আর কি করে জানব।'

'আমিও বুঝতে পারিনে। তারপর এসব লেখে কে?'

'বিদ্বান লোকেরাই লেখে, আর কে লিখবে!...'

তার দাড়ি-ঢাকা মুখের ওপর দিয়ে একটা ছায়া খেলে যায়।

'ভদ্দরলোকেরাই গো, ভদ্দরলোকেরাই। তারাই লিখে সব ছাড়ছে চারদিকে। কিন্তু আবার ভদ্দরলোকদের বিরুদ্ধেই যে লেখা সব! বুঝিয়ে দিতে পারো, গাঁটের কড়ি খরচ করে এরকম নিজেদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষদের খেপিয়ে দিয়ে লাভটা কি?'

মা শিউরে ওঠে। একটা আতঙ্কের চীৎকার বেরিয়ে আসে মুখ থেকে। বলে : 'কি বলছ কি?'

ভালুকের মত করে গর্দান ঘুরিয়ে বলে রীবিন : 'যা বলেছ! হঠাৎ যখন কথাটা মগজে ঢুকল, চোখের সামনে সব আঁধার হ'য়ে গেল গো আমারো!'

'কিছু আঁচ করেছ?'

'ধোঁকা, সব ধোঁকা! অবশ্যি হাতে নাতে প্রমাণ কিছু নেই। তবে বেশ বুঝতে পারছি—বেটাদের শয়তানি সব। তোমার ভদ্দরলোকেরা তো ধড়িবাজ কম নয়! আমি হক্ কথাটা জানতে চেয়েছিলাম। এখন বুঝতে পারছি সব। ভদ্দরলোকদের ধার পাশ দিয়েও যাচ্ছেনা আর এ শর্মা। ব্যাটারা দরকার হলেই ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে ছাতির ওপর দিয়ে হেঁটে চলে যাবে গট্ গট্ ক'রে যেন পুলের ওপর দিয়ে যাচ্ছে...'

মায়ের বুকটা কুঁকড়ে যায়।

আর্তস্বরে ব'লে ওঠে : 'যীশু! যীশু! খোকা কি এসব বুঝতে পারছে না? অন্যেরাও কি পারছে না?...'

চোখের সামনে ভেসে ওঠে ইয়েগর, নিকলাই ইভানোভিচ্, সাশার মুখ। সাচ্চা মানুষের মুখ—সাচ্চা প্রাণের ছবি... মায়ের হৃদয় বলে—না-না—হ'তে পারে না...।

মাথা নেড়ে বলে : 'বিশ্বাস করিনা আমি। আমি জানি সোনার মত খাঁটি সব ছেলে।'

'কাদের কথা বলছ গো?' চিন্তিত মুখে রীবিন বলে।

'সব্বার কথাই বলছি। সব কটাকেই দেখেছি তো আমি!'

'ঠিক দিকে তোমার নজর যায়নি। আর একটু দূর পানে তাকাও দেখি।' মাথা নীচু করে বলে ও। 'হ'তে পারে আমাদের দলের মানুষরা কিচ্ছুটি জানেনা। নিজের বিশ্বাস নিয়েই তারা আছে—সেখানে কোনো গোলমাল নেই! কিন্তু হতেও তো পারে তাদের পেছনে কুচুটে স্বার্থপর সব মানুষ আছে—যারা নিজের মতলবটি ছাড়া দুনিয়ার আর কিচ্ছু জানেনা। নইলে বাবা অমনি অমনি নিজেদের গাল পাড়ে...

বুঝলে কিনা!'

তারপর আবার বলে : 'দেখ এই সব ভদ্দর আদমিদের দিয়ে কিচ্ছু হবে না।' কৃষক মানুষ—অনেক কষ্ট করে যেন কথাটা ওকে মনে নিতে হয়েছে, এমনি সুর ওর কথায়।

আবার সংশয়ে মন দোলে মায়ের। জিজ্ঞাসা করে :

'তাহ'লে কি করতে চাও এখন?'

মায়ের দিকে তাকিয়ে চুপ হয়ে থাকে রীবিন। তারপর বলে :

'আমার কথা শুধোচ্ছ? ও ব্যাটাদের কাছ থেকে তফাত থাকো... ব্যস্। বুঝলে কিনা!'

আবার আঁধার হয়ে ওঠে তার মুখ। নিস্তব্ধ হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরে আবার বলে :

'কমরেডদের সঙ্গে থেকেই কাজ করতে চেয়েছিলাম। এবং পারতামও। লোককে কেমন করে বোঝাতে হয় তা আমি জানি। কিন্তু ওদের ওপর আমার কি রকম আর বিশ্বাস নেই। সুতরাং চলেই যাব।'

মাথাটা ঝুঁকে পড়ে। কি যেন গভীর চিন্তায় ডুবে যায় মানুষটা।

'একাই যাব আমি। গাঁয়ে, শহরতলীতে, সব জায়গায় গিয়ে লোককে বলব। ঝাঁকানি দিয়ে দিয়ে জাগাতে পারি কিনা দেখি। নিজেদের ভাগ্য ওদের নিজের হাতে নিতে হবে। একবার যদি কথাটা বোঝে ওরা, খুঁজে পেতে নিজেরাই পথের হদিশ করে নেবে। আমার কাজ শুধু ওদের সমঝানো। ওদের আশা বল, মগজ বল, বেবাক ওদের নিজেদের মধ্যে বুঝলে কিনা।'

বড় মায়া হয় মায়ের, আবার ভয়ও করে। লোকটাকে কোনও দিন ভালো লাগেনি। আজ মনে হয় বড় স্নেহের জন। অত্যন্ত নরম স্বরে বলে :

'ধরবে যে...'

রীবিন তাকায় মায়ের দিকে :

'হ্যাঁ ধরবে। কিন্তু আবার ছাড়বে। আবার আরম্ভ করব আমি।'

'মুজিকরাই ধরিয়ে দেবে তোমায়, তারপর ঠুসবে গারদে।'

'মেয়াদ ফুরোলে বেরুব তো! তখন আবার শুরু ক'রব। আর মুজিকদের কথা বলছ? কবার ধরবে ওরা? একবার, দুবার, তিনবার। তারপর নিজেরাই দেখবে আমায় বেঁধে না রেখে আমার কথা শোনাই ওদের পক্ষে মঙ্গল। আমি বলবো, বাপুহে! বিশ্বাস না হয় নাই করলে, শোনই না দু'টো কথা। তাতে দোষ কি আছে?'

ধীরে ধীরে, যেন প্রত্যেকটি শব্দকে ওজন ক'রে ক'রে উচ্চারণ করে।

'ঢের দেখলাম এ কয়দিনে। শিখেওছি এক আধটু...'

মাথা নাড়তে নাড়তে অতি বিষণ্নভাবে বলে মা : 'কিন্তু মিখাইলো ইভানোভিচ্, শেষ হ'য়ে যাবে যে একেবারে!'

কালো গভীর চোখ দুটো তুলে চায় মায়ের দিকে। উৎসুক দৃষ্টি, কি যেন শুধাতে চায়। পালোয়ানী দেহটা সামনের দিকে নুয়ে আসে; হাত দু'টো আঁকড়ে ধরে চেয়ারটাকে। কালো দাড়ির ফ্রেমের মধ্যে শামলা মুখখানার ওপর কে যেন কালি ঢেলে দিয়ে যায়।

'বীজের কথা যীশু খৃষ্ট কি বলেছেন মনে করে দেখ।—নতুন করে জন্মাবার

জন্যই বীজ মরে গো। কিন্তু দেখে নিও তুমি, অত শিগ্‌গির আমার মরণ হবে না। সেয়ানা আছি আমি।'

ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে ওঠে : 'যাই দেখি একবার আড্ডায়। লোকজন আসবে যাবে, তাদের সাথে দু'দণ্ড বসে কথা টথা কইব। খখল তো বুঝি আর ওদিক মাড়ায় টাড়ায়না। এসেই আবার পুরানো জোয়াল ঘাড়ে নিয়েছে ?'

মা একটু হেসে জবাব দেয় : 'হ্যাঁ।'

'বেশ বেশ! তাকে ব'লো আমার কথা...'

ধীরে ধীরে পাশাপাশি হেঁটে রান্না ঘরে যায় দু'জন। দু'একটা সামান্য কথা হয়, কিন্তু কেউ চোখ তুলে কারো দিকে তাকায় না।

'আসি তাহ'লে।'

'এসো। কারখানায় নোটিস্ দিচ্ছ কবে ?'

'দেওয়া হয়ে গেছে।'

'কবে যাচ্ছ ?'

'কাল সক্কাল বেলা। আচ্ছা এবার চলি।'

সদর দরজার কাছে এসে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আচম্‌কা দেহটা নুয়ে পড়ে ওর। মায়ের বুকের মধ্যে কি একটা সংশয় দোল দিয়ে ওঠে। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে শোনে—ভারী পায়ের শব্দগুলি মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে। নিঃশব্দে ফিরে এসে পাশের ঘরে গিয়ে জানালার পরদা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে মা। স্তব্ধ নিঝ্‌ঝুম আঁধার বাইরে।

'রাত্তিরের বুকেই আমার জীয়ন-কাঠি।' মনে মনে বলে মা।

চলে-যাওয়া মুজিকটির জন্য মায়ের বুকটা টনটন করতে থাকে। কি গভীর, গম্ভীর মানুষটা! তাগ্‌ড়া দেহটায় কি বুকের পাটা!

আন্দ্রিয়েই ফিরল খুশিতে টগ্‌বগ্ করতে করতে।

মা রীবিনের কথা বলে। ও চেঁচিয়ে ওঠে :

'যেতে দাও, যেতে দাও। ওর খুশি মত ঘুরুক, ফিরুক, যা চায় করুক। আমাদের সাথে কদম ফেলে চলা ওর মুশ্‌কিল। এখনও সেই পুরানো মুজিকী ধ্যান-ধারণায় মগজ পোরা। আমাদের কথা বুঝবে কি ক'রে ও ?'

'ভদ্দরলোকেদের কথা বলছিল,' অতি সাবধানে বলে মা, 'একেবারে ফেল্‌না কথা নয় বোধহয়। দেখিস্ সত্যি যেন আবার বোকা বনতে না হয় ওদের হাতে।'

'উল্টো মোচড় দেয় তারা না ?' হাসতে হাসতে বলে আন্দ্রিয়েই। 'সত্যি নেন্‌কো, আমাদের টাকা যদি থাকত! কি ভাবে চলছে, জানো ? চলছে অন্য লোকের টাকায়। নিকলাই ইভানোভিচ্ পঁচাত্তর রুবল পায় মাসে। তা থেকে আমাদের পঞ্চাশ রুবল দেয়। অন্যরাও প্রায় তাই করে। কত সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা আধপেটা খেয়ে এক এক কোপেক করে জমিয়ে আমাদের হাতে তুলে দেয়। তা, ভদ্দরলোক নানান-রকম আছে। কেউ তোমাদের দিকে ফিরেও চাইবে না; কেউ দুহাতে ঠকাবে; কিন্তু সেরা সেরা গুলোই এসে আমাদের সাথে ভিড়ে গেছে...'

হাতে হাত তালি দিয়ে ব্যগ্রভাবে আবার বলে যায় :

'আমাদের চূড়ান্ত জয় এখনও বহু বহু দূর—ঈগল-পাখী যতদূর ওড়ে বুঝি তার চেয়েও দূর। জানি। তবু পয়লা মে'র ছুটির দিনে আমরা একটা মহড়া দেব। কি ব্যাপারটা হয় দেখো একবার।'

রীবিনের কথায় মায়ের মনে যে সন্দেহ হয়েছিল, আন্দ্রিয়েইর কথায় তা পরিষ্কার

হয়ে গেল। মাটির দিকে চেয়ে চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে ঘরের মধ্যে পায়চারি করে করে বলতে লাগল,

'এক এক সময় বুক এমন ভ'রে ওঠে মা। যেগানেই যাও, সবাইকে মনে হয় কমরেড্। সে এক আশ্চর্য! সবাইকে ভালো লাগে। মনে হয় সবার বুকে ওই এক আগুন জ্বলছে। একটি কথাও মুখ ফুটে তোমার বলার দরকার নেই। বিনি কথায় একেবারে সাফ বোঝাবুঝি হয়ে যায়। আলাদা মানুষ সব, আলাদা আলাদা সুর বাজছে তাদের বুকের মধ্যে, তবু দেখ চমৎকার একটা কোরাসের মত একেবারে মিশে গিয়ে এক সাথে বাস করছে সব। সুর নয়তো যেন ঝরণা। সব গিয়ে একই নদীতে পড়ছে। তারপর সেই ধারার জলে পুষ্ট হয়ে, বাঁধন ভেঙে নাচতে নাচতে নদী গিয়ে নব-জীবনের আনন্দ-সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ছে...'

নিশ্চল হয়ে বসে থাকে মা। নড়তে সাহস হয় না, পাছে খখলের চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়। নিবিষ্ট চিত্তে শোনে ওর কথা। অমন সহজ করে বলতে কেউ পারে না। কথাগুলো একেবারে সোজা গিয়ে বুকের মধ্যে পেঁছায়। পাভেলও তো আগামী দিনের কত স্বপ্ন দেখে, কিন্তু এতটুকুও যদি মুখ ফুটে বলে। অথচ আগামী দিনে এই মাটির পৃথিবীর বুকে প্রত্যেকটি মানুষের ঘরে ঘরে যে আনন্দের সওগাত এসে পেঁছাবে খখল তার উচ্ছ্বসিত কথার তুলিতে তার ছবি আঁকে। ও যেন ওই ভবিষ্যতের মধ্যেই বেঁচে আছে। পাভেল আর কমরেড্দের জীবন, তাদের কাজ-কর্মের অর্থ মা এরি মধ্যে খুঁজে পায়।

হঠাৎ মাথাটাকে মস্ত ঝাঁকানি দিয়ে আবার বলতে আরম্ভ করে খখল :

'তারপর হঠাৎ চমক ভাঙে। দেখি চারদিকে হিম, থম্থমে। এখানে সেখানে আবর্জনার স্তূপ। মানুষগুলি এমনি শ্রান্ত ক্লান্ত, সোজা হয়ে হাঁটতে পারছে না। খিটখিটে রুক্ষ মেজাজ...'

ব্যথায় গলাটা ভারী হয়ে আসে।

'কিন্তু মা, মানুষকে বিশ্বাস করোনা। বড্ড লাগে, না? তবু বলি, তাদের বিশ্বাস করো না, বরঞ্চ ভয় করো। এমন কি ঘৃণা পর্যন্ত করতে পারো। মানুষের দুটো দিক আছে। হয়তো মানুষকে তুমি ভালোবাসতেই চাইবে। কিন্তু পারবে না তো! যে-মানুষ বুনো জন্তুর মত কেবলি তোমার পেছনে তাড়া করবে, ভুলেও মনে করবে না যে তুমি মানুষ, তোমার মধ্যেও মানুষের আত্মা আছে, তোমার মানুষের চেহারাটা অবধি থেঁতলে বিকৃত করে দেবে, তাকে ক্ষমা করবে কি করে বল তো? না, ক্ষমা করা চলে না! এটা তোমার ব্যক্তিগত প্রশ্ন নয়—নিজে না হয় সব সইলে। কিন্তু কর্তারা ভাববে, তাদের নীতিতে তোমার সমর্থন আছে—তা কি করে চলবে? মানুষ ঠ্যাঙাবার কায়দা তারা তোমার পিঠের ওপর মক্শো করবেন—তাই বা তুমি দেবে কেন?'

ওর চোখে যেন একটা হিম শিখা জ্বলে। মাথাটা নীচু হয়ে আছে বিদ্রোহে। আরো দৃঢ় ভাবে বলে :

'আমায় স্পর্শ করুক আর না করুক, অন্যায়কে বরদাস্ত করবার অধিকার আমার নেই। সংসারে আমি একা নই। আজ হয়ত আমায় কেউ মেরে গেল। আমি হেসে বললুম, যাক্গে, যেতে দাও। কিন্তু ওখানেই শেষ নয়। আমার ওপর তাকতটা পরীক্ষা করে, কাল হয়ত গিয়ে আর একজনের গায়ের চামড়া খসাবে। সকলকে সমান চোখে কি দেখা যায়? নিজের পছন্দ বা মনের ধারা অনুসারে

বাছাই করতে হয়। এটা আমার পছন্দ, ওটা পছন্দ নয়—এমনি করেই বেছে নিতে হয়। ব্যাপারটা আরামদায়ক নয় মোটেই, তাই না? কিন্তু এটাই সত্যি।'

কেন জানি মা'র সাশার কথা মনে পড়ে, আর মনে পড়ে সেই পুলিশ-অফিসারের কথা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে মা : 'আ-চালা আটায় আর কেমন রুটি হবে?'

'ওই তো মুস্কিল, মা!' খখল গলাটাকে উঁচু ক'রে বলে।

'সত্যি তাই।' স্বামীর চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে—মস্ত বড় একটা ভারী শেওলা-জমা পাথর যেন, আঁধার আঁধার গুমটানো চেহারা। ভাবতে চেষ্টা করে, নাতাশাকে যদি খখল বিয়ে করে, আর পাভেল সাশাকে, তাহ'লে কেমন হয়।

আগের কথার জের টেনে আবার বলে খখল :

'কিন্তু কেন এমন হয়, বলতে পারো? অত্যন্ত সোজা কথা। মানুষ সব সমান স্তরের নয়। সব সমান করে দিয়েই দেখা যাক। মানুষের মনের আর হাতের যা সৃষ্টি, সব কিছুর সমান হিস্‌সা দাও সবাইকে। কাউকে ভয় দেখিয়ে, হিংসে দিয়ে দাবিয়ে রেখোনা; লোভ আর অজ্ঞানতার অন্ধকূপে বন্দী ক'রে রেখো না...'

এর পরেও অনেক কথা চলে অনেকক্ষণ ধরে।

কারখানায় আবার কাজ হয়েছে নাখোদকার। মাইনে এনে সব মায়ের হাতে তুলে দেয়। পাভেলের কাছ থেকে যেমন করে নিত, ঠিক তেমনি করেই নেয় মা।

এক এক দিন চোখ মিচ্‌কিয়ে বলে খখল :

'একটু পড়ি এসোনা, নেন্‌কো!'

মা হাসে। কিন্তু কিছুতেই আসবে না। আন্দ্রিয়েইর হাসিটা যেন ফোটে। মনে মনে ভাবে, 'এটা যদি ঠাট্টার ব্যাপারই হয়ে থাকে তো বলতে আসা কেন বাপু।'

কিন্তু প্রায়ই এমনি কথার সব অর্থ জিজ্ঞাসা করে, যা কথাবার্তায় সচরাচর ব্যবহার হয়না। জিজ্ঞাসা করার সময় মুখটা নির্লিপ্ত ঔদাস্যে আরেক দিকে ফেরানো থাকে। আন্দ্রিয়েই আন্দাজ করে গোপনে পড়াশোনা করছে মা। তাই আজকাল আর ওর কাছে বই নিয়ে বসার জন্য পীড়াপীড়ি করেনা।

একদিন বললে মা : 'দেখরে আন্দ্রিউশা, আজকাল ভালো দেখতে পাচ্ছিনা যেন। মনে হচ্ছে চশমার দরকার।'

'বেশ তো, রবিবার নিয়ে যাব ডাক্তারের কাছে।' জবাব দেয় আন্দ্রিয়েই।

উনিশ

তিনবার মা পাভেলের সাথে দেখা করার অনুমতি চাইতে গেল, তিনবার অত্যন্ত ভদ্রভাবে ফিরিয়ে দিলে পুলিশের পাকা-চুল, বেগ্‌নি-গাল আর মস্ত-নাক-ওয়ালা বড়-কর্তা।

'আরও সপ্তাহ খানেক অপেক্ষা করতে হয় যে, মা। তারপর দেখি কি করা যায়। এখন তো কোনো মতেই হয়না!'

গোলগাল মোটা চেহারা কর্তার; দেখে মনে হয় যেন একটা টস্‌টসে টোপা কুলে অনেক দিন পড়ে থেকে থেকে ছাতা ধরেছে। হল্‌দে একটা কাঠি নিয়ে ক্ষুদে ক্ষুদে ধারাল শাদা দাঁতগুলো খোঁটে হরদম; কটা রং-এর ছোট চোখে অমায়িক হাসি; গলার স্বরটা হামেশাই বড় ভদ্র।

খখলকে বলে মা : 'লোকটা বড় ভদ্র। সর্বদা কেমন হাসি মুখ।'

'তা বটে,' জবাব দেয় খখল : 'ওদের সবাই অমনি ভালো, অমনি ভদ্র। মুখের হাসি ঘোচেনা ওদের। ওদের কাছে হুকুম অসে—শ্রীমান অমুক সাতিশয় বুদ্ধিমান ও সাধু ব্যক্তি। কিন্তু আমাদের মনে হইতেছে লোকটা বিপজ্জনক। অতএব কিছু যদি মনে না করেন, দয়া করিয়া পত্রপাঠ ইহাকে ফাঁসি কাষ্ঠে চড়াইবেন।—এবং এরা হাসতে হাসতে ফাঁসি দেয়। এবং ফাঁসি দিয়ে আবার হাসতে থাকে।'

'কিন্তু এখানে খানা-তল্লাসী করতে যে অফিসারটা এসেছিল, সে আবার আরেক রকম। ভারী খারাপ লোক।'

'ওরা কেউ মানুষ নয়। সব হাতুড়ী। মানুষের মাথায় মেরে তাকে বেহুঁশ করে রাখাই ওদের কাজ। স্রেফ যন্ত্র। ঐ দিয়েই তো আমাদের মত মানুষদের শায়েস্তা করে। এমনি শায়েস্তা করে যে একেবারে হাতের পুতুল বানিয়ে রাখে। কর্তারা নিজেদের সুবিধামত ছাঁচে ফেলে গড়ে পিটে নিয়েছে তাদের গোলামদের। সুতরাং বিনা প্রশ্নে নির্বিচারে ওরা হুকুম তামিল করে।'

ছেলের সাথে দেখা করার হুকুম মিলল অনেক করে। জড়সড় হয়ে মা গিয়ে বসল জেল-আফিসের এক কোণে। ছোট নোংরা ঘরটা। ছাদ এসে প্রায় মাথায় ঠেকে। আরও অনেকেই এসেছে বন্দী আত্মীয় স্বজনদের সাথে দেখা করতে। বোঝা গেল এরা এর আগেও এসেছে এখানে। আসা যাওয়ায় পরিচয় হয়েছে পরস্পরের সাথে। আস্তে আস্তে মাকড়শার জাল বোনার মত করে আলাপের জাল বুনে চলেছে।

'শুনেছেন ব্যাপার? আজ প্রার্থনার সময় গাইয়ে ছেলেদের একজনের কান টেনে ছিঁড়ে দিয়েছে গির্জার সেক্‌সটন।'

পেন্সন-পাওয়া অফিসারের উর্দি-পরা এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক টিপ্পনি কাটেন : 'ভারী শয়তান ও ছোঁড়াগুলো।'

ওধারে ওই টাক-পড়া বেঁটে মানুষটা, খাটো ঠ্যাং, ল্যাংলেঙ্গে দুই হাত, থুথ্‌নিটা যেন বেরিয়ে আসছে, অস্থিরভাবে ঘরময় পায়চারি করছে আর ভাঙা গলায় ভারী উত্তেজিত হয়ে বলছে :

'দিন দিন সব জিনিসপত্রের দাম চড়ছে। থাকে কি করে মানুষ? মাঝারি রকমের মাংস, তার দাম কিনা পাউন্ড চৌদ্দ কোপেক, আর রুটি উঠল গিয়ে আড়াই কোপেকে...'

কয়েদীরা আসে যায়। সকলের পরনে সেই এক ছাই রঙের পোশাক আর ভারী চামড়ার জুতো। আধো-আলো আধো-অন্ধকার ঘরটায় ঢুকে সবাই চোখ পিট্‌পিট করে। একজনের পায়ে বেড়ীও ছিল। জেলের সব কিছুই এমন অদ্ভুত রকমের শান্ত আর সাদাসিধে যে অস্বস্তি লাগে দেখে। এই আবহাওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে এখানকার মানুষগুলো। একদল বন্দী-জীবনকে নসীব বলে মেনে নিয়ে চুপচাপ মেয়াদ পালন করছে, আর একদল পাহারা দিয়ে চলেছে অলসভাবে, অন্য একদল ক্লান্ত পায়ে প্রতি সপ্তাহে নিয়মমাফিক আসে বন্দীদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। মায়ের মন আর ধৈর্য মানতে চায় না। বুক ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করে। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায় চার দিকে। অবাক হয়ে যায় জায়গাটার বিষণ্ণ নিরাভরণতায়।

পাশেই বসেছিল এক বৃদ্ধা। মুখের চামড়া কুঁচকে কুঁকড়ে গেছে কিন্তু চোখ দু'টিতে বয়সের পরশ লাগেনি। রোগা ঘাড় বাড়িয়ে সকলের কথা শুনতে যায়, সকলের ওপর ঘুরে বেড়ায় ওর চটুল দৃষ্টি। পেলাগেয়া জিজ্ঞাসা করে :

'কাকে দেখতে এসেছেন?'

'ছেলেকে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত সে।' বৃদ্ধা চিৎকার করে জানান, 'আর আপনি?

'আমিও ছেলেকেই দেখতেই আসছি। কারখানায় কাজ করে।'

'কি নাম?'

'ভ্লাসফ্‌।'

'এ নাম তো শুনিনি কোনোদিন। অনেক দিন আছে?'

'প্রায় সপ্তাহ সাতেক হল।'

'আমার ছেলে—দশটি মাস।' বৃদ্ধা বলে। ওর স্বরে গর্বের আভাসটুকু পেলাগেয়া টের পায়।

টেকো লোকটি বক্‌বক করে বলে : 'অসহ্য! সবাই তেতো হয়ে উঠেছে। সবাই চ্যাঁচাচ্ছে। শালার জিনিসপত্রের দাম বেড়েই চলেছে। কাজেই মানুষের দাম নামছে। এর একটা হেস্তনেস্ত হওয়া দরকার। কিন্তু কেউ কি একটা আঙুলও নাড়বে?'

'ঠিক বলেছেন,' অফিসার বলে : 'সত্যি আর সওয়া যায়না। এখন একটা জবরদস্ত গলার হাঁক চাই। বুঝলেন কিনা... জবরদস্ত গলা চাই।...'

জোর জমে ওঠে আলাপ; সবাই যোগ দেয় আলাপে। জীবন সম্পর্কে নিজের নিজের মতামত জানাতে সবাই ভারী ব্যস্ত। কিন্তু কথা কয় চাপা স্বরে। মায়ের কেমন অস্বস্তি লাগে। এদের সাথে মত মেলেনা। মনও মেলেনা। বাড়ীতে ওদের কথা-বার্তা, আলাপ আলোচনার ধরনই অন্য। অনেক স্পষ্ট, অনেক সহজ-সরল। বাড়ীতে ওরা মুক্ত-কণ্ঠে কথা কয়।

স্থূল-বপু, চৌকোণা লাল দাড়ি, জেলর এসে নাম ডাকে মায়ের, ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভালো ক'রে দেখে নেয়। তারপর খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে যায় : 'আমার সাথে আসুন।'

লোকটার পা যেন আর চলে না। মায়ের ইচ্ছা হয় পেছন থেকে ধাক্কা মারে।

ছোট্ট একটা ঘরে পাভেল দাঁড়িয়ে আছে হাসি মুখে হাত বাড়িয়ে।

হাতখানা ধরে এসে মা। একটু হাসে, চোখের পাতা দ্রুত ওঠানামা করে। মুখ দিয়ে কথা সরে না। খালি বলে :

'এই যে... ওরে... ওরে...'

পাভেল শক্ত ক'রে মায়ের হাত ধরে। বলে : 'শান্ত হও মা।'

'আর ভয় নেই বাবা।'

একটা নিশ্বাস ফেলে জেলর বলে :

'মা-ই বটে!' তারপর সশব্দে একটা হাই তুলে বলে : 'কিন্তু দূরে দূরে দাঁড়াতে হবে যে একটু!'

মা'র শরীর কেমন আছে, বাড়ীর কথা, একথা-সেকথা জিজ্ঞাসা করে পাভেল।... কিন্তু আরো কিছু শুনতে চায় মা। ছেলের চোখের দৃষ্টিতে খোঁজে না-শুধান প্রশ্ন। কিন্তু কিছুর ইশারা মেলে না। তেমনি শান্ত, ধীর। চেহারাটা একটু যেন ফ্যাকাসে হয়েছে, চোখ দু'টোও যেন আরো বড় বড় দেখাচ্ছে।

'সাশা তার কথা বলতে বলেছে তোকে।' মা বলে।

পাভেলের চোখের পাতা কাঁপে থিরথির করে; মুখখানা কোমল হয়ে ওঠে। কোমল হাসি জেগে ওঠে ঠোঁটের কোণে। মায়ের বুকটা হঠাৎ মোচড় দিয়ে ওঠে একটা তীব্র ব্যথায়।

'তোকে ছাড়বে টাড়বে না ওরা?' একটু বিরক্তির সাথে শুধায় আহত স্বরে, 'কেন যে তোকে আটকে রেখেছে, বুঝিনে বাপু। ইস্তাহার তো রোজই পড়ছে কারখানায়।'

পাভেলের চোখ জ্বলে ওঠে। 'সত্যি?' তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করে।

'ওসব আলোচনা নিষেধ এখানে।' ঝিমুন স্বরে বলে জেলর, 'খালি পারিবারিক কথা, বাড়ী ঘরের কথা, ব্যস্।'

মা তেতে ওঠে : 'এ বুঝি পারিবারিক কথা হল না?'

'তা বলতে পারিনে। তবে ওসব আলাপ করার হুকুম নেই এখানে।' নিরুৎসুক জবাব আসে জেলরের।

'বেশ, তাই হবে।' পাভেল বলে, 'বাড়ীর কথাই বলো মা। কি-ভাবে কাটিয়েছ এতদিন?'

মায়ের চোখে একটা বাল-সুলভ দুষ্টুমির ঝিলিক খেলে যায় :

'জানিস্? আমি কারখানায় নিয়ে যাই সব...' একটু থেমে বলে চলে, 'এই বাঁধাকপির ঝোল, পরিজ্, আরো কত কি সব খাবার জিনিস। মারিয়া রাঁধে, আমি বেচতে নিয়ে যাই...'

পাভেল বোঝে। চুলের মধ্যে হাত চালায়। চাপা হাসিতে চোখ চক্‌মক্ করে।

'যাক ভালোই হয়েছে। কাজে লেগে আছ। নয়তো মন গুমরাতে চুপচাপ বসে।' এত কোমল, ভেজা কণ্ঠ ছেলের শোনেনি কখনও মা।

'যখন সেই ইস্তাহারগুলো পাওয়া গেল, আমাকে শুদ্ধু তল্লাসী করে ছেড়েছে, জানিস্?' মা বলে একটু অহঙ্কার করে।

'ফের'! জেলরের স্বরে এবার একটু রাগের ঝাঁঝ, 'একবার ব'লে দিয়েছি এসব নিষেধ এখানে! একটা লোককে আটক করা হয় এইজন্যে যে বাইরে কী ঘটছে তা সে জানতে পারবে না। আর সেই বাইরের কথাই আপনি বারবার তুলছেন! কোন্ কথা বলা চলে আর কোন্ কথা বলা বারণ একথা বোঝার মত বয়স আপনার হয়েছে নিশ্চয়ই!'

পাভেল বলে, 'থাক্ মা। মাতাভিয়েই ইভানোভিচ্ ভারী ভালো লোক। ওঁকে

চটিওনা। খুব খাতির আমার সঙ্গে। অন্যদিন এখানে থাকে ওঁর সহকারী। আমাদের ভাগ্যি ভালো যে নিজেই আছেন আজ।'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে জেলর বলে : 'সময় হয়ে গেছে।'

'আচ্ছা, এসো মা। মন টন খারাপ করোনা। ছেড়ে দেবে শিগ্গিরই।'

জড়িয়ে ধরে চুমু খায় মাকে। আনন্দে কান্না আসে মায়ের।

'বাস্ বাস্। চলুন এবার।' বলল জেলর, তারপর মাকে নিয়ে যেতে যেতে নীচু স্বরে বলে, যেন আপন মনে :

'কাঁদবেন না, কাঁদবেন না। শিগ্গিরই ছাড়বে। সব্বাইকে ছেড়ে দেবে। এক তিল জায়গা নেই এখানে।'

বাড়ী ফিরে হেসে ডগ্মগিয়ে সব কথা বলে খখলকে। ভ্রূ দুটো কাঁপতে থাকে ওর।

'খুব কারসাজী করে বলেছি। ঠিক বুঝতে পেরেছে। নইলে অমন আদর, অমন কথার স্বর তো দেখিনি। কোনো দিন না!' বলতে বলতে দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে আসে একটা।

খখল হাসে। বলে : 'ভারী মজার মানুষ তো তুমি! মানুষ কত রকম কত হাজার জিনিস চায়। আর তোমরা মায়েরা খালি আদর কাড়তে চাও আর ভালোবাসা চাও।'

'না রে না, দেখতিস্ যদি, আর যারা এসেছিল।' হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠে মা : 'সব ওদের অভ্যেস হয়ে গেছে জল ভাতের মত।। বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ছেলে-গুলোকে পুরে রেখেছে। কিন্তু কেমন করে সব আসে, বসে থাকে, রাজ্যের কথা নিয়ে বক্বক করে যেন কিছুই হয়নি। লেখা-পড়া জানা লোকেরাই যদি পারে ওরকম করতে আমাদের মত বোকা-মুখ্যুদের কাছ থেকে আর কি আশা করিস!'

'ব্যাপারটা সোজা,' অভ্যস্ত কায়দায় বিদ্রূপ করে বলে খখল, 'আইন জিনিসটা ওদের বেলায় নরম, আমাদের বেলায় কড়া, আর আইনের ফ্যাকড়াও আছে ওদের জন্যই। তাই ওরা নিজেরা যখন আইনের প্যাঁচে পড়ে তখন ক্ষেপে ওঠে মুখ ভ্যাংচায়। কিন্তু ওই পর্যন্তই, আর বেশি এগোয় না ওরা। নিজের হাতের লাঠি পিঠে পড়লে ব্যথাটা একটু কমই বাজে'!

কুড়ি

সেদিন সন্ধ্যেবেলা, মা বসে মোজা বুনছে আর খখল পড়ে শোনাচ্ছে প্রাচীন রোম-সাম্রাজ্যের দাস-বিদ্রোহের কাহিনী। দরজায় খুব জোরে ধাক্কা দিল কে। খখল গিয়ে খুলে দিল। ভেসভশিচকফ্। হাতে একটা সাদা পুঁটলি। টুপিটা মাথার পেছন দিকে ঠেলা, হাঁটু পর্যন্ত কাদা।

'যাচ্ছিলাম এদিক দিয়ে। আলো দেখলাম। এসে ঢুকে পড়লাম। ভাবলাম দেখা করে যাই। সোজা জেল থেকে আসছি।' গভীর আন্তরিকাতর সাথে মায়ের হাতটা ঝাঁকানি দিয়ে অদ্ভুত স্বরে বলে :

'পাভেল প্রণাম দিয়েছে।'

বসল ভেস্‌ভশিচকফ্‌, কিন্তু কেমন যেন একটা অস্বস্তি ওর। সারা ঘরটা যেন পাঁতি পাঁতি ক'রে দেখে। দৃষ্টিতে বিষাদ আর সংশয়ের ছায়া।

মায়ের কোনো কালেই ভালো লাগেনি ওকে। ওর নেড়া মাথা আর ছোট চোখ-গুলো দেখে কেমন ভয় ভয় করে সর্বদা। কিন্তু আজ মা খুশি হ'য়ে উঠল ওকে দেখে। ওর কথায় হাসিতে স্নেহ ঝ'রে পড়ল।

'কি রোগা হয়ে গেছ! একটু চা দেবে ওকে, আন্দ্রিউশা!'

রান্নাঘর থেকে হেঁকে বলে খখল :

'সামোভার জ্বালিয়ে দিয়েছি।'

'পাভেল কেমন আছে? তোমার সাথে আর কাউকে ছেড়েছে?'

মাথা নীচু করে নিকলাই।

'না, একা আমাকেই। পাভেল ভালো ছেলেটির মত বসে আছে। দিন গুনছে কবে মেয়াদ ফুরোবে।'

তারপর মাথা তুলে মায়ের দিকে তাকিয়ে চাপা দাঁতের ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে বলে :

'আমি বলে দিয়েছিলাম ওদের, না যদি ছাড়ো বাবা, হয় কাউকে খুন করব, নয় নিজে খুন হব।'

শিউরে ওঠে মা। লোকটার কোঁচকান চোখের ধারাল দৃষ্টির সামনে তাকাতে পারে না মা :

রান্নাঘর থেকে খখল চ্যাঁচায় :

'ফিওদর কেমন আছে হে? এখনও কবিতা লেখে?'

'হ্যাঁ। ওসব বুঝিটুঝিনে।' মাথা ঝাঁকিয়ে বলে নিকলাই। 'ভাবে কি নিজেকে ও ছোঁড়া? ক্যানারী পাখী? খাঁচায় রাখো তাও গান গাইবে। কিন্তু যাক্‌গে— বর্তমানে এটুকু বুঝছি যে আমার বাড়ী যাবার ইচ্ছে নেই।'

মা বলে : 'বাড়ীতে আর গিয়েই বা কি করবে? কি আছে বাড়ীতে? শূন্য পুরী, খাঁ খাঁ করছে। উনোনে আগুন নেই। জমে আছে সব...'

কিছু বলে না, শুধু আড়চোখে একবার তাকায়। তারপর পকেট থেকে সিগারেটের বাক্স বের করে একটা জ্বালিয়ে মুখে দেয়। বদ-মেজাজী কুকুরের মত গোঁ গোঁ করে আর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে কেমন করে ধোঁয়াগুলি ওঠে আর হাওয়ায় মিলিয়ে যায়।

'তা আছে। সবই হয়তো জমে আছে হিমে। হয়তো গিয়ে দেখব, আরসোলা, ইঁদুরেরা জমে জমে প'ড়ে আছে এখানে ওখানে। আজ রাতটা আমায় থাকতে দেবে এখানে, পেলাগেয়া নিলোভনা?' ঘোঁত ঘোঁত করে মোটা গলায় জিজ্ঞাসা করে মায়ের দিকে না তাকিয়ে।

জবাবটা যেন লুফে নেয় মা : 'তা আবার বলতে।' ওর সামনে বসে থাকতে বড় অস্বস্তি লাগছে কেন জানি।

'আজকাল বাপ-মায়ের জন্য ছেলেকে মুখ ঢাকতে হয়...'

চম্‌কে উঠে শুধায় মা : 'কি, কি বলছ?'

মায়ের দিকে একবার তাকিয়ে চোখ বন্ধ করে ও। বসন্তের দাগ-ওয়ালা মুখটাকে মনে হয় অন্ধ মানুষের মুখ।

একটা গভীর নিশ্বাস ফেলে আগের কথাটারই পুনরাবৃত্তি করে :

'বলছিলাম বাপ-মায়ের জন্য ছেলেকেও মুখ ঢাকতে হয়। বাপের জন্য আমি লজ্জায় মুখ দেখাতে পারি না। কিন্তু কই তোমার জন্য পাভেলের তো তা হয় না। অমন বাপের বাড়ীতে আর পা দিচ্ছিনে। আমার বাপ নেই, ঘর নেই, কিচ্ছু নেই। পুলিশ ব্যাটারা ধরে না রাখলে আমি চলে যেতাম সাইবেরিয়ায়। সেখানে যত লোককে ওরা চালান করেছে, সবাইকে বের করে নিয়ে আসতাম, ওদের পালাবর পথ বাতলে দিতাম।'

স্পর্শ-কাতর মনখানা দিয়ে মা ওর ভেতরের যাতনাটা বোঝে, কিন্তু তবুও মায়ের মনে এক ফোঁটা দরদ জাগে না।

চুপ করে থাকলে হয়ত মনে ভাববে কিছু মানুষটা, তাই বলে মা : 'তবে তো অন্য কোথাও যাওয়াই ভালো।'

আন্দ্রিয়েই রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে হাসতে হাসতে :

'কি মা, কিসের সলা দিচ্ছ?'

উঠতে উঠতে বলে মা : 'যাই খাবার জোগাড় করিগে।'

তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ খখলের দিকে তাকিয়ে থেকে, হঠাৎ বলে ওঠে নিকলাই :

'কতগুলি মানুষকে খুন করে ফেলা দরকার।'

'সে কিহে? কেন বল তো?' খখল জিজ্ঞাসা করে।

'স্রেফ্ দুনিয়া থেকে সরিয়ে ফেলা দরকার।'

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে খখল তাকিয়ে আছে নিকলাইএর দিকে। ওর রোগা লিক্‌লিকে দেহটা জুতোর গোড়ালির ওপর দোল খায়। নিকলাই বেশ আঁটসাঁট হয়ে বসে আছে চেয়ারে। ওকে ঘিরে ঘিরে সিগারেটের ধোঁয়ার জাল বোনে। ক্ষণে ক্ষণে লালের ছোপ পড়ে দাগ্‌ড়া দাগ্‌ড়া হয়ে ওঠে মুখটা।

'ইসাই গরবফ্‌এর ঘাড়ে গর্দানে আলাদা না করেছি তো নাম নাই!'

'কেন, বলতো?'

'ব্যাটা নিজে গোয়েন্দা, আর সাথে আমার বাপটার মাথাটাও খেল। তাকে অবধি গোয়েন্দা বনিয়েছে।' রাগে গোঁ গোঁ করতে করতে বলে ভেসভ্‌শিচকফ্।

'এই কথা?' বলে ওঠে খখল। 'কিন্তু তাতে তোমার কিহে? ও অপবাদ তোমায় যে দেবে সে নেহাৎ মূর্খ!'

গোঁ হয়ে নিকলাই বলে : 'বোকা চালাক সব সমান। সব দেখা আছে। নিজেদের কথাই ধরনা, এই তোমার আর পাভেলের কথা বলছি। দুজনেই তো খুব চতুর। বলতো দেখি শুনি একবার, তোমাদের কাছে কি আমি ফিওদর বা সাময়লফের সমান? তোমরা নিজেদের যে চোখে দেখ, পার তেমনি করে আমায় দেখতে? মিথ্যে কথা বলোনা, বাবা। বিশ্বাস করবনা। সবাই আমায় একটেরে ঠেলে রেখেছে...'

খখল উঠে গিয়ে ওর পাশে বসে। অত্যন্ত কোমল স্বরে বলে :

'তোমার মনটা ভালো নেই, নিকলাই।'

'হুঁ! আমার মনটাই না হয় ভালো নেই। আর তোমাদের! রোগী সবাই। খালি রোগের তফাৎ। তোমাদের রোগটা হোমরা-চোমরা—মানে ভড়ং কর তাই। নইলে সব শালাই সমান। বল তুমি কি বলতে চাও! শুনি!'

তীক্ষ্ম চোখ দুটো আন্দ্রিয়েইর মুখের ওপর যেন বিঁধে থাকে। দাঁত কড়মড় করতে করতে জবাবের প্রতীক্ষা করে নিকলাই। লালের ছাপ লাগা মুখের ভাব

এতটুকু বদলায়নি। কিন্তু মোটা ঠোঁট দুটো কাঁপতে থাকে। হয়তো শীতেই কাঁপে।
ভেসভ্‌শিচকফের জ্বলন্ত দৃষ্টির দিকে ওর অন্তরঙ্গ নীল চোখ দুটি তুলে ধরে খখল বলে : 'কি বলব! বলার কিছু নেই। যার বুকে কাঁচা ঘা, তার সাথে তর্ক করা চলেনা, ভাই। তাতে তার দুঃখই বাড়ে।'

চোখ নামিয়ে গুনগুনিয়ে বলে নিকলাই :

'আমার সাথে তর্ক করে পারবেই না তুমি।'

'দেখ আমরাও কিছু ফুল-বিছানো পথ দিয়ে চলিনি। ঝড় ঝাপ্‌টা মাথার ওপর নিয়ে, অসহ্য দুঃখের মধ্য দিয়ে তোমারই মত কাতরাতে কাতরাতে আমাদের পথ ভাঙতে হয়েছে...'

'থাক্‌—কিছু বলোনা আমায়। বলবার মত কিছু নেই তোমাদের। আমার ভেতরটা নেকড়ের মত হিংস্র হয়ে আছে।' ধীরে ধীরে বলে ভেস্‌ভশিচকফ্‌।

'না, কিছু বলতে চাইনে। তবে জানি যে এভাব বেশী দিন থাকবে না। চলে যাবে। একেবারে না গেলেও যাবে।'

টুক্‌রো একটা হাসি ছুঁড়ে মেরে নিকলাই-এর কাঁধ চাপড়ে বলে যায় আন্দ্রিয়েই :

'বাচ্চাদের হাম হওয়ার মত হে। একবার না একবার হবেই সব্বার। শরীরটা শক্ত থাকলে বাঁচোয়া। দুর্বলদের সর্বনাশ। এও তেমনি। ধর জীবনটাকে তোমার সম্পূর্ণ দেখাই হয়নি—তুমি যে কোথায় আছ, কোথায় যে তোমার জায়গা—কিছুই জানোনা। সবে খোঁজা শুরু হয়েছে। এমনি সময় যদি মনের রোগ হয়, সত্যি একেবারে কাত করে ফেলে। মনে হয়, তোমাকে ভারী উমদা একটা খাবার চীজ মনে করে দুনিয়া-শুদ্ধু লোক হাঁ করে খেতে আসছে। কিন্তু খানিক বাদেই দেখবে—তুমি নও শুধু, মেলাই মানুষ আছে তোমার মত। তখন নিজেই লজ্জা পাবে যে তোমার টিম্‌টিমে ঘণ্টাটি নিয়ে গির্জার ঘণ্টা-ঘরে উঠেছিলে গিয়ে গুমর করে। সবগুলো ঘণ্টা বাজলে তোমার ঘণ্টার আওয়াজ শোনাই যেতনা—তেলের মধ্যে মাছির মত স্রেফ ডুবে যেত। কিন্তু একসঙ্গে সবগুলো ঘণ্টার কোরাস বেজে উঠলে বুঝতে পারবে, ডুবে গেলেও তোমার ঘণ্টাটির ক্ষীণ আওয়াজেরও অত্যন্ত মিঠে একটি সুরের দান আছে তার মধ্যে। সমবেত সুরের মধ্যে তারও স্থান আছে। বুঝলে তো কি বলতে চাইছি?'

মাথা নেড়ে নিকলাই বলে, 'হয়তো বুঝেছি। কিন্তু বুঝলেও বিশ্বাস করিনে।'

হেসে খখল তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে শব্দ করে করে পায়চারি করতে আরম্ভ করে।

'একটি আস্ত গবেট তুমি। আমিই কি আগে বিশ্বাস করতাম হে!'

'আমাকে গবেট বলছ কেন?' খখলের দিকে তাকিয়ে একটু ঝাঁঝালো হাসি হেসে জিজ্ঞেস করে নিকলাই।

'গবেটকে গবেট বলব না তো কি বলব?'

হঠাৎ মুখটাকে এতখানি হাঁ করে হোঃ হোঃ করে হেসে ওঠে নিকলাই।

'কি হ'ল, অত হাসছ কেন?' অবাক হয়ে খখল ওর সামনে এগিয়ে আসে।

'এই, মনে হচ্ছিল কি জান? তোমার মনে যে কষ্ট দেয় সে নেহাতই গাধা।' নিকলাই জবাব দেয়।

'হঠাৎ আবার একথা মনে হতে গেল কেন? আমার আবার মনে কষ্ট কে দিল?' খখল বলে কাঁধ ঝাঁকিয়ে।

ভালো-মানুষী, পিঠ-চাপড়ান ধরনের হাসি হাসে ভেস্‌ভশ্চিকফ্‌। বলে :
'তা জানি টানিনে বাপু। তবে জানি তোমায় কষ্ট দিলে সে নিজেই মনে কষ্ট পাবে।
খখল হাসে : 'তোমার আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই।'
রান্নাঘর থেকে মায়ের ডাক শুনে খখল উঠে যায়।
নিজেকে একা পায় ভেস্‌ভশ্চিকফ্‌। চারদিকে চায়। মোটা-চামড়ার তৈরী ভারী বুট-আঁটা পা দু'টোকে ছড়িয়ে দেয়। পায়ের থোরাটা টিপে টিপে দেখে; একটা হাত ওপরে তুলে মাংসল বাহুটার দিকে তাকিয়ে থাকে; হলদে রঙের লোমে ঢাকা মোটা মোটা খস্‌খসে আঙুলগুলোর পেছন দিকটা নিরীক্ষণ করে। তারপর বিরক্ত হয়ে উঠে পড়ে।
আন্দ্রিয়েই সামোভার নিয়ে ঘরে ঢুকে দেখে নিকলাই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আন্দ্রিয়েইকে দেখে শুকনো হাসি হেসে বলে উঠল :
'দেখেছ চেহারাখানা? দেখলেই যে মারে বাবারে করে পালাবে সব।'
আন্দ্রিয়েই গভীর কৌতূহলে তাকায়। বলে :
'চেহারাটার দিকে হঠাৎ নজর গেল কেন হে?'
'সাশা বলে মুখই নাকি মানুষের আয়না।'
'স্রেফ বাজে কথা।' চেঁচিয়ে ওঠে খখল। 'ওর চেহারাখানা কি? নাকটা বঁড়শীর মত, চোয়ালের হাড্ডিগুলো যেন ছুরির ফলা। কিন্তু ওর মনটা দেখত? ঠিক যেন তারার মত!'
নিকলাই ওর দিকে তাকিয়ে হেসে ওঠে।
তারপর চা খেতে বসে সবাই।
নিকলাই মস্ত বড় একটা আলু আর নুন-মাখানো রুটি নিয়ে চিবুতে লাগল ষাঁড়ের মত। খেতে খেতেই জিজ্ঞাসা করে :
'তারপর এখানকার হালচাল কেমন?' মুখ ভর্তি খাবার নিয়েই জিজ্ঞেস করে।
কারখানার ভেতরকার কাজের একটা ভারী রঙ্গীন ছবি আঁকে আন্দ্রিয়েই। নিকলাই আবার কেমন বিষণ্ণ হয়ে ওঠে।
'উঃ বড্ড সময় লাগছে। এত দেরী? আরও তাড়াতাড়ি কাজ করা দরকার।'
মা তাকায় ওর দিকে। একটা বিদ্বেষ গুমরে ওঠে মনের মধ্যে।
'জীবন তো ঘোড়া নয় হে যে চাবুক কষে ছুটানো যাবে।'
নিকলাই মাথা নাড়ে জেদী ছেলের মত।
'বড় দেরী। ধৈর্য ধ'রে আর বসে থাকতে পারিনা আমি। 'কি করব বলতো?'
জবাবের আশায় খখলের মুখের দিকে চায়। একটা পরম অসহায়তা ফুটে ওঠে ওর চোখে মুখে।
মাথা নীচু ক'রে বলে আন্দ্রিয়েই।
'আমাদের নিজেদেরও শিখতে হবে, অন্যদেরও শেখাতে হবে। এই হচ্ছে আমাদের কাজ।'
ভেসভ্‌শিচকফ্‌ জিজ্ঞাসা করে : 'ওরে বাবা? তবে লড়াই শুরু হবে কবে?'
হেসে জবাব দেয় খখল : 'তা জানিনে; তবে এটুকু জানি যে জিতবার আগে বহুবার হারতে হবে আমাদের এবং যতদূর বুঝি, হাতে হাতিয়ার তোলবার আগে মগজগুলোকে শানাতে হবে।'

নিকলাই খাবার দিকে মনোযোগী হয়ে পড়ে। মা গোপন-দৃষ্টিতে ওর চওড়া মুখটা নিরীক্ষণ করে, খোঁজে, ওই মাংস-পিণ্ডের মত ভারী দেহটার মধ্যে ভালো লাগবার মত কিছু মেলে কিনা।

নিকলাইয়ের তীক্ষ্ম দৃষ্টির সাথে চোখাচোখি হয়ে যায়। মায়ের ভ্রূদু'টো কাঁপতে থাকে। আন্দ্রিয়েই চঞ্চল হয়ে ওঠে। হঠাৎ হাসি কথায় মেতে ওঠে ও। তারপর হঠাৎ শিস দিতে আরম্ভ করে কথার মাঝখানেই।

মা বোঝে ওর মনে কিসের অস্বস্তি। নিকলাই গুম হয়ে বসে আছে। খখল যত কথা জিজ্ঞাসা করে, নেহাত অনিচ্ছায় কাটা কাটা জবাব দেয়।

ছোট্ট ঘরখানায় আবহাওয়া গুমট হয়ে ওঠে। দম বন্ধ হয়ে আসতে চায় মা আর আন্দ্রিয়েইর। দুজনেই এক-এক বার চোরা দৃষ্টিতে তাকায় নিকলাইয়ের দিকে।

অবশেষে উঠে পড়ে নিকলাই। বলে :

'বড় ক্লান্ত লাগছে, শোব। জেলেও সেই বসে আর বসে। বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ এসে বললে, যাও তোমার ছুটি। ব্যস্ চলে এলাম।'

রান্নাঘরে শুতে যায় ও। কিছুক্ষণ নড়াচড়া করে, তারপর সমস্ত শব্দ থেমে যায়। সব নিস্তব্ধ হয়ে গেলে চুপি চুপি আন্দ্রিয়েইকে বলে মা :

'বাবারে। কি সব সাংঘাতিক জিনিস ওর মাথার মধ্যে!'

'হ্যাঁ মা, গোলমাল আছে একটু, কিন্তু ও থাকবে না বেশী দিন।' আমিও এক কালে অমনি ছিলাম। প্রাণের মধ্যে আগুনটা ভালো করে জ্বলবার আগে খানিকটা ধোঁয়া-কালি তো হবেই! তুমি শুয়ে পড়, নেন্‌কো। আমি আর একটু পড়ে, তারপর শোব।'

ঘরের এক কোণে সূতীর পরদা ঝোলান। তার আড়ালে বিছানা রয়েছে একটা। সেখানেই আজ মায়ের শোয়ার ব্যবস্থা। অনেকক্ষণ ধরে প্রার্থনা করে মা। হৃদয়ের গভীর হ'তে দীর্ঘশ্বাস ওঠে। তার উষ্ণ রেশটা কানে আসে আন্দ্রিয়েইর। তাড়াতাড়ি করে বইয়ের পাতা উল্টে চলে, কপালটা রগড়ায়, লম্বা লম্বা আঙুল দিয়ে গোঁফের ডগা পাকায়, আর কেবল পা নাড়ে এদিক থেকে সেদিক। ঘড়িটা টিক্‌টিকিয়ে যায়; বাইরে কেঁদে ফেরে উদাস হাওয়া।

মায়ের চাপা স্বর শোনা যায় : 'হায়রে অদৃষ্ট! এত লোক সংসারে! সবাইর বুকে ব্যথা? সবার বুকেই এমনি কান্না? সুখী মানুষ কি নেই সংসারে?'

খখল জবাব দেয় : 'আছে বৈকি, নেন্‌কো! আছে। আরো হবে। অনেক অনেক...'

রকম রকম নিত্য নতুন ঘটনার মধ্য দিয়ে জীবনটা যেন টগবগিয়ে ছুটে চলল। এখন আর ভয় করেনা মায়ের। বাড়ীতে নিত্য নতুন আরো কত মানুষ আসে সন্ধ্যে-বেলা। চাপা গলায় কথা বলে আন্দ্রিয়েইর সাথে। কেমন, ব্যস্তসমস্ত উদ্বিগ্ন ভাব ওদের। তারপর রাত্তির বেলা কোটের কলার তুলে দিয়ে, চোখ পর্যন্ত টুপি নামিয়ে, নিঃশব্দে সন্তর্পণে ওরা আঁধারে মিলিয়ে যায়। ওদের মধ্যের চাপা উত্তেজনার ভাবটা মা বেশ অনুভব করে। সবাই যেন হাসতে গাইতে চায়, কিন্তু সময় কোথায় ওদের। সব সময় তাড়া। কোথায় যেন যাবার ব্যস্ততা। ওদের মধ্যে কারো কারো গুরু গম্ভীর চেহারা; চোখা চোখা শানান চিট্‌কারী আছে জিভের ডগায়। কেউ কেউ স্ফূর্তিবাজ, নতুন প্রাণের উদ্যমে যেন ঝলমল করছে। আবার কেউ আছে মহা শান্ত, চিন্তাশীল। কিন্তু মায়ের চোখে ওরা এক—একই লক্ষ্যপথের প্রত্যয়বান পথিক সব। প্রত্যেকটি মুখ নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে একেবারে আলাদা, তবু যেন তারা মিলে জুলে এক হ'য়ে মিশে যায় আর একজনের শীর্ণ একখানি মুখের সাথে—তার শান্ত রেখায় রেখায় দৃঢ়-সংকল্প, গভীর স্বচ্ছ, গাঢ়-চোখে কোমলে-কঠিনে মিলিয়ে সে এক বিচিত্র দৃষ্টি, যীশু খৃষ্ট যখন ইমায়ুস্‌এর পথে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর চোখ দিয়ে যে দৃষ্টি ঝরেছিল, ঠিক সে রকম।

মা গোনে তাদের সংখ্যা; মনে মনে ছবি আঁকে, ঘিরে আছে এরা পাভেলকে। মায়ের ধন শত্রুর দৃষ্টি থেকে আড়াল হ'য়ে আছে সেই মানুষের অরণ্যে।

একদিন একটি মেয়ে এল শহর থেকে আন্দ্রিয়েইর জন্য একটা পুলিন্দা নিয়ে। চালাক চতুর মেয়ে, মাথায় একরাশ কোঁকড়া চুল। যাবার সময় মায়ের দিকে তাকিয়ে তার খুশি খুশি চোখ দু'টোকে ঝিলমিলিয়ে ব'লে গেল :

'আসি, কমরেড্‌!'

হাসি চেপে মা বললে : 'এসো।'

মেয়েটি চলে গেলে, হাসিমুখে জানালা খুলে দেখতে লাগল নূতন এই কম্‌রেডটির যাওয়া। ছোট ছোট পা ফেলে তড়বড়িয়ে চলেছে রাস্তা দিয়ে। ও যেন বসন্তের ফুল, তেমনি সরস, তেমনি তাজা; প্রজাপতির মতই হালকা ওর দেহ।

মনে মনে বলে মা : 'ওরে মেয়ে, আমি তোর কমরেড্‌। ভগবান করুন যোগ্য সাথী যেন তোর মেলে। তার হাত ধরে সারা জীবন যেন চলতে পারিস।'

কিন্তু কেমন যেন একটা ছেলেমানুষী সারল্য আছে এই ছেলেমেয়েগুলোর মধ্যে। মনে মনে স্নেহের হাসি হাসে মা। কি গভীর বিশ্বাস ওদের। দিনে দিনে তার গভীরতা মা দেখছে চোখের সামনে। সংশয়ের রাস্তা থাকে না আর। দেখে অবাক লাগে। এই অবাক লাগার মধ্যে কি যে সুখ! ওরা স্বপ্ন দেখে ন্যায়ের জয় হবে। ওদের এই স্বপ্ন এক অদ্ভুত উষ্ণতায় আদরে ভ'রে রাখে মায়ের বুকটা। ওদের কথা শুনতে কি জানি এক অজানা বিষাদে মনটা ছেয়ে যায়, দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। নেহাত সরল, একেবারে শিশুর মত। নিজের ভালো-মন্দর দিকে এক রাত্তি যদি নজর থাকে। ওদের এই ছন্নছাড়া, বাউণ্ডুলে স্বভাবের মধ্যেই কি কম মধু। মায়ের হৃদয়কে ছুঁয়ে যায় তার তারে তারে।

জীবন সম্বন্ধে ওদের কথাবার্তা এখন অনেক বুঝতে পারে মা। অনুভব করে মানুষের দুঃখের আসল গোড়াটাকে ওরা খুঁজে পেয়েছে। ওদের অধিকাংশ দাবী-

গ্‌লোই মা স্বীকার করে। তবে ওরা যে বলে খোল-নলচে বদলে জীবনকে ওরা একেবারে নতুন করে গড়বে—আর অমনি জোরাল গলায় ডাক দেবে যে সমস্ত মেহনতী মান্‌ষ ওদের চারধারে এসে জ্‌টবে সেই ডাক শ্‌নে—কেন জানি এসব কথা একট্‌ও বিশ্বাস হ'তে চায় না। মনের গভীরে একটা সংশয় থেকে যায়। কি ক'রে হবে? সবাই তো যার যার পেটের চিন্তায় ব্যস্ত। একটা দিনের জন্য খাওয়া বাদ দিতে রাজী হবে কেউ? কেউ না। তারপর এত কষ্ট সইতেই বা আসবে ক'জন? আর সে তো এক দিন, দ্‌'দিনের কথা নয়। বলতে গেলে জীবন ভোর। বলে বটে ছেলেগ্‌লো, দ্‌ঃখের পথটা ভয়ংকর লম্বা, কিন্তু ওটা পের্‌তে একবার পারলেই সেই সোনার রাজ্য, যেখানে মান্‌ষে মান্‌ষে ভাই ভাই হয়ে গলাগলি করে বাস করছে সব। সব এক মন এক প্রাণ। ওদের সেই সোনার রাজ্যের স্বপ্ন দেখার চোখই বা ক'জনের আছে? এই সব নানা কারণে মায়ের বড় দ্‌ঃখ হয়—লক্ষ্মী ছেলেমেয়েগ্‌লো—কিন্তু একেবারে নাবালক। শিশ্‌, থাকলে কি হবে ম্‌খভরা এক দঙ্গল দাড়ি আর গোঁফ।

মাথা নেড়ে মনে মনে বলে: 'আহা, বাছারে আমার। খেটে খেটে কালি মেরে গেছে ম্‌খগ্‌লো বাছাদের।'

এখনও বেশ আছে সবাই। চমৎকার স্‌ন্দর জীবন: বাড়াবাড়ি মাতামাতি নাই। বাজে খেয়াল নাই। দিনগ্‌লো কাজে ভরা, যা নিজেরা জেনেছে তাই মান্‌ষকে শেখাতে প্রাণপাত করে। মা এতদিনে বোঝে, এত বিপদ, ঝড়-ঝাপটা থাকা সত্ত্বেও কি ক'রে ওদের এ জীবন ভালো লাগে। নিজের ফেলে-আসা জীবনটার এ'দো অন্ধকার গলি-ঘ্‌পচির দিকে পেছন ফিরে তাকায়। মোচড় দেয় ব্‌কটার মধ্যে। কিন্তু ধীরে ধীরে সমস্ত জ্বালা ব্যথা শান্ত হয়ে আসে। একট্‌ একট্‌ করে ওর চেতনার মধ্যে আলোর ঝলক এসে পড়ে। সেই আলোয় দেখতে পায় মা নিজের ম্‌ল্য। তুচ্ছ নয় সে। এই ন্‌তন জীবনের কাঠামোর মধ্যে তাকেও দরকার আছে। কোন কাজে যে লাগতে পারে একথা আগে ভাবতেও পারেনি মা। এখন পরিষ্কার চোখে দেখতে পাচ্ছে, ঘরে ঘরে তার ডাক। এ এক নতুন ব্যাপার। ভারী ভালো লাগে। হে'ট মাথাটা উ'চু হয়ে ওঠে।

নিয়মিতভাবে কাগজপত্র কারখানায় নিয়ে যায় মা; মনে করে এ ওর কর্তব্য। গোয়েন্দারা ওকে রোজ দেখে; কিন্তু বিশেষ নজর দেয়না। অনেকবার তল্লাসীর পাল্লায় পড়েছে, কিন্তু ঘটনাচক্রে কাগজ নিয়ে যাবার পালার দিনটা একবারও পড়েনি। প্রত্যেকবারই পরের দিনটা পড়েছে। অতএব নিষিদ্ধ কিছ্‌ই থাকেনা কাছে। আর যেদিন কিছ্‌ থাকে না ঠিক সেই দিনই চলাফেরায় এমন ভাব করে যে সন্দেহ হয় রক্ষীদের। তারা ওকে ধরে, তল্লাসী করে; ও রাগ করে, তর্ক করে। দেখায় যেন ভয়ানক অপমান হয়েছে। শেষ পর্যন্ত নির্দোষিতা প্রমাণ হলে নিজের ব্‌দ্ধিকে তারিফ করতে করতে ব্‌ক ফ্‌লিয়ে চলে যায়। ভারী মজা লাগে মায়ের।

ভেসভ্‌শিচকফ্‌ কারখানার কাজ আর পেলনা। একটা কাঠ-চেরাই কলে কাজ জ্‌টে গেল। কাঠ নিয়ে যাবার সময় প্রায়ই দেখা হয় রাস্তায়। হয় ভারী একটা ভিজে কাঠের গ্‌ঁড়ি, নয় পাঁজা করে বাঁধা কতগ্‌লি তক্তা ঝ্যাঁকর্‌ ঝ্যাঁকর্‌ করতে করতে টেনে নিয়ে চলেছে দ্‌টো হাড্ডিসার কালো ঘোড়া। অতিরিক্ত মেহনতে ওদের ল্যাং-ল্যাঙে ঠ্যাংগ্‌লো চক্‌চকিয়ে কাঁপে, মাথাটা অনবরত নড়ে। আর নিষ্প্রভ, জ্‌ল্‌ম-সওয়া চোখগ্‌লি মিট্‌মিটিয়ে চায়। নিকলাই পাশে পাশে হাঁটে—ময়লা, ছে'ড়া পোষাক, পাঁচমণী এক জোড়া ব্‌ট, ট্‌পীটা মাথার পেছন দিকে ঠেলে দেওয়া। আল্‌-

থালু ঝোড়ো কাকের মত চেহারা, ঠিক যেন সদ্য-ওপড়ান একটা গাছের গুঁড়ি। মাটির দিকে তাকিয়েই মাথা নেড়ে প্রতি-সম্ভাষণ জানায়। ঘোড়াগুলি অন্ধের মত যখন তখন গিয়ে পথ চলতি মানুষ, গাড়ী-ঘোড়ার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। গালি-গালাজ, শাপ-মন্যি বোলতার ঝাঁকের মত এসে পড়ে নিকলাইর ওপর। ও না দেয় জবাব, না তোলে চোখ। তীক্ষ্ন একটা শিস্ দিয়ে হাঁকে ঘোড়াদের : 'হট্ হট্...চল্ চল্...।'

বিদেশী খবরের কাগজ বা নতুন বইপত্তর এলে, পড়বার জন্য আন্দ্রিয়েইর কাছে কম্‌রেড্‌দের ডাক পড়ে। নিকলাইও আসে। দুই-এক ঘণ্টা চুপচাপ এক কোণে ব'সে মন দিয়ে শোনে। পড়া শেষ হলে তুমুল তর্কবিতর্ক চলে কিন্তু ভেসভশিচকফ তাতে যোগ দেয় না। সবাই চ'লে গেলে বিরস মুখে আন্দ্রিয়েইকে জিজ্ঞাসা করে :

'কার দোষ বলতে পার?'

'এটা-আমার ওটা-আমার যে প্রথম মুখ থেকে বার করেছিল তার! কিন্তু সে তো হাজার হাজার বছর মরে ভূত হয়েছে। তার পেছনে ধাওয়া ক'রে তো লাভ হবে না বিশেষ!' ঠাট্টার সুরে বলে আন্দ্রিয়েই। কিন্তু অস্বস্তি থেকে যায়।

'তারপর বড় লোক আর তাদের পেটোয়ারা?'

মাথার চুল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে এবং গোঁফ মোচড়াতে মোচড়াতে খখল অত্যন্ত সহজ ভাষায় মানুষের কথা, তাদের জীবনের কথা বলে। দোষটা দেখা যায় সকলেরই। খুশি হয় না নিকলাই। মোটা ঠোঁট দুটো চেপে নিজের মনেই বলতে থাকে, এ হ'তেই পারে না কক্‌খনও। তারপর চলে যায় অত্যন্ত বিরক্ত বিরস মন নিয়ে।

একদিন বলে বসে : 'উঁহুঁ, দোষ কারো আছে। আর এখানেই আছে তারা। একেবারে আগা-পাছ-তলা চষে আগাছার মত সব উপড়ে ফেলতে হবে। মায়া দয়া ক'রলে চলবে না।'

মা বলে : 'তোমার কথাও তো ইসাই অমনি বলছিল সেদিন!'

একটু চুপ করে থেকে ভেসভশিচকফ্ জিজ্ঞাসা করে : 'ইসাই?'

'হ্যাঁ। শয়তানের হাঁড়ি। সবার ওপরে চোখ রাখে আর হাজার রকম প্রশ্ন করে সবাইকে। আজকাল আমাদের এ রাস্তায় ঘোরাঘুরি করছে। জানালা দিয়ে উঁকি মারে যখন তখন।'

'কি? জানালা দিয়ে উঁকি মারে?' ভেসভশিচকফ্ আবার বলে।

খখল ওর কথা লুফে নিয়ে জবাব দেয় :

'তা দিক না, বয়ে গেল। খেয়ে দেয়ে কাজ না থাকে তো দিক্ যত খুশি।'

মা বিছানায়, নিকলাই-এর মুখটা দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু আন্দ্রিয়েইর কথায় বুঝল যে ইসাইএর কথাটা তোলা ঠিক হয়নি।

নিকলাই চেঁচিয়ে ওঠে : 'থামো। ওই একজন...'

'ওর অপরাধটা কি হে?' খখল তাড়াতাড়ি বলে, 'ও বোকা সেইটেই ওর অপরাধ?'

জবাব দিলে না ভেসভশিচকফ্। চলে গেল।

খালি পায়ে আস্তে আস্তে ক্লান্ত দেহটাকে টেনে টেনে পায়চারী করে আন্দ্রিয়েই। লম্বা লম্বা পায়ে নিঃশব্দে পা ফেলছে। খালি পা, জুতো খোলা, পায়চারি করবার সময় পায়ের শব্দে যাতে পেলাগেয়ার ঘুমের ব্যাঘাত না হয় সেজন্যে সে সব সময়েই জুতো খুলে রাখে। মা ঘুমোয়নি, নিকলাই চলে গেছে বুঝতে পেরেই উদ্বিগ্ন

স্বরে বলে :

'ওকে আমার বড় ভয় করে।'

ঝিমান গলায় বলে খখল : 'হুঁ। একেবারে মরীয়া হয়ে উঠেছে। ইসাই-এর নাম আর ওর সামনে নিও না কখনও নেন্‌কো। লোকটা সত্যি স্পাই।'

'তাতে আর আশ্চর্য কি? ওর কে এক আত্মীয় পুলিশে কাজ করে।'

খখল চিন্তিত ভাবে বলে : 'কিছু আশ্চর্য নেই নিকলাই-এর। ধ'রে ঠেঙ্গিয়ে দিতে পারে ও। দেখছ তো সাধারণ মানুষের মন কি রকম বিষিয়ে উঠেছে আমাদের ক্ষমতা-ধারী প্রভুদের দৌলতে! এই আমাদের নিকলাই-এর মত মানুষ যেদিন বুঝতে পারবে কি অন্যায় আর অবিচারটা ওরা পাচ্ছে, শুষতে শুষতে একেবারে ছিবড়ে ক'রে ছেড়ে দিয়েছে সবাইকে, কি অবস্থা হবে দেখি ভাবতো? আকাশটা ওরা রক্ত দিয়ে নাইয়ে দেবে। আর সেই রক্তে পৃথিবীটা সাবানের মত গ'লে গ'লে ফেনা হ'য়ে উঠবে।'

চাপা গলায় চীৎকার ক'রে ওঠে মা : 'ওঃ বলিস্‌নে বলিস্‌নে, কি ভয়ানক, ভাবতেও পারিনেরে, আন্দ্রিউশা!'

'তা মা, মাছি পেটে গেলে তো বমি হবেই। একটু সাবধান থাকলেই হ'লো!'

মিনিট খানেক পরে বলে আন্দ্রিয়েই, 'কিন্তু রক্তের চিহ্ন অবধি থাকবে না গো! যে কান্না ওরা সাধারণ মানুষকে কাঁদিয়েছে! চোখের জলে সমুদ্র হয়ে গেছে। বুর্জোয়াদের রক্তের প্রতিটি বিন্দু পরিষ্কার হ'য়ে ধুয়ে যাবে ওই সমুদ্রের নোনা জলে।

তক্ষুনি মৃদু হেসে বলে : 'কিন্তু তাতেইবা সান্ত্বনা কোথায়?'

বাইশ

রবিবার দিন দোকান থেকে ফিরে এসে, দরজা খুলেই থমকে গেল মা। আনন্দে এমনি ক'রে সর্বাঙ্গ অভিষিক্ত হ'য়ে উঠল যেন গ্রীষ্ম-কালের উষ্ণ বৃষ্টি-ধারায় নেয়ে এল এইমাত্র। ভেতরের ঘরে পাভেল-এর গলা।

'এই যে, এই যে মা এসেছে!' চেঁচিয়ে ওঠে খখল।

ঘাড় ফেরায় পাভেল। মুখখানা ওর আলো হ'য়ে উঠল। মা দেখে ওই আলোর আখরে লেখা কি যেন শপথ নিয়ে এসেছে ছেলে মায়ের জন্য।

অপ্রত্যাশিত ব্যাপার—ছেলের এই ঘরে ফেরা। অভিভূত হ'য়ে ব'সে পড়ে মা।

পাণ্ডুর মুখখানা নেমে আসে মায়ের দিকে। ঠোঁট কাঁপে থির্ থির করে। চোখের কোণে জল দেখা যায় পাভেলের। কথা কইতে পারে না। বোবা দৃষ্টিতে শুধু ছেলেকে দেখে মা।

খখল ওদের একা রেখে বাইরে চলে গেল শিস দিতে দিতে।

পাভেল মায়ের হাতটা চেপে ধ'রে অস্ফুট স্বরে বলে শুধু : 'নাগো, মা আমার মা! ধন্যবাদ, ধন্যবাদ মা!'

ছেলের অমন আদরে-গলা মুখের ভাব, অমন আদরে-গলা কথা শুনে মায়ের

বুক আনন্দে বিহ্বল হ'য়ে ওঠে। ছেলের মাথায় হাত বোলায় মা আর থামাতে চেষ্টা করে নিজের ভেতরের কলরব। বলে :

'হ্যাঁরে, খোকা, অত ধন্যবাদ কেনরে?'

'আমাদের কাজে তোমারও হাত লেগেছে যে। ধন্যবাদ মা!' আবার বলে। 'মা ছেলেতে মিলে কাজ করি, এ কথা বলতে পারা কি কম সুখের কথা?'

নিঃশব্দে লোভীর মত প্রতিটি কথা যেন পান করে মা। চোখে মুখে উছলে পড়ে অমন ছেলের মা হওয়ার গর্ব।

পাভেল বলে : 'আমি বুঝতাম তোমার কত কষ্ট হচ্ছে। কত জিনিষ আমাদের তোমার ভালো লাগেনি। আমি তো ভেবেছিলাম কোনও দিনই আমাদের সাথে তোমার মতের মিল হবে না, আমাদের চিন্তা তোমার চিন্তা হ'য়ে উঠবে না। যেমন সারা জীবন নীরবে সব কিছু সহ্য ক'রে এসেছ, তেমনি ক'রে হয়ত শুধু সহ্যই করে যাবে আমাদের। আমার বড্ড খারাপ লাগত।'

'অনেক জিনিষ আন্দ্রিউশা বুঝিয়ে দিয়েছে।' মা বলে।

পাভেল হাসে : 'সব কথা বলেছে ও আমায়।'

'ইয়েগরও। জানিস্ আমরা দু'জনে এক জায়গারই মানুষ! আন্দ্রিউশা আমায় আবার পড়াতেও চেয়েছিল।'

'আর তুমি লজ্জায় পড়তে আসনি, লুকিয়ে লুকিয়ে নিজে পড়েছ, কেমন?'

বিপুল আনন্দে মা যেন স্থির থাকতে পারে না। বলে : 'তাই বলেছে বুঝি! কোথায় ও! ডাকত দেখি! ইচ্ছে ক'রেই বেরিয়ে গেছে। বাছার আমার নিজের মা নেই।...'

পাভেল বাইরের দরজা খুলে ডাক দেয় : 'আন্দ্রিয়েই! কোথায় হে!'

এই যে আমি। কাঠ কাঠছি।'

'শিগ্গির এসো এখানে।'

তক্ষুনি এল না আন্দ্রিয়েই। একটু দেরী ক'রেই এল। এবং এসে সোজা সাংসারিক কথা পেড়ে বসল :

'কাঠ প্রায় ফুরিয়েছে। নিকলাইকে বলতে হবে, কিছু কাঠ দিয়ে যায় যেন। পাভেল-এর দিকে তাকিয়ে দেখেছ, নেনকো! মনে হচ্ছে ওরা বিদ্রোহীগুলোকে জেলে নিয়ে জামাই আদরে রাখে। খুব ঠুসে দুধ ঘি খাওয়ায়।'

মা হেসে ওঠে। তখনও আনন্দের বিহ্বলতা যায়নি, থামেনি বুকের মধুর নৃত্য। কিন্তু এরই মধ্যে সতর্ক মায়ের প্রাণ অনুভব করেছে এতো ছেলের নিজ চেহারা নয়। তার সেই সর্বদা শান্ত, গম্ভীর স্বরূপেই দেখবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে উঠল মা। সবই আজ বড় মধুর। জীবনের এই বৃহৎ সুখের দিনটিকে বুকের তলায়, গোপন মণি-কোঠায় অমর ক'রে রাখবে মা, ঠিক এমনি ক'রে এমনি প্রবল, এমনি প্রাণবন্ত করে। এতটুকু তার নষ্ট হ'তে দেবে না। হয়ত একটু পরেই এ মুহূর্তখানি মিলিয়ে যাবে বুদ্বুদের মত করে; পাখী-ধরা নতুন পাখী পেলে যেমন তাড়াতাড়ি তাকে খাঁচায় পোরে, তেমনি মাও ভয়ে ভয়ে হৃদয়ের খাঁচার দ্বার বন্ধ ক'রে দিল ক্ষিপ্র হাতে।

হঠাৎ মা ভারী ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে : 'খাবি চল তোরা। খাসনি তো কিছু নিশ্চয়ই এখনও।'

'না। কাল জেলার বলে দিল আজ ছাড়া পাব। কাল থেকে খেতে পারিনি

আর কিছু।' বলে পাভেল। 'জানো, বাইরে বেরিয়ে প্রথমেই দেখা সিজফের সাথে। রাস্তার ওধার দিয়ে যাচ্ছিল। আমায় দেখে এদিকে চলে এল। আমি ওকে বললাম, আমি তো এখন ভারী বিপজ্জনক ব্যক্তি—পুলিশের নেক-নজরে আছি, আমার সাথে সাবধান হয়ে কথাবার্তা কওয়া ভাল। গা করলে না। ভাইপোর কথা জিজ্ঞাসা করল। কিন্তু কি জিজ্ঞাসা করল শুনলে অবাক হ'য়ে যাবে। প্রথমে জিজ্ঞাসা করল—ফিওদর ঠিকমত চলছে তো! আমি বললাম, জেল—জেলে আবার ঠিক ভাবে চলাচলি কি? পারে নাকি কেউ? বলে—না, বলছিলাম কি, কম্‌রেডদের নামে কর্তাদের কাছে লাগানি-ভাঙ্গানি করেনি তো! আমি বললাম, না, সে ভালো ছেলে। বুদ্ধি-সুদ্ধি আছে। শুনে দাড়িতে হাত বুলোতে-বুলোতে খুব গর্বিত-ভাবে জিজ্ঞাসা করল, আমাদের সিজফদের মধ্যে ওসব ঘর-ভাঙ্গানো মানুষ পাবে না!'

'বেশ মাথা-ওয়ালা লোক,' খখল বলে, 'অনেক কথা হ'য়েছে আমার ওর সাথে। লোক ভালো। ফিওদরদের ছাড়বে নাকি শিগ্গির?'

'বোধ হয় সব্বাইকেই ছাড়বে। কারো বিরুদ্ধে তো পায়নি কিছু। এক ওই ইসাই বুড়ো যা বলে। ওর আর এমন কি বলবার মুরোদ আছে!'

মা কাজ ক'রছে, চোখ রয়েছে ছেলের দিকে। আন্দ্রিয়েই পেছনে হাত দিয়ে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে পাভেল-এর কথা শুনছে। আর পাভেল পায়চারী করছে ঘরময়। বড় বড় দাড়ি রেখেছে পাভেল, চাপ চাপ কালো দাড়ি ঘন হয়ে কুঁকড়ে আছে গালের ওপরে। পাভেলের ময়লা রঙে খানিকটা কমনীয়তা এসেছে যেন। খাবার নিয়ে এসে মা বলে : 'বোস তোরা।'

খাবার সময় আন্দ্রিয়েই রীবিন-এর কথা বলে। দুঃখিত হয়ে বলে পাভেল :

'আমি থাকলে যেতে দিতুম না ওকে। কি সম্বল নিয়ে গেল লোকটা সাথে? শুধু হিজিবিজি পোরা মাথাটা আর খানিকটা রাগ এই তো!'

'চল্লিশ বছর যে লোকটা নিজেরই মনের মধ্যেকার বাঘ-ভাল্লুকের সাথে হাতাহাতি ক'রে কাটাল, তাকে পোষ মানান চাট্টিখানি কথা নয় হে।' খখল বলে।

তুমুল তর্ক বাধে দু'জনে। সব কথা মা ভালো করে বুঝতে পারে না। খাবার পরেও তর্ক চলে। দাঁতভাঙা সব কথার যেন তুফান। মাঝে মাঝে স্বর নামে একটু।

পাভেল জোরের সাথে বলে : 'এক পাও পিছোলে চলবে না আর। এখন জোর কদমে এগিয়ে যেতে হ'বে।'

'অর্থাৎ দুদ্দাড় করে গিয়ে পড়বে লাখো মানুষের মধ্যে। তারা আঁতকে উঠে ভাববে দুষমন এল বুঝি...'

ওদের কথা-বার্তা শুনে মা বুঝতে পারছে পাভেলের চাষীদের দিকে তত ঝোঁক নেই। কিন্তু খখল বলছে মুজিকদেরও বুঝিয়ে পথে আনার চেষ্টা করা একান্ত দরকার। আন্দ্রিয়েইর কথা মা বেশী ভালো বুঝতে পারে। তাই মনে হয় পাভেলের চাইতে এ ছেলেই পথটাকে বুঝেছে ভালো। কিন্তু ও পাভেলকে কিছু বললেই মা উৎকর্ণ হ'য়ে, সচকিত হ'য়ে ওঠে; ছেলে কি জবাব দেয় শোনার জন্য নিশ্বাস বন্ধ ক'রে প্রতীক্ষা করে। নিশ্চিন্ত হ'তে চায় খখলের কথায় ও রাগ করেনি তো। কিন্তু দুজনে সমানে চিৎকার করে চলে, কেউ কারও কথায় রাগ করে না।

কখনও বা ছেলেকে জিজ্ঞাসা করে : 'হ্যাঁরে, সত্যি?'

মৃদু হেসে জবাব দেয় পাভেল, 'সত্যি, মা!'

ক্ষ্যাপায় খখল, 'ভোজটা তো জুটেছিল ষোড়শোপচারে। কিন্তু ভালো ক'রে চিবিয়ে খেলে না ব'লেই তো গলায় আটকে গেল। জলটল খাও এক ঢোঁক'!

'ইয়ারকী ছাড়ো।' পাভেল বলে, 'ভোজই বটে, শ্রাদ্ধের ভোজ।'

মা হাসে আর মাথা নাড়ে।

তেইশ

বসন্ত এল। বরফ গ'লে নীচেকার কাদা, ময়লা জেগে উঠল। প্রতিদিন আরো বেশী ক'রে ওঠে। ভাঙা-চোরা জীর্ণ, নোংরা বস্তীটা হতশ্রী, কুৎসিত দেখায়। দিনের বেলা ছাদ থেকে টিপ টিপ ক'রে জল চোঁয়ায়, আর ধোঁয়াটে দেয়ালগুলো স্যাঁৎসেতে হ'য়ে ওঠে যেন ঘেমেছে! রাত্তির বেলা তাতে সাদা সাদা বরফের কণা ঝুলে থাকে। মাঝে মাঝে এখন সূর্যের মুখ দেখা যায়। জলাটায় শোনা যায় জলের কলকলানি।

সে-দিবসে পালনের প্রস্তুতি চলে।

দিনটার অর্থ আর গুরুত্ব বুঝিয়ে চারদিকে পুস্তিকা ছড়ায়। যে-সব ছেলেরা এতদিন এ-সব থেকে দূরে ছিল, এবার তারাও বলে :

'একটা কিছু করতে হবে হে!'

ভেসভশিচকফ্ তার আঁধার হাসি হেসে বলে :

'লুকোচুরি খেলা খুব হ'য়েছে। এবার কাজের কাজ।'

ফিওদোরের ভারী উৎসাহ। বড় রোগা হ'য়ে গেছে ও, চলা ফেরা কথায় সব সময় এমন একটা ভীরু ভীরু ভাব, যেন বন্দী লার্ক। ওর সাথে সাথে থাকে ইয়াকফ্ সমফ্। মুখে কথা নেই, বয়সের তুলনায় বড় বেশী গম্ভীর। শহরে একটা কাজ পেয়েছে ইয়াকফ্, সাময়লফ্ [জেলে থেকে ওর চুলগুলো আরো লাল হয়ে গেছে], ভাসিলি গুসেফ্, বুকিন, দ্রাগুনফ এবং আরো কয়েকজন জেদ ধ'রল মিছিলে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে যাবে। কিন্তু, পাভেল, খখল, সমফ্ এবং অন্য কয়েকজন আপত্তি করে।

ইয়েগর এসে ঠাট্টা ক'রে মতদ্বৈধের হাওয়াটা হালকা ক'রে দেয়। সেই হাঁপানী। ক্লান্তিতে ঘামছে। বলে :

'বন্ধুগণ, বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা বদলাবার জন্য আমরা প্রাণপাত ক'রে পরিশ্রম করছি। এই মহৎ কর্মকে জয়যুক্ত করার জন্য আমার এক জোড়া নূতন জুতো কেনা অত্যন্ত প্রয়োজন।' ব'লে নিজের ভিজে আর ছেঁড়া জুতো জোড়ার দিকে ইঙ্গিত করে। 'আমার রবারের পা-ঢাকা জোড়ার বর্তমান অবস্থা মেরামতেরও অযোগ্য। এবং প্রতিদিন আমার পা ভিজে যায়। আমরা প্রকাশ্যে ও আপোষ-হীন-ভাবে বর্তমান-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আওয়াজ তুলতে চাই। যতদিন এই কাজটি না পারি মাতা বসুন্ধরার উদরে আশ্রয় গ্রহণ করবার আমার বিন্দুমাত্র বাসনা নাই। অতএব কমরেড সাময়লফ্-এর সশস্ত্র জলুষ-এর প্রস্তাবের পরিবর্তে আমার

প্রস্তাব এই যে বর্তমানে আমাকে এক জোড়া নূতন বুটরূপ অস্ত্র দ্বারা সজ্জিত করা হোক। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই পন্থায় বিনা মাশুলে প্রথম-শ্রেণীতে সার্বজনীন ভ্রমণের সুযোগ লাভ অপেক্ষা সমাজতন্ত্রের জয় অধিকতর সহজ হবে।'

উন্নততর জীবন লাভের জন্য কোন্ দেশের মানুষ কি ভাবে সংগ্রাম করছে, সে-সব কাহিনী এই রকম সালংকার ভাষায় ও শ্রমিকদের শোনায়। মার বড় ভালো লাগে ওর কথা শুনতে। শুনতে শুনতে মনে হয়—যেন ওই ধড়িবাজ, বেঁটে-মোটা লালমুখো মানুষগুলোই আসলে সাধারণ মানুষের শত্রু। ওরা লোভী, নিষ্ঠুর; এক ফোঁটা মায়া দয়া নেই ওদের মনে। ওরা শুধু মানুষকে ঠকায়, শোষে আর পেষে। রাজা খারাপ হ'লে এই বেচারাদেরই খ্যাপায় ওরা রাজার বিরুদ্ধে। আর ওদের সাহায্যে অত্যাচারী রাজাকে তাড়িয়ে নিজেরা ক্ষমতা দখল ক'রে বসে। তারপর মতলব হাসিল হ'লে—আর কি! কাজের বেলায় কাজী—কাজ ফুরলেই পাজী! বাধা দিলে কতগুলি নিরপরাধ মানুষের রক্তে মাটি ভাসে...। শুধু মনে হয় না, ছবির মত মনের মধ্যে গেঁথে যায়।

একদিন সাহস ক'রে কথাটা খুলে বলে মা ইয়েগরকে। বলে, ইয়েগরের বক্তৃতা শুনে কি ধরনের ছবি মনে মনে এঁকেছে। বলতে গিয়ে লজ্জা পায়, বিব্রত হয়।

শুনে হাসতে হাসতে লুটোপুটি খায় ইয়েগর। বলে :

'ঠিক বলেছেন মা, একেবারে ঠিক। ইতিহাস-রূপী ষণ্ডটাকে একেবারে তাক্ করে শিং বাগিয়ে পাকড়েছেন দেখছি। একটুও হাত ফস্কায়নি। আপনার ছবিতে এখানে সেখানে খালি একটু চড়া রং হ'য়ে গেছে। কিন্তু মূল ছবিটা ঠিক আছে। ওই বেঁটে মোটা লোকগুলিই মানুষের আসল শত্রু, ওরা ডাঁশ—গরীব গবরা মানুষ-গুলোর রক্ত খেয়ে ওরা বেঁচে থাকে। বুর্জোয়া নাম ঠিকই রেখেছিল ফরাসীরা। ওরা সত্যই বুর—বুর মানে জংলী, অসভ্য, হিংস্র জানোয়ারের মত। মানুষের অজ্ঞানতার সুযোগ নিয়ে ওদের রক্ত শোষণ করে...'

'মানে বড় লোকেরা?'

'যা বলেছেন। ওই তো ওদের দুর্ভাগ্য। শিশুর খাদ্যের মধ্যে তামা মিশিয়ে দিন, দেখবেন তার হাড্ডিগুলো আর বাড়বে না, বামন হয়ে থাকবে। তামার বিষে দেহটা বাড়তে পায় না, আর সোনার বিষে আত্মা কুঁকড়ে ছোট হ'য়ে থাকে। পাঁচ কোপেক ক'রে সেই যে বাচ্চাদের খেলার বলগুলো পাওয়া যায় না, ঠিক সে রকম খেলো আর ফাঁপা।'

ইয়েগরের কথাই হচ্ছিল সে-দিন। পাভেল বলে :

'দেখ আন্দ্রিয়েই, মুখে যারা বেশী হাসে, জানবে তাদেরই মনে বেশী ব্যথা!'

একটু চুপ ক'রে থেকে খখল বলে : 'তাহ'লে তো গোটা রাশিয়ার মানুষের হাসতে হাসতে মরেই যাওয়া উচিত।'

নাতাশা এল সে-দিন। আর এক শহরে জেলে ছিল এতদিন। বিশেষ বদলায়নি। মা লক্ষ্য করেছে, ও এলে খখল ভারী খুশি হ'য়ে ওঠে। রীতিমত মেতে ওঠে। খুঁচিয়ে খেপিয়ে, সবার পেছনে লেগে সবাইকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তোলে। নাতাশাও প্রাণ খুলে হাসে। কিন্তু সে যাবার পর খখল যেন ঝিমিয়ে পড়ে। ক্লান্ত পা দু'খানি টেনে টেনে পায়চারী করে আর আপন মনে শিস দেয়। শিস নয় তো যেন ব্যথা গলান কান্না ঝরতে থাকে।

সাশাও আসে প্রায়ই। ধূমকেতুর মত আসে আর তেমনি করেই চলে যায়।

যতক্ষণ থাকে, ভারী ব্যস্ত; যেন পেছন থেকে কে ওকে তাড়া ক'রে বেড়াচ্ছে। দিন দিন কেমন জানি খামখেয়ালী মেজাজ হচ্ছে ওর।

একদিন ও যাবার সময় পাভেল সাথে সাথে গেল এগিয়ে দিতে। দরজাটা খোলাই ছিল, বন্ধ করে যেতে ভুলে গেছে পাভেল। মা শুনতে পেল :

'তাহ'লে ঝাণ্ডা তোমার হাতেই থাকবে?' সাশা শুধোয়।

'হাঁ।'

'একেবারে স্থির?'

'হাঁ। আমি ছাড়া ঝাণ্ডা আর কারো হাতে থাকতে পারবে না।'

'তার মানে নির্ঘাত জেল, তা মনে আছে?'

পাভেল নিরুত্তর।

'যেতে পাবে না' বলতে গিয়ে কথা বেধে যায় সাশার মুখে।

'কি?'

'অন্য কারো হাতে ছাড়তে পারো না?'

'না।' দৃঢ় কণ্ঠের জবাব আসে।

'আবার ভেবে দেখো।...সবার ওপর তোমার এত প্রভাব, প্রত্যেকে ভালোবাসে তোমায়...তোমাকে আর নাখোদকাকে...সবচেয়ে বেশী ভালোবাসে। ভেবে দেখ, এদের মধ্যে থাকলে কত কাজ করতে পারবে। আর ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে বেরুলেই তো ধ'রে নিয়ে যাবে। এবার আর এখানে রাখবে না। অনেক দূরে কোথাও পাঠিয়ে দেবে, একেবারে নির্বাসন; আর শিগ্গির ছাড়বে না এবার।

ওর স্বরে শংকা আর আবেগ। এ আবেগ মায়ের চেনা। বুকটা যেন ঠাণ্ডা হ'য়ে যায় মেয়েটার কথায়।

'দেখ আমি স্থির ক'রে ফেলেছি। ও আর বদলান যাবে না।' পাভেল বলে।

'আমি যদি বলি, তবুও না?'

হঠাৎ পাভেলের গলার স্বর কঠোর হ'য়ে ওঠে :

'খবরদার ও ভাবে কথা বলবে না। অধিকারের বাইরে যাচ্ছ।'

'আমি তো মানুষ!' ধীরে ধীরে সাশা বলে।

'হ্যাঁ! শুধু মানুষ নও, আশ্চর্য মানুষ!' চাপা স্বর, যেন গলা ধ'রে গেছে, 'তোমায় ভালোবাসি সাশা। ভালোবাসি ব'লেই বলছি অমন কথা আমায় বলো না তুমি।'

'আচ্ছা, আসি তাহ'লে।' সাশা বলে।

পায়ের শব্দে বোঝা গেল ছুট্ছে সাশা। পাভেল উঠোন পর্যন্ত গেল পেছন পেছন।

ভয়ে মায়ের বুকটা কুঁকড়ে যায়। কি নিয়ে ওরা কথা বলছিল, বুঝতে পারে না মা; কিন্তু মন ব'লে দেয়—বড় দুঃখের দিন আসছে...।

'কি করতে চায় ও?'

পাভেল ফিরে আসে, আন্দ্রিয়েইও এসেছে।

মাথা ঝাঁকিয়ে খখল বলে, 'না, জ্বালালে দেখছি এই ইসাই-টা! কি করা যায় বলো তো ওকে নিয়ে?'

মা জিজ্ঞাসা করে মাথা নীচু করে : 'তোরা কি করবি রে?'

'কখন? এখন?'

'পয়লা মে তে?'

'ওঃ' চাপা স্বরে বলে পাভেল, 'আমাদের ঝাণ্ডাটা মিছিলে আমিই ব'য়ে নিয়ে যাব, সেই কথাই বলছিলাম। হয়তো আবার জেলে যেতে হবে।'

মায়ের চোখে যেন কতগুলো সূঁচ ফুটল; মুখ শুকিয়ে গেল। পাভেল-এর হাতটা নিয়ে আস্তে আস্তে আদর ক'রতে থাকে।

'আমায় যেতেই হবে। অবুঝ হয়ো না, মা!'

ধীরে ধীরে মাথা তুলে বলে মা : 'আমি তো কিছু বলিনি।' কিন্তু ছেলের সাথে চোখাচোখি হ'য়ে যায়। ওর চোখের কঠিন দীপ্তির সামনে মা যেন পিছিয়ে যায়।

দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে মায়ের হাত ছেড়ে দেয় পাভেল। একটু তিরস্কারের সুরে বলে : 'কোথায় খুশি হবে! না তার উল্টো করছ! কবে যে আমাদের মায়েরা হাসতে হাসতে ছেলেদের মরতে পাঠাতে পারবে তাই ভাবছি!'

খখল ঠাট্টা ক'রে ওঠে : 'ওরে বাস্‌রে যেন প্রবল প্রতাপান্বিত, শ্রী শ্রী শ্রীল মেয়র সাহেব এলেন...'

মা আবার বলে : 'আমি তো বলিনি কিছু! তোর পথে বাধা আমি হ'তে চাই না। কিন্তু আমার যে কষ্ট হয়...কি করব, আমি যে মা...'

সরে যায় পাভেল। বলে :

'এর নাম ভালোবাসা নয়, পায়ের বেড়ী!'

কথাগুলো যেন শেলের মত বাজে মায়ের বুকে। কেঁপে ওঠে মা। বলে :

'খোকা, খোকা! অমন ক'রে বলিস না...'। ভয় হয়, পাছে আরো কঠিন কথা বলে পাভেল। বলে : 'আমি বুঝিনে যে তা নয়; বুঝি না ক'রে তোমার উপায় নেই...করতেই হবে কমরেড্‌দের জন্য...'

'না কমরেড্‌দের জন্য নয়। আমার নিজেরই জন্য।'

নীচু দরজা দিয়ে অতি কষ্টে হাঁটু বাঁকিয়ে, প্রথমে এক কাঁধ, তারপর মাথা, তারপর আর এক কাঁধ এমনি ক'রে ঘরে ঢোকে খখল; ওর বড় বড় চোখগুলি পাভেল-এর মুখের ওপর গেঁথে যায়—বিরস মুখে বলে :

'হুজুর, অধীনের আর্জি, সংকল্পটা ত্যাগ করলেও মন্দ হয় না।'

পাহাড়ের ফাটলের মধ্যে টিকটিকির মত দেখায় ওকে।

মায়ের চোখে প্রায় জল এসে যায়। ছেলেকে লুকোবার জন্য কাপড় কাচার অছিলা ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় মা। এক কোণে বসে নিঃশব্দে অঝোরে কাঁদে। চোখের জলের ধারায় বুঝি বুকের রক্ত ঝরে পড়ছে।

ও ঘরে চাপা স্বরে বচসা চলছে। আধ-খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে শোনা যায়। খখল বলছে :

'কি ভেবেছ কি বলতো? ও বেচারাকে কাঁদিয়ে খুব ফুর্তি লাগছে না?'

'তোমার তাতে কি?' চীৎকার ক'রে ওঠে পাভেল।

'আমার অনেক কিছু! যা খুশি তাই ক'রে যাবে, আর বন্ধু হ'য়ে আমি সাক্ষী-গোপাল হয়ে চুপচাপ দেখে যাব? অমন ক'রে না বললে হ'ত না? বোঝ না কিছু?'

'শক্ত হওয়া দরকার। হাঁ না যাই বলব, শক্ত হয়ে বলতে হবে। ভয়ে কাঁপলে চলবে না।'

'ওরে বাসরে! যত বাহাদুরী সব মায়ের বেলায়!'

'সবার বেলায়ই। শুধু মায়ের বেলায় হ'তে যাবে কেন? ভালোবেসে পায়ে শেকল বেঁধে পেছন দিকে টানবে অমন ভালোবাসা, দোস্তি চাই না আমি।'

'ওঃ মস্ত বড় পালোয়ান! হয়েছে! হয়েছে! বাহাদুরী জানা আছে সব। যাও না গিয়ে, বল না দেখি একজনের কাছে—জারীজুরী দেখা যাবে একবার!'

'বলা হয়ে গেছে।'

'হয়ে গেছে? মিথ্যে কথা। যদি বলে থাক, অমন করে বলনি। আস্তে আস্তে, নরম করে, আদর ক'রে বলেছ। শুনিনি, তবে ঠিক জানি। ওখানে হম্বি-তম্বি চলবে না। ওসব চলে মায়ের কাছে।'

চোখের জল মুছে উঠে পড়ে মা। কি জানি, হতভাগা খখলটা যে গোঁয়ার-গোবিন্দ, কি বলতে কি বলে বসবে। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে রান্না ঘরে এসে ঢুকে জোরে জোরে বলতে আরম্ভ করে। ভয়ে দুঃখে স্বর কাঁপছে : 'উঃ কি ঠাণ্ডারে, বাবাঃ। কে বলবে শীত চলে গেছে।'

অনর্থক সোরগোল করে এদিক থেকে ওদিক সরাতে লাগল বাসনগুলি। শব্দে ও ঘরের কথা শোনা যায় না। মায়ের গলা আরো উঁচু পর্দায় ওঠে :

'সব উল্টো-পাল্টা চলছে। এদিকে মানুষের মগজ তাতছে, আর ওদিকে বাইরে পাল্লা দিয়ে হিম পড়ছে। আর আর বছর এমনি দিনে কি সুন্দর রোদ ওঠে। এক রত্তিও যদি শীত থাকে!'

আবার ওদের গলা শোনা যায়। থমকে দাঁড়ায় মা!

'শুনছ!' খখল বলে : 'ফেলে দাও তোমার চাল। একটু বুঝতে চেষ্টা কর। তোমার চাইতে ঢের ঢের বেশী কষ্ট সয়েছে বেচারী। সারা জীবন সুখ কাকে বলে জানতেই পায়নি।'

'একটু চা-টা খাবিনে তোরা?' গলাটা কেঁপে ওঠে মার। কাঁপুনিটাকে ব্যাখ্যা করে মা : 'বাপ্‌রে, জমে গেলাম!'

পাভেল ধীরে ধীরে মায়ের কাছে আসে মাথা নীচু করে। মুখে অপরাধের হাসি। বলে :

'মা, আমায় ক্ষমা কর মা। তোমার কাছে আমি এখনও ছোট। তোমার অবোধ ছেলে। মা আমার...'

গভীর বেদনায় ছেলের মাথাটা বুকে চেপে ধরে মা।

'আমার কথা ছেড়ে দে,' কান্না ঝ'রে পড়ে কথায়, 'চুপ! একটি কথাও না। ঈশ্বর জানেন, তোর পথেই যাবি তুই। কিন্তু আমার মনটাকে নিয়ে টানা-হেঁচড়া করিসনি! আমি মা। মা সন্তানকে ভালোবাসবে না? বলিস্ কি? ভালো না বেসে সে কি পারে? তোদের সবাইকে আমি ভালোবাসি। তোরা সবাই আমার আপনজন। তোদের ভালো না বেসে কি থাকা যায় রে? আমি যদি তোদের ভালো না বাসি আর কে বাসবে বল্? সব চলে যাবি তোরা...তুই চলবি তাদের আগে আগে; পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবি তুই...সব চলবে তোর পেছন পেছন...সব কিছু ছেড়ে। সব ফেলে রেখে...আঃ খোকারে! খোকা!'

অথৈ চিন্তা বুকের মধ্যে তোলপাড় করে। বিরাট বহ্নি-জ্বালার মত। একটা বিপুল বেদনা-ভরা আনন্দ হৃৎপিণ্ডটাকে চিরে-ফেড়ে ফালি ফালি করে দেয়। কিন্তু তা বোঝাবার ভাষা কোথায় পাবে মা! বোবা ব্যথায় তীব্র তীক্ষ্ম যন্ত্রণাভরা দৃষ্টিতে ছেলের দিকে চায় মা।

'বুঝতে পারিনি মা, ক্ষমা করো। এখন সব বুঝতে পারছি। আর এমন ভুল হবে না। দেখে নিও তুমি। আর কক্‌খনও হবে না।'

প্রসন্ন মনে মৃদু হেসে সরে যায় পাভেল। কিন্তু লজ্জার কাঁটাটা তবু বিঁধতে থাকে।

পাশের ঘরের দোরের কাছে গিয়ে বলে মা—স্বরে একটু মিনতির সুর বাজে:

'হাঁরে আন্দ্রিউশা, আর চ্যাঁচামেচি করিসনি ওর সাথে। তুই তো বড় ওর...'

মায়ের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে থেকেই জবাব দেয় আন্দ্রিয়েই :

'হুঁ, শুধু চ্যাঁচামেচি? হয়েছে কি মা? ধরে ঠ্যাঙাব না এর পর!'

কাছে গিয়ে হাতটা বাড়িয়ে দেয় মা :

'তুই আমার সোনার ছেলে...'

হাত দুটো পেছনে রেখে, মায়ের পাশ কাটিয়ে ও রান্নাঘরে চলে যায় মাথাটাকে ষাঁড়ের মত গোঁজ ক'রে। ওর গম্ভীর অথচ বিদ্রূপের স্বরটা কানে আসে মা'র :

'সামনে থেকে হ'টে যা পাভেল! নয়তো মুণ্ডুটা চিবিয়ে খাব। ঘাব্‌ড়ে গেলে নাকি, ও নেন্‌কো? সত্যি খাবো না গো! ঠাট্টা, স্রেফ্‌ ঠাট্টা। আমি সামোভারটা চাপাচ্ছি। বাঃ কি সুন্দর কয়লা! এই যাঃ ভিজে যে সব একশা!'

চুপ ক'রে যায়। মা এসে দেখে মাটিতে উবু হ'য়ে ব'সে খুব কষে ফুঁ দিচ্ছে সামোভারে।

'ঘাবড়ে যেয়ো না গো, ওর কেশ-স্পর্শ করব না আমি।' বলে চোখ না তুলে। 'আমি পাথর নই, মা, সেদ্দ গাজরের মত নরম তুলতুলে, টিপে দেখনা একবার! এই পালোয়ান, কান বন্দ্‌ করো! সত্যি আমি পাভেলকে খুব ভালোবাসি, মা। কিন্তু ওর ওই গোঁ-টা আমার ভালো লাগে না। ধরো না হয় নতুন জামা আছেই ওর একটা। ওর কাছে খুবই সুন্দর জামাটা। সুতরাং ভুঁড়ি বাগিয়ে যাকে পায় তাকেই দেখিয়ে বেড়ায়—দেখ হে কি সুন্দর জামা আমার! বেশ তো, ভালো আছে তো আছেই। তাই ব'লে অত গায়ে প'ড়ে দেখান কেন লোককে! এমনিইতো লোকের জ্বালায় অস্থির!'

ওদিক থেকে পাভেল চ্যাঁচায় : 'আর কতক্ষণ চলবে হে? অনেক হয়েছে। এবার ছাড়ো না হয়!'

সামোভারের দুইদিকে ঠ্যাং ছড়িয়ে খখল বসে আছে মাটিতে, মা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর মাথার পেছনটার দিকে। হাতের ওপর দেহের ভর রেখে, ঘাড় ফিরিয়ে ও মা ছেলের দিকে তাকায়। বলে চোখ মিট্‌মিট্‌ ক'রে :

'বেশ আছ বাপু তোমরা দু'জন।' ওর চোখ দুটো ঈষৎ লাল হয়েছে।

পাভেল নীচু হ'য়ে ওর হাত ধরে খপ্‌ ক'রে।

চেঁচিয়ে ওঠে খখল—

'এই টানলে প'ড়ে যাব কিন্তু!'

মা বলে : 'কিসের ভয়রে তোর! ওঠ যা, হাতে হাত মেলা দেখিনি একবার দু'জনে, দেখি! যা, কোলাকুলি কর! যত জোরে পারিস, যত বেশি জোরে...'

পাভেল বলে : 'কি হে, কি বল!'

খখল ওঠে। নিবিড়, গভীর আলিঙ্গনে মিলে যায় দুটি দেহ আর একটি প্রাণ। মায়ের চোখ বেয়ে অশ্রু গড়ায়—এবারে আর দুঃখের অশ্রু নয়, সুখের। নিজেই

বলে মা :

'মেয়েরা ভারী কাঁদতে ভালোবাসে! ওরা সুখেও কাঁদে, দুঃখেও কাঁদে।'

আস্তে ক'রে পাভেলকে সরিয়ে দেয় খখল। চোখ মুছতে মুছতে বলে :

'খুব হয়েছে, ভাগো এখন! বাবাঃ, কি কয়লা তোমার। ফুঁ দিয়েছি আর যত ছাই ছিটকে এসেছে চোখে।'

জানালার ওপর ব'সে পড়ে পাভেল। বলে :

'লজ্জা পাচ্ছ কেন? ও রকম চোখের জলে লজ্জা নেই।'

মা গিয়ে বসে পাভেলের পাশে। নতুন অভয়-মন্ত্র পেয়েছে মা। তাতেই বিষণ্ণ মন ভ'রে আছে শান্তিতে আর তৃপ্তিতে।

খখল ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলে :

'উঠো না, নেন্‌কো, একটু ব'সে বিশ্রাম ক'রে নাও। যা ঘোল খাইয়েছে তোমায়। বাসন-পত্র আমি নিয়ে আসছি।'

ওর ভরা মিঠে গলাটা শোনা যায় :

'বেশ চেখে নেওয়া গেল জীবনকে, একেবারে রক্ত-মাংসের মানুষের সহজ প্রাণ-ঢালা জীবন।'

'যা বলেছ।' জবাব দেয় পাভেল।

মা বলে : 'কিন্তু আমাদের সব কিছু আলাদা হয়ে গেল; সুখ দুঃখ সব...'

'তাই তো হওয়া উচিত!' খখল বলে : 'কারণ মানুষের প্রাণটাই নতুন করে জন্ম নিচ্ছে যে, নেন্‌কো গো! একেবারে নতুন মন, তাই নিয়ে টগবগিয়ে মানুষ চ'লেছে সম্মুখের দিকে, চারদিককে যুক্তি বিচারের আলোয় আলো ক'রে। ডাক দিয়ে যাচ্ছে দুনিয়ার মানুষকে : 'কে কোথায় আছ মানুষ ভাই! এক হও; এক পরিবার তোমরা, ভাই ভাই সব এক হও!' সে ডাক শুনে সাচ্চা প্রাণগুলো জোট বাঁধছে। সব মিলে জ্বলে একটা মস্ত বড় প্রাণ হয়ে উঠছে—ভারী জবরদস্ত, আর এমনি তার আওয়াজ যে রুপোর ঘণ্টা...'

মা ঠোঁট চেপে কাঁপুনি বন্ধ ক'রে, চেপে চোখ বন্ধ ক'রে চোখের জল রোখে।

পাভেল হাত তুলে কি যেন বলতে যায়। মা ওকে টেনে এনে কানে কানে বলে : 'চুপ, বলতে দে।'

খখল এসে দরজার সামনে দাঁড়ায়। বলে চলে : 'এখনও হয়েছে কি! অনেক দুঃখ সইতে হবে মানুষকে। অনেক রক্ত ঝরাতে হবে। কিন্তু আমার বুকের মধ্যে আর মগজটার মধ্যে যে দৌলত আছে তার তুলনায় কতটুকু আর আমি দিতে পারব। যত দুঃখই সইনা কেন, রক্ত ঝরতে ঝরতে জীবনটা যদি ক্ষয়েও যায়, সে কিছুই নয় তার কাছে। আলোর ধনে ধনী ওই আকাশের নক্ষত্রের মত আমি। তারই মত অমনি ঐশ্বর্য আমার। অফুরন্ত আনন্দ আছে আমার মধ্যে! কেউ তা নষ্ট ক'রতে পারবে না। ঐ তো আমার জোর, আমার সোনার কাঠি। ঐ জোরেই আমি সব কিছু বুক চিতিয়ে নিতে পারি। সব কিছু সইতে পারি।'

চা খেতে খেতে মাঝ রাত্তির গড়িয়ে গেল কথায় কথায়—মানুষের কথা, জীবনের কথা, আগামী দিনের কথা...অন্তরঙ্গ আলাপ।

মা শোনে, বোঝে; দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে; প্রত্যেকটি উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে মায়ের মন উধাও হয়ে যায় অতীতের মধ্যে; অতীতের দুঃখভারাক্রান্ত ভোঁতা জীবনের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেয় এই নতুন উপলব্ধিকে।

আর ভয় ক'রে না মায়ের। আজের এই অন্তরঙ্গ আলাপের উষ্ণতায় সব ভয় গলে ঝ'রে যায়। বহুদিন আগের একটি দিনের কথা মনে পড়ে। সে-দিনও ঠিক এমনি লেগেছিল, আজের মত ওর বাবা সে-দিন বলেছিল :

'যা মুখপুড়ী, মুখ বাঁকাচ্ছে দেখ না! নেহাৎ বেকুব না হ'লে কোন্ ব্যাটা তোকে বিয়ে করবে? পাস যদি কাউকে তোর সাতপুরুষের ভাগ্যি। মেয়ে হ'য়ে জন্মেছিস্, বিয়ে হবে, ছেলে বিয়োবি, নাকের জলে চোখের জলে এক হবে। দুনিয়া সুদ্দু তো ওই হ'চ্ছে। তুই আবার কোথাকার কে এলি।'

বাপের কথায় সে-দিন পরিষ্কার দেখতে পেয়েছিল মা ওর সামনের পথটা, আঁকা বাঁকা আঁধার গলি-ঘুপ্‌চির নিরুদ্দেশ, নিষ্ফলা পথ, অমোঘ নিয়তির মত পায়ে-জড়ান। যেতেই হবে ওপথে, নাস্তি গতিরন্যথা! অতএব এক অন্ধ শান্তিতে মন ভ'রে গিয়েছিল ছটফটানি থেমে। আজও তাই। দিব্য চোখে মা দেখছে, সইতে হবে, নতুন নতুন দুঃখ সইতে হবে। নিজের মনেই কাকে যেন বলতে থাকে বিদ্বেষের সুরে :

'নাও নাও, এই নাও!'

মনটা ঠাণ্ডা হ'য়ে আসে এতে। কড়া তারের মত কি একটা যেন গুনগুনিয়ে কাঁপতে থাকে বুকের মধ্যে।

কিন্তু আত্মার গভীরে অস্পষ্ট আশা জেগে থাকে; কিছুতেই মরে না সে-আশা। যাবে না, সব যাবে না! সব কেড়ে নিয়ে একেবারে রিক্ত করে দেবে না ওরা। কিছু, একটু কিছু থাকবেই।

চব্বিশ

সে-দিন সকাল বেলা, পাভেল আর আন্দ্রিয়েই সবে কাজে বেরিয়ে গেছে। করসুনভা এসে জানালায় ধাক্কা দিয়ে চীৎকার ক'রে বলল :

'শুনছ গো? ইসাইকে কারা জানি খুন ক'রেছে। দেখবে তো চল।'

মা চম্‌কে ওঠে। বিদ্যুৎ-ঝলকের মত খুনীর নামটা যেন ঝলকে যায় মনের মধ্যে। চাদরটা গায়ে জড়াতে জড়াতে জিজ্ঞাসা করে :

'কে করলে খুন গো!'

'তোমার জন্য মড়ার পাশে ব'সে আছে কিনা সে! খুন ক'রে কেউ ব'সে থাকে!'

রাস্তায় চলতে চলতে আবার বলে :

'আবার সব তল্লাসীর হিড়িক পড়বে। হেস্ত-নেস্ত করবে আবার। তোমার ছেলেরা বাড়ীঘরেই ছিল কাল, রক্ষে। নিজ চোখে দেখলাম কিনা। জান তো, বাড়ী ফিরতে আমার মাঝ-রাত্রি পেরিয়ে যায়; কাল ভাবলাম, যাই দেখি কি করছ। জানালা দিয়ে দেখি সবাই মিলে টেবিল ঘিরে ব'সে আছ...'

ভয়ে কালো হ'য়ে মা বলে ওঠে : 'কি বলছ গো! আমার ছেলেরা? এ কি কেউ ভাবতে পারে?'

করসুনভা বলে : 'কে আবার মারতে আসবে বাপু, তোমার ব্যাটার সাঙ্গো-

পাণ্ডোরাই মেরেছে! ও মানুষটা ওদের পিছে টিকটিকির মত লেগে থাকত, চুক্‌লি করত, কেই বা না জানে...'

মায়ের গলা যেন বন্ধ হ'য়ে আসে, কথা ব'লতে পারে না। দুই হাতে বুক চেপে ধরে।

'কি হ'ল গো? তোমায় ভয় কি? ওর যা হবার তাই হ'ল। শিগ্‌গির করে চল, নয়তো নিয়ে যাবে।'

মন কালো সন্দেহে ছেয়ে যায়। ভেসভশিচকফ্ নয় তো?'

'লোকটা চূড়ান্ত পথ বেছে নিয়েছে।' ভাবে মা।

বেশী দূরে নয় কারখানা থেকে, পোড়া বাড়ীটার সামনে, একটা খোলা মাঠে লোকে লোকারণ্য—মেয়ে-পুরুষ, ছেলে-বুড়ো, দোকানী-পসারী, সামনের হোটেলটার চাকরগুলো, কেউ বাদ নেই। পুলিশও এসেছে। কলরব শোনা যাচ্ছে, যেন ভীমরুলের চাকে ঘা পড়েছে। মানুষগুলোর পায়ে পায়ে পোড়া কয়লার ছাই উড়ছে। পুলিশ-দলের সঙ্গে এসেছে বুড়ো জমাদার পেৎলিন। লোকটার মুখে একগোছা ফুরফুরে সাদা দাড়ি আর বুকের ওপরে সারি সারি মেডেল।

একটা আধ-পোড়া কাঠে হেলান দিয়ে মাটির ওপর আধ-শোয়া, আধ-বসা অবস্থায় রয়েছে ইসাই-এর দেহটা। খালি মাথাটা ডান কাঁধের ওপর হেলে আছে; ডান হাতটা পাৎলুনের পকেটে, আর বাঁ হাতের আঙ্গুলগুলো যেন মাটি খিমচে আছে।

মা ওর মুখের দিকে তাকায়। পা ছড়িয়ে ব'সে আছে—পায়ের ফাঁকে টুপীটা, একটা চোখ যেন আনমনে তাকিয়ে আছে ওই দিকে। ঠোঁটগুলি ফাঁক, যেন অবাক হ'য়ে হাঁ ক'রে আছে মানুষটা। ওর রোগা টিংটিঙে দেহটা, চোখা মাথা আর হাড্ডি বের-করা দাগড়া দাগড়া মুখ যেন মরণের আক্ষেপে কুঁকড়ে ছোট হ'য়ে গেছে। দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে মা, ক্রুশের চিহ্ন আঁকে। বেঁচে থাকতে একদিনের তরেও ভালো লাগেনি মায়ের ওকে, আজ কেমন মায়া হয়।

কে একজন চাপা গলায় বলে : 'রক্ত-টক্ত নেই, দেখেছ? বোধহয় কিলিয়েই সাব্‌ড়ে দিয়েছে।'

আর একটা রাগের গলা শোনা যায় : 'ব্যাটা টিক্‌টিকি! আর মুখ খুলতে হবে না বাছাধনের!'

পুলিশ-জমাদার মেয়েদের পাশ দিয়ে দৌড়ে যায়। হুমকী দেয় :

'কোন শালা বল্লেরে!'

লোক জন স'রে যায়। কেউ ছুটে পালায়। কে একটা লোক বিশ্রীভাবে হেসে ওঠে। মা বাড়ী ফিরে আসে। মনে ভাবে, 'ছিঃ কেউ একটিবার আহা করলে না!'

নিকলাই-এর ছবিটা ফুটে ওঠে চোখের সামনে। হিম কঠিন পাথুরে দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে দৈত্যের মত মানুষটা। ডান হাতখানা ঝাঁকাচ্ছে যেন এইমাত্র বড্ড লেগেছে।

ছেলেরা বাড়ী এলে শুধায় : 'কাউকে ধরেছে নাকি রে?'

খখল বলে : 'কি জানি, শুনিনি কিছু।'

দু'জনেই বড্ড বিমর্ষ, মা লক্ষ্য করে। জিজ্ঞাসা করে আস্তে আস্তে :

'নিকলাইএর ওপর কারো সন্দেহ হয়েছে নাকি রে?'

'না।' জবাব দেয় পাভেল। ওর চোখগুলি কেমন কঠিন, কথাগুলোর ধরণ ইঙ্গিতপূর্ণ। 'বোধ হয় সন্দেহ করে না। কারণ কাল দুপুরে ও নদীর দিকে

গেছে আজও ফেরেনি। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম ওর কথা...'

'ভগবান রক্ষে করেছেন!' একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়ে মায়ের।

খখল মায়ের দিকে তাকিয়ে মাথা নীচু করে। মা বলে :

'কি অসহায়ভাবে ব'সে আছে! মাগো! কারো যদি একটু কষ্ট হয়! আহা রে, বেচারা মরবার সময়ও একটা মিঠে কথা শুনতে পেলে না গো! দেখাচ্ছে এই এতটুকুনি! যেন কাঠকুটোটা, কেউ কেটে ভেঙ্গে অমনি ওখানে ফেলে রেখে গেছে।'

খাবার সময় হঠাৎ হাতের চামচেটা ফেলে চেঁচিয়ে ওঠে পাভেল :

'কিছুতেই বুঝতে পাচ্ছিনে!'

'কি?' খখল শুধায়।

'আমরা ঘরের পোষা জন্তুকে মেরে খাই বটে কিন্তু কাজটা ভালো নয়। তবে প্রাণের ভয়ে বুনো জন্তু জানোয়ার মারতে এতটুকু হাত কাঁপে না। মানুষ যদি বুনো জন্তুর মত নিজের ভাইদের খেতে যায় হাঁ ক'রে, আমিও তাকে খুন ক'রতে পারি। আমার এতটুকু বাধবে না। কিন্তু ইসাইএব মত মানুষ, তার ওপরে তো করুণা হওয়া উচিত। ভাবছি ও মানুষের জান নিতে হাত সরল কার!'

খখল কাঁধ নেড়ে বলে :

'বুনো জন্তুর চাইতে ওই বা কম ছিল কিসে? এক-ফোঁটা রক্ত খায় ব'লে মশাও তো মারি, আমরা!'

'হ্যাঁ তা মারি। কিন্তু আমি ঠিক তা বলছি না। মানে বলছিলাম, এই মাছি মেরে হাত কালো করা আর কি?'

কাঁধে আর একটা ঝাঁকানি দিয়ে জবাব দেয় আন্দ্রিয়েই :

'তা কি করা যাবে!'

পাভেল খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলে :

'অমন পদার্থকে তুমি মারতে পারতে?'

'তা আমাদের যে লক্ষ্য, তা সিদ্ধির জন্য, আর কমরেডদের জন্য আমি সব করতে রাজী আছি। দরকার হ'লে নিজের ছেলেকেও খুন করতে পারি।' ব্যথিত অথচ দৃঢ় স্বরে বলে খখল।

মা অস্থির হয়ে চাপা গলায় ব'লে ওঠে : 'আঃ কি যা তা বকছিস্!'

'কি করব মা! জীবনই এমনি।' একটু হেসে বলে ও।

'সত্যি, জীবনটাই অমনি।' পাভেল বলে।

হঠাৎ অত্যন্ত অস্থিরভাবে উঠে পড়ে আন্দ্রিয়েই, যেন ভেতর থেকে তাকে একটা কিছু খোঁচাচ্ছে। বলে :

'কি করব বল! তাড়াতাড়ি লক্ষ্যে পোঁছুতে হবে তো। ঐ জন্যই তো যে-মানুষকে শুধু ভালোবাসার কথা, তাকে আজ ঘৃণা করতে হচ্ছে। প্রগতির পথ যারা আগলে রাখবে, পদের লোভে, স্বার্থের খাতিরে ঘুষ নিয়ে জনসাধারণকে যারা শত্রুর কাছে বেচে দেবে, তাদের সরিয়ে ফেলা ছাড়া উপায় কি? জুডার মত দালালদের বরদাস্ত করতে পারি না আমি। অমনি ছেড়ে দি, তাহলে আমিও জুডার পর্যায়ে গিয়ে পড়ব। কিন্তু তুমি বলবে, অন্যে কি করছে না করছে তাতে মাথা গলাবার আমার কিসের অধিকার। বলতে পার বন্ধু! বড় কর্তারা এই যে সৈন্য-পুলিশ, জল্লাদ-ফাঁসুড়ে, জেলখানা, বেশ্যাখানা, কালাপানি, আরো এমনি হাজারো নরকের পাহারা দিয়ে যে নিজেদের আখের আর স্বার্থ আগলাচ্ছেন,

সে-অধিকার তারা কোথায় পেলেন? ওঁরা যে অধিকারে করছেন, আমাদেরও সেই অধিকার। অতএব যে-মুগুর দিয়ে আমাদের গুঁতোচ্ছেন তাঁরা, ঘটনা-চক্রে তাদের সে-মুগুর যদি একদিন আমাদের হাতে উঠে আসে, তা কি আমাদের দোষ? পিঁপড়ের জাঙ্গালের মত টিপে মারছে আমাদের পাইকারী হারে। বলতে চাও, মুখ বুজে মরব? কেন? হেতের তুলবার অধিকার আমাদের আলবৎ আছে। হেতের মুঠো ক'রে ধরব, এবং যে দুষমন আগ বাড়িয়ে আমাদের কাজ পণ্ড করতে আসবে তার মাথাটাও নেব। হাজার বার সে-অধিকার আছে আমাদের। এই তো জীবন! কিন্তু সত্যি বলছি এ-জীবন আমার ভালো লাগে না। কি হবে ওসব অপদার্থদের রক্ত দিয়ে! ওদের রক্তের মধ্যে কি আর সার-বস্তু আছে? নিস্ফল রক্ত। কিন্তু আমাদের রক্ত। মাটির বুকে বৃষ্টি পড়লে বসুন্ধরা যেমন ফলবতী হন, তেমনি আমাদের রক্ত থেকে জন্ম নেবে সত্য। আর ওদের রক্ত মাটিতে পড়লে চোঁ করে শুকিয়ে যাবে, একটু চিহ্নও থাকবে না। ও আমার জানা আছে। কিন্তু কাউকে সত্যি যদি খুন করতে হয়, আমি করব। পাপ যদি হয়ই, মাথা পেতে নেব। আমি ম'রলে আমার পাপ তো আমার সঙ্গেই যাবে, আগামী দিনের গায়ে তার কোনও দাগ থাকবে না। যদি থাকে সে আমারই গায়ে থাকবে। আর কোথাও লাগবে না।'

ঘরের এ মাথা ও মাথা পায়চারী ক'রে বেড়ায় ও। যেন নিজের একটা অংশ টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে কেটে ফেলছে নিজের হাতে এমনি ভঙ্গি। ওর দিকে তাকাতে মার বুকটা টন্ টন্ করে, ভয় করে। মনে হয় ভয়ংকর কষ্ট হ'চ্ছে ওর ভেতরে। এতক্ষণে খুনের কথাটা মার মন থেকে পরিষ্কার হ'য়ে গেছে। ভেসভশ্চিকফ্ যদি না ক'রে থাকে, তবে তো ফুরিয়েই গেল। ওদের দলের আর কারো কর্ম নয়।

পাভেল মাথা নীচু ক'রে শোনে আন্দ্রিয়েইর কথা :

'কখনও কখনও এগিয়ে যাবার জন্য নিজের বিরুদ্ধে যেতে হয়। সব কিছু দিতে হয়—নিজের হৃদয় পর্যন্ত। যে ব্রত গ্রহণ করেছি, তার জন্য জান দেওয়া তো সহজ কথা। তার অনেক বেশী দিতে হয়—প্রাণের চেয়ে যা বেশী, দিতে হয় তাই। দিতে পারলে দেখবে যে-সত্যের জন্য লড়ছ, তা কত বিশাল, কত জোরদার হ'য়ে উঠেছে। দেখবে এ দুনিয়ায় ওই সত্যের চেয়ে বড় দৌলত আর নেই।'

ঘরের মাঝখানে এসে থমকে দাঁড়ায়। মুখ ফ্যাকাশে, আধ-বোজা চোখ। উদ্যত হাতে গভীর শপথের ভাষা :

'আমি জানি, সময় আসবে যখন প্রতিটি মানুষ আর সকলের কাছে তারার মত হবে। দেখবে কত সুন্দর মানুষ। নিজের রূপে তারা নিজেরা মুগ্ধ হবে। পৃথিবীর বুকে থাকবে শুধু মুক্ত-মানুষ। মুক্তি যাদের মহিমা দিয়েছে। প্রত্যেকটি হৃদয়ের দুয়ার খুলে যাবে। হিংসে, দ্বেষ কারো মনে থাকবে না। জীবন রূপ পাবে মানুষের সেবায়—মানুষের প্রতিমা, মহিমা পাবে, প্রতিষ্ঠা পাবে স্বর্গের দেউলে। অত উঁচু? মুক্ত মানুষের কাছে কিছুই দুরধিগম্য নেই। মানুষ সে-দিন সুন্দর হবে; সত্য আর মুক্তিতে পাবে সে তার বীজমন্ত্র। আর যে-মানুষ ভালোবেসে সারা পৃথিবীকে কোল দিতে পারবে, যে-মানুষ সর্ব-বন্ধন মুক্ত—সেই হবে পুরুষোত্তম। কারণ সব চেয়ে বড় সৌন্দর্য ওই মুক্তিতে। যারা এই নব-জীবনের সাধনা ক'রবে তারাই হবে মহাজাতি।'

মিনিটখানেক চুপ ক'রে থাকে খখল। তারপর সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে আবার বলতে আরম্ভ করে। স্বরটা যেন ওর আত্মার গভীর থেকে উৎসারিত :

'আর ঐ জীবন... ঐ জীবনের সাধনার জন্য আমার সর্বস্ব পণ।'

ওর মুখের ওপর আবেগের লহর খেলে যায়। গাল বেয়ে বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা গাড়িয়ে পড়ে।

পাভেলের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। মাথা তুলে ও ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায় খখলের দিকে। মায়ের মনে আশংকার কালো ছায়া ঘনিয়ে আসে। চম্‌কে লাফিয়ে ওঠে মা চেয়ার থেকে।

আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করে পাভেল :

'কি? কি বলছ তুমি?'

খখল মাথা ঝাঁকানি দিয়ে ছিটকে উঠে দাঁড়ায় একেবারে সোজা হয়ে। মায়ের চোখের দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে বলে :

'আমি সব জানি—আমার চোখের সামনে সব হ'য়েছে।'

মা ছুটে গিয়ে দুই হাতে ওর মুখ চেপে ধরে। ও ডান হাতটা ছাড়াতে চেষ্টা করে—কিন্তু মায়ের হাতে শক্ত করে ধরা। চাপা স্বরে বলে মা :

'চুপ চুপ, আমার লক্ষ্মী বাবা!'

'দাঁড়াও!' মোটা গলায় বিড়্ বিড়্ ক'রে বলে আন্দ্রিয়েই :

'কি ক'রে কি হল সব বলছি।'

জল-ভরা চোখে মা চায় ওদিকে। ফিস্ ফিস্ ক'রে বলে :

'না, না, নারে! বলিসনি আন্দ্রিউশা! বলিসনি!'

এগিয়ে আসে পাভেল। ছল ছল চোখে, বিবর্ণমুখে বলে ও :

'মা ভেবেছে, খুন বুঝি তুমিই করেছ।'

'না মোটেই তা ভাবিনি। বিশ্বাসই হয়না আমার, হবেও না। নিজের চোখে দেখলেও না।'

হাত ছাড়াতে চেষ্টা করে। মাথাটা মোচড়াতে মোচড়াতে বলে খখল :

'দাঁড়াও। না আমি নই। আমি খুন করিনি—তবে ব্যাপারটা বন্ধ করতে পারতাম।'

পাভেল বলে : 'চুপ, আন্দ্রিয়েই চুপ!'

আন্দ্রিয়েইর দীর্ঘ দেহটা থর্ থর ক'রে কাঁপে। পাভেল যেন কাঁপুনি থামাবার জন্যই এক হাত দিয়ে বন্ধুর একখানা হাত চেপে ধরে, আর এক হাত রাখে ওর কাঁধে। আন্দ্রিয়েই পাভেলের দিকে ফিরে বলে হতাশ সুরে :

'তুমি জান পাভেল, আমি মোটেই চাইনি। তবু ঘটে গেল। তুমি তো এগিয়ে গেলে। আমি আর দ্রাগুনফ মোড়ের কাছে রয়ে গেলাম। এমন সময় ইসাই এল। দাঁড়িয়ে আমাদের ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে লাগল। দ্রাগুনফ্ বললে, সারা রাত্তির ধরে ও আমার পেছনে লেগে আছে, আজ মেরেই ফেলব ওকে। ব'লে চলে গেল। আমি ভাবলাম বাড়ী গেল। তারপর ইসাই আমার কাছে এল...'

লম্বা একটা নিশ্বাস নেয় খখল।

'কি অপমানটাই করল আমাকে কুকুরটা। অমন ক'রে কেউ আমায় বলতে সাহস পায়নি কোন দিন।'

মা নীরবে ওকে টেনে টেবিলের কাছে নিয়ে বসিয়ে নিজে ওর পাশে বসে। দু'জনের কাঁধ ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে থাকে। পাভেল পাশে দাঁড়িয়ে বিরস মনে নিজের দাড়ি টানে।

'ও বলল কি জান? পুলিশের খাতায় নাকি আমাদের প্রত্যেকের নাম আছে।

আমাদের মে-দিবসের অনুষ্ঠানের ঠিক আগে আগেই নাকি সব্বাইকে ধ'রবে। জবাব দিইনি। একটু হাসলাম, কিন্তু আমার ভেতরটা টগবগ্ ক'রে ফুটছিল। বলতে লাগল, আমি এত ভালো এত বুদ্ধিমান ছেলে হ'য়ে এ ভুল পথে যে কেমন ক'রে এলাম। এদিকে না এসে যদি...'

থেমে হাত দিয়ে মুখ মুছে নিল। ওর চোখে অদ্ভুত একটা শুক্‌নো জ্বালা।

'বুঝতে পারছি!' পাভেল বলে :

'হ্যাঁ এদিকে না এসে যদি আইন কানুন মেনে চলতাম...'

খখল বন্ধ মুষ্টি আস্ফালন করে।

'তাই বটে। শয়তান কাঁহাকার। ওকথা না ব'লে যদি আমায় দু'ঘা মেরে যেত! ওর পক্ষেও ভাল হত। মনে হ'ল ওর পচা বোট্‌কা গন্ধ-ওলা থুথু আমার বুকের ভেতরটায় ছিটিয়ে দিলে। সইতে পারলাম না।'

উদ্‌ভ্রান্তের মত এক ঝট্‌কায় হাত ছাড়িয়ে নেয় আন্দ্রিয়েই। চাপা, তীব্র ঘৃণার স্বরে বলতে থাকে :

'ওর মুখে একটা চড় কষিয়ে চ'লে এলাম। হঠাৎ শুনি পেছনে দ্রাগুনফের গলা। বলছে—এইবার তোমায় হাতেনাতে ধরেছি!—হয়তো ঘাপটি মেরে কাছেই ছিল দ্রাগুনফ্ কোথাও।'

থেমে আবার বলে খখল :

'পেছন ফিরে আর তাকাইনি। কিন্তু বেশ বুঝতে পারছিলাম... মারের শব্দ কানে আসছিল...। না থেমে, চলে এলাম এমনি ভাবে যেন একটা ব্যাংই মাড়িয়ে মেরে ফেলেছি। কাজ করছি এমন সময় ছুটে এল সব চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে—ইসাইকে মেরে ফেলেছে কে। কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। কিন্তু আমার হাতটা যেন অবশ হ'য়ে গেল, কিছুতেই কাজ করতে পারছিলাম না। ঠিক যে ব্যথা তা নয়, অবশই হয়ে গেল একেবারে...'

অলক্ষ্যে একবার তাকিয়ে দেখল হাতটার দিকে।

'ও পাপ বুঝি আর জীবনে যাবে না...'

মা কোমল স্বরে বলে : 'কিন্তু তোর মনের মধ্যে তো কোন পাপ নেই!'

দৃঢ়ভাবে বলে খখল : 'না, পাপের কথা নয়। ও মরেছে তার জন্য আমার আফশোষ নাই। কিন্তু ব্যাপারটাই কেমন বিশ্রী! এর সাথে নিজেকে জড়াতে চাইনি।'

পাভেল কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে : 'বুঝতে পারছি না। খুন তো তুমি করনি। কিন্তু ধর যদি তুমিই করতে...'

'শোন ভাই, বলছি। তুমি জানছ, টের পাচ্ছ যে একটা মানুষ খুন হচ্ছে, কিন্তু বাধা দেবার কোন চেষ্টাই করছ না...'

'বুঝতে পারিনে, বাপু,' পাভেল আবার বলে, 'হয়ত বুঝছি, কিন্তু আমার তো বাপু কিছু লাগছে টাগছে না।'

বাঁশী বেজে ওঠে। খখল গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলে :

'আর কাজে যাব না।'

'আমিও না।' পাভেল বলে।

'আমি নাইতে যাচ্ছি।' ব'লে কাপড় চোপড় নিয়ে অত্যন্ত বিরস মনে বেরিয়ে যায় খখল।

মা সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। চলে গেলে বলে :

'যাই বলিস্, পাভেল, মানুষ মারা মহা পাপ। কিন্তু তার জন্য কাউকে দোষী করিনে আমি। ইসাই-এর জন্য কষ্ট হয় আমার। এমনিতেই তো কেউ পুছতই না ওকে। সকালে যখন দেখলাম, মনে প'ড়ে গেল, ফাঁসিতে লটকাবে ব'লে শাসিয়েছিল তোকে। কিন্তু তাই ব'লে ও মরাতে আমার ফূর্তিও হয়নি, ওর ওপর ঘেন্নাও হয়নি। বরঞ্চ ভারী দুঃখ হয়েছিল। কিন্তু এখন... এখন আর তাও হয় না...'

চিন্তিত ভাবে চুপ ক'রে থাকে খানিকক্ষণ মা। তারপর যেন অবাক হ'য়ে হেসে বলে : 'কি সব যা তা বলছি, দেখ দেখিনি!'

পায়চারী ক'রে চলে পাভেল। ওর জবাব থেকে বোঝা যায় মায়ের কথা কিছুই ওর কানে যায়নি :

'এই হলো জীবনের চেহারা। পরস্পরের ওপর মন কি রকম বিশ্রী ভাবে বিষিয়ে আছে মানুষের দেখেছ? মারতে চায় না, তবু হাত উঠে যায়। আর মারছ কাকে? না, নেহাৎই একটা তুচ্ছ প্রাণী, যে তোমার আমার দশের মতই হতভাগা। বরঞ্চ বুদ্ধি নেই ব'লে ও আরও দুর্ভাগা। পুলিশ, গোয়েন্দারা আমাদের শত্রু। কিন্তু তারাও আমাদের মতই মানুষ। আমাদের মতই তাদেরও রক্ত শুষছে রক্ত-চোষারা। আমাদের যেমন মানুষ ব'লে গণ্য করে না, ওদেরও তাই। কোনো তফাৎ নেই। কিন্তু ওদের জুজুর ভয় দেখিয়ে, জাত ভাইদের পেছনে লেলিয়ে দিয়েছে। হাত-পা বেঁধে, যাঁতা কলে পিষছে ওদের, রক্ত শুষে শুষে খাচ্ছে। জুলুম জবরদস্তি ক'রে ওদের দিয়ে ভাইকে ঠাঙ্গাচ্ছে। ওদের তো আর মানুষ রাখেনি, ওদের হাতের ডাণ্ডা-বন্দুক আর ইঁট পাথর যেমন, ওরাও তেমনি। আর জাঁক ক'রে বলছে ওরাই নাকি সরকার!'

মায়ের কাছে আসে। বলে : এযে কত বড় অন্যায় মা, এমনি করে লক্ষ লক্ষ লোককে হত্যা করা! প্রাণে মারে না সত্য; মারে আত্মাকে। এর থেকে জঘন্য হত্যা আর কি আছে! ওরা শুধু খুনী নয়, খুনীর বাড়া। মানুষের আত্মাকে হত্যা করে ওরা। ওদের আর আমাদের মধ্যে তফাৎটা বুঝতে পাচ্ছ তো? আমরা খুন করি তো করি একজনকে। তাও সে কত আমাদের লজ্জা, কত গ্লানি, কত অনুশোচনা। আর দুঃখ। সব থেকে বেশী মনের গ্লানি। কিন্তু নির্মমভাবে হাজার হাজার লোককে অকাতরে প্রতিদিন মারছে ওরা! আশ্চর্য! এতটুকু বিবেকের দংশন নেই; বরঞ্চ যেন উল্লাস। ফূর্তি করতে করতে ওরা মানুষ মারে। কিন্তু কেন? স্রেফ নিজেদের স্বার্থ। টাকা-কড়ি, আর আখের গুছোবার জন্য, আর আমাদের ওপরে মালিকানা কায়েম করার জন্য আমাদের শুষে শুষে, নিংড়ে নিংড়ে শেষ করে ফেলে। একবার ভাবো দেখিনি মা! একটা গোটা মানবতার টুঁটি টিপে মেরে তার আত্মাকে বিকৃত বিকল ক'রে ছেড়ে দেওয়া? ওরা কি সত্যি নিজেদের জন্য করে এই জঘন্য কাজ—না মোটেই নয়। করে ওদের পুঁজি আগলাবার জন্য। বাইরের দৌলত রক্ষার জন্য, আত্মার দৌলতের জন্য নয়।'

নীচু হয়ে মায়ের হাতখানা ধ'রে একটু জোরে চাপ দিয়ে বলে :

'কি যে সাংঘাতিক, কুৎসিত ব্যাপার মা, যদি জানতে সব, তাহ'লে বুঝতে পারতে আমরা কেন লড়ছি, কোন্ সত্যের জন্য। এবং কত বড় সত্য সে!'

ওঠে মা। বুকের ভেতর যেন তুফানের তোলপাড়। ইচ্ছে হয় ছেলের হৃদয়ের সাথে নিজের হৃদয়খানি এক হ'য়ে এক আলোক শিখায় মিশে যাক্।

অতি কষ্টে অস্ফুট-স্বরে বলে :

'ওরে দাঁড়া, একটু অপেক্ষা কর! একটু... বুকের মধ্যে কি যেন... একটু দাঁড়া!'

পঁচিশ

খুব জোরে জোরে কার জানি পায়ের শব্দ বাইরের দরজায়। দু'জনেই চম্‌কে উঠে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

আস্তে আস্তে দরজা খুলে যায়। রীবিন ঢোকে। হাসিমুখে তাকিয়ে বলে :

'নাও, এলাম হে। হেথা হোথা চোদ্দ কোশ ক'রে সাত হাঁড়ির খবর নিয়ে এলাম।'

ভেড়ার চামড়ার জামা গায়ে, গাছের বাকলের স্যাণ্ডাল জুতো পায়, আর মাথায়, লোম-ওলা ভাল্লুকে টুপী। আর বেল্টে-গোঁজা এক জোড়া দস্তানা।

'আরে পাভেল! দিলে ছেড়ে? তা বেশ। আছ কেমন? কাজ কর্ম চলছে কেমন? তুমি কেমন আছ গো পেলাগেয়া নিলোভনা?' সাদা দাঁতগুলো ঝিক্‌মিকিয়ে এক গাল হেসে কুশল শুধায় সবার। গলার স্বরটা আগের চেয়ে আরো কোমল হয়েছে। মুখের দাড়ির ঝাড়টি আরো বেড়ে উঠে রীতিমত অরণ্য হয়ে উঠেছে।

খুশি হ'য়ে ওঠে মা। কালি-মেরে যাওয়া ধ্যাবড়া হাতখানা মর্দন করবার জন্য এগিয়ে আসে। বলে : 'বড় খুশি হলাম তোমায় দেখে।'

অতিথির দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলে পাভেল :

'নাও মা, তোমার মুজিক ভাই এল।'

'আমার মুজিকই ভালো। তোমরা তো ভদ্রলোক বনছ, আমি না হয় উল্টোটাই দেখি!'

কোট টুপী খুলে ফেলে রীবিন। রং বেরংএর সার্টটা ঠিক করতে করতে পায়চারী করে আর নিরীক্ষণ ক'রে দেখে ঘরের চারদিক।

'খালি ক'খানা বই, আর তো নূতন কিছু দেখতে পাচ্ছিনা! তারপর, শোনাও দেখি তোমাদের সব কথা বার্তা।'

পা অনেকখানি ফাঁক ক'রে, হাঁটুর ওপর হাতের তেলো ভর দিয়ে বসে রীবিন। মুখে মৃদু হাসি; জবাবের প্রতীক্ষা করতে করতে গাঢ় চোখ দু'টি দিয়ে পাভেলের চোখে কি জানি খোঁজে।

পাভেল বলে, 'বেশ চলছে সব।'

রীবিন হাসে। বলে : 'আমরা জমি চষি, বীজ বুনি। চোখের সামনে দিয়ে তার গাছ হয়, ফসল ফলে। তারপর, আর কি—বীয়র চোলাই—তারপর বাকী বছর ঘুম! তাই না? কি বল হে দোস্তরা।'

পাভেল ওর মুখোমুখি বসে বলে : 'আপনার খবর বলুন দেখি, মিখাইল ইভানোভিচ্‌!'

'বেড়ে আছি। থাকি ইয়েগেলদেয়েভোতে—ইয়েগেলদেয়েভো। নাম শুনেছ? চমৎকার ছোট্ট শহর। বছরে দু'বার মেলা হয়। হাজার দুই ঘর বাসিন্দা আছে। কিন্তু দুরবস্থার শেষ নেই। এক ফোঁটা জমি নেই কারো। চষতে হয় বরগা নিয়ে চষো। আমি মজুরী করছি একটা ছিনে জোঁকের কাছে। পচা মড়ার ওপর যেমন পোকা গিস্‌ গিস্‌ করে, তেমনি ওই ছিনে জোঁকের দল গিস্‌ গিস্‌ করছে জায়গাটায়। আমার কাজ কয়লা পুড়িয়ে আলকাতরা বানানো। এখানে যা পেতাম তার সিকি পাই, খাটি ডবল। সাতজন আছি আমরা ওই ছিনে-জোঁকটার ওখানে। সব ছেলে-মানুষ, ভারী ভালো সব। আমি ছাড়া সব ওখানকারই লোক। লেখাপড়া একটু

আধটু সবাই জানে। একটা ওদের মধ্যে—নাম ইয়েফিম, ভারী গোঁয়ার-গোবিন্দ। ছোঁড়াকে নিয়ে কি যে করা হবে ভেবে পাইনা।'

'ওখানে কাজ করেন কি ক'রে আপনি? ওদের সাথে কথা বার্তা হয়?' সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে পাভেল।

'হয় না তো কি! জিভটা তো কুলুপ মেরে রাখিনি। তোমাদের বই-পত্তর—খান চৌত্রিশ হবে, সব নিয়ে গেছি। কিন্তু আমি বাপু বাইবেল চালাই। অনেক কিছু পাওয়া যায় ওতে। তা ছাড়া শাস্তর। ওটার ওপর বিশ্বাস টিশ্বাস রেখো।'

পাভেলের দিকে তাকিয়ে চোখ মিচ্‌কিয়ে হাসে।

'ভাবছ বুঝি ঐ পর্যন্তই দৌড়! না হে না, বই পত্তর নিতে এসেছি আরো কিছু। ওই ইয়েফিম ছোঁড়াও আছে আমার দিকে। আলকাতরা দিয়ে আজ মালিক পাঠালে এদিকে। ঐ সবুরে একটু চক্কর দিয়ে গেলাম হে। দাও দেখি কি দেবে। ইয়েফিমটা আসার আগেই সেরে সুরে ফেল। সব অন্দি-সন্দি ছোঁড়ার না জানাই ভালো।'

মা রীবিনের দিকে তাকায়। ওর পোষাক ছাড়া আরো কিছু যেন বদলেছে, ধরণ-ধারণ যেন আগের মত অত ভারিক্কী নেই। সে দিল-খোলা চোখ আর নেই, দৃষ্টিটাতে চালাকী খেলছে।

পাভেল বলে: 'মা একটু গিয়ে ব'লে আসবে! ওরা জানে কোন বই। বলো গাঁয়ে পাঠাতে হবে।'

'যাচ্ছি, এই এলাম ব'লে, তভক্ষণে সামোভারটা হোক।'

রীবিন হেসে বলে: 'তুমিও ভিড়েছ গো, পেলাগেয়া নিলোভনা! তা বেশ। মেলা লোক বই টই চায়। ওখানকার মাষ্টার মশায়টির কীর্তি। বেশ লোক, যদিও গির্জার গুষ্টি। ভার্স্ট সাতেক দূরে একজন মাষ্টারনীও আছে। ওরা অবশ্য এসব নিষিদ্ধ বই টই ছোঁয় না—চাকরিটা যাবে। কিন্তু এ বই আমার দরকার—বেশ ঝাল-মশলা-দার বই বুঝলে? পুলিশ টুলিশ বা পাদ্রী মশাইর চোখে যদি পড়ে মাষ্টার বেচারাদের গর্দান যাবে। আমি অবশ্য একটু সরে থাকব, আড়ালে আবডালে।

নিজের চালাকীতে বেশ আত্ম-প্রসন্ন। গাল ভরে হাসে।

মা ভাবে মনে মনে: 'চেহারাটি তো ভাল্লুকের মত। বুদ্ধিতে তো দেখছি শেয়াল!'

পাভেল শুধায়: 'মাষ্টারদের যদি সন্দেহ করে, তবে ধরে টরে জেলে পুরবে নাকি?'

'নয়তো কি?' রীবিন জবাব দেয়।

'কিন্তু দোষ তো আপনার, জেলে তো আপনারই যাওয়া উচিত!'

'অবাক করলে তুমি!' হাঁটু চাপড়ে বলে রীবিন। 'আমায় সন্দেহ করবেই না! বই পত্তর ভদ্দরলোকের জিনিষ। আমরা চাষা-ভুষো মানুষ। আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবর রাখিনা। কোত্থেকে এল বই-পত্তর, ওই মাষ্টাররাই জবাব দেবে।'

চোখ কুঁচকে তাকিয়ে থাকে পাভেল। ছেলের এই ভঙ্গীটুকু মায়ের চেনা—রীবিনের ব্যাপারটা পাভেলের ঠিক বোধগম্য হয়নি এবং সে রেগে গেছে।

সাবধানে বলে মা: 'মিখাইলো ইভানোভিচ্ কাজ করবেন নিজে কিন্তু তার দায় চাপাবেন অন্যের ঘাড়ে। কেমন?'

দাড়ি হাতড়ে জবাব দেয় রীবিন: 'অন্তত এখন তো তাই।'

'আচ্ছা মা,' শুক্‌নোভাবে বলে পাভেল : 'কেউ যদি, আচ্ছা ধরো আন্দ্রিয়েই, ও আমার পেছনে লুকিয়ে থেকে কিছু করল, আর তার জন্য আমার জেল হল। কেমন লাগবে তোমার?'

মা চম্‌কে ওঠে।

মা মাথা নেড়ে বলে : 'কম্‌রেড্‌দের চোখে ধুলো দেবে? পারবে কি করে?'

'ওহোঃ, বুঝেছি হে বুঝেছি, কি বলতে চাইছ, পাভেল!' হাই তুলে জবাব দেয় রীবিন। তারপর মায়ের দিকে তাকিয়ে বলে : 'বুঝলে মা, ইয়ে বটে!' তারপর আবার পাভেল-এর দিকে ফিরে বলে : 'বুদ্ধি সুদ্ধি পাকেনি এখনও, দোস্ত! বেআইনী কাজ করতে গেলে অত মান-মার্যাদা, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা ভাবলে চলে না। নিজেই ভেবে দেখ! জেলে যাবার কথা বললে! পয়লা তো যাবে যার কাছে বেআইনী কাগজপত্র পাওয়া গেল সে। মাষ্টাররা নয়। দ্বিতীয় নম্বর হ'ল, আমরা যা বলি আর মাষ্টাররা যা পড়ায়, একই জিনিষ সব হরে দরে। ওরা খালি কর্তাদের পাশ-করা বই পড়ায়। তার কথাগুলো আলাদা। মানে, তার মধ্যে সত্যিটা কিছু কম আছে। ঐটুকুই যা তফাৎ। সোজা কথায়, আমি চলি গট্‌গটিয়ে বড় রাস্তা দিয়ে। আর ওরা যায় অলিগলি দিয়ে। কর্তাদের কাছে দুইয়ের কসুরই সমান! কি বল, ঠিক কি না! তিন নম্বর হ'ল—যতই করুক ওরা, ওদের জন্য কাণাকড়ির দরদ নাই আমার। শত হলেও পাও-সওয়ার আর ঘোড়-সওয়ার সেপাইয়ে দোস্তি হয় না ভাই কখনও। ও তুমি দেখে নিও। তবে যদি বল—হ্যাঁ চাষী-ভাইরা হ'লে অন্য কথা। তাদের সাথে কি আর অমনটি হবে! ওই মাষ্টারটা এক জন পাদ্রীর ছেলে, বুঝলে! আর মাষ্টারনীর বাপ হচ্ছে জমিদার। এদের এখন এই ছোটলোকগুলোর জন্য এত মাথা-ব্যথা কেন হে? আমি চাষা-ভূষো মানুষ। ওই সব ভদ্দরলোকদের মন-মেজাজ বোঝা আমার কর্ম নয়। আমি শুধু আমার-টুকুনি জানি! হাজার বছর তো তেনারা জ্যান্ত চাষীদের গতর থেকে ছাল-চামড়া তুলেছেন। সেটা বেশ বুঝেছি। কিন্তু আজ এই যে বলা নেই কওয়া নেই, দরদ উথলে উঠল, আর নিজের হাতে আমাদের আঁধার চক্ষের ঠুলি খসাতে লেগে গেলেন ওটা ঠিক ঠাওর করতে পারছিনা। পরীর গপ্প মালুম হচ্ছে। পরীর গপ্প টপ্পর ধার ধারিনে বাপু! বুঝলে কিনা ব্যাপারটা। কোথায় আমি, আর কোথায় তেনারা—মানে ওই ভদ্দরলোকেরা। আসমান-জমিন তফাৎ। এই ধরো, শীতকালে তুমি একটা ক্ষেতের ওপর দিয়ে ঘোড়ায় চেপে চলেছ। হঠাৎ দেখতে পেলে, সামনে দিয়ে কী যেন একটা চলে গেল। নেকড়ে হতে পারে, শেয়াল হতে পারে, কুকুরও হতে পারে। এত দূরে যে বুঝতেই পারা গেল না কী সেটা।'

মা ছেলের দিকে তাকায়—কেমন শুকনো শুকনো দেখায় ওকে। বিব্রতভাবে দাড়িতে হাত বুলায় পাভেল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। রীবিন আত্ম-সন্তুষ্টভাবে নিরীক্ষণ করে ওকে।

আবার বলতে আরম্ভ করে :

'ভদ্রতা টদ্রতার সময় নেই এখন আর। ভারী কঠিন হয়েছে সব। বাঁচাই মুস্কিল। কুকুর তো ভেড়া নয়, বাপুহে। সে তো যখন ইচ্ছে, মেজাজ-খুশি মত ঘেউ ঘেউ করবেই।'

চেনা মুখগুলো ভেসে ওঠে মায়ের চোখের সামনে। বলে :

'ভদ্দরলোকেরাও গরীব গরবার জন্য জান দেয়। দেখগে কত ভদ্দরলোক জেলে

জেলেই গোটা জীবন কাটিয়ে দিলে।

'ওঃ, তাদের কথা বলছ!' জবাব দেয় রীবিন, 'তা ওদের জাতই আলাদা। মুজিকরা বড়লোক হয়ে ওপর পানে ওঠে, ভদ্দরলোক হয়। আর ভদ্দরলোক বেচারারা গরীব হয়ে মাটিতে নেমে আসে মুজিক হয়ে। এই তো দেখ্‌ছি। তোমার হাতখানা যদি কাঠের হাত হয়, তাহ'লে তুমি বড় ভালো লোক। মনে আছে সেবার আমায় কি বলে বুঝিয়েছিলে? কে কেমন করে থাকে, তাইতেই তার রীত-চরিত্তির, মন-মেজাজ বোঝা যায়। বুঝলে কি? এদিকে তো মজদুর বলবে 'হাঁ', তো মালিক বলবে 'না'। আর মালিক বলবে 'হাঁ' তো মজদুর বলবে 'না'। মুজিক, জমিদারের ব্যাপারও ঐ। চাষীর পো একদিন যদি পেট পুরে দুটো খেলে তো জমিদার শালার পেট ফাঁপতে লাগবে। তবে মুজিকরা তো আর আশমানের দেবতা নয় কেউ। ভালো মন্দ তাদের মধ্যে আলবৎ আছে।'

খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে বলিষ্ঠ কালো দেহটা। মাথা নীচু, দাড়ির গোছা কাঁপে যেন নিঃশব্দে ও দাঁত কড়মড় করছে। একটু নরম সুরে আবার বলতে আরম্ভ করে :

'পাঁচ পাঁচটা বছর কারখানায় কারখানায় ঘুরেছি। গ্রাম যে কি একদম ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু এবারে গাঁয়ের দিকে তাকিয়ে আমার চমক ভাঙ্গল। আর দূরে থাকতে পারলামনা হে। গাঁয়ের যে কি হাল, হেথা বসে তার আন্দাজ করতেই পারবেনা। কি জুলুম যে চলছে মানুষের ওপর—তা না দেখলে পেত্যয় যাবে না। ক্ষিদে ওদের নিত্য সাথী। নিজের ছায়ার মত পেছন পেছন লেগে আছে অষ্ট-পহর। এক টুকরো রুটির পিত্যেশ নাই কোথাও। ক্ষিদে ওদের তো খাচ্ছেই, ওদের আত্মাকে অবধি গিলে খাচ্ছে। মানুষের চেহারাই কি আছে নাকি ওদের। ক্ষিদের জ্বালায় তা অবদি গেছে। কোন মতে ধুক্‌পুকিয়ে বেঁচে আছে। কিন্তু সে বাঁচন মরার বাড়া। গলে-পচে যাওয়া। জ্যান্ত মানুষগুলো স্রেফ পচে যায়। সরকারী গোলামরা শকুনির মত ঘিরে থাকে ওদের; কোন ফেলনা-ফালতু জিনিষে হাত দিলেও রক্ষে নেই... আর একবার যদি কোন মুজিককে হাতেনাতে ধরতে পারে তাহলে জিনিসপত্র তো কেড়েকুড়ে নেবেই, তারপর ঘুষি মেরে চোয়ালের হাড়টি আর আস্ত রাখবে না...'

চারদিকে চায় রীবিন, তারপর পাভেলের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

'কাজেই গাঁয়ে ফিরে যাওয়া ঠিক করলাম। পয়লা তো মনে হয়েছিল বুঝি পারবনা। মনে মনে নিজকে খুব ধমকে দিলাম। খবরদার! পালানো টালানো চলবেনা। ক্ষিদের রুটি হয়তো জোগাতে পারবেনা, কিন্তু দুটো মিঠে কথা তো কইতে পারবে! আর কি! থেকে গেলাম। কিন্তু রাগে আমার গায়ের চামড়া চড়চড় করতে লাগল। এখনও রাগ যায়নি। কলজের মধ্যে ছুরির ফলার মত বিঁধে আছে।'

ধীরে ধীরে পাভেলের কাছে এসে ওর কাঁধে হাত রাগল। কপাল বেয়ে দরদর ক'রে ঘাম ঝরছে আর হাত কাঁপছে।

'তোমার সাহায্য চাই পাভেল। আমায় বই দাও—এমনি বই দাও, যেন প'ড়ে ওদের চোখের ঘুম পালায়। বুঝলে হে, যেমন তেমন জিনিষে হবে না, চোখা চোখা সজারুর কাঁটা চাই। কাঁটা দিয়ে মাথার খুলি ফুটো করে মগজে ঢোকাতে হবে। যারা তোমাদের সব বই টই লেখে, তাদের ব'লে দিও গাঁয়ের লোকেদের জন্যও যেন লেখে কিছু। এমনি ক'রে লিখবে, যেন টগবগিয়ে ফোটে লেখাগুলো, মানুষগুলোর বুকে আগুন জেবলে দেয়, আর কিছু না পারুক—মুক্তির লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে জানটাই দিক কমসে কম!'

তারপর হাত তুলে প্রতিটি কথা, অতি স্পষ্ট ক'রে, ধীরে ধীরে উচ্চারণ ক'রে বলে :

'মরণ দিয়েই তো মরণকে জিততে হয়। মরব কি অমনি? মুর্দাগুলোকে জীয়ন্তে কবর থেকে তুলবার জন্য মরব। দুনিয়া জোড়া লাখ লাখ মানুষকে বাঁচাবার জন্য হাজারে হাজারে জান আমাদের দিতে হবে। বুঝলে কি না! আরে মরণ তো সোজা—মানুষকে জাগাবার জন্যে, মানুষের মধ্যে প্রাণ-প্রতিষ্ঠার জন্যে অতি সহজেই প্রাণ দেওয়া যায়!'

মা সামোভার নিয়ে আসে। তাকায় রীবিনের দিকে। ওর কথার ধারে ও ভারে মা যেন নুয়ে পড়ে, ওকে দেখে কেন জানি আজ স্বামীকে মনে পড়ে। অমনি ক'রেই দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ত তার; শার্টের আস্তিন গুটোবার সময় হাতখানা অমনি করেই উঠত। এমনিই অস্থির আর রাগী ছিল মানুষটা, কিন্তু কথা কইতনা। এ লোকটা মনের কথাকে প্রকাশ করতে জানে, তাইতে ওকে অত ভয় করে না।

পাভেল মাথা নেড়ে বলে : 'হ্যাঁ, যা বললেন তা আমরা করবই। আপনি শুধু আমাদের মাল-মশলা দিন, আমরা আলাদা খবরের কাগজ বার করব আপনার জন্য।'

মা ছেলের দিকে তাকিয়ে হাসে। তারপর কাউকে কিছু না ব'লে গায়ের কাপড় টেনে নিয়ে বেরিয়ে যায়।

'বেশ কথা। দেব তোমায় মাল-মশলা। কিন্তু ভাষাটা যেন খুব সোজা ঝরঝরে হয় হে! বাছুরটাও যেন প'ড়ে বুঝতে পারে।' রীবিন বলে।

রান্নাঘরের দরজা খুলে কে একজন ভেতরে আসে।

'আরে এসো, এসো, ইয়েফিম, এসো। হ্যাঁ, এই যে ইয়েফিম! আর এই পাভেল! পাভেল, তোমায় এরই কথা বলছিলাম।'

পাভেলের সামনে দাঁড়িয়ে লম্বামত একটি ছেলে; চওড়া মুখ, সুন্দর চুল, খাটো একটা ভেড়ার লোমের কোট গায়ে, টুপীটা হাতে ধরা। ভ্রূর নীচ দিয়ে তাকিয়ে আছে পাভেলের দিকে। চেহারা দেখে মনে হয় খুব জোয়ান। মোটা গলায় বলে :

'ভারী খুশি হলাম তোমাকে দেখে।' হ্যাণ্ড-শেক করে হাত দু'টো দিয়ে নিজের কাঠি কাঠি চুলগুলির মধ্যে বিলি দেয়। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে চারদিকে। বইয়ের তাকটার দিকে চোখ পড়তেই ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়; পাভেলের দিকে চোখ টিপে রীবিন বলে, 'এই রে, ঠিক চোখ পড়েছে!' ইয়েফিম ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকায়, তারপর বইগুলো নেড়ে নেড়ে দেখে ব'লে ওঠে :

'ওরে বাস্! কত বই! কিন্তু পড়ো কখন? গাঁয়ে থাকলে মেলা সময় পেতে...'

'কিন্তু মেলা ইচ্ছেটি তো আর থাকত না!' পাভেল বলে।

'বারে! তা কেন? লোকের মগজগুলো চাঙ্গা হতে সুরু করেছে। ভূ-তত্ত্ব? সে আবার কি?'

বুঝিয়ে দেয় পাভেল।

বইটা তাকে রাখতে রাখতে বলে : 'আমাদের এ বইয়ে দরকার নেই।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রীবিন বলে : 'অত সব পৃথিবীর খবর জেনে চাষা-ভুষোরা কি করবে। চাষীর হাত থেকে জমিগুলো বেমালুম উড়ে গেল কি ক'রে, তার হদিস্‌টা পেলেই হ'ল। জমিদার ব্যাটারা চোখের ওপর দিয়ে কেমন ক'রে চুরি করল! য়্যাঁ? দুনিয়াটা ঘুরছে না দাঁড়িয়ে আছে তা জেনে কোন ইষ্টিটা লাভ হবে! আমাদের ফসল নিয়ে কথা। তারপর দুনিয়াটা আসমান থেকে লট্‌কে

থাক আর হেঁট মাথা ক'রে বাদুড়-ঝোলাই ঝুলুক, তা আমাদের কি!'

আর একটা বইয়ের নাম পড়ে ইয়েফিম : 'দাসত্বের ইতিহাস, এ কি আমাদেরই কথা?'

একখানা বই ওর হাতে তুলে দিয়ে পাভেল বলে : 'এর মধ্যে আমাদের দেশের ভূমিদাসদের কথা কিছু আছে।'

পাতা উল্টে পাল্টে বইখানা রেখে দিলে ইয়েফিম। বলে :

'এতো সেকেলে কথা।'

'তোমার নিজের জমি আছে?' জিজ্ঞাসা করে পাভেল।

'আলবৎ! আমাদের তিন ভাইয়ের আছে বৈকি কয়েক বিঘা। কিন্তু স্রেফ বালি। বাসন মাজা যায়, বাস্ ঐ পর্যন্ত।'

এক মুহূর্ত থেমে আবার বলে চলে :

'জমি ছাড়ান দিয়ে মজুরী করছি এখন। কি করব! জমি তো পেটে খাওয়াতে পারে না, শুধু পায়ের বেড়ী হ'য়ে আছে। বছর চারেক হল ক্ষেত-মজুরের কাজ করছি। মন্দার সময় গিয়ে সেপাই-এর কাজ ক'রতে হয়। মিখাইলো কাকা বলে, যেও না। সেপাইদের দিয়ে নাকি আজকাল মানুষ ঠ্যাঙগায়। কিন্তু আমি বলি, কেন যাব না? ওসব ঠ্যাঙগান ট্যাঙগান সে হ'ত আগে, স্তেপান রাজিনের সময়ে বা পুগাচভের সময়েও। এখন সব বদলাতে হবে তো! তুমি কি বলো?' প্রশ্ন করে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে পাভেলের দিকে।

হেসে জবাব দেয় পাভেল : 'নিশ্চয়ই, সে আর বলতে! কিন্তু কাজটা খুব সোজা নয়। সৈন্যদের কি বলা আর কেমন ক'রে বলা তা জানা দরকার।'

'তা শিখব!' ইয়েফিম বলে।

ওর দিকে একটা কৌতূহলী দৃষ্টি ফেলে পাভেল বলে : 'অফিসাররা টের পেলে তোমায় গুলি করবে।'

আবার বই দেখতে দেখতে শান্তভাবে বলে ছেলেটি : 'ওদের কাছ থেকে দয়া মায়ার পিত্যেশও করিনে।'

রীবিন বলে : 'চাটা খেয়ে নাও, ইয়েফিম, শিগ্গির শিগ্গির যেতে হবে।'

'আচ্ছা আচ্ছা খাচ্ছি। বল তো বিপ্লব কাকে বলে? বিদ্রোহকে?'

স্নান ক'রে ফিরে এল আন্দ্রিয়েই। মুখ চোখ লাল, এখনও যেন বাষ্প বেরুচ্ছে দেহ থেকে। মুখে একটা বিরস ভাব। নিঃশব্দে ইয়েফিমের করমর্দন ক'রে রীবিন-এর পাশে গিয়ে ব'সে পড়ল; একটু হাসল ওর দিকে তাকিয়ে।

রীবিন ওর হাঁটুতে একটা চাপড় মেরে বলে : কি হে, কি হ'লো, মুখখানা অমন ভার কেন?

'না না, তেমন কিছু নয়।' জবাব দেয় খখল।

ইয়েফিম আন্দ্রিয়েইর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে : 'তুমিও কারখানায় কাজ কর?'

'হাঁ। কেন বল তো!'

রীবিন জবাব দেয়, 'এর আগে কারখানায় কাজ করে এমন মানুষ দেখেনি কখনও। ওর ধারণা ওরা সব আলাদা জীব।'

'কি হিসেবে?' জিজ্ঞাসা করে পাভেল।

ইয়েফিম আন্দ্রিয়েইকে নিরীক্ষণ ক'রে দেখে নিয়ে বলে : 'তোমাদের বাপু বড় কড়া হাড্ডি। আমাদের চাষার হাড্ডির অত ধার নেই।'

রীবিন জবাব দেয় : 'চাষার ব্যাটার অত ছটফটানি নেই কিনা! ওরা চুপ-চাপ শান্ত ভাবে ভুঁয়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। নিজের থাক, আর না থাক পায়ের তলায় মাটি থাকলেই হ'ল। মাটির ছোঁয়াটুকুনি—বাস্ ওতেই তো মজে আছে। কিন্তু কারখানার মজুর! পাখী! পাখী! ঘর নাই, বাড়ী নাই, দেশ মাটি কিছু নাই...আজ হেথা কাল হোথা। ফুড়ুক ফুড়ুক উড়ছে। এই আর কি! মেয়ে-মানুষও ওদের এক ঠেঁয়ে বেঁধে রাখতে পারে না, কিছু হ'ল তো সেলাম ঠুকে ফুড়ুৎ! একটা ছেড়ে আরেকটা ভালোর তালাশে চলল কোথা। কিন্তু চাষা-ভুষোদের তা নয়। তারা কোনখানটিতে যাবে না মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে। আপন ভুঁয়েই থেকে ঘর দুরস্ত ক'রে নিতে চায় ওরা। এই যে তোমার মা এসেছে ফিরে।'

ইয়েফিম পাভেলের কাছে এসে বল্লে : 'তোমার দু'এক আনা বই আমায় পড়তে দিও দিকি!'

'দেব বৈকি!' জবাব দেয় পাভেল।

আগ্রহে চক্‌চক্ ক'রে ওঠে ইয়েফিমের চোখ। বলে :

'শিগ্গিরই ফেরত পাঠাব। আলকাতরা নিয়ে হরদমই তো লোকজন এদিকে আসছে যাচ্ছে।'

রীবিন জামা প'রে বেল্ট এঁটে তৈরী। হাঁক দেয় : 'চল হে!'

বইখানা হাতে নিয়ে ইয়েফিম আনন্দের চীৎকার ক'রে ওঠে : 'কি মজা! খুব পড়'তে পাব!'

ওরা চলে গেলে আন্দ্রিয়েইর দিকে ফিরে পাভেল বলে :

'কি হে কেমন লাগল ওদের, বল দেখি?'

অলস ভঙ্গিতে টেনে টেনে জবাব দেয় খখল :.হুঁ-উ-উঁ! এক জোড়া ঝোড়ো মেঘ আর কি!'

'কি রকম বদলে গেছে মিখাইল!' মা বলে, 'কে বলবে দেখে কারখানায় ও মজুরী করেছে কোনোদিন! একেবারে খাঁটি মুজিক, আর কি সাংঘাতিক হ'য়েছে মানুষটা দেখেছিস্!'

চায়ের গেলাশ হাতে নিয়ে ব'সে ব'সে ভ্রূ কোঁচকায় আন্দ্রিয়েই। পাভেল বলে : 'প্রথম থেকে ছিলে না! থাকলে দেখতে লোকটার মনের মধ্যে কি কাণ্ড কারখানা হ'চ্ছে। তুমি তো মানুষের মন মন ক'রে পাগল! কত কথাই যে বলল! আমি তো থ মেরে গেলাম। ওঃ মানুষের ওপরে ওর কত কম বিশ্বাস! মানুষের কোন দামই নেই ওর কাছে। ঠিকই বলেছে মা, ওকে দানায় পেয়েছে।'

'সে আমি দেখেই বুঝেছি!' বিরস মুখে জবাব দেয় খখল। 'মানুষের মনকে বিষিয়ে দিয়েছে কর্তারা। কিন্তু জনসাধারণ যখন উঠবে, তারা কিছু বাকী রাখবে না। সব ভেঙেগ গুড়িয়ে নিঃশেষ ক'রে দেবে। ফাঁকা মাটি চায় ওরা। একেবারে খাঁ খাঁ করা শূন্য মাটি। তা ওরা সব ফাঁকা ক'রেই নেবে। ধ্বংসের আগুনে পুড়িয়ে দেবে সব।'

একটি একটি ক'রে ধীরে ধীরে কথাগুলো বেরিয়ে আসে। মা বুঝতে পারে অন্য কিছু ওর চিন্তাকে ছেয়ে আছে। কাছে এসে সন্তর্পণে ওর গায়ে হাত দিয়ে বলে : 'ছিঃ আন্দ্রিউশা! অমন করে না। মাথা ঠিক কর।'

'দাঁড়াও, নেন্‌কো আমার, দাঁড়াও।' শান্ত কোমল স্বরে বলে। তারপর সহসা যেন জ্ব'লে ওঠে। টেবিল চাপ্ড়িয়ে চীৎকার ক'রে ওঠে :

'দেখে নিও, পাভেল! একবার খাড়া হ'য়ে দাঁড়াতে দাও চাষীদের। তারাও নিজের হকের মাটি ছিনিয়ে নেবে। প্লেগের পর যেমন সব পুড়িয়ে-ঝুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল ওই কাল ব্যাধির বীজ ধ্বংস করবার জন্য, ওরাও তেমনি সব পুড়িয়ে, ভেঙেগ ছারখার করবে—ওদের জীবনের কালো ইতিহাসটার কোন চিহ্ন রাখবে না।'

ধীরে ধীরে পাভেল বলে : 'তখন ওরাই আমাদের পথের বাধা হ'য়ে দাঁড়াবে।'

'বাধা হ'তে দেব কেন আমরা? রাশ টেনে রাখব। আমরাই ওদের সব চেয়ে আপনার জন। আমাদের ওরা বিশ্বাস করবে এবং আমাদের পথ মেনে নেবে।'

'গাঁয়ের জন্য একটা খবরের কাগজ বার ক'রতে বলছিল আমায় রীবিন।' পাভেল বলে।

'খুব ভাল কথা!'

'একটু আলাপ-সালাপ ক'রে দেখলে হ'ত রীবিনের সাথে। না ক'রে ভালো করিনি।' সংক্ষিপ্ত হাসি হেসে বলে পাভেল।

শান্তভাবে জবাব দেয় খখল : 'ভাবছ কেন তার জন্য? মেলা সময় পাবে তার। তুমি তোমার বেহালার ছড় টেনে যাও, যাদের পায়ের তলায় মাটি নেই, তারা নাচবে ওই তালে তালে। ঠিকই বলেছে রীবিন, আমাদের পায়ের তলার মাটিকে আমরা অনুভব ক'রতে পারি না। চাইও না। মাটিটাকে ধ'রে ক'ষে নাড়া দিতে হবে কিনা! একবার নাড়া দেব বাঁধন ঢিলে হবে। আরেকবার দিলেই বাস্ বাঁধন ছিঁড়ে একেবারে মুক্তি...।'

মা হেসে বলে : 'সবই ভারী সোজা তোর কাছে, হাঁরে আন্দ্রিউশা!

'নয় তো কি?' জীবনটাই তো সোজা!' খখল বলে।

খানিক পরে ব'ললে : 'আমি একটু মাঠের দিকে যাচ্ছি বেড়াতে।

'সেকি রে? এই তো নেয়ে এলি। যা বাতাস বাইরে, শেষে সর্দি-টর্দি লাগবে।'

'একটু হাওয়ায় ঘুরে এলে ভালো লাগবে।'

'দেখো, ঠাণ্ডা লাগে না যেন। তার চেয়ে শুয়ে ঘুমোও।' দরদভরা সুরে পাভেল বলে।

'না। আমি যাচ্ছি।' বলে জামা কাপড় প'রে কিছু-না বলে বেরিয়ে গেল। 'ওর মনটা ভালো যাচ্ছে না।' একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মা বলল।

'সে দিনের পর থেকে মার যেন ওর দিকে টানটা বেড়ে গেছে।' পাভেল বলে।

'তাই নাকি! কি জানি খেয়াল করিনি তো!'

'তোমার মনটাই তো নরম!' কোমল ভাবে বলে পাভেল।

'তোদের—মানে তোর, তোর বন্ধুদের কোন কাজে যদি লাগতে পারতাম! কি ক'রে যে কি ক'রব বুঝতে পারি না কিছুই।'

'ভাবছ কেন? সব শিখে যাবে।'

'অন্তত বিনা ভাবনায় থাকাটাও যদি শিখতে পারতাম!'

'থাক মা, এসব কথা আর না! খালি এটুকু মনে রেখো যে তোমার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নাই।'

উদ্গত কান্নাটাকে পাভেলের কাছ থেকে লুকুবার জন্য তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে গিয়ে ঢোকে মা।

একটু রাত ক'রেই বাড়ী ফেরে আন্দ্রিয়েই। ফিরেই সোজা বিছানায় গিয়ে পড়ে। 'বাপস্ মনে হচ্ছে যেন দশ মাইল হেঁটে এসেছি।'

'কি হে একটু ভাল-টাল লাগল?' জিজ্ঞাসা করে পাভেল।

'এই চোপরাও। কথা-টথা নয়, ঘুমুচ্ছি আমি।' আর একটিও কথা বল্লে না আন্দ্রিয়েই।

একটু পরেই এল ভেসভশিচকফ। সেই চিরকেলে ছেঁড়া ময়লা পোষাক আর মুখে বিরক্তি।

'ইসাইকে খুন করল কে, কিছু শুনেছ না কি হে?'

'না,' সংক্ষিপ্ত জবাব দেয় পাভেল।

'তাহ'লে জবরদস্ত মানুষ পাওয়া গেছল। তা আমিই তো ফতে করতে পারতাম—হেতের শানাচ্ছিলামও। আমারই উচিত ছিল। এ কাজটার জন্য আমার মত যুগ্যি মানুষই বা আর কে ছিল!'

'ওসব কথা ছেড়ে দাও, নিকলাই!' অমায়িক স্বরে বলে পাভেল।

'উরে বাসরে!' স্নেহভরে বলে মা, 'মনখানা তো মাখনের ডেলা। হাঁক-ডাকের বহর দেখ না একবার!'

নিকলাইয়ের বসন্তের দাগ-লাগা মুখখানাও ভালো লাগে এই মুহূর্তে মায়ের।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিকলাই বলে : 'আমার তো আর কিছু করবার যোগ্যতা নাই, এসব ছাড়া! কি ভাবি সর্বদা জানো? আমার জায়গাটা কোথায়। কোথাও তো আমার জায়গা নেই সত্যি! কত লোককে কত কথা বলতে হয় তোমাদের। কি সুন্দর ক'রে বল তোমরা। আমি তো তাও পারি না। সব বুঝি; জুলুম অত্যাচার সব দেখি—কিন্তু কথা ঠিক ঠিক জুগিয়ে বলতে পারি না। আমি একটা জানোয়ার। জানোয়ারের মতই বোবা!'

পাভেলের কাছে এগিয়ে আসে। কিন্তু মাথাটা নীচু হ'য়ে যায়। তাকাতে পারে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টেবিলটা খুটতে থাকে। খানিকক্ষণ পরে বলে, কেমন যেন একেবারে ছেলে মানুষের মত ক'রে; কোথায় গেল ওর সেই ঝাঁঝাল রোখা স্বর, কোথায় গেল কি :

'দেখ, আমাকে খুব শক্ত কাজ দাও তো কিছু। কোন অর্থ নাই, উদ্দেশ্য নাই, শুধু কাঠের বোঝা ব'য়ে ব'য়ে আর আমি বাঁচতে পারছি না। তোমাদের কত কাজ, কাজে তোমরা সবাই ডুবে আছ। আমিও দেখতে পাচ্ছি, কি ভাবে কোন দিকে সব যাচ্ছে—কিন্তু বাস্ এক পাশে দাঁড়িয়ে শুধু দেখছিই আর কাঠ বইছি। এই নিয়ে কি বাঁচা যায়! দাও, ভাই, খুব শক্ত দেখে কিছু কাজ আমায় দাও!'

পাভেল ওর হাতটা ধ'রে কাছে টেনে আনে।

'দেব দেব, তাই দেব।'

পার্টিশনের ওদিক থেকে খখলের গলা শোনা যায় :

'ও হে, আমাদের টাইপ-বসানোর কাজ করবে? শিখিয়ে দোব।'

নিকলাই ওর কাছে এগিয়ে যায়। বলে :

'যদি সত্যি দাও শিখিয়ে, আমার ছুরিটা দিয়ে দেব তোমায়।'

হোঃ হোঃ ক'রে হেসে ওঠে খখল : 'চুলোয় যাক তোমার ছুরি!'

নিকলাই তবু বলে : 'খুব ভাল ছুরি!'

পাভেলও হাসে এবারে। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে প'ড়ে নিকলাই বলে : 'আমায় ঠাট্টা করছ?'

খখল বিছানা থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে আসে। বলে : 'করছিই তো! এই চলনা একটু মাঠের দিকে বেড়িয়ে আসি! কি চমৎকার চাঁদ উঠেছে। যাবে?'

পাভেল বলে : 'চল!'

নিকলাইও ব'লে বসে : 'আমিও যাব। খখলের হাসি শুনব। আমার ভারী ভালো লাগে।'

খখল খিলখিল ক'রে হেসে ওঠে : 'উপহার-টুপহার পাব শুনলে আমারও চমৎকার লাগে হে।'

কাপড়-জামা পরতে রান্না ঘরে যায়। মা হাঁকে : 'গরম জামা পরে নে কিছু।'

ওরা বেরিয়ে গেলে মা জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকে ওদের দিকে। তারপর যীশু-মূর্তির দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলে : 'রক্ষা ক'রো ভগবান, ওদের সহায় হ'য়ো।'

ছাব্বিশ

দিনগুলো এমনি ছুটে চ'লেছে, এমনি ব্যস্ততায় যে মে-দিবসের কথা ভাববার ফুরসুৎও নেই মায়ের। সারা দিনের হৈ হল্লা, ব্যস্ততা আর খাটুনির পর বিছানায় যখন শ্রান্ত দেহটা এলিয়ে পড়ে মার, বুকের ভেতরটা কেমন কেমন যেন ক'রতে থাকে। ভাবে : 'কবে যে শেষ হবে এই সব! দিনটা তাড়াতাড়ি এলেই বাঁচা যায়!'

ভোরবেলা কারখানার ঘণ্টা বাজে—ছেলেরা কাজে যাবে, তাড়াতাড়ি তাদের খাবার দেওয়া। তারপর মস্ত বড় কাজের ফিরিস্তি দিয়ে ছেলেরা চ'লে যায়, সারাদিন খাঁচায়-রাখা কাঠবেড়ালীর মত মা কেবলি এদিক ওদিক ছট্‌ফটিয়ে ছুটোছুটি করে—ওদের খাবার তৈরী, পোস্টারের এই আঠা, কালি...তারপর কারা সব প্রায়ই আসে গা-ঢাকা দিয়ে, পাভেলের জন্য খবর রেখে যায়। এদের সাথে কথা-বার্তা বলা। ওরা যেমনি আসে আবার তেমনি গা-ঢাকা দিয়ে চ'লে যায়। ওদের সেই উত্তেজিত ভাব মার রক্তে যেন নেশা ছড়িয়ে দেয়।

প্রতিদিন ভোর বেলা উঠেই দেখা যায় পাঁচিল, দরজা, এমন কি পুলিশ ফাঁড়ি অবধি পোস্টারে ছেয়ে আছে—মে-দিবসে যোগ দেবার জন্য শ্রমিকদের আহ্বান। কারখানায়ও প্রতিদিন প্রচুর পোস্টার লেগে থাকে। প্রতিদিন পুলিশ-এসে শ্রমিক-বস্তিতে ঢুকে পোস্টারগুলো টেনে টেনে ছিঁড়ে ফেলে। কিন্তু যাবার সময় আবার নতুন প্রচার-পত্র যেন হাওয়ায় উড়ে উড়ে এসে পড়ে মানুষের পায়ের কাছে। শহর থেকে গোয়েন্দার আমদানী হয়। তারা রাস্তার মোড়ে মোড়ে গা-ঢাকা দিয়ে থাকে। দুপুর বেলা টিফিনের ছুটিতে হল্লা ক'রে, স্ফূর্তি ক'রে শ্রমিকের দল আনা-গোনা করে; টিকটিকিরা চোখ রাখে তাদের ওপর। পুলিশ হিমশিম খেয়ে যায়। আড়ালে হাসে শ্রমিকেরা। বুড়োরাও হাসে, টিপ্পনী কাটে।

এখানে সেখানে জটলা, আর পোস্টারগুলো নিয়ে উত্তেজিত আলোচনা। জীবন যেন টগবগ্ করে ফুটছে। এবারের এই বসন্তের মরশুমে জীবনে একটু রং লাগল; কারণ প্রত্যেকেরই মনের তারে কেমন নূতন ঝঞ্ঝনা। কারো বা জ্বালার ওপর জ্বালা;

তারা প্রাণ-ভ'রে গাল দেয় এই জঞ্জালগুলোকে। কারো বা মনে মনে আবছা আবছা একটুখানি কিসের আশা, কিসের ভয়। আর যাদের চেষ্টায় [নেহাৎই দু'চারজন মাত্র—] আজকের এই বিপুল জাগরণ, তারা আনন্দে কি যে করবে ঠিক পায়না।

পাভেল আর আন্দ্রিয়েইর ঘুম গেছে। বাড়ী ফেরে ওরা রাত পোহালে। তখন আর চেহারার দিকে চাওয়া যায়না। মা জানে সারা রাত ওরা ঝোপে জঙ্গলে ব'সে সভা ক'রেছে। সারা রাত্তির সওয়ারী পুলিশ বস্তীর চারধারে টহল দেয়; গোয়েন্দা আর টিকটিকিরা ঘাপটি মেরে থাকে যেখানে সেখানে। একলা কোন মানুষকে দেখলে চিলের মত ছোঁ মারে, আর জটলা দেখলেই ভেঙ্গে দেয়। ধর-পাকড়ও চলে। মার বুঝতে বাকী নেই যে কোন সময় ছেলে দুটোকে ধরে নিয়ে যাবে। নিক, ওদের ধ'রেই নিক। ওদের ভালো হবে।

যে কোন কারণেই হোক সময়-রক্ষকের খুনের ব্যাপারটা ধামা-চাপা পড়ল। দিন দুই পুলিশ একটু নড়াচড়া ক'রেছিল। কিছু খোঁজ-তালাশী আর জন দশ বারো লোককে জিজ্ঞাসা-বাদের পর আর তেমন গা করেনি।

পুলিশপক্ষের মতামতটা জানা যায় মারিয়া কর্সুনোভার কাছ থেকে। মারিয়া কর্সুনোভার অন্য সবার সঙ্গে যেমন খাতির, তেমনি পুলিশের সঙ্গে। কথায় কথায় মায়ের কাছে সে মতামত জানিয়ে যায়। বলে :

'খুনীকে খুঁজে বার করা কি এতই সহজ! সেদিন সকাল থেকে অন্তত শ'খানেক লোকের সঙ্গে ইসাইয়ের দেখা হয়েছে, তার মধ্যে কম করে হলেও অন্তত নব্বইজনের হাত নিশপিশ করেছে একটা ঘুষি মেরে লোকটার মুখ বন্ধ করে দেয়। গত সাত বছর ধরে লোকটা তো আর অন্য সবাইকে কম জ্বালায়নি!'

খখলের পরিবর্তনটা চোখে পড়ে। মুখখানা রোগা হ'য়ে গেছে। চোখের পাতা ফোলা—অত বড় চোখদুটোকে দেখায় আধ-বোজা। নাকের পাশ থেকে ঠোঁটের কোণ পর্যন্ত মিহি মিহি রেখা পড়েছে। সাধারণত কথা বড় একটা কয়না; কিন্তু থেকে থেকে তীব্র আনন্দের ঝংকার ওঠে মনের মধ্যে। ও মুখর হ'য়ে ওঠে তখন। ওর মুখরতায় মূর্ত হয়ে ওঠে আগামী দিনের স্বপ্ন—যে-দিন জয়ী হবে মানুষের বিচার-বুদ্ধি, জয়ী হবে তার মুক্তি-সাধনা। ওর হৃদয়ের আনন্দের ঢেউ নাচিয়ে তোলে ওর শ্রোতাদেরও। এমনি আনন্দের মুহূর্তের আনাগোনা বেড়ে চলে প্রতিদিন।

ইসাইয়ের মৃত্যু নিয়ে জল্পনা-কল্পনা থেমে গেছে। একদিন বাঁকা হাসি হেসে বলে আন্দ্রিয়েই :

'মানুষের কি কাণাকড়ার দাম আছে ওদের কাছে! নিজেদের স্বার্থ কায়েম করার জন্য মানুষগুলোকে কুত্তার মত আমাদের পেছনে লেলিয়ে দেয়, হতভাগাদের দিয়ে দালালী করায়; কিন্তু তারা গেল বা থাকল তার জন্য ওদের কোন মাথা-ব্যথা নেই। শুধু টাকার আণ্ডিল। একটা কড়ি গেলে যেন পাঁজরখানা খ'সে যায় ওদের।'

পাভেল দৃঢ় কণ্ঠে বলে : 'থাক আন্দ্রিয়েই, এসব কথা আর না।'

মা বলে, 'ভালোই তো রে, আবর্জনা জমে ছিল, ফুঁ দিতেই উড়ে গেছে।'

খখল বিষণ্ণভাবে ঘাড় নাড়ে : 'ঠিক কথাই মা কিন্তু তবুও মন শান্ত হয় না।'

কথাটা খখল প্রায়ই বলে। যখনই বলে তার কোন বিশেষ অর্থ থাকে না। ভয়ানক একটা জ্বালা ও তিক্ততা ফুটে ওঠে।

বহু-আকাংক্ষিত, বহু-প্রতীক্ষিত মে-মাসের পয়লা এল।

ভোর-বেলা কারখানার বাঁশীটি বেজে উঠল তেমনি আদেশের সুরে। সারা রাত

চোখের পাতা এক হয়নি মার। আওয়াজ শুনে ধড়ফড় ক'রে উঠল। সামোভার ঠিকঠাক করে রাখা হয়েছিল আগের দিনই। তাড়াতাড়ি ওটাতে আগুন ধরিয়ে দিল মা। রোজকার মত ছেলেদের দরজায় ধাক্কা দিতে গিয়েই, কি জানি মনে হ'ল, ফিরে এল। যেন দাঁত-ব্যথা হয়েছে এমনি-ভাবে মুখে হাত দিয়ে বসে রইল জানালায়।

ফ্যাকাশে আকাশ—ছোট ছোট গোলাপী, সাদা মেঘের টুকরো ছড়িয়ে আছে,—যেন কারখানার বাঁশীর আওয়াজে ভয়-পাওয়া পাখীর দল। মায়ের চোখ দুটি ওই মেঘগুলির 'পর আর কান পাতা আপনার বুকের মধ্যে। মাথা ভারী, শুক্‌নো চোখে নিদ্রা-বিহীন রাত্রির জ্বালা। মনের মধ্যে এক বিচিত্র প্রশান্তি। হৃদ্‌পিণ্ডটা সমান তালে টিপ্‌ টিপ্‌ ক'রে চলেছে। মনটা ঘরোয়া কথার জাবর কাটছে :

'বড্ড শিগ্‌গির সামোভারটায় আগুন দিয়ে ফেললাম। জলটা শুষে যাবে ফুটে ফুটে। বেচারারা ভারী ক্লান্ত, ঘুমুক আজ আর দু'দণ্ড।'

সূর্যের তরুণ ছটা জানালায় এসে হাসিমুখে উঁকি মারে। মা হাত বাড়িয়ে দেয়। রোদের উষ্ণ স্পর্শ লাগে ত্বকে। আরেক হাত দিয়ে মৃদু মৃদু চাপড়ায় সেই জায়গাটি। মুখে অতি কোমল, মন্থর চিন্তার একটুখানি হাসি। ধীরে ধীরে উঠে সামোভারের নলটি সরিয়ে দিলে। তারপর হাত মুখ ধুয়ে বসল উপাসনায়। হাত অনবরত ক্রুশের চিহ্ন ক'রে চলে, ঠোঁট দু'খানি নিঃশব্দে নড়ে। মুখে কিসের আলো জ্বলে ওঠে, আর ডান ভ্রূখানি মৃদু মৃদু নড়ে।

দ্বিতীয়বার বাঁশী বাজে। প্রথমবারের মত অত জোরে নয়, জবরদস্ত ভঙ্গিটাও নেই। গাঢ় ভেজা ভেজা শব্দটার একটু যেন থির্‌ থির্‌ কম্পন। মায়ের মনে হয় আজ যেন একটু বেশীক্ষণ ধরে বাজছে বাঁশীটা।

ও ঘর থেকে খখলের গভীর স্পষ্ট গলাটা শোনা যায় :

'এই পাভেল, শুনছ!'

মেজের ওপর একটা খালি পায়ের শব্দ শোনা যায়। ওদের মধ্যে কে যেন একটা রাজসিক হাই তুলল।

মা ডেকে বলে : 'তোদের চা তৈরী রে!'

পাভেল উৎফুল্ল হ'য়ে উঠে : 'এই উঠছি, মা।'

'সূর্য উঠছে হে!' খখল বলে, 'মেঘও আছে দেখছি। আজ আবার মেঘ টেঘ কেনরে বাপু!'

আলু থালু হয়েই রান্নাঘরে ঢোকে আন্দ্রিয়েই। মেজাজটা আজ ওর ভারী প্রসন্ন। বলে : 'সুপ্রভাত, নেন্‌কো! ঘুমিয়েছিল তো!'

ওর কাছে উঠে আসে মা। স্বরটাকে নীচু ক'রে বলে : 'ওর পাশে পাশেই থাকিস্‌ আজ, বাবা!'

'তা আবার ব'লতে!' ফিস্‌ ফিস্‌ ক'রে বলে ও, 'ভেবোনা কিচ্ছুটি। যতদিন আমরা এক সাথে আছি, কাছে কাছেই থাকব। নিশ্চিন্ত থেকো।'

'কি ফিস্‌ফাস্‌ হচ্ছে হে দু'জনে!' পাভেল এসে শুধায়।

'কি আবার। এই এমনি রে, খোকা।'

'মা আমাকে আজ ভালো করে মুখ টুখ ধুয়ে যেতে বলছেন। মেয়েগুলো দেখছি আজ নয়ন-বাণে ঘায়েল করবে আমায়।' বলতে বলতে সদর দরজার দিকে যায় হাত মুখ ধোবার জন্য।

গানের মত গুন-গুন স্বরে পাভেল বলে, 'জাগো শ্রমিক, সংগ্রামী জনতা জাগো।'

বেলা বাড়ার সাথে সাথে দিনটা পরিষ্কার হ'য়ে যায়। হাওয়া উঠে মেঘ উড়িয়ে নিয়ে গেল। টেবিলে খাবার পরিবেশন করতে করতে অবাক হ'য়ে ভাবে মা, এই তো ছেলে দু'টো আছে, প্রাণ ভ'রে হাসছে, ঠাট্টা তামাশা করছে। এর পরে যে ওদের অদৃষ্টে কি আছে কে জানে! কেন জানি মায়ের ভেতরটা আজ বড় শান্ত। শুধু শান্ত নয়, আনন্দে ভরা।

প্রতীক্ষার সময়টাকে সংক্ষিপ্ত করবার জন্য ধীরে ধীরে অনেকক্ষণ বসে খায় ওরা। পাভেল অভ্যাস মত ধীরে ধীরে চায়ের চিনি নাড়ে, সমান ক'রে রুটিতে নুন মাখায়। খখল টেবিলের তলায় তার পাটা নিয়ে ভারী ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কিছুতেই ঠিক ভাবে রাখতে পারছেনা ওটাকে। চায়ের পেয়ালায় রোদ এসে পড়েছে; তার ছায়া নাচছে দেয়ালে আর ছাদে। তাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে ও।

বলে: 'আমার যখন বছর দশেক বয়েস, একদিন গ্লাসে যে সূর্যের আলো পড়েছে তাই ধরবার জন্য খেপে উঠলাম। নিলুম একটা গেলাস। একটা জায়গায় রোদের টুকরো এসে পড়েছিল। পা টিপে টিপে গিয়ে জোরসে গেলাসটা উপুর করে দিলুম। বাস্, গেলাস ভেঙ্গে হাতটা গেল কেটে; তার ওপর ঠ্যাঙ্গানি। মারটার খেয়ে উঠোনে যেতেই চোখ পড়ল একটা জায়গায় কাদা ছিল খানিকটা, তার ওপরে সূর্যের ছায়াটা পড়েছে। গিয়েই তো গায়ে যত জোর ছিল, দমাদম লাথি সূর্যের ছায়াটার ওপর। বুঝতেই তো পারছ, সমস্তখানি কাদা ছিটে আমার গায়ে। অতএব আরেক প্রস্থ ঠ্যাঙ্গানি। রাগে আকাশের সূর্যটাকে মুখ ভেংচিয়ে চেঁচাতে লাগলুম—ওরে লালমুখো দৈত্যি! লাগেনি তো! কচু লেগেছে! এক ফোঁটাও লাগেনি। গায়ের ঝাল ঐ ক'রে মেটালুম। তবে মনটা একটু শান্ত হ'ল।'

পাভেল হেসে বলে: 'লালমুখো কেন ব'লেছিলে, বলতো।'

'আমাদের রাস্তাটা পেরিয়েই ওধারে একজন কামার থাকত। মস্ত বড় লাল মুখ ছিল তার, আর লাল দাড়ি। বেশ হাসিখুশি আমুদে মানুষ ছিল। আমার কেন জানি মনে হ'ত সূর্যও অমনি দেখতে।'

এসব বাজে কথা মায়ের আর সয় না। বলে: 'এসব কথা ছেড়ে, আজকের তোদের মিছিলের কথা বল তো একটু!'

'ওতো সব ঠিকই হ'য়ে আছে মা! এখন ওই নিয়ে আবার আলোচনা করতে বসলে সব তাল গোল পাকিয়ে যাবে।' খখল বলে ধীরে ধীরে, 'আজ যদি আমাদের সত্যি ধরে, নিকলাই ইভানোভিচ্ এসে ব'লে যাবে তুমি কি করবে।'

দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে একটা মায়ের। বলে: 'বেশ।'

'চল না, একটু বেড়িয়ে আসি।' পাভেল বলে। স্বরটা কেমন স্বপ্নালু।

'না এখন বাইরে যেতে হবে না।' আন্দ্রিয়েই বলে। 'কেন মিছেমিছি পুলিস ব্যাটাদের আগে থাকতেই চটিয়ে রাখবে! তোমায় ভালো ক'রে চেনে সব।'

ছুট্‌তে ছুট্‌তে আসে ফিওদর। মুখ উদ্ভাসিত, গাল দুটো যেন জ্বলন্ত আগুন। ওর আজ আনন্দোদ্দীপ্ত উত্তেজনার ধাক্কায় ওদের মিনিট গোনার ক্লান্তি কেটে গেল। ও বলে:

'জান? আরম্ভ হয়ে গেছে। বেশ সাড়া প'ড়ে গেছে সবার মধ্যে। সব আসছে বেরিয়ে। ওদের মুখগুলোতে আজ যেন কুড়ুলের ধার। ভেসভশ্চিকফ্, ভাসিয়া গুসেফ, আর সাময়লফ কারখানার গেটে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে। অনেকে ফিরে গেছে। দেখবে এস। সময়ও হ'য়েছে। দশটা হল।'

'চল, যাচ্ছি.' পাভেল বলে :

'দেখবে, টিকিনের পর সারা কারখানার লোক বেরিয়ে আসবে।' বলে ছুটে চলে গেল ফিওদর।

'ছেলেটা যেন হাওয়ার মধ্যে মোমবাতিটার মত জ্বলছে।' ব'লে রান্না ঘরে গিয়ে ঢুকল কাপড় বদলাবার জন্য মা।

'কি ব্যাপার! তুমি কোথায় চললে, নেন্‌কো?' আন্দ্রিয়েই জিজ্ঞাসা করে।

'তোদের সঙ্গে।'

আন্দ্রিয়েই গোঁফের ডগা টানে আর পাভেলের দিকে চায়। পাভেলের হাতের আঙুলগুলি চুলের মধ্যে আনাগোনা করে চঞ্চল হ'য়ে। মায়ের কাছে এসে বলে : 'তোমায় আমি কিচ্ছু বলব না মা। আমায়ও তুমি কিছু ব'লো না, কেমন?'

'আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে। ভগবান তোদের সহায় হোন।' অনুচ্চস্বরে বিড় বিড় ক'রে বলে মা।

সাতাশ

বেরিয়ে আসে মা। ব্যগ্র উত্তেজিত একটা চাপা কোলাহলে আকাশ যেন গম্‌গম্‌ করছে। বাড়ীর দরজায় জানালায় দলে দলে মানুষের উৎসুক চোখ চেয়ে আছে পাভেল আর আন্দ্রিয়েইর দিকে। মায়ের চোখের সামনে যেন সরষে ফুল ফুটে ওঠে।

লোকেরা ওদের সম্ভাষণ করে। আজকের সম্ভাষণটা যেন একটু বিশেষ ধরনের। শান্ত স্বরে উচ্চারিত মন্তব্য কানে আসে : 'ওই যে আমাদের নেতারা যায়, দেখেছ!'

'অত-শত জানিনে, নেতা আবার কে!'

'কিছু খারাপ ভেবে তো আর বলিনি!'

ওদিক থেকে একটা মহা-বিরক্ত স্বর শোনা যায় : 'পুলিশ ধ'রবে নির্ঘাত, এবার আর জান নিয়ে ফিরে আসতে হবে না।'

'কেন সেবারও তো ধ'রেছিল!'

একটা জানালা থেকে একজন স্ত্রীলোকের চীৎকার রাস্তায় এসে আছড়ে পড়ে : 'কি ক'রছ, ভেবে-চিন্তে করো। একলাটি নও এখন। মাগ-ছেলে আছে ঘরে।'

পা-কাটা জসিলফ্‌-এর ঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে শোনে : 'এই পাভেল, পাজী, বদমাশ! দেখ না তোর কি হয়! মাথাটি থেঁৎলে দেবে। দেখবি তখন।' মাথাটি বের করে বলে জসিলফ্‌ পা-কাটা গেছে ওর কারখানার কাজে। এখন ভাতা পায় কিছু।

শিউরে উঠে থম্‌কে দাঁড়ায় মা। আগুনের মত একটা রাগের হল্কা ছড়িয়ে যায় সারা দেহে। লোকটার ধ্যাব্‌ড়া ফুলো ফুলো মুখটার দিকে চেয়ে থাকে। গাল দিতে দিতে মাথাটা ভেতরে ঢুকে যায়।

মা এগিয়ে যায়। ছেলের কাছে কাছে থাকবে এবার, আর দূরে যাবে না।

কোন কিছুর দিকেই পাভেল আন্দ্রিয়েইর লক্ষ্য নাই। কোন কথাই ওদের কানে

যায়না। শান্ত, ধীরে, স্থির পদক্ষেপে ওরা চলছে সামনের দিকে।

পথের মধ্যে দেখা হয় মিরনফ্-এর সাথে। মধ্যবয়সী, নম্র, সাচ্চা মানুষ। সবাই মানে। পাভেল শুধায় :

'আপনিও কাজে যাননি আজ, দানিলো ইভানোভিচ্?'

'না, আমার বউ-এর ছেলে হবে। প্রসবের সময় হ'য়ে এসেছে। তাছাড়া আজকের মত দিনে...সবাই কেমন অস্থির...' তারপর স্থির দৃষ্টিতে পাভেল-এর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে ফিস্‌ফিস্ ক'রে :

'লোকে বলছে তোমরা নাকি বড় সাহেবকে ঘাঁটাবার জন্য জানালা দরজা ভেঙে হাঙ্গামা করবে ব'লে মতলব এঁটেছে!'

পাভেল উত্তেজিত হ'য়ে বলে : 'আমরা তো নেশা করিনি!'

'আমরা শুধু আমাদের পতাকা নিয়ে গান গেয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাব,' খখল বলে, 'গান শুনবেন আপনি! আমাদের সংগঠনের গান।'

চিন্তিত ভাবে জবাব দেয় মিরনফ্ : 'আমি জানি তোমাদের দলের সব কথা। পড়িও তোমাদের বই কাগজপত্র। আরে! পেলাগেয়া নিলোভনাও এসেছেন যে! আপনিও ভিড়ে প'ড়েছেন?' বুদ্ধি-দীপ্ত চোখে হাসি দুলিয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে বলে মিরনফ্।

'ন্যায় আর ধর্ম যে-দিকে, মরবার আগে সে-রাস্তার ধুলো একটু গায়ে মেখেনি।'

'চুপ চুপ! তাহ'লে ওই যে শুনছিলাম কারখানায় কাগজ-পত্র চালান করছেন আপনি, কথাটা মিথ্যে নয়!' বলে মিরনফ্।

পাভেল বলে : 'কারা বলে?'

'হুঁ! এই বলে আর কি! আচ্ছা আসি তাহ'লে।'

নিজের সম্বন্ধে কথাগুলো শুনে মনে মনে খুশি হ'য়ে ওঠে মা। নিঃশব্দে হাসে। পাভেল হেসে বলে :

'মায়ের কপালেও এবার শ্রীঘর-দর্শন আছে দেখছি।'

সূর্য ওপরে ওঠে। ফুর্‌ফুরে বাসন্তী সরসতার ওপর ঝ'রে প'ড়ে তার উষ্ণতা, উড়ুক্কু মেঘের দলের ডানা এসেছে ঝিমিয়ে। ধীরে ধীরে আলসে আবেশে ভেসে চলেছে তাদের ফিকে আর স্বচ্ছায়মান ছায়ার দল—রাস্তা, ঘর-বাড়ী ছাদের ওপর দিয়ে, মানুষকে আচ্ছন্ন ক'রে। মনে হয় সারা বস্তীটার দেয়াল পাঁচিলের ধুলো-ময়লা উড়িয়ে, বিস্ত্রস্ত মানুষগুলোর মুখের কালির ছোপকে ধুয়ে মুছে সব বিলকুল সাফ ক'রে দিয়ে গেল। সব কিছু যেন ঝর্‌ঝরে, ঝলমলে হ'য়ে উঠল। কারখানার যন্ত্র-দানবগুলোর সুদূর গুম্‌রানি ছাপিয়ে উঠল জনতার আওয়াজ।

জানালা থেকে ছিট্‌কে ছিট্‌কে আসে, কখনও গালি গালাজ, শাপমন্যি, কখনও গম্ভীর সুচিন্তিত কথা আর উৎসাহের ধ্বনি। আজের এই আশ্চর্য দিনটার বৈচিত্র্যময় জীবন-ছন্দের সাথে পা মিলিয়ে চলার অধিকার পেয়ে মায়ের বুক কৃতজ্ঞতায় ভ'রে আছে। ওদের কথা শুনে মায়ের ইচ্ছা হয় প্রতিবাদ করে, ওদের বুঝিয়ে দেয় কি বিত্ত যে পেয়েছে মা তার খবর শুনিয়ে দেয় ডেকে ডেকে।

একটা গলির মোড়ে প্রায় শ'খানেক লোক জমায়েত হয়েছে। ভেসভ্‌শিচকফ্-এর গলা শুনতে পাওয়া গেল তাদের মধ্য থেকে। অগোছাল এলোমেলো কথা :

'যেমন ক'রে লেবু নিংড়োয় তেমনি ক'রে ওরা আমাদের সব রক্ত নিংড়ে নিচ্ছে।'

কয়েকটা অমার্জিত স্বর এক সাথে গর্জন ক'রে ওঠে : 'ঠিক, ঠিক হ্যায়।'

খখল বলে : 'যাই হোক চেষ্টা করছে লোকটা। যাব নাকি, একটু সাহায্য করব গিয়ে?'

পাভেল বাধা দেবার আগেই ওর হালকা দেহটা সুড়সুড় ক'রে ভিড়ের ফাঁকে গলিয়ে চলে গেল। তারপর মিঠে কণ্ঠের আওয়াজ উঠল :

'বন্ধুগণ! আপনারা শোনেন দুনিয়ায় ইহুদী, জার্মান, ইংরেজ, তাতার এমনি বহু জাতির বাস। কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করিনা। মাত্র দুটি জাতের মানুষ সারা সংসারে—ধনী আর গরীব। জলে তেলে যেমন মিশ খায় না, এরাও তেমনি মিশ খেতে পারে না। হ্যাঁ ঠিক, আলাদা আলাদা মানুষের পোষাক আলাদা, কথা কয় তারা আলাদা ভাষায়। কিন্তু তাকিয়ে দেখুন দেখি একবার বড়লোক ফরাসী জার্মান ইংরেজরা তাদের দেশের মেহনতী মানুষের সাথে কেমন ব্যবহারটা করে! তাহ'লে বুঝবেন যে আমাদের মেহনতী মানুষদের বেলায় সব দেশের বড়লোকরাই এক। সব...'

ভিড়ের মধ্যে হেসে উঠল কে একজন।

'ফয়াসী বলুন, তাতার আর তুর্কী বলুন, সব মেহনতী মানুষের এই এক অবস্থা, এমনি কুকুরের মতই বেঁচে থাকে তারা, এই রুশ দেশে আমরা যেমন আছি।'

ভিড় বাড়তে থাকে। দলের পর দল মানুষ এসে নিঃশব্দে দাঁড়ায় পেছনে ঘাড় উঁচু ক'রে, পায়ের আঙ্গুলে ভর দিয়ে।

আন্দ্রিয়েইর কণ্ঠ আরো ওপরে ওঠে।

'অন্য অন্য দেশের শ্রমিক ভাইয়েরা এই সহজ সত্যটা বুঝেছে। এবং আজ এই পয়লা মে...'

কে চীৎকার ক'রে উঠল, 'পুলিশ...পুলিশ!'

চারজন সওয়ারী পুলিশ ছুটে এল চাবুক মারতে মারতে আর চীৎকার করতে করতে : 'ভাগো, ভাগো সব!'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিরক্ত হ'য়ে ঘোড়ার জন্য পথ ক'রে দিয়ে কয়েকজন গিয়ে উঠল বেড়ার ওপর। একটা স্পর্ধিত কর্কশ কণ্ঠ শোনা যায় :

'শালা শুয়োরের পাল ঘোড়ায় চড়ে এসেছে রে ঘোঁৎ ঘোঁৎ ক'রতে ক'রতে...'

খখল রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইল। দু'জন সওয়ারী তাড়া ক'রল ওর দিকে। ও একদিকে একটু স'রে গেল। সেই মুহূর্তে মা এসে ওকে টেনে নিয়ে গেল।

'তুই না ব'লেছিলি রে পাভেল-এর সাথে সাথে থাকবি! আর সর্দারী ক'রে একা এসেছিস্ মরবার জন্য!'

হেসে বলে খখল : 'ঘাট হয়েছে, মা! হাজার বার মাপ চাইছি।'

ভেতর থেকে সর্বাঙ্গ ছেয়ে কেমন জানি একটা ক্লান্তি আসছে মায়ের। ভাবে এমন ক্লান্তি কেন? এতো ভালো নয়! মাথাটা ঘুরছে। ক্ষণে আনন্দ ক্ষণে বেদনায় মিলিয়ে সে এক অদ্ভুত অনুভূতি! অস্থির হ'য়ে ওঠে মা—কারখানার টিফিনের ঘণ্টা কখন বা বাজবে!

গির্জার কাছে এসে দেখে, সেখানে গির্জার আঙ্গিনায় শ'পাঁচেক তেজী জোয়ান ছোকরা আর ছোট ছোট ছেলেরা সব জড় হয়েছে। ভিড়টা যেন ঢেউয়ের মত ফুলে ফুলে উঠে সামনে পেছনে দুলছে। জনতা চঞ্চল হয়ে মাথা তুলে বহু দূরে কি যেন দেখতে চেষ্টা করছে। কিসের জন্য যেন অধীর ভাবে প্রতীক্ষা করছে তারা। তীব্র উত্তেজনায় সারা বায়ুমণ্ডল কাঁপছে। কেউ কেউ চঞ্চল হ'য়ে এদিক ওদিক করছে।

দেখে মনে হ'চ্ছে যেন কি ক'রবে ঠাওরাতে পাচ্ছে না; কেউ বা বাহাদুরীর ভঙ্গিতে বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছে। মেয়েদের মধ্য থেকে চাপা কলকল ওঠে। পুরুষেরা বিরক্ত হ'য়ে স'রে যায়। মাঝে মাঝে গালি-গালাজ ওঠে। পাঁচমিশেলী এই জনতার ভিড় আক্রোশের এক চাপা গর্জনে যেন থম্‌থম্ করতে থাকে।

নরম, কাঁপা গলায় একজন স্ত্রীলোক বলে, 'মিতেন্‌কা, সাবধানে চলাফেরা কোবো।'

জবাব আসে : 'আমার জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না।'

সিজফের গলা শোনা যায়—মানুষকে অভিভূত করে সে স্বর, শান্ত, স্থির একেবারে বুকের ভেতরে গিয়ে পেঁছিয়।

'না, জোয়ানদের আমরা বিপদের মুখে এগিয়ে দেব না। আমাদের চাইতে ওদের অনেক বেশী বুদ্ধি, বেশী হিম্মৎ। আমাদের সেই জলার মাশুলের ব্যাপারে এগিয়ে এসেছিল কে? ওরা গেল জেলে, আর আমরা ফলটি ভোগ করলাম।'

সব কোলাহল ছাপিয়ে বাঁশী বেজে ওঠে। সারা ভিড়টা শিউরে উঠল। যারা ব'সেছিল তারা উঠে দাঁড়াল। মুহূর্তের জন্য সব স্তব্ধ, সতর্ক। কারো কারো মুখ শুকিয়ে গেল ভয়ে।

পাভেলের বলিষ্ঠ, ভরা কণ্ঠ শোনা যায় : 'বন্ধুগণ!'

একটা গরম বাষ্পের ঝাপটা যেন এসে লাগে চোখে। এক লাফে গিয়ে ছেলের পেছনে দাঁড়ায়। চুম্বকের আকর্ষণে লোহার টুকরোর মত ভিড় ছুটে আসে পাভেলের দিকে। মা ওর মুখের দিকে তাকায়—নির্ভীক, গর্বিত মুখ, প্রদীপ্ত দুই চোখ।

'বন্ধুগণ! আমরা কে এই কথা মুক্তকণ্ঠে দুনিয়াকে জানাবার দিন এসেছে আজ। আমরা শপথ নিয়েছিলাম, আজ আমাদের ঝাণ্ডা ওড়াব। মুক্তির ঝাণ্ডা, ন্যায়ের ঝাণ্ডা!'

একটা সাদা দণ্ড আকাশে ঝল্‌কে উঠল। পরক্ষণেই নেমে এল জনতার মধ্যে, দু-ভাগ হয়ে গেল জনতা। কিছুক্ষণ আড়াল হয়ে থাকার পরে সহস্র উন্মুখ চোখের ওপর দিয়ে মেহনতী জনগণের বিরাট লাল পতাকা উড়ল আকাশে বিরাট কোন পাখীর ছড়ান ডানার মত, পাভেল তার হাত তুলে ধরল। পতাকাটা কাঁপতে লাগল হাওয়ায়। অনেকগুলি হাত এসে ধ'রল সাদা দণ্ডটা। তার মধ্যে মায়ের হাতও আছে।

পাভেল আওয়াজ তোলে : 'মেহনতী জনতা জিন্দাবাদ!'

শত সহস্র কণ্ঠে ওঠে তার প্রতিধ্বনি—'জিন্দাবাদ!'

'সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট শ্রমিক পার্টি জিন্দাবাদ! আমাদের পার্টির বন্ধুগণ! আমাদের পার্টি জিন্দাবাদ—যে পার্টি থেকে আমরা সব কিছু পেয়েছি—সেই পার্টি জিন্দাবাদ!'

জনতা যেন ফুলে ফেঁপে উঠছে। যারা পতাকার মর্ম বোঝে, তারা ছুটে এসে পতাকাকে ঘিরে ধরল। মাজিন, সাময়লফ গুসেফ্‌রা এসে দাঁড়াল পাভেলের পাশে। নিকলাই মাথা নীচু ক'রে ঠেলে ঠেলে পথ ক'রে এগিয়ে আসে। একদল উজ্জ্বল-চোখ ছেলের ধাক্কায় মা ছিট্‌কে যায়। চেনে না মা এদের।

'দুনিয়ার শ্রমিক জিন্দাবাদ!' পাভেল ধ্বনি তোলে।

সহস্র বলিষ্ঠ নন্দিত কণ্ঠ থেকে প্রাণ-মাতান সাড়া জাগে।

মা, নিকলাই আর কার যেন একটা হাত শক্ত ক'রে ধরে। হাঁটু দুটো থর্ থর্

ক'রে কাঁপছে। অশ্রুতে গলা বন্ধ হ'য়ে আসছে, কিন্তু চোখে কান্না নেই। কম্পিত ওষ্ঠের ভেতর দিয়ে অস্ফুট স্বরে বেরিয়ে আসে :

'ওরে আমার সোনার ছেলেরা...'

নিকলাই-এর চওড়া মুখখানা আনন্দে উছলে ওঠে। ঝাণ্ডার দিকে তাকিয়ে কি যেন বলে। হাত বাড়িয়ে দেয় ঝাণ্ডার ডাণ্ডাটাকে ধরবার জন্য। পরক্ষণেই হাতটা জড়িয়ে ধ'রে মায়ের গলা। হাসিতে উচ্ছ্বসিত মুখে চুমোয় চুমোয় ভ'রে দেয় মাকে।

জনতার কোলাহল ছাপিয়ে খখলের উক্রেনীয় কোমল গলাটি ওঠে :

'বন্ধুগণ! আমরা এক নতুন দেবতার নামে লড়াইয়ে নেমেছি। সে দেবতা আমাদের আলোর দেবতা, যুক্তি-বিচার, মিতালী আর সত্যের দেবতা। আমাদের আসল লক্ষ্য এখনও বহুদূর। কিন্তু আমাদের কাঁটার মুকুট হাতের কাছে এসে পেঁছিল বলে। সত্যের জয় হবেই, এতে যার বিশ্বাস নাই, সত্যের জন্য জান দেবার যার সাহস নেই, নিজের ওপর যার ভরসা নেই—সে তফাৎ যাও। আমাদের লক্ষ্যে যার বিশ্বাস আছে আজ আর্জি শুধু তাদের কাছে। তারাই শুধু এগিয়ে এসো। বাকীরা এসো না আমাদের সাথে। কষ্টই পাবে শুধু। পয়লা মে জিন্দাবাদ! স্বাধীন মানুষের ছুটির দিন জিন্দাবাদ!'

ভিড় আরও বেড়ে ওঠে।

পাভেল শক্ত ক'রে ধ'রে ঝাণ্ডাটাকে হাওয়ায় ছড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে যায়। সূর্যের আলোয় ও যেন জ্বল্ জ্বল্ করে; ওর মুখে উদাত্ত প্রাণের আলোর হাসি।

ফিওদর গান ধরে :

> জীর্ণ পৃথিবীর বন্ধন-ডোর
> দুঃখ রাতের তমিস্রা-ঘোর......

ওর সঙ্গে যোগ দেয় আরও দশ বারোটি কণ্ঠ :

> ছিন্ন দীর্ণ করি জাগো!...
> সংগ্রামী জনতা জাগো!

মা ফিওদরের পেছনে পেছনে হাঁটে, সমস্ত মুখ জুড়ে একটি প্রদীপ্ত হাসি; ওর মাথার ওপর দিয়ে গলা বাড়িয়ে ঝাণ্ডা আর ছেলের দিকে তাকিয়ে থাকে। চারদিকে শুধুই আনন্দ-ঝল্‌মল্ মুখ, আর আলো-ঝ'রে-পড়া চোখ। মিছিলের সামনে দিয়ে চলেছে মায়ের ছেলে আর আন্দ্রিয়েই। গাইছে দু'জনে। তাদের সুর ভেসে আসে কানে। আন্দ্রিয়ের উদাত্ত কণ্ঠের নিখাদের সাথে মিশে গেছে পাভেলের গভীর উদাত্ত কণ্ঠ :

> জাগো ভুখা মানুষ ভাই,
> মেহনতী জনতা, জাগো সবাই...

চীৎকার ক'রতে ক'রতে চারদিক থেকে দলে দলে মানুষ ছুটে আসে লাল ঝাণ্ডাকে সেলাম জানাতে। তাদের চীৎকার গানের সাথে এক হ'য়ে মিশে যায়। একদিন ঘরের কোণায় ব'সে ওরা গান গেয়েছিল; সেদিন গলা চেপে গাইতে হয়েছিল। আজ এই পথের বুকে আকাশের তলায় আর বাঁধন নেই। ফুলে ফেঁপে উঠছে গান অসংবৃত বেগে; নির্ভীক প্রতিধ্বনি তুলে তুলে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

আগামী দিনের সুদীর্ঘ পথের পরে ডাক দিচ্ছে মানুষকে, জানিয়ে দিচ্ছে তাদের এ রক্ত-ঝরা দুঃখের পথ। গানের প্রশান্ত শিখায় জ্বলে গেল চলন্ত কালের পেছনে পড়ে থাকা যত কালো কয়লার স্তূপ, মানুষের গতানুগতিক মন; পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল অজানার ভয়।

কে একজন মায়ের পাশে পাশে চ'লছে—ভয়ার্ত মুখে তার সুখ আভা। চীৎকার ক'রে ডাকছে কাকে :

'ওরে মিতিয়া, কোথায় যাচ্ছিস্ তুই?' কাঁপছে গলাটা। চলতে চলতে মা বলে : 'পেছু ডেকোনা গো! যেতে দাও ওকে। ওর জন্যে তোমার কিচ্ছুটি ভয় নেই। পয়লা আমিও ভয় পেয়েছিলুম। আমার ছেলেও গেছে—ওই দেখছ? আগে আগে চলেছে নিশান হাতে নিয়ে।'

'আহাম্মুকের দল, সব যাচ্ছ কোথায়? ওখানে সেপাই সব সেজে আছে।'

সেই লম্বা, রোগা মেয়ে মানুষটি তার হাত-জির্‌জিরে হাত দিয়ে মায়ের হাত-খানা শক্ত ক'রে ধ'রে আবেগে ব'লে ওঠে :

'শোন শোন, গাইছে ওরা। আমার মিতিয়াও গাইছে।'

মা সাহস দেয় : 'ভয় কি? এযে ধর্মের কাজ! একবার ভাব তো যীশু খৃষ্টই কি থাকতেন মানুষ যদি না তাঁর জন্য গিয়ে জান দিত!'

কি সহজ সত্য! মায়ের নিজের মনেই যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। সেই স্ত্রী-লোকটি এখনও শক্ত ক'রে তার হাত ধ'রে আছে—মা তাকিয়ে দেখে তার দিকে। একটা বিস্ময়ের হাসি খেলে যায় মুখে। আবার নিজের মনেই বলে : যীশুখৃষ্টই কি থাকতেন মানুষ যদি না তাঁর জন্য জান দিত?'

কখন সিজফ্ এসে পাশে দাঁড়ায়। বলে :

'আজ একেবারে খোলাখুলি মিছিল ক'রে যাচ্ছি, অ্যাঁ?' গানের সুরে সুরে টুপী নাচিয়ে বলে :

'আবার গানও গাইছি। আর সে কি যেমন তেমন গান! আঃ মা!'

'এসো সৈনিক, ছাড়ো তিতিক্ষা,
জার সাথে রণ,
করো প্রাণ পণ,
সন্তানে দাও দীক্ষা...'

'আজ আর আমার ভয় ডর নেই। ছেলেটা তো মাটির তলায়...'

মায়ের বুক ধড়্ফড়্ ক'রে পাছে পেছনে প'ড়ে থাকে। ধাক্কায় ধাক্কায় একটা বেড়ার ধারে গিয়ে ছিট্‌কে পড়ল—পাশ দিয়ে চলেছে উত্তাল সাগরের ঢেউ—ঢেউয়ের পর ঢেউ—জনতার ঢেউ। অসংখ্য মানুষ। দেখে মায়ের বুক নেচে ওঠে উল্লাসে।

...জাগো শ্রমিক জাগো!
সংগ্রামী জনতা জাগো...

এ যেন তূর্য-নিনাদ—ঘুমন্ত মানুষকে জাগিয়ে দিয়ে, প্রাণে প্রাণে লড়াইয়ের শপথ, কারো প্রাণে বা জ্বলন্ত জিজ্ঞাসা জ্বালিয়ে দিয়ে, গগনে গগনে বাজে। কেউবা অজানা সুখে কাঁপে, কেউ-বা নতুনের পদ-ধ্বনি শোনে। কোথাও ভীরু একটুখানি আশা, কোথাও-বা বহুকালের সঞ্চিত আক্রোশের বাঁধ-ভাংগা জোয়ার জলে।

হাওয়ায় উড়ছে রক্ত-পতাকা। প্রতিটি চোখ সম্মুখের দিকে সেই রক্ত-পতাকায় বাঁধা। কার একটা উল্লাসের চীৎকার শোনা যায় :

'ওই যে যাচ্ছে, ওই ওই! কি সুন্দর দেখাচ্ছে হে তোমাদের!'

ভাষা নেই ওর। প্রাণের ভেতর যে বিপুল আবেগ উথাল-পাথাল করছে আজ সাধারণ মোটা কথা দিয়ে তা বোঝান যায় না। তাই অশ্রাব্য ভাষায় গাল দিতে সুরু করে। কিন্তু কোথা থেকে কালো বিদ্বেষ, দাসত্বের বিদ্বেষ। সূর্যের আলোয় ঘুম-ভাঙ্গা অজগরের মত ফুঁসে ওঠে।

বদ্ধ-মুষ্টি আস্ফালন ক'রে একজন কে চেঁচিয়ে ওঠে একটা জানালা থেকে :

'শালাদের আস্পর্দা দেখনা! জারের বিরুদ্ধে মাথা তুলছে শালারা!'

মায়ের কানে পোঁছায় কথাটা।

বেনো জলের মত ছুটে চলেছে মানুষ—নর এবং নারী। কি এক চঞ্চলতা সকলের মুখে। গানের টানে কেবলি ছুটে আসছে মানুষ আর মানুষ, যেন আগ্নেয়-গিরির বুক ফেটে লাভার স্রোত বইছে। ছেলেকে আর দেখা যায় না। আকাশে উড়ছে তার হাতের রক্ত-নিশান। সেই দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মায়ের মনের পর্দে ছেলের স্বপ্ন-মূর্তি জেগে ওঠে—তার আ-তাম্রবরণ ভ্রূ আর চোখ দুটিতে বিশ্বাসের অগ্নি-শিখা জ্বলছে।

একেবারে পিছিয়ে পড়েছে মা, মিছিলের শেষ প্রান্তে। আশে-পাশে ধীরে-চলার দল চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে পা-পা করে চলছে—শুধু দর্শক ওরা—নির্বিকার, নিরাবেগ। ঘটনার উপসংহার ওদের জানা :

'একদল সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে ইস্কুলে, আর একদল কারখানায়।'

'গভর্ণর এসেছেন।'

'সত্যি!'

'এই তো এলেন। নিজের চক্ষে দেখে এলাম।'

'শালারা ভয় খেয়ে গেছে—নইলে এত সেপাই-পুলিশ, খোদ ম্যাজিস্টর অবধি!' গলাটা খুশি-খুশি শোনায়।

'সোনার ছেলেরা আমার!' মা ভাবে।

কিন্তু যে-সব কথা কানে আসছে তার মধ্যে প্রাণ বা আবেগ নেই। এই লোক-গুলিকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাবার জন্যে তাড়াতাড়ি পা চালায় মা। লোকগুলো কুঁড়ের মতো এত আস্তে আস্তে পা ফেলছিল যে এগিয়ে যেতে মাকে বিশেষ বেগ পেতে হল না।

হঠাৎ মিছিলটা সামনের দিকে যেন ধাক্কা খেয়ে পেছন দিকে হটতে লাগল—ক্রুদ্ধ গর্জন উঠছে ভিড় থেকে। গানের খেই ছুটে যায়—আবার আরো জোরে, আরো উদ্দাম হয়ে আকাশকে প্লাবিত ক'রে দেয়—আবার স্তিমিত হ'য়ে যায়। একে একে সকলের গলা থেমে যায়। কেউ কেউ চেষ্টা ক'রে ধ'রে রাখতে...

> জাগো ভুখা মানুষ ভাই,
> মেহনতী জনতা জাগো সবাই...

কিন্তু সমবেত কণ্ঠের জোর নেই আর। বিশ্বাসের ভিৎ নড়ে গেছে, স্বরে যেন ভয়।

মা পেছন থেকে কিছুই দেখতে বুঝতে পারছে না। ভিড় ঠেলে ঠেলে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করে। পিছিয়ে আসছে পদে পদে ধাক্কা খায় তাদের সাথে। কেউ ভ্রূ কোঁচকায়; কারো মাথা নীচু, কারো মুখে অস্বস্তির হাসি। কেউ বিদ্রূপ ক'রে শিস্ দিচ্ছে। মা সকলের মুখে ভাষা খোঁজে চোখভরা মিনতি নিয়ে। ওই যে পাভেলের স্বর শোনা যায় :

'বন্ধুগণ, সৈন্যরাও আমাদের মতই মানুষ। ওরা আমাদের স্পর্শও করবে না। কেন করবে? যে সত্যের ঝাণ্ডা আমরা হাতে নিয়েছি ও সত্য যে সবার জন্য। আমাদের মত ওদেরও তা একান্ত দরকার। ওরা এখনও বুঝতে পারেনি। কিন্তু বুঝবার দিন এসেছে। সেদিন ওরা খুনে আর ডাকাতদের কথায় রুখবে না আমাদের হাত ধ'রে পাশে এসে দাঁড়াবে ওই মুক্তি-পতাকার তলায়। দেরী ক'রলে চলবে না। ওদের চোখ খুলে দিতে হবে, বোঝাতে হবে সত্যটা। এবং সেজন্যই না থেমে আমাদের এগিয়ে চলতে হবে। আগে, আগে, বন্ধুগণ আগে চল।'

পাভেলের কণ্ঠে দৃঢ়তা। ওর কথাগুলি যেন ঝন্‌ঝন্ ক'রে বেজে উঠল। কিন্তু তবু জনতা ছত্রভঙ্গ হ'তে লাগল। এক এক ক'রে ওরা ফিরে যেতে লাগল বাড়িতে কিংবা বেড়ায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মিছিলের চেহারাটা হয়েছে একটা ফলকের মতো, পুরোভাগে পাভেল—হাতে তার মেহনতী জনগণের রক্ত-পতাকা আকাশের পটে আন্দোলিত হচ্ছে ঘন ঘন। কিংবা মিছিলটাকে দেখাচ্ছে যেন একটা বিরাট-দেহ কালো পাখী। উড়বার জন্য ডানা দিয়েছে মেলে। পাভেল সেই পাখীর ঠোঁট...'

আটাশ

রাস্তাটা যেখানে শেষ হয়েছে সেইখানে মা দেখে ময়দানের পথটা আগলে দাঁড়িয়ে আছে এক ধোঁয়া রংএর পাঁচিল—মানুষের পাঁচিল—মায়ের মনে হয় মানুষগুলোর যেন মুখ নেই। প্রত্যেকের কাঁধের ওপর জ্বল্‌জ্বল্ করছে বেয়নেটের তীক্ষ্ণ, হিম, পাথুরে হাসি। সেই নির্বাক নিশ্চল পাঁচিলটার হিম চেহারা দেখে শ্রমিকরা ঝিমিয়ে গেল—মায়ের বুকের ভেতরটা জমে যেন বরফ হ'য়ে গেল।

মায়ের আশে পাশে চেনা মুখ দেখা যায় না। অচেনাদের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেছে তারা। মা ভিড় ঠেলে এগিয়ে চলে পতাকা লক্ষ্য ক'রে। চেনা মুখ দেখলে তবে বুকে বল পাবে। ধাক্কা খেয়ে একটা লম্বা-পানা, দাড়ী-গোঁফ কামান, এক-চক্ষু মানুষের গায়ে গিয়ে পড়ল। ফিরে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে লোকটা :

'কে গা তুমি?'

মায়ের হাঁটু দুটো কাঁপছে। নিচের ঠোঁটটা কাঁপছে। জবাব দেয় :

'আমি পাভেল ভ্লাসফের মা।'

'তাই নাকি?' জবাব দেয় এক-চোখা মানুষটা।

ওদিকে পাভেলের বক্তৃতা চলেছে : বন্ধুগণ, পেছন ফেরা নয়। আমাদের পথ শুধু সামনে। আর কোন দিক আমরা জানিনে।'

আবহাওয়া থম্‌থমে, শঙ্কায় দুলছে। ওপরে উঠল পতাকা, নিমেষের জন্য যেন কেঁপে উঠল। তারপর সহস্র মানুষের মাথার ওপর ভেসে উঠল তার পূর্ণ বিস্তার। দৃঢ় স্থির গতিতে এগিয়ে চলল পতাকা সৈন্যদের ব্যূহের দিকে। মা কেঁপে উঠে চোখ বুজল। তার নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে এল। হাঁপাতে লাগল মা। চারজন মাত্র—পাভেল, আন্দ্রিয়েই, সাময়লফ্ আর মাজিন—আলাদা হয়ে গেছে ভিড় থেকে।

বাতাসে ভেসে আসে ফিওদর মাজিনের স্বচ্ছ কণ্ঠ :

অসম যুদ্ধের মরণ যজ্ঞে...

কতগুলি গলায় দ্বিতীয় চরণের ধুয়া ওঠে :

হ'লে বলিদান শহীদ বীর!

গানের তালে তালে পা ফেলে এগিয়ে চলেছে চারজন।

ফিওদরের সংকল্প-কঠিন কণ্ঠ যেন উজ্জ্বল রঙের ফিতের মত খুলতে খুলতে চলে, মনুষ্যত্বের শপথকে উদাত্ত আরাবে ঘোষণা করে :

মুক্তি মন্ত্রে লইয়া দীক্ষা...

সাথীদের সমবেত কণ্ঠ ওঠে :

সব তেয়াগিলে সন্ন্যাসী বীর. .

ওধার থেকে কে যেন ঝাঁঝাল স্বরে ব'লে ওঠে :

'গান গাইছে আবার শালারা। শালা কুত্তার-বাচ্চা, নিজেদের মড়া-কান্না কেঁদে নিচ্ছে শালারা!'

দুই হাতে বুক চেপে ধরে মা। তাকায় চার ধারে। চারটে ছেলে নিশান নিয়ে এগিয়ে চলেছে ভয়-ডরশূন্য হ'য়ে—দেখে জনতা যেন এদিক ওদিক দুলছে। ডজন কয়েক চলছে বটে ওদের পিছু পিছু। কিন্তু পায়ে পায়ে একজন ক'রে খসছে, পথটা যেন তেতে উঠছে, পায়ের তলা জ্ব'লে যাচ্ছে :

...এ ক্রুর দিনের হবে অবসান...

গেয়ে চলে ফিওদর। ওর যেন দিব্য-দৃষ্টি খুলে গেছে। এবার বহু বলিষ্ঠ কণ্ঠের কোরাস ওঠে :

...জাগো রে মানুষ, এল আহ্বান...

কিন্তু গানের সাথে সাথে চাপা কানাকানি :

'ওই দেখ দেখ, হুকুম দিলে ব'লে।'

সত্যি সত্যি সামনে থেকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠের হুকুম গর্জে ওঠে :

'বন্দুক নীচু!'

নেমে এ'ল বন্দুকগুলো একটা ঢেউ-খেলান লাইনে। অগ্রগামী পতাকাকে সম্ভাষণ জানায় যেন তাদের ইস্পাতী দেঁতো হাসি।

'আগে বাড়ো!'

এক-চক্ষু লোকটা পকেটে হাত গুঁজে এক পাশে স'রে যায়।

মা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। চোখের পাতা নিশ্চল, নিষ্কম্প।

সৈন্যদের ধূসর ঢেউ সারা পথটা আগলে দাঁড়াল। ঝলমলে বেয়নেটগুলো বাগিয়ে ধ'রে তারা এগিয়ে আসতে লাগল—একটা নিষ্ঠুর কঠিনতা ওদের চোখে মুখে। তাড়াতাড়ি ছেলের কাছে এগিয়ে আসে মা। আন্দ্রিয়েই ততক্ষণে পাভেলকে তার দীর্ঘ দেহটা দিয়ে আড়াল ক'রে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

পাভেল তীক্ষ্ম স্বরে বলে চীৎকার ক'রে : 'স'রে যাও কমরেড, নিজের জায়গায় যাও।'

আন্দ্রিয়েই-এর মাথাটা উঁচু, একটু পেছন দিকে হেলান। হাত দুটো পেছনে। গান গেয়ে চলেছে সে। পাভেল তাকে কাঁধ দিয়ে ধাক্কা দিয়ে বলে :

'স'রে যাও, ঝাণ্ডা আগে যাবে।'

'তফাৎ যাও!' হুকুম আসে। তলোয়ার উঁচিয়ে হুকুম দেয় ক্ষুদে অফিসার তার ক্ষীণ কণ্ঠে। হাঁটু না বাঁকিয়ে সোজা পা উঁচুতে তুলে মার্চ ক'রে এগিয়ে আসে সে। বুটের তলার কঠিন আঘাত খট্ খট্ করে বাজে মাটির ওপর। মা ওই বুকের চক্‌মকানি চেনে।

ওর সামান্য একটু পেছনে থেকে সঙ্গে সঙ্গে চলছে ঢ্যাঙ্গা একটা লোক—কদম-ছাঁট চুল, মোটা এক জোড়া আধ-পাকা গোঁফ, লাল-লাইনিং দেওয়া ছাই রং-এর চওড়া ডোরা একেবারে পাৎলুন-এর পা পর্যন্ত নেমে গেছে। খখলের মত হাঁটে পেছন দিকে হাত রেখে। ওপর দিকে তোলা ঝাঁকড়া ভ্রুজোড়ার তলায় চোখ দুটো স্থির হ'য়ে আছে পাভেলের দিকে।

মায়ের চোখ ঘুরছে সব দিকে কিন্তু দেখছে না বিশেষ কিছু। বিরাট একটা কান্নার রোলে মায়ের বুকটা ছাপা; প্রতি নিশ্বাসের সাথে ফেটে বেরিয়ে আসতে চায়। দম বন্ধ হ'য়ে আসে মায়ের। দুই হাতে বুক চেপে কান্না থামায়। পেছনের ধাক্কায় সামনে এগিয়ে চলে কিছু না ভেবে, যেন জ্ঞান-চৈতন্য নেই। পা টলে। বুঝতে পারে পেছনের ভিড়টা হালকা হ'য়ে আসছে। সামনে থেকে যে হিমেল ঢেউটা এদিক পানে তেড়ে আসছে তারি তোড়ে ভেসে যাচ্ছে সব।

লাল ঝাণ্ডা উঁচু রেখে এগিয়ে যাচ্ছে অগ্রগামীর দল। এগিয়ে আসছে ধোঁয়াটে রং-এর মানুষগুলোর নিরেট ঢেউটা। কাছে, আরো কাছে,...মুখগুলো দেখতে পাচ্ছে মা...বিকট বিকৃত মুখ—রাস্তাটার আড়াআড়ি সমস্তটা জুড়ে সারি-বাঁধা হ'য়ে আছে—রং বেরং-এর চোখগুলি দিয়ে যেন এলোমেলো ফুট্‌কি-কাটা নোংরা হ'লদে একটা লাইন। ছেলেগুলোর বুকের দিকে তাগ্ ক'রে ধরা রয়েছে বন্দুকগুলো। সঙ্গীনের নির্মম ইস্পাত দেওয়া ফলাগুলো ঝক্‌মক্ করছে কঠিন দীপ্তিতে। কারো গায়ে ঠেকল না সঙ্গীনগুলো, এক এক ক'রে সরিয়ে দিতে লাগল। জনতা ছত্রভঙ্গ হ'য়ে গেল।

মা শুনছে পেছনে ত্রস্ত মানুষের ছুটোছুটি। কেউ বলছে :

'চলে যাও সব!'

"পালিয়ে এস ভ্যাসফ্!'

'ফিরে এসো পাভেল!'

ভেসভশ্চিকফ্ চ্যাঁচায় : 'ঝাণ্ডাটা ফেলে দাও, পাভেল। এদিকে দাও, আমি লুকিয়ে রাখছি।'

পতাকার ডাণ্ডাটা এসে ধ'রল ও। হ্যাঁচকা টানে পতাকাটা পিছনে সরে এল খানিক।

'ছেড়ে দাও!' পাভেল চীৎকার করে।

চম্‌কে উঠে হাত ছেড়ে দেয় নিকলাই, যেন হাতটা ওর পুড়ে গেল। ধীরে ধীরে গান থেমে গেল। থেমে গেল মিছিল। কতগুলো লোক পাভেলকে ঘিরে দাঁড়াল একটা নিরেট প্রাচীরের মত। কিন্তু মানবে না পাভেল, ঠেলে এগিয়ে চলে। হঠাৎ একেবারে নিস্তব্ধ হ'য়ে গেল সব—যেন ওপর থেকে ঝ'রে প'ড়ে স্তব্ধতার স্বচ্ছ মেঘখানি গোটা মিছিলটাকে আচ্ছন্ন ক'রে দিল।

মাত্র জন কুড়ি লোক নিশানটাকে ঘিরে আছে; কিন্তু তারা শক্ত পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রাণের উদ্বেগ মাকে ঠেলে নিয়ে আসে সামনে। তা ছাড়া কি যেন বলতে চায় ওদের সে।

'কেড়ে নাও নিশান!' দীর্ঘকায় বৃদ্ধ লোকটি হুকুম দেয়।

ক্ষুদে অফিসার পাভেলের দিকে ছুটে গিয়ে চীৎকার ক'রে ওঠে :

'নিশান ছেড়ে দাও!'

'খবরদার!' হেঁকে ওঠে পাভেল।

পতাকা আকাশের পটে অগ্নি-শিখার মত কাঁপতে থাকে দীপ্ত হ'য়ে। তারপর ডাইনে বাঁয়ে ঝাঁকানি খেয়ে সোজা হ'য়ে দাঁড়ায়। ক্ষুদে অফিসার লাফিয়ে পেছনে হটতে গিয়ে প'ড়ে যায়।

বৃদ্ধ মাটিতে পা আছড়িয়ে আবার হুকুম দেয় : 'গ্রেপ্তার কর।'

কয়েকজন সৈন্য ছুটে আসে। একজন বন্দুকের কুঁদো দিয়ে পতাকা-দণ্ডে আঘাত ক'রে। ঝাণ্ডা পড়ে গিয়ে সৈন্যদের ভিড়ে অদৃশ্য হ'য়ে যায়।

কার তিক্ত কণ্ঠ শোনা যায় : 'ওঃ!'

মা বুক ফাটা আর্তনাদ ক'রে ওঠে আহত পশুর মত। সৈন্যদের মধ্য থেকে স্বচ্ছ স্বরে জবাব আসে পাভেলের : 'মাগো, বিদায়, বিদায়!'

বিদ্যুতের মত দুটো চিন্তা মায়ের মনে খেলে গেল :

'বেঁচে আছে পাভেল! বেঁচে আছে? আমায় মনে করছে!'

'বিদায়, নেন্‌কো আমার।'

আঙ্গুলের ডগায় ভর ক'রে দাঁড়িয়ে দেখতে চেষ্টা ক'রে মা। আন্দ্রিয়েইর মাথাটা দেখা যায়। হাসছে আন্দ্রিয়েই মার দিকে তাকিয়ে। প্রণাম জানাচ্ছে।

'বাছারে আমার...আন্দ্র্যুশা! খোকা!'

ডেকে বলে ওরা : 'বিদায় কম্‌রেড্‌স্‌!'

বহু কণ্ঠের জীর্ণ ক্ষীণ সাড়া জাগে—জানালা, ছাদ, হেথা হোথা থেকে।

কে যেন বুকে আঘাত ক'রল মায়ের। অন্ধকার চোখে তাকিয়ে দেখে মা সামনে ক্ষুদে অফিসারের ধ্যাবড়া লাল মুখটা।

চীৎকার ক'রে অফিসার, 'ভাগো এখান থেকে!'

একবার তাকিয়ে দেখে নিল লোকটাকে মা। দু'টুকরো হ'য়ে ভাঙ্গা পতাকা দণ্ডটা প'ড়ে আছে ওর পায়ের কাছে, এখনও তার মাথায় লাল কাপড়ের একটা টুক্‌রো জড়িয়ে আছে। মা নীচু হ'য়ে তুলে নেয় ওটা। অফিসার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ওকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে হাঁকে :

'ভাগো, ভাগো জল্দি, বলছি।'

সৈন্যদের মধ্য থেকে সঙ্গীতের ধ্বনি ওঠে :

...সংগ্রামী জনতা জাগো...
জাগো শ্রমিক জাগো...

চারদিক যেন ঘুরছে, ভাসছে, কাঁপছে। সারা বাতাস গম্‌গম্‌ করছে টেলিগ্রাফের তারের মত একটা চাপা গুঞ্জনে—অশুভের সংকেত। অফিসার ছুটে যায় :

'এই গান থামাও!' তারপর রাগে চীৎকার ক'রে ওঠে : 'সার্জেণ্ট-মেজর ক্লাইমফ্‌...'

পতাকা-দণ্ডটা যেখানে ফেলেছিল, টলতে টলতে মা গিয়ে সেটাকে আবার তুলে আনে।

'শয়তানগুলোর মুখ বন্ধ করে দাও...'

আপ্রাণ প্রয়াস ক'রে, কেঁপে কেঁপে শেষে থেমে যায় গান। কে একজন মায়ের ঘাড় ধ'রে পিঠে ধাক্কা মেরে বলে : 'ভাগ্‌ ভাগ্‌, ভাগ্‌ এখান থেকে।'

অফিসার চ্যাঁচায় : 'রাস্তা একদম সাফ্‌!'

মায়ের কাছ থেকে কয়েক পা দূরেই আর একটা জটলা। তারা গাল দেয়, শিস্‌ দেয়, চীৎকার করে আর পেছু হটে। ধীরে ধীরে তারা গিয়ে যার যার ঘরে ঢুকল।

একজন অল্পবয়সী সৈন্য মাকে পাশের গলিতে ঠেলে দেয় ধাক্কা দিয়ে :

'হট্‌ শালী! হট্‌!'

এক হাতে পতাকা-দণ্ডটার ওপর ভর দিয়ে আর এক হাতে দেয়াল বা বেড়া ধরে ধীরে ধীরে হাঁটে মা। হাঁটু দু'টোয় যেন বিন্দুমাত্র শক্তি নেই। ওর সামনে দিয়ে পৃষ্ঠ-ভঙ্গ-দেওয়া দল চলেছে। আশে পাশে পেছনে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে সৈন্যরা, 'ভাগ্‌ যাও, ভাগ্‌ যাও!'

চ'লে গেল সৈন্যরা। মা থামে। চারদিকে চায়। রাস্তার মোড়ে শূন্য ময়দানের পথ আগ্‌লে দাঁড়িয়ে আছে একদল সৈন্য। আরও ওদিকে কতগুলি ধূসর মূর্তি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে জনতার দিকে। মায়ের একবার ইচ্ছে হয় ফিরে যায়। কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও পা দু'টো এগিয়ে চলে সামনের দিকে। কাছেই একটা নির্জন সরু গলি। সেখানে গিয়ে ঢোকে।

আবার থামে। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ে। কোথা থেকে জনতার কোলাহল ভেসে আসে।

পতাকা-দণ্ডের ওপর সমস্ত দেহটা ভর দিয়ে আর একবার চলতে আরম্ভ করে মা। সারা শরীর ঘামে নেয়ে গেছে, ভ্রূ কাঁপছে, ঠোঁট নড়ছে, মনের মধ্যে এলোমেলো কথা সব আগুনের ফুল্‌কির মত ছিট্‌কে ছিট্‌কে ওঠে, আর হাতখানা তার ইসারায় আপনা থেকেই নড়ে। ফুলকিগুলো ক্রমশ বেড়ে ওঠে। চীৎকার ক'রে ব'লে ওই কথাগুলোকে দিকে দিকে ছড়িয়ে দেবার একটা অদম্য বাসনা অগ্নি-শিখার মত ধক্‌ ধক্‌ ক'রে জ্বলতে থাকে মায়ের মনে।

গলিটা হঠাৎ বাঁয়ে মোড় ঘুরে গেছে। মোড়ের মাথায়ই আর একটা জটলা।

'সঙ্গীনের খোঁচা খেতে যাবে কে বাবা! এ কি খেলা পেয়েছ!' কে একজন জবরদস্ত গলায় বলে।

'বাপ্‌ রে বাপ্‌! ওদের কাণ্ডটা দেখেছ! বেয়নেটগুলো একেবারে ওদের গা ঘেঁষে চলে গেল আর পাহাড়ের মত ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইল ওরা! ভয় ডর কিচ্ছু নেই!'

'বুঝলে কে? পাভেল ভ্লাসফ!'

'আর ওই খখল?'

'পেছনে হাত দিয়ে হাসছে সর্বক্ষণ!

সবাইকে ঠেলে একেবারে সামনে এসে দাঁড়ায় মা। সসম্মানে স'রে দাঁড়ায় সবাই। মা বলে চীৎকার ক'রে :

'বন্ধুগণ!'

কে যেন হেসে ওঠে।

'আরে দেখ দেখ, হাতে নিশেনটা রয়েছে হে!'

একটা মোটা গলা ধম্‌কে ওঠে : চুপরাও!

মা দুই হাত ছড়িয়ে দেয় : 'প্রভুর দোহাই, শোন তোমরা! শোন! সাচ্চা মানুষ তোমরা! আজ যা ঘট্‌ল, একবার নির্ভয়ে সে-দিকে তাকাও দেখি! আজ যারা ন্যায়ের জন্য—তোমাদের সবার জন্য, ভাবী সন্তানদের জন্য পথে বেরিয়ে এসেছে, তারা আমাদেরই সন্তান! শরীরের রক্ত। সুদিনের আশায় এই ক্রুশখানি নিয়ে বেরিয়েছে তারা। এ জীবন চায় না তারা। তারা নতুন জীবন চায়—একেবারে আলাদা জীবন—সত্যের জীবন—ন্যায়ের জীবন। সব মানুষের জন্য সুখের জীবন চায় তারা...।'

পাঁজরার তলায় হৃদ্‌পিণ্ডটা যেন ফেটে যাচ্ছে। গলা শুকিয়ে কাঠ, আগুনের মত জ্বলছে। মনের গভীরে, অতি গহন গভীরে নতুন নতুন তেজোদ্দীপ্ত কথারা সব জন্ম নিচ্ছে—যে কথা সবাইকে, সব কিছুকে বুকে টেনে নেওয়ার ভাষা—তারা মায়ের জিভের আগল দিলে খুলে। মায়ের কথায় ব্যঞ্জনায় প্রেরণায় সহজের সুর লাগল।

সবাই নির্বাক হ'য়ে শুনছে মায়ের কথা। মনে হয় মায়ের কি যেন ভাবছে ওরা। অদম্য ইচ্ছা হয় ডাক দিয়ে তাদের বলে যে আন্দ্রিয়েই, পাভেল, আর আরও আরও সব মানুষ যাদের ওরা মিলিটারীর হাতে তুলে দিয়েছে, যাদের একলা ফেলে পালিয়ে চ'লে এসেছে—যে পথটা সেই ছেলেরা দেখিয়ে গেছে—সেই পথটাই পথ। কপাল কুঁচকে, মন দিয়ে শুনছে সবাই। একবার ওদের দিকে তাকিয়ে নিয়ে মা বলে যায় জোর দিয়ে মৃদু স্বরে :

'তারা চায় আনন্দ, ঘরে ঘরে আনন্দ। সেই আনন্দের তালাশ ক'রতে বেরিয়েছে আমাদের বুকের ধনেরা। ওরা যীশুখৃষ্টের নামে, সত্যের নামে পথে নেমেছে; যে মিথ্যা দিয়ে, জুলুম দিয়ে লোভীরা আমাদের ছাতির ওপর পাষাণ-চাপা দিয়ে রেখেছে, হাত পা বেঁধে মেরে মেরে আমাদের পিঠের চামড়া তুলেছে, তাদের বিরুদ্ধে লড়ছে ওরা। ওগো ভালো মানুষরা, ওই জন্যই মায়ের বুকের কচি ধনেরা আজ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। একা ওদের জন্য নয়—সবার জন্য, সারা দুনিয়ার জন্য, সারা দুনিয়ার শ্রমিক ভাইদের জন্য—তাদের ছেড়ো না তোমরা, একলা পথে যেতে তাদের দিও না। তোমরাও ওদের পায়ে পায়ে কদম ফেলে চল ওদের সাথে। ওদের ওপর বিশ্বাস রেখো—ওরা তোমাদেরই ছেলে। ওদেরই কলজের মধ্যে সত্য জনম নিলো, ওই সত্যের জন্য ওদের জান কবুল। ওদের ওপর বিশ্বাস রেখে চল।'

হঠাৎ গলা বন্ধ হ'য়ে গেল। টল্‌তে লাগল মা, যেন এখনই অচেতন হ'য়ে প'ড়ে যাবে। কে একজন ধ'রে ফেলল। আর একজন অধীর কণ্ঠে বলে :

'সত্য সত্য কথাই ব'লেছে, একেবারে ভগবানের সত্য! শোন ভাইয়েরা, ভালো

ক'রে শোন।'

দরদ-ভরা আর একটা কণ্ঠ শোনা যায় :

'দেখছ, কি কষ্ট দিচ্ছে নিজেকে!'

'কষ্ট নিজেকে দেবে কি, দিচ্ছে আমাদের; বোকা কিনা, তাই মুখটি বুজে সব জুলুম সইছি। আমরা এতদিন চক্ষু মুদে ছিলাম। এখন আক্কেল না হ'লে আর কবে হ'বে!'

'ভক্তি শ্রদ্ধা যদি কারো থাকে গো তো ওদেরই আছে!' চীৎকার ক'রে বলে কে এক মেয়ে। গলাটা তার কাঁপছে; 'আমার মিতিয়া গো, আমার সোনার ছেলে, মনের মধ্যে একটুকুন কালো ময়লা নাই। কি ভালোই না বাসে ওদের! চলে গেল পেছন পেছন! ঠিক কথাই বলছে গো, এই মেয়েটা! সত্যি তো, ছেলেগুলোন যাবে, জল্লাদের হাতে তাদের কি ক'রে ছেড়ে দিয়ে যাব? অন্যায়টা কি করল ওরা?'

কথাগুলো শুনে মায়ের সারা শরীর কাঁপে। স্তব্ধ ধারায় চোখের জল বয়।

সিজফ্ বলে : 'ঘরে চলগো, মা! অনেক ধকল গেল। আর না আজ।'

মুখখানা ওর ফ্যাকাশে, এলোমেলো দাড়ি। হঠাৎ সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে চারদিকে চায় কঠিন দৃষ্টিতে। আবেগ-ভরা স্বরে বলে :

'তোমরা তো জান, ভাই সব! আমার ছেলেটা কারখানায় কেমন করে ম'ল। ও যদি আজ বেঁচে থাকত, আমিই ওদের সাথে পাঠিয়ে দিতুম। বলতুম—যা ব্যাটা, ওই খাঁটি পথ, ইমানদারীর পথ! চলে যা।'

আর বলতে পারে না সিজফ্। সবাই নির্বাক। সবার মুখ আঁধার। মস্ত বড় নতুন একটা কি যেন ওদের শক্ত ক'রে আঁকড়ে ধরেছে। আজ আর ভয় নেই ওই নতুনকে।

আবার বলতে আরম্ভ করে সিজফ্। শক্ত মুঠোটা ওপরে তুলে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বলে :

'বুড়োটার কথা শোন, ভাই সব! আজ তিপ্পান্ন বছর এই দুনিয়ায় আছি। তার মধ্যে এই কারখানায় কাজ করছি এক কুড়ি উনিশটি বছর। আজ আমার ভাই-পোটাকে ধ'রে নিলে। কি সুন্দর, চালাক চতুর ছেলে! একেবারে ভ্ল্যাসফের পাশে পাশে হাঁটছিল ও, ঝাণ্ডাটার পরেই। ওদের সাথে ও আগু বেড়ে যাচ্ছিল...'

হাতটা নেড়ে একটু সহজ হ'য়ে, মায়ের হাত ধ'রে আবার বলে :

'এই স্ত্রীলোকটি হক্ কথা বলেছে। ছেলেগুলো আমাদের ইমানদারী নিয়ে ন্যায্যভাবে থাকতে চায়। আর আমরা ওদের বাঘের মুখে স'পে দিয়ে পালিয়ে এলুম। হ্যাঁ, পালিয়ে এলুম বইকি! সাচ্চা কথা! চল, পেলাগেয়া নিলোভনা!'

কেঁদে কেঁদে চোখ লাল হয়েছে মায়ের। আর একবার সবার দিকে তাকিয়ে বলে মা : 'বেঁচে থাকুক আমাদের বাছারা। দুনিয়া ওদের।'

সবাই চেয়ে দেখে মাকে, বিষণ্ণ চোখে, শ্রদ্ধায়। চলে যায় মা সকলের দরদের মধ্য দিয়ে। সিজফ্ নিঃশব্দে পথ ক'রে চলে। সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ায় বাক্যহীন মানুষ। কোন এক অদৃশ্য অচেনা শক্তির টানে সাথে সাথে যায় তারা। যেতে যেতে চাপা স্বরে কথা কয়।

বাড়ীর দোরগোড়ায় এসে মা ওদের দিকে ফিরে হাতের লাঠিটায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে কোমল স্বরে বলে : 'ধন্যবাদ!' প্রাণের অতল থেকে সেই নূতন কথাটা আবার ভেসে উঠল। বললে আবার :

'মানুষ জান দিয়েছিল ব'লেই আমরা যীশুকে পেয়েছিলাম। নইলে কোথায় পেতাম তাঁকে?'

নিঃশব্দে মায়ের দিকে তাকায় জনতা।

আরেকবার তাদের নমস্কার জানিয়ে ঘরের মধ্যে চ'লে যায় মা। সিজফ্‌ও যায় সাথে সাথে।

জনতা তবু দাঁড়িয়ে থাকে, চাপা স্বরে কথা কয়। তারপর ধীরে ধীরে চ'লে যায় তারা।

(প্রথম খণ্ড সমাপ্ত)

দ্বিতীয় খণ্ড

একটা বিচিত্র অবস্থার মধ্যে মায়ের বাকী দিনটা কাটল। দেহে মনে অসীম ক্লান্তি। খানিক আগেই যা ঘটে গেল তার স্মৃতিগুলি কুয়াশার জালের মত ছেয়ে রইল চেতনা। চোখের সামনে ধোঁয়াটে বিন্দুর মত হ'য়ে নেচে বেড়াতে লাগল সেই বেঁটে অফিসারটার মূর্তি। আন্দ্রিয়েইর হাসি-ভরা দুই চোখ—পাভেলের মুখ... ঠিক যেন ব্রোঞ্জের মূর্তি...মনের মধ্যে একেবারে গেঁথে আছে।

কাজ নেই, লক্ষ্য নেই—এঘর ওঘর করে মা। একবার জানালায় গিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ব'সে থাকে; আবার ওঠে, এদিক ওদিক করে; খুট্ করে কোথাও একটু শব্দ হ'লেই চম্‌কে উঠে চারদিকে চায়। ঢক ঢক ক'রে জল খায়; না মেটে তেষ্টা, না নেবে বুকের আগুন। দিনটা যেন চিরে একেবারে দু'খান হ'য়ে গেছে। প্রথম অর্ধেকটায় একটা অর্থ ছিল, কিন্তু দ্বিতীয় অর্ধেকটায় আর তা নেই; কে যেন নিঃশেষ ক'রে শুষে নিয়ে গেছে। এখন মরুভূমির মত খাঁ খাঁ করছে চারদিক। আর সেই শূন্যতার মধ্যে হাহাকারের মত ভেসে বেড়াচ্ছে এই প্রশ্নটা :

তারপর এখন?

করসুনভা আসে। হাত পা ছুঁড়ে ডুকরে কাঁদে; রাগে মাটিতে পা আছড়ায়; কাকে উদ্দেশ করে গাল দেয়; মাকে বোঝায়, আশ্বাস দেয়। কিন্তু অটল পাষাণ-মূর্তি হ'য়ে আছে মা।

'সারা কারখানার মানুষ খেপে গেছে গো! শুনেছ? একেবারে গোটা কারখানা।' বলে করসুনভা।

মায়ের মাথাটা ক্ষীণভাবে নড়ে একটু; ক্ষীণভাবে হয়তো বা একটা 'হুঁ' বেরিয়ে আসে। কিন্তু মনটা থাকে পেছন পানে—ফুরিয়ে গেল, সব ফুরিয়ে গেল, চলে গেল আন্দ্রিয়েই আর পাভেল। কাঁদতে পারছেনা মা। কান্না আসে না, হৃদ্‌পিণ্ডটা যেন কুঁকড়ে শুকিয়ে যাচ্ছে। ঠোঁট মুখ সব শুকনো কাঠ। থরথর্ ক'রে হাত কাঁপে। মেরুদণ্ড বেয়ে কনকনে ঠাণ্ডা—কি যেন একটা শিরশিরিয়ে উঠছে।

সাঁঝের বেলা পুলিশ এল। মা অবাকও হ'লনা, ভয়ও পেলনা। খুশিতে ডগমগ হ'য়ে জুতো মচ্‌মচিয়ে হৈহৈ ক'রে সব ঢুকল এসে। হলদে-মুখো অফিসারটা দাঁত বের ক'রে হেসে বলে :

'কি গো, কেমন আছ? এই তিনবার দেখা হ'ল, তাই না?'

মার শুকনো জিভ্‌টা ঠোঁটের ওপর চলাফেরা করে। কথা কয়না মা। বকর্ বকর্ ক'রে চলে লোকটা। হাজার রকম উপদেশ দেয়। মা বোঝে লোকটা মজা পেয়েছে খুব। কিন্তু আজ আর বিরক্ত লাগেনা। হয়ত কথাগুলো মার কানেও যায়না। কিন্তু লোকটা যখন বলল :

'তোমারই তো দোষ, মাদাম! জার আর ঈশ্বরকে যে ভক্তি করতে হয়, ছেলেকে তা শেখাতে পারোনি।'

মা নিরুৎসুকভাবে জবাব দিলে দরজার কাছে দাঁড়িয়েই :

'কি করেছি না করেছি সে বিচার আমাদের ছেলেরাই করবে। তারা এত কষ্ট সইছে, আর আমরা তাদের একলা ফেলে চলে এসেছি, এ অপরাধের কি ঘাট আছে? এর বিচার যদি কেউ করতে পারে ওরাই পারবে।'

'কি?' চীৎকার ক'রে ওঠে অফিসার, 'জোরে বল।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মা বলে : 'বলেছি যে, ছেলেরাই আমাদের বিচার করবে।'

রাগের ঝোঁকে কি যেন বলল অফিসার। মা শুনতে পেলে না।

আবার খানাতল্লাশী। মারিয়া করসুনভাকে সাক্ষী রাখা হ'ল। মায়ের পাশেই দাঁড়িয়ে রইল সে। কিন্তু একটিবারও তাকাল না তার দিকে। অফিসার নানারকম সওয়াল করে। মাথাটা প্রায় মাটির সাথে ঠেকিয়ে সেলাম ক'রে প্রতিবার একই জবাব দেয় করসুনভা :

'আমি জানিনা, হুজুর! বোকা মুখ্যু মানুষ! ফিরি ক'রে দুঃখু ধান্দা করে খাই। আমি ওসব জানিনা।'

গোঁফে মোচড় দিয়ে গর্জে ওঠেন হুজুর : 'না জান তো, চোপরাও।' আবার আভূমি সেলাম করে ও। আর সাহেব পেছন ফিরলেই মুখ ভ্যাংচায়। মায়ের কানে কানে বলে : 'মুখপোড়াটাকে দিলাম ভেংচে।'

মাকে তল্লাশী করতে বলে ওকে। চোখ মিট্‌মিট্ ক'রে অফিসারের দিকে তাকিয়ে যেন ভারী ভয়ে পেয়েছে এমনি ভাবে বলে :

'হুজুর, মা-বাপ। বাপের জন্মে তো এসব করিনি হুজুর। কি করে করতে হয়, জানিনে।'

রাগে হুংকার দিয়ে মাটিতে লাথি মারে সাহেব। চোখ নামিয়ে নেয় করসুনভা। মায়ের কানে কানে বলে :

'তুমি বরং বোতাম টোতামগুলো খুলতে শুরু কর।'

মায়ের জামা কাপড় দেখতে দেখতে মুখ লাল হ'য়ে ওঠে ওর। চাপা গলায় বলে : 'খেঁকী কুকুর কোথাকার!'

ঘরের কোণায়, যেখানে মায়ের দেহ-তল্লাশী করছিল মারিয়া, সেদিকে তাকিয়ে চীৎকার ক'রে ওঠে সাহেব : 'এই, কি বলাবলি করছ ওখানে?'

ভীতস্বরে বলে মারিয়া : 'মেয়েলী কথা সাহেব!'

অবশেষে কাগজ দিয়ে সই করতে হুকুম করে মাকে।

অনভ্যস্ত হাতে বড় বড় জ্বলজ্বলে অক্ষরে লিখলে মা—

'পেলাগেয়া ভ্লাসফা—অমুক শ্রমিকের বিধবা-পত্নী।'

মুখ বিকৃত করে ঝেঁঝে ওঠে সাহেব : 'ও আবার কি লিখলে? ও কেন লিখেছ? তারপর, ঘোঁৎ ক'রে হেসে উঠে বলে : 'জানোয়ার!'

ওরা চ'লে গেলে মা জানালার কাছেই দাঁড়িয়ে রইল; হাত দুটোকে বুকের ওপর আড় ক'রে রাখা—পলকহীন চোখ সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। ভ্রুদুটো ওপর দিকে টানা, ঠোঁট আর চোঁয়াল এমনি শক্ত ক'রে চাপা যে ব্যথা করতে লাগল। কেরোসিনের ডিবেটার তেল ফুরিয়ে গেছে; সলতেটা চড়্‌চড়্ করছে, আলো কাঁপছে থির্‌থির্ ক'রে। ফুঁ দিয়ে বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে অন্ধকারেই দাঁড়িয়ে রইল। বুকের রন্ধ্র রন্ধ্র এমনি একটা নির্লক্ষ্য আকুতিতে ভরে আছে যে হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দনের স্থানটুকুও বুঝি নেই। বহুক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে রইল মা। চোখ আর পা টন টন করতে লাগল। মারিয়া জানালায় দাঁড়িয়ে জড়ানো গলায় ডাকে :

'ঘুমিয়েছ গো পেলাগেয়া নিলোভনা? আঃ বেচারা। কি কষ্ট! যাও, শুয়ে পড়গে!'

কাপড় না ছেড়েই লুটিয়ে পড়ল মা বিছানায়। নিমেষে গভীর ঘুমে একেবারে আচ্ছন্ন হ'য়ে গেল। স্বপ্ন দেখতে লাগল :

জলার ওধারে শহরের রাস্তার ধারে হলদে রংএর বালু-ঢিপিটার পাশ দিয়ে যেন যাচ্ছে মা। সেখান থেকে বালু কাটছে শ্রমিকরা। পাভেল দাঁড়িয়ে আছে তার ওপরে আর গাইছে :

...জাগো শ্রমিক জাগো
সংগ্রামী জনতা জাগো...

আন্দ্রিয়েইর মত মিঠে, সুরেলা গলা। নীল আকাশের পটে ওর মূর্তিটা অতি স্পষ্ট, যেন জ্বল জ্বল্ করছে। চোখে হাতের আড়াল দিয়ে মূর্তিটির দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে মা চলেছে। ছেলের কাছে আসতে লজ্জা করছে। কারণ মা অন্তঃসত্ত্বা। কোলে আর একটি শিশু। যেতে যেতে এক মাঠে এসে পড়ল। ছেলের দল বল খেলছে। বলটা লাল রংএর। কোলের শিশু বলটার জন্য হাত বাড়িয়ে কাঁদতে আরম্ভ করে। মা স্তনটা ওর মুখে পুরে দিয়ে ফিরে চলে। কিন্তু কোথায় গেল পাভেল? সৈন্যরা ওর দিকে সংগীন উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মা ছুটতে ছুটতে মাঠের মাঝখানে গির্জেটায় এসে ঢোকে। ধব্‌ধবে শাদা প্রকাণ্ড বড় গির্জা—বিরাট উঁচু, কোথায় গিয়ে পৌঁচেছে তার চুড়ো, ঠিকঠিকানা নেই। গির্জাটা যেন মেঘ দিয়ে গড়া, সারা অঙ্গ মেঘের।—কাকে যেন কবর দেওয়া হচ্ছে। মস্ত বড় কালো কফিন, সেঁটে বন্ধ করা। শাদা পোষাক পরা পুরুতের দল গির্জা প্রদক্ষিণ করতে করতে গাইছে :

আ হা হা! ঐ আসে
যীশু আসে
মৃত্যুঞ্জয়ী মহামানব আসে

ধূপদানী হাতে পুরুতটি মায়ের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হেসে মাথা ঝুঁকিয়ে নমস্কার জানায়। ঝলমলে লাল চুল লোকটির, আর সাময়লফ্‌এর মত হাসিখুশি মুখ। গির্জার গম্বুজটার পাশ দিয়ে সূর্যের কিরণ এসে পড়ছে, যেন শুভ্র উত্তরীয় উড়ছে কার। ভেতর থেকে সংগীতের ধ্বনি আসছে :

...যীশু আসে
মৃত্যুঞ্জয়ী মহামানব আসে

উপাসনা-হলের মাঝামাঝি এসে পুরুত হঠাৎ থেমে গিয়ে চীৎকার করে উঠলেন : 'গ্রেপ্তার কর!'

কোথায় চ'লে গেল তার পুরুতের বেশ! ওপরের ওষ্ঠের ওপর জেগে উঠল পাক-ধরা খাড়া খাড়া জোড়া গোঁফ। ভয়ে সব ছুটে পালাতে লাগল। ধূপদানী-হাতে সেই ডিকনটিও পালায়। ধূপ-দানীটি তার হাত থেকে ছিট্‌কে প'ড়ে গেল। দুই হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরল সে। ধরণটা যেন খখলের মত। মা ছুটন্ত মানুষগুলোর পায়ের কাছে ফেলে দিল শিশুটিকে। কিন্তু আশ্চর্য। কেউ মাড়াল না। উলঙ্গ ছোট্ট দেহটার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে সব পাশ কাটিয়ে চ'লে গেল। মা নতজানু হ'য়ে ব'সে পড়ে সকলকে মিনতি জানায় :

'ফেলে যেও না, ফেলে যেও না ওকে! সঙ্গে নিয়ে যাও তোমরা!'

খখল গায় :...মৃত্যুঞ্জয়ী মহামানব আসে... সেই হাসি মুখ; সেই হাত পেছনে দিয়ে দাঁড়ানর ভঙ্গি।

কাঠ-বোঝাই এক গাড়ী। নিকলাই চলছে পাশে পাশে। মা শিশুটিকে তুলে গাড়ীর ওপর রাখল। নিকলাই বলে : 'এবারে তাহ'লে একটা কাজের মত কাজ আমায় দিয়েছে ওরা।'

নোংরা রাস্তা। জানালা থেকে মাথা বাড়িয়ে আছে লোকেরা। কেউ গাল দিচ্ছে, কেউ শিস্; কেউ বা হাত নাড়ছে। সুন্দর পরিষ্কার দিন। ঝলমলে রোদ, কিন্তু কোথাও এক ফোঁটা ছায়া নেই।

খখল চেঁচিয়ে ওঠে : 'গাওগো, নেন্‌কোর্মাণ গাও। এই তো জীবন!'

গায় খখল। ওর সুরের ঝংকারে সব শব্দ, সব কোলাহল ডুবে যায়। মা ওর পেছন পেছন চলছে। হঠাৎ হোঁচট খেয়ে প'ড়ে গেল মা একটা অতল অন্ধকার গর্তে। অমনি চারধারের শূন্যতা ছুটে এল তাড়া করে...

ধড়্‌ফড়্ ক'রে জেগে উঠল মা। বরফের মত ঠান্ডা ঘামে সর্বাঙ্গ নাওয়া। কোন দৈত্যের মস্ত বড় একখানা কঠিন হাত যেন চেপে বসেছে ওর বুকের ওপর; একটু একটু করে মোচড় কষে নিংড়োচ্ছে কলজেটা ফুর্তি করে। কারখানার বাঁশী শ্রমিকদের ডেকে ডেকে বেজে চলেছে। শব্দ শুনে মনে হ'ল, দ্বিতীয়বারের বাঁশী, ঘরময় বই কাগজ-পত্র ছড়ান। চারদিক তচনচ। মেজেতে কাদা-মাখা বুটের দাগ।

মা উঠেই ঘর গোছাতে লেগে গেল। না ধুল মুখ, না করল প্রার্থনা। রান্না-ঘরে ভাঙা পতাকা-দণ্ডের টুকরোটা প'ড়ে আছে। লাল কাপড়ের একটা ফালি তখনও লেগে আছে। মা ওটাকে তুলে স্টোভে গুঁজে দিতে গেল। কিন্তু কি ভেবে কাপড়ের ফালিটুকু খুলে নিয়ে সযত্নে ভাঁজ ক'রে পকেটে রেখে দিল। তারপর লাঠিটাকে হাঁটুতে ভেংগে স্টোভে ফেলে দিল। জল ঢেলে ঢেলে সব ঘর দরজা ধুয়ে ফিট্‌ফাট করল, সামোভার জ্বালল। তারপর এসে বসল জানালায়।

'এর পর?'

প্রশ্নটা আবার নতুন করে মনে পড়ে যায়।

হঠাৎ মনে পড়ে প্রার্থনা তো করা হয়নি। উঠে গিয়ে খৃষ্টের মূর্তির সামনে দাঁড়ায়। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই বসে পড়ে আবার। বুকের ভেতরটা একেবারে খালি—খাঁ খাঁ করছে চারদিক!

অদ্ভুত নিরালা নিঝুম চারদিক। কাল যারা মুক্ত কণ্ঠে চীৎকার করেছে পথে পথে, আজ কোথায় তারা? আজি কি তারা ঘরের নিরালায় ব'সে গতকালের আশ্চর্য দিনটার কথাই ভাবছে!

বহুকাল আগের একটা ঘটনা মনে প'ড়ে গেল। জমিদার জাউসাইলভদের বাড়ীর হাতার মধ্যে একটা বড় পুকুর ছিল। কি জলপদ্মই না ফুটে থাকত। একদিন যাচ্ছিল ও ওধার দিয়ে। শরৎকাল। পুকুরটার মাঝখানে একটা নৌকা। ছায়া-নিবিড় শান্ত পুকুর, হলদে রংএর ঝরা-পাতায় ছাওয়া। নৌকাটা এমনি স্থির, নিশ্চল, মনে হয় ওই রূপ-রচনার মধ্যে জলের সাথে কেউ ওটাকে আঠা দিয়ে সেঁটে রেখেছে। কোন মানুষ নেই, দাঁড়-বৈঠে নেই। ঝিমিয়ে পড়া জলের বুকে, একরাশ মড়া পাতার পরিবেশে, একলা নিরালা নাওখানিকে অমন নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, কি একটা নাম-হীন নিবিড় গভীর ব্যথায় তরুণ মেয়ের হৃদয় হুহু ক'রে উঠেছিল। বহুক্ষণ পাড়ে দাঁড়িয়ে রইল। অবাক হ'য়ে ভাবছিল, কেই বা আর কেনই বা নাও-খানিকে অমন ক'রে মাঝ-পুকুরে ঠেলে দিয়েছে। সে-দিনই সন্ধ্যে-বেলায় শুনেছিল জমিদারীর কোন এক কর্মচারীর বৌ ডুবে মরেছে। ছোট্টখাট্ট দেখতে ছিল বৌটি,

ভারী তাড়াতাড়ি হাঁটত; মাথায় সেকি এক রাশ দুরন্ত কালো চুল ছিল।

মা হাত দিয়ে কপালটা মুছে নিল। গতকালের স্মৃতির মধ্যে চিন্তাগুলি কেঁপে কেঁপে ভাসতে লাগল। তারি আবেশে মোহগ্রস্তের মত কতক্ষণ যে ব'সে রইল মা আনমনে গেলাসের ঠাণ্ডা চায়ের দিকে তাকিয়ে তার ঠিক নেই। ভারী ইচ্ছে হ'তে লাগল, ওর সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে এমনি কোন সহজ-সরল জ্ঞানী মানুষের সাথে ব'সে যদি দুটো কথা কইতে পারত!

যেন ওর এই প্রবল ইচ্ছারই টানে নিকলাই ইভানোভিচ্‌ এল দুপুরের দিকে। তবুও ওকে দেখেই হঠাৎ ভয়ে শিউরে উঠল মা। তার সম্ভাষণের কোনো জবাব না দিয়ে বলল...

'কেন এসেছ তুমি! ঠিক হয়নি আসা। দেখতে পেলে ধ'রে নেবে তোমায়ও।'

মায়ের হাতে শক্ত একটা চাপ দিয়ে, চশমাটা ঠিক করে পরে নিল। তারপর মায়ের কাছে স'রে এসে বলল :

'পাভেল, আন্দ্রিয়েই আর আমার মধ্যে কথাবার্তা হয়েছে যে ওরা গ্রেপ্তার হ'লেই আপনাকে শহরে নিয়ে যাব। খানাতল্লাশী টল্লাশী হয়েছে?' খুব তাড়াতাড়ি বলল কথাগুলো। স্বরটা কোমল, আর ব্যগ্রতায় ভরা।

উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে মা : 'করে আবার নি। কোন রকম লজ্জা-বিবেকের বালাই না রেখে তন্ন তন্ন করে তল্লাশী করেছে।'

নিকলাই কাঁধ-ঝাঁকিয়ে বলে : 'লজ্জা থাকবে কোন দুঃখে?' তারপর খুলে বলল কেন মায়ের শহরে যাওয়া দরকার।

সব মন দিয়ে শুনে একটুখানি ফিকে হাসি হাসল মা। ভালো ক'রে বুঝল না নিকলাইর যুক্তি; কিন্তু গভীর স্নেহ-মিশ্রিত একটা বিশ্বাস মনকে অভিভূত করে দিল। অবাক হয় মা, কেমন করে এল এ বিশ্বাস।

'খোকা যদি তাই ব'লে থাকে, আর তোমার যদি ..' মা বলে।

'আরে তার জন্য ভাবছেন কেন?' বাধা দিয়ে বলে নিকলাই, 'আমি তো একাই থাকি, কালেভদ্রে কখনও বোনটা আসে দু'চারদিনের জন্য।'

'তোমার ঘাড়ে চেপে তাই বলে খাবনা আমি।' মা বলে।

'বেশ তো, কাজ করবেন। খোঁজা যাবেখন।' বলে নিকলাই।

কাজ! মায়ের কাছে কাজ বলতেই তার ছেলের কাজ, আন্দ্রিয়েইর কাজ, তাদের কর্ম-সাথীদের কাজ। মা নিকলাইএর কাছ ঘেঁষে আসে, তার চোখের ভেতর দিয়ে মর্মের মধ্যে তাকিয়ে বলে :

'সত্যি? সত্যি পাবো?'

'আমার বাড়ীতে আর তেমন কাজ কি? আমি তো বিয়ে থাওয়া করিনি!'

মা একটু মিইয়ে গিয়ে জবাব দেয় : 'না না আমি সে-কথা বলিনি। সংসারের কাজকর্মের কথা ভাবছিলাম না!' একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস বেরিয়ে আসে। নিকলাই তাহ'লে বুঝতে পারেনি। একটু দুঃখ হয়। কিন্তু নিকলাইএর হ্রস্ব-দৃষ্টি চোখ দুইটি হাসিতে উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। একটু চিন্তাকুল ভাবে বলে :

'পাভেলের সাথে যদি দেখা-সাক্ষাতের অনুমতি পান দেখবেন তো কোথাকার চাষীরা নাকি তাদের জন্য কাগজ বার করতে ব'লেছিল, তাদের ঠিকানাটা আনতে পারেন কিনা...'

মা খুশি হ'য়ে ওঠে : 'আমি চিনি তো তাদের! ঠিক খুঁজে বার করব। তারপর

তুমি যেমন বলবে। আমায় কেউ সন্দেহ করবে না। কেন? কারখানায় বে-আইনী কাগজপত্র নিয়ে যাইনি?'

হঠাৎ অদম্য ইচ্ছে হয়, এক গাছা লাঠি হাতে নিয়ে, মুসাফিরী থলি একটা কাঁধে ফেলে বেরিয়ে পড়বে মা, পথে; বন পেরিয়ে গাঁয়ের পর গাঁ পেরিয়ে যতদূর পথ গেছে শুধু চলবে আর চলবে। ব্যাকুল ভাবে বলে :

'দাও, দাও, আমায়। দেখো, ঠিক পারব। যেখানে বলবে যাব। ঠিক পথ খুঁজে খুঁজে চিনে নেব। শীতে গ্রীষ্মে কোন সময় মুসাফিরের পা থামবে না। যতদিন না কবরে গিয়ে সেঁধুই শুধু চলব আর চলব! বেশ হবে না?'

মুসাফির! গৃহ নেই, আশ্রয় নেই... শুধু পথ! গাঁয়ে গাঁয়ে, দোরে দোরে প্রভু যীশুর নামে ভিক্ষের ঝুলি পেতে শুধু পথ চলা! বুকটা টন্ টন্ করে ভাবতে।

নিকলাই পরম আদরে মায়ের হাতখানা নিজের উষ্ণ হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে :

'আচ্ছা, এসব কথা পরে হবে'খন।'

মা কেঁদে ওঠে : 'কি বলছ! আমাদেরই ছেলে ওরা, এই কলজের রক্ত! ওরাই যদি অমন করে নিজেদের বিলিয়ে দিতে পারে... হেসে খেলে জান অবধি দিতে পারে... আর আমি তো মা!'

নিকলাইএর মুখ সাদা হয়ে যায়। নিবিড় ভাবে তাকিয়ে থাকে মায়ের মুখের দিকে। অতি শান্ত ভাবে বলে :

'এমন কথা তো কোন দিন শুনিনি!'

'কথা! কথা কোথায়! কথা তো নেই।' গভীর বিষাদে মাথাটাকে ঝাঁকুনি দিয়ে মা বলে : 'মায়ের বুকটা খুলে দেখাবার মত কথা যদি থাকত...'

মা উঠে দাঁড়ায়। প্রচণ্ড একটা শক্তি বুকের ভিতরের কথাগুলোকে যেন ঠেলে বার করে দিচ্ছে। মাথাটা ঘুরে ওঠে।

'তা হ'লে যে কেঁদে ভাসাবে সব! পাথরও গলে যাবে...'

আর একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিকলাইও উঠে পড়ে।

'তাহ'লে ঠিক রইল! আমার বাড়ী আসছেন!'

মাথা নাড়ে মা।

'দেরী টেরী করবেন না। যত শিগ্গির পারেন চলে আসবেন। নয়তো ভাবনায় থাকব।'

মা অবাক হ'য়ে ওর দিকে তাকায়। ভাবনায় থাকবে? কেন? মা কে ওর? মাথা নুয়ে, মুখে সলজ্জ বিব্রত একটুখানি হাসি নিয়ে ঐ তো দাঁড়িয়ে আছে মানুষটা... ক্ষীণ-দৃষ্টি, দেহটা ঝুঁকে পড়েছে, নেহাৎ সাধারণ যেমন তেমন গোছের কালো কোটটা গায়ে। চেহারাটা স্বভাবের একেবারেই বিপরীত...

চোখ নীচু ক'রে শুধায় :

'টাকা পয়সা আছে তো?'

'না।'

তাড়াতাড়ি পকেট থেকে টাকা বের ক'রে মার হাতে দেয়।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটুখানি হাসে মা। বলে :

'তোমার সব কিছুই সৃষ্টি-ছাড়া। তোমার কাছে দেখছি টাকা টাকা নয়, খোলাম কুচি। কত মানুষ একটা কড়ির জন্য আত্মাটাকেও বিকিয়ে দেয়। আর তুমি?

কানা-কড়ির দাম নেই পয়সার! অন্যের খাতিরে দয়া করে যেন পয়সাটা তোমার পকেটে ফেলে রাখ, তাই না?'

নিকলাই একটু হেসে বলে : 'বাপ্‌স্‌! টাকা পয়সা? বিচ্ছিরি জিনিষ!

গভীর ভাবে মায়ের হাতটায় চাপ দিয়ে বিদায় নেয় নিকলাই। যাবার সময় আর একবার বলে যায় : 'শিগ্গির শিগ্গির চ'লে আসবেন কিন্তু।'

সঙ্গে সঙ্গে দোরগোড়া অবধি যায় মা। যেতে যেতে ভাবে : 'এত ভালো লোক, কিন্তু আমার জন্য ওর মায়া নেই!'

ব্যাপারটা ভালো লাগছে কি খারাপ লাগছে বুঝতে পারে না মা।

দুই

নিকলাইএর সাথে দেখা হবার তিন দিন পর, মা রওনা হল শহরে। ঘোড়ার গাড়ীর ওপর ট্রাঙ্ক দুটো চাপান। বস্তীর সীমানা পেরিয়ে মাঠের পথে নেমে হঠাৎ পেছন ফিরে তাকায় মা। এতক্ষণে যেন বুঝতে পারে সত্যি চিরদিনের মত বস্তী ছেড়ে চলে যাচ্ছে, বস্তী নয়—বসতি, যেখানে জীবনের সুদীর্ঘ কালো অধ্যায়টা কেটে গেল দুঃখে কষ্টে। নূতন দিনের শুরু হয়েছিল এখানেই। একেবারে নূতন তার স্বাদ। নূতন আনন্দ বেদনার মধ্য দিয়ে দিনগুলো তর তর্‌ ক'রে চলে যাচ্ছিল বেশ।

মাটির বুকে কারখানাটা ছড়িয়ে আছে তার কালো কালো চিমনীগুলো উঁচিয়ে। যেন একটা বিরাট মাকড়সা। তারি গা ঘেঁষে, জলার ধারে ধারে শ্রমিকদের এক তলা বাড়ীগুলো—কুঁজো হ'য়ে, গায়ে গায়ে হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে আছে। ধোঁয়ায় কালো তাদের দেহ ক্ষুদে ক্ষুদে আলো-প্রাণহীন জানালাগুলো দিয়ে করুণ চোখে পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকে যেন। বাড়ীগুলোর ওপর দিয়ে দেখা যায় গির্জা। কারখানার মতই ওটার গভীর লাল রং। কিন্তু চিম্‌নীর মত অতদূর উঠতে পারেনি তার চুড়ো।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মা ব্লাউজের কলারটা ঠিক করে নেয়। কলারটা যেন গলায় এঁটে বসেছিল।

ঘোড়ার পিঠে লাগামটা নেড়ে দিয়ে গাড়োয়ান হাঁকে : 'হট্‌ হট্‌।' অদ্ভুত মানুষ; ধনুকের মত বাঁকা পা, মুখ দেখে বয়েস বোঝবার যো নেই; বিরল-কেশ মাথা, দাড়ির অবস্থাও তাই। চুল দাড়ির রং যেন জ্বলে গেছে। নিষ্প্রভ দুই চোখ। চলবার সময় শরীরটাকে এমনভাবে মোচড় দিয়ে চলে যে ডাইনে বাঁয়ে ফেরা বোঝা যায় না।

নিস্তেজ স্বরে আবার হাঁকে : 'হট্‌ হট্‌।' বাঁকা পায়ের কাদা-লাগা ভারী বুট মাটিতে ঠোকে... ভঙ্গি দেখলে হাসি পায়। চারদিকে তাকায় মা... ধূ ধূ শূন্য মাঠের বিস্তার... মায়ের প্রাণটার মতই শূন্য।

গভীর উষ্ণ বালির ওপর দিয়ে গাড়ীটা চলেছে। ঘোড়া দুটোর মাথা নড়ে যান্ত্রিক ভাবে। চাকায় চাকায় ধুলো ওড়ে। পেছনে প'ড়ে থাকে সেই ধুলোর জাল, বালির মধ্যে ঘোড়ার ক্ষুরের ছপ্‌ ছপ্‌ আর পুরানো গাড়ীটার ঝ্যাঁকর ঝ্যাঁকর শব্দ!

শহরের এক প্রান্তে নিরালা একটা রাস্তার ধারে নিকোলাইএর আস্তানা।

দোতলা বাড়ী; তারি একধারের অংশ। তিনখানি ঘর। কতকালের যে পুরোনো বাড়ীটা তার ঠিক নেই। ওর অংশটার সামনে ছোট্ট একটু বাগান। লিলাক আর একেসিয়ার ডাল, আর পপলার গাছের রুপোলী পাতারা ওর ঘর তিনখানির জানালা দিয়ে উঁকি মারে। ভেতরে সব ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে; শান্ত পরিবেশ। মেঝের ওপর গাছপাতার মৌন ছায়ার নাচ, দেয়াল ঘেঁষে বইএর তাকের সার। তাদের ওপর দিয়ে, গম্ভীর গম্ভীর কাদের যেন ছবি ঝোলান।

ছোট্ট ঘরখানিতে নিয়ে এল মাকে নিকলাই। একটা জানালা বাগানের দিকে। আর একটার সামনে ছোট্ট একটা ঘাসে-ঢাকা উঠোন। বইএর আলমারী আর তাকে দেয়াল ঠাসা। জিজ্ঞাসা করল নিকলাই :

'তোমার কষ্ট হবে না তো এখানে?'

মা বলে : 'আমি রান্নাঘরেই বেশ থাকব। বেশ সুন্দর পরিষ্কার তক্‌তকে ঘরটা...'

নিকলাই ঘাবড়ে যায়। ভালো ক'রে গুছিয়ে কথা বলতে জানেনা নিকলাই। কোনো মতে মাকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত রাজী হয় মা। মুহূর্তে খুশি হয়ে ওঠে নিকলাই।

ভেতরের আবহাওয়া যেন এক বিশেষ রকম। অতি সহজে বুক ভ'রে নিশ্বাস নেওয়া যায়। খুব ভালও লাগে। কিন্তু একটু জোরে কথা কইতেই লজ্জা করে। পাঁচিলের গায়ে ওই শান্ত চিন্তাশীল মুখগুলি তাকিয়ে আছে, কি গভীর একাগ্রতায়। ওই সমাহিত ভাবনার জগৎটাকে ব্যাহত করতে ইচ্ছে যায়না।

জানালার ওপরকার ফুলের টবগুলি দেখে মা বলে : 'জল দিতে হবে গাছগুলোতে।'

অপরাধীর মত জবাব দেয় গৃহ-কর্তা : 'ওঃ! হাঁ। আমি বড় ভালোবাসি ওগুলোকে, কিন্তু, এই... আমার বড় সময় কম, তাই দেখতে পারিনা।'

মা লক্ষ্য করে, নিজের সুন্দর স্বচ্ছন্দ ঘরখানায়ও নিকলাইএর কেমন যেন একটা বিরক্তির ভাব। যেন কোন কিছুর সাথে খাপ খাচ্ছেনা ওর। হাতের রোগা আঙুল-গুলো দিয়ে চশমাটা ঠিক করতে করতে প্রত্যেকটি জিনিষ একেবারে চোখের কাছে এনে দেখে। এদিক ওদিক নজর গেলে ট্যারা চোখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চায়। কখনও বা কোন জিনিষ মুখের কাছে ধ'রে যেন চোখ দিয়ে অনুভব করে। মায়ের মত ও-ও যেন নূতন এসেছে এখানে। তাই সবই ওর কাছে নতুন, অচেনা। এতে যেন সহজ হ'য়ে ওঠে মা। ওর পেছন পেছন ঘোরে, জিজ্ঞাসা ক'রে জেনে নেয় কোথায় কি আছে, কখন খায়, কখন শোয়, কখন কি করে। নিয়ম মাফিক কিছুই করতে পারে না, স্বভাবও শোধরাতে পারেনা নিকলাই। অপরাধের কুণ্ঠা জেগে থাকে ওর কথায়।

মা গাছগুলিতে জল দেয়; পিয়ানোর ওপর ছড়ান স্বর-লিপিগুলি গুছিয়ে রাখে। সামোভারটা ওর সামনে নিয়ে এসে দেখিয়ে বলে : 'দেখ তো এটা কি হয়েছে! কতকাল মাজনি!'

ও আস্তে আস্তে হাত বুলায় নিষ্প্রভ পাত্রটার ওপর। ভালো করে দেখবার জন্যে নাকের সামনে তুলে ধরে। মা হাসে।

রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে সারা দিনটার দিকে ফিরে তাকায় মা। বালিশ থেকে মাথা তুলে চারদিকে চায়। বিশ্বাস হ'তে চায় না। এই প্রথম অন্যের বাড়ীতে থাকা। একটি রাতও কোথায় থাকেনি কখনও। কিন্তু কই, কোন অসুবিধা বা

অস্বস্তি তো লাগছে না! নিকলাইয়ের কথা ভাবে। মনটা কেমন সিক্ত হ'য়ে আসে। ওর জীবনকে আর একটু সুন্দর করে তুলতে হবে, একটু স্নেহ দেখাতে হবে ওকে— যে স্নেহ ওর জীবনে আনবে আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য। একটা কথা কইতে পারে না গুছিয়ে, একটা কোন কাজ ক'রতে পারে না। কিছু ক'রতে গেলেই ভণ্ডুল করে বসে, হাসি পায় দেখলে। কি পরিষ্কার স্বচ্ছ জ্ঞান-দীপ্ত ওর চোখ, অথচ একেবারে শিশুর মত সরল মানুষ। সাধারণ মানুষের সঙ্গে ওর মিল নেই, সাধারণ মানুষের চেয়ে ও আলাদা। মানুষটার জন্য মায়ের মনটা কেমন করে। তারপর মনে হয় ছেলের কথা। পয়লা মের ঘটনাগুলো ভেসে ওঠে চোখের সামনে। পয়লা মে—শব্দটা যেন ক্ষণে ক্ষণে নতুন হ'য়ে বুকের দুয়ারে ঘা দেয়, নতুনতর অর্থ-গৌরবে। দিনটাও যেমনি মহিমায় সমুজ্জ্বল, সেদিনকার বেদনায়ও তেমনি মহিমা আছে। কারো জবরদস্ত ঘুষি খেয়ে মুখ থুবড়ে মাটিতে প'ড়বে তুমি। কিন্তু এ আঘাতে মাথা তোমার হেঁট হবে না। দুঃখে দুঃখে কলজেটা ঝাঁঝরা হ'য়ে যাবে। ধিকি ধিকি জ্বলতে থাকবে আক্রোশের আগুন। আর তার তেজে বাঁকা মেরুদণ্ডটা সোজা হ'য়ে উঠবে।

শহুরে রাত। কত রকম রকম অচেনা শব্দ সব ভেসে আসে খোলা জানালার পথে, বাগানের গাছের পাতাগুলোতে শিরশিরানি জাগিয়ে—কত দূর দূরান্তর থেকে শ্রান্তিতে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে...ঘরের মধ্যে এসে তারা মিলিয়ে যায়। শোনে আর ভাবে মা...'আমাদের ছেলেরাও খোলা দুনিয়ার পথে বেরুচ্ছে...'

পরদিন সকালে উঠে মা সামোভারটা মেজে চক্‌চকে ক'রল। তারপর চায়ের জল ফুটিয়ে, নিঃশব্দে খাবার টেবিল সাজিয়ে রান্নাঘরে এসে ব'সল; নিকলাইএর ঘুম ভাঙেনি তখনও। খানিক পরে একটু কাসির শব্দ ক'রে দরজা খুলল নিকলাই। এক হাতে তার চশমা, আর এক হাত সার্টের কলারে। সম্ভাষণের আদান-প্রদানের পর মা সামোভার নিয়ে খাবার ঘরে গেল, নিকলাই গেল হাতমুখ ধুতে। মেজেতে জল প'ড়ে একাকার। এই সাবান পড়ে এই দাঁতের বুরুশ পড়ে...নিজের আনাড়ী-পনায় বিরক্ত হ'য়ে নিজেকে গাল দেয়।

খেতে খেতে মাকে বলে : 'জেম্‌ৎস্‌ভো বোর্ডে ভারী বিশ্রী কাজ আমার—চাষীরা কি ভাবে ম'রে হেজে শেষ হ'য়ে যাচ্ছে, তাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখ আর কি।'

অপরাধীর হাসি হাসে।

'না খেতে পেয়ে অকালেই মরছে সব। বাচ্চাগুলো আধমরা হ'য়ে জন্মায়। তারপর শীত আসবার আগেই সব মাছির মত মরে। এসব আমরা জানি, কারণ যে কি তাও জানি। ওই সব দেখবার জন্যই মাস মাস মাইনে খাচ্ছি...'

'তুমি ছাত্র?' মা শুধায়।

'না ছাত্র নই, মাস্টার। আমার বাবা ভিয়াংকাতে এক কারখানার ম্যানেজার। কিন্তু আমি মাস্টারী নিয়ে গাঁয়েই চ'লে গেলাম। বই পত্র দিতাম চাষীদের। ধরা প'ড়ে যাই। দিলে জেল ঠুকে। জেল থেকে বেরিয়ে এক বইএর দোকানে কাজ নিলাম। নিজেরই অসাবধানতায় আবার জেলে যেতে হ'ল। সেখান থেকে দিলে আর্কেঞ্জেলে অন্তরীণ ক'রে। কিন্তু সেখানকার কর্তাদের খুশি রাখতে পারলাম না। সুতরাং জাহাজে তুলে নিলে। শ্বেত-সাগরের পারে ছোট্ট একটা গাঁয়ে ছেড়ে দিলে। সেখানে পাঁচ বচ্ছর ছিলুম।'

অতি শান্ত, নিরুদ্বেগ স্বরে কথাগুলো আলোকোজ্জ্বল ঘরখানার মধ্যে ঝ'রে

ঝ'রে পড়ে। এমনি-ধারা অনেক কাহিনী শ্বনেছে মা। কিন্তু সবাই এই রকম ঠাণ্ডা। আশ্চর্য! এমনি ক'রে বলে যেন কপালের লেখন ছিল তাই ঘ'টে গেল।

'আজ আমার বোন আসছে,' বলে নিকলাই।

'বিয়ে হয়েছে?'

'বিধবা। ওর স্বামীকে পাঠায় সাইবেরিয়ায়। সেখান থেকে সে পালিয়ে আসে। দ্ব'বছর আগে ইউরোপে সে মারা গেছে যক্ষ্মায়।'

'তোমার চেয়ে ছোট?'

'না, ছ'বছরের বড়। ব'লতে গেলে ওর দৌলতেই আমার সব। শ্বনবেন ওর পিয়ানোর হাত। কি চমৎকার যে বাজায়! এটা ওরই পিয়ানো। এখানকার প্রায় সব জিনিষই ওর। শ্বধ্ব বইগ্বলো আমার।'

'কোথায় থাকে তোমার বোন?'

'যত্র তত্র,' হেসে বলে নিকলাই, 'যেখানেই কোন জবরদস্ত মেয়ের দরকার হয়, সেখানেই ওকে যেতে হয়।'

'সেও কি এই—কাজ করে?' মা শ্বধায়।

'হ্যাঁ' জবাব দেয় নিকলাই।

খানিক পরেই ও বেরিয়ে গেল। মা ভাবতে লাগল—ওদের কাজের কথা... আর যারা আশ্চর্য নিষ্ঠায়, নিঃশব্দে ঐ কাজের মধ্যে নিজেদের বিলিয়ে দিচ্ছে দিনের পর দিন—তাদের কথা। পাহাড়ের ভয়াল নৈশ মহিমার সামনে দাঁড়িয়ে যেমন মনে হয় তেমনি তুচ্ছ ক্ষ্বদ্র মনে হয় নিজেকে।

কালো-পোষাক পরা, দীঘল চেহারার একটি স্বদর্শনা মহিলা এল দ্বপ্বরের দিকে। মা দোর খ্বলে দিলে। হাতের থলিটি মাটিতে নামিয়ে সে এসে মায়ের হাত জড়িয়ে ধ'রে বলল :

'আপনি পাভেল মিখাইলোভিচের মা, তাই না?'

মহিলার পোষাকের জল্বশ দেখে হকচকিয়ে গেছে মা। কোনমতে একটা হাঁ ব'লে ফেলে।

'আপনাকে যেমনটি ভেবেছিলাম, ঠিক মিলে গেছে। আমার ভাই আমাকে লিখেছিল আপনি এখানে থাকবেন।' আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাথা থেকে টুপিটা খ্বলতে খ্বলতে বলে, 'তাছাড়া পাভেল মিখাইলোভিচের সাথে আমার বহ্বকালের বন্ধ্বত্ব। তার কাছ থেকেও শ্বনেছি আপনার কথা।'

গলাটা মোটা, কথা বলে অতি ধীরে ধীরে। কিন্তু চলা-ফেরা, নড়াচড়ায় যেমন ক্ষিপ্র তেমনি জবরদস্ত। চোখগ্বলি এখনও তর্বণী মেয়ের চোখ; কিন্তু গালের পাশে মিহি মিহি রেখা; আর কাণের পাশের চুলের মধ্যে র্বপোলী ছিটে ঝিকমিক করে। বললে :

'বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে। এক কাপ কফি পেতে পারি?'

'এই যে এক্ষ্বনি ক'রে দিচ্ছি।' বলে মা। তারপর আলমারী খ্বলে কফির সাজসরঞ্জাম গোছাতে গোছাতে শ্বধায় :

'কি বলছিলেন আপনি? পাভেল আমার কথা বলেছে?'

পকেট থেকে একটা চামড়ার সিগারেট-কেস্ বের ক'রে একটা সিগারেট ধরিয়ে বলে : 'সে কি আর অল্প স্বল্প!' তারপর ঘরের মধ্যে পায়চারী ক'রতে ক'রতে জিজ্ঞাসা করে মাকে :

'ছেলের জন্য খুব ভয় পেয়েছেন তো।'

কফিপাত্রের নীচে স্পিরিট-বার্নারের ছোট্ট নীল শিখাটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে খুশির হাসি হাসে মা। খুশিতে ভরে উঠেছে মনটা, এই স্ত্রীলোকটির সামনে এতক্ষণ যতটা আড়ষ্ট লাগছিল, তা কেটে গেছে।

মনে মনে ভাবে মা : 'ছেলে আমার, তার মায়ের কথা বলেছে বন্ধুকে! তারপর ধীরে ধীরে বলে : 'সহজ তো নয়। প্রথমটায় খুব ভাবনা হ'ত, কিন্তু এখন জানি কিনা যে ও একা নয়...'

মহিলার মুখের দিকে তাকিয়ে মা বলে : 'আপনার নামটা কি?'

'সোফিয়া।'

মা নিরীক্ষণ ক'রে দেখে সোফিয়ার মুখ। কি যেন আছে ওর মুখে। দৃপ্ত, উচ্চকিত, মানুষকে সাথে সাথে উড়িয়ে নিয়ে যায় ঝোড়ো হাওয়ার মত।

'জেলে তো ওরা বেশীদিন থাকে না' সোফিয়া বলে নিশ্চয়তার সুরে, 'এখন মামলা টামলা গুলো তাড়াতাড়ি শেষ ক'রলেই বাঁচা যায়! ওদের নির্বাসনে পাঠানোর সংগে সংগেই পাভেল মিখাইলোভিচের পালানোর ব্যবস্থা ক'রতে হবে। এদিকে ওকে ভীষণ দরকার।'

ভালো ক'রে যেন বুঝতে পারে না মা; ফ্যাল ফ্যাল ক'রে সোফিয়ার দিকে চায়। পোড়া সিগারেটটা রাখবার জন্য কিছু একটা খুঁজছিল সোফিয়া। না পেয়ে একটা টবের মাটির মধ্যে ওটাকে গুঁজে দিল।

মার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল : 'ওতে ফুল নষ্ট হয়।'

'মাপ করবেন,' সোফিয়া বলে, 'নিকলাইও আমাকে এই নিয়ে ধমকায়।' সিগারেটের টুক্‌রোটা তুলে নিয়ে বাইরে ফেলে দেয়।

মা বড় বিব্রত হ'য়ে পড়ে। বলে :

'ছিঃ ছিঃ কি যে বলি আমার মাথার ঠিক নাই। আপনার ওপরও হুকুম চালাচ্ছি। কিছু মনে করবেন না।'

'আমি নোংরামি করেছি। বলবেন বৈকি! একশ' বার বলবেন। কিন্তু কফি হ'লো? ওকি এক পেয়ালা কেন? আপনি?'

সহসা উঠে মার কাঁধে হাত দিয়ে কাছে টেনে আনে। গভীর দৃষ্টিতে চোখে চোখে তাকিয়ে বলে :

'লজ্জা ক'রছে আপনার?'

মা একটু হাসে। বলে :

'সিগারেটের ব্যাপার নিয়ে মুখ ফস্‌কে যা বলে ফেলেছি তার পরেও বলতে চান, আমার লজ্জা হবে না?' তারপর বিস্ময় গোপন করবার কোন চেষ্টা না করে আবার বলে : 'মোটে তো কাল এসেছি, এরই মধ্যে কর্তাপনা ফলাচ্ছি, যেন আমারি বাড়ী। যা খুশি করছি, যা খুশি বলছি .কোন ভয় ডর নেই...'

'তাই তো হওয়া উচিত!' ব'লে ওঠে সোফিয়া।

ব'লে চলে মা : 'আমার মাথা খালি ঘোরে! আমি নিজেকেই যেন চিন্‌তে পারছি না। আগে কিছু কাউকে বলতে হ'লে, অনেক ভেবে, অনেকবার পিছিয়ে, বিষম খেয়ে তবে বলতে পারতাম। আজকাল যেন মনটা হাঁ করাই আছে। ফস্‌ ক'রে এমনি কথা মুখে আসে, যা আগে হয় তো ভাবতেও পারিনি।'

আর একটা সিগারেট ধরায় সোফিয়া। ওর কালো চোখের কোমল আলো মায়ের

মুখের ওপর পড়ে।

'বলছেন, ওর পালাবার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু পালিয়ে পালিয়ে থাকবে কি ক'রে?' অস্বস্তিকর প্রশ্নটা মনের মধ্যে ওলট-পালট হচ্ছিল মায়ের। এতক্ষণে বোঝা হাল্‌কা হল।

আর এক পেয়ালা কফি ঢালতে ঢালতে জবাব দেয় সোফিয়া :

'ও আর কি! কত আছে অমনি। সে কি আর এক আধ জন! তেমনি ভাবেই থাকবে। এই তো একজনকে নিয়ে একটা আস্তানায় দিয়ে এ'লাম। খুব কাজের লোক। পাঁচ বচ্ছর ঠুকেছিল। কিন্তু সাড়ে তিন মাস মাত্র থেকেছিল, তারপরেই বাস্।'

কিন্তু তাকিয়ে থাকে মা সোফিয়ার দিকে। তারপর হেসে আস্তে আস্তে বলে :

'মনে হচ্ছে, পয়লা মে দিনটিতেই আমার কিছু একটা হয়েছে। নিজের কোন হদিশ পাচ্ছি না যেন। মনে হ'ত একই সঙ্গে দুটো আলাদা আলাদা রাস্তায় চলেছি। কখনও যেন একটু বুঝতে পারতাম আবার পরক্ষণেই সব কুয়াসায় আঁধার। এই আপনার কথাই ধরুন না কেন—ভদ্রঘরের মেয়ে এই কাজ ক'রছে...পাভেলকে জানেন আপনি, তার প্রশংসা করছেন, কি বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেব জানিনা।'

'সেতো আপনারই প্রাপ্য।' হাসতে হাসতে সোফিয়া বলে।

'আমি আবার কি করলাম। পাভেলকে অত শেখান, আমার সাধ্যি তো হয়নি।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে মা।

সোফিয়া নিজের প্লেটের মধ্যে পোড়া সিগারেট্‌টা চেপে দেয়। তারপর মাথাটাকে একটা ঝাঁকানি দিতেই এক রাশ সোনালী চুল এলিয়ে পড়ে কোমর পর্যন্ত।

'এবার এসব জমকালো ধড়াচুড়ো ছাড়তে হবে।' বাইরে যেতে যেতে বলে।

তিন

সন্ধ্যাবেলা ফিরে এল নিকলাই। খাবার টেবিলে ব'সে হাসতে হাসতে গল্প করছিল সোফিয়া—কয়েদখানা থেকে পালিয়েছিল এক কমরেড্। তাকে ও লুকিয়ে রেখেছিল। সারাক্ষণই ও স্পাইএর ভয়ে কাঁটা হ'তে থাকত। যাকে দেখত তাকেই ওর মনে হ'ত স্পাই। আর কি কান্ডটাই করত পলাতক কমরেড্‌টি।—সোফিয়ার কথার সুরে যে খানিকটা গুমরের ভাব আছে, যেমন থাকে কোন শক্ত কাজ ভালোভাবে শেষ করতে পারলে কোন মজুরের কথায়—এটুকু মা টের পায়।

এবেলা সোফিয়া পরেছে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ঢাকা ধূসর রংএর গ্রীষ্ম-বাস। তাইতে যেন আরো লম্বা দেখাচ্ছে ওকে, চোখ দুটি হয়েছে গাঢ়তর আর চাল-চলনে এসেছে স্থৈর্য।

খাবার পর নিকলাই বললে বোনকে : 'তোমার জন্য আর একটা কাজ রয়েছে, সোফিয়া। তোমাকে বলেছিলাম, কৃষকদের জন্য একটা সংবাদপত্র বার করব ঠিক করেছি আমরা। যে-লোকটি কাগজ বিলি করবার ভার নেবে, এই সব ধর-পাকড় হ'য়ে যাওয়ায় তাকে খোঁজ করতে পারছি না। এ-ব্যাপারে আমাদের একমাত্র গতি

এখন পেলাগেয়া নিলোভনা। তাই ওঁকে নিয়ে তোমায় একটু গাঁয়ের দিকে যেতে হবে। একটু তাড়াতাড়ি করো।'

সিগারেট খেতে খেতে জবাব দেয় সোফিয়া : 'যাবো বৈকি। কি বলেন পেলাগেয়া নিলোভনা!'

'নিশ্চয়ই।'

'অনেক দূর?'

'তা প্রায় আশী ভার্স্ট হবে।'

'বেশ। একটু বাজানো যাক এখন। আপনার খারাপ লাগবে না তো, পেলাগেয়া নিলোভনা?'

'আমার জন্য ভাববেন না। ধ'রে নিন আমি নেই এখানে।' ব'লে এক কোণে গিয়ে সরে বসল। ভাই ও বোন এমন ভাব করে যেন মা-কে তারা খেয়ালের মধ্যে আনছে না কিন্তু অলক্ষ্যে নিজেদের কথাবার্তার মধ্যে মা-কে তারা টেনে আনতে লাগল।

'শোন, নিকলাই। একটা গ্রিগ নিয়ে এলুম এবার। জানলাটা বন্ধ করে দাও দিকি।'

বাজনাটা খুলে বাঁ হাতে টুংটাং ক'রে বাজাতে সুরু করে। তারে তারে সুরের যাদু জাগে। এদিকে নীচু পর্দায় দীর্ঘশ্বাসের মত চাপা রাগিণী ঢেউ দিয়ে ওঠে। উদারার পটে ওর ডান হাতের আঙ্গুলগুলোর ফাঁক দিয়ে যেন কতগুলি ঝল্‌মলে সোনালী সুরের ঝাঁক ডানা ঝটপটিয়ে কলকলিয়ে উড়ে গেল। আঁধার আকাশে ভয়-পাওয়া পাখীর ঝাঁকের মত।

মায়ের অনভ্যস্ত কানে রাগ-রাগিণীর সূক্ষ্ম কারুকার্য ধরা পড়েনা—মনে হয় নিরর্থক কোলাহল। প্রথমটায় চুপচাপ বসে থাকে মা—ডিভানের একধারে পা গুটিয়ে ব'সে আছে নিকলাই, কখনও বা তাকে দেখে, কখনও বা তাকিয়ে থাকে সোফিয়ার সোনালী-চুলের তাজ পরা মুখটির কঠিন প্রোফাইলের দিকে। সূর্যের কিরণ পরম অন্তরঙ্গতায় সোফিয়ার মাথা আর কাঁধের ওপর আলো ঢেলে যেন ওর আঙ্গুল-গুলোকে আদর করবার জন্য বাজনার বুকে ঝ'রে পড়ছে। সুরের লহর ফুলে ফেঁপে ঘরখানাকে ভরে তোলে। কখন যে তার দোলায় মায়ের বুখখানিও দুলে ওঠে সে জানতেও পারেনা।

কেন জানি একটা ব্যথা গুমরে ওঠে—কোন অতীতের আঁধার ঠেলে, বহুদিনকার ভুলে-যাওয়া ব্যথাটা নূতন ক'রে কাঁচা হ'য়ে ওঠে...

স্বামী সেদিন অনেক রাত্তিরে মাতাল হ'য়ে বাড়ী ফিরল। শুয়ে ছিল ও। হাত ধরে হিঁচড়ে টেনে নামাল ওকে বিছানা থেকে। তারপর কোঁকে একটা লাথি মেরে বলল : 'বেরিয়ে যা হারামজাদী, এখান থেকে। দু চোখের বিষ তুই, দূর হ'য়ে যা চোখের সামনে থেকে।'

মার এড়াবার জন্য দু'বছরের কোলের ছেলেটাকে তুলে ধরল ও সামনে ঢালের মত ক'রে। ভয় পেয়ে বাচ্চাটা কেঁদে উঠে ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল ওর হাতের মধ্যে।

মিখাইল গর্জায় : 'বের হ! বেরিয়ে যা! এক্ষুনি বেরিয়ে যা!'

মা ছুটে গিয়ে ঢুকল রান্নাঘরে; একটা জামা কাঁধে ফেলে আর কোন মতে চাদর দিয়ে বাচ্চাটাকে জড়িয়ে, সেই রাত-কাপড়েই খালি পায়ে বেরিয়ে এল রাস্তায়; না এক ফোঁটা চোখের জল, না ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে এক টুকরো নালিশ। মে মাসের

রাত্তির। হিমেল হাওয়া। হিমে-ভেজা রাস্তার ধ্বলো পায়ের তলায় আর আঙ্বলের ফাঁকে চাপ চাপ হয়ে সেঁটে থাকে। ছেলে উথাল পাথাল করে কোলের মধ্যে। ব্বকের মধ্যে চেপে নিয়ে ভয়ের তাড়নায় রাস্তা বেয়ে ছ্বটে চলল মা। যেতে যেতে অস্ফ্বট স্বরে বাচ্চাকে ভোলাতে চেষ্টা করে :

'আ-আ-আ! আ-আ-আ! আ-আ-আ!'

ভোরের দিকে লজ্জায় ভয়ে ও মরে যেতে লাগল, পাছে ওই বে-আব্র্ব অবস্থায় কেউ দেখে ফেলে ওকে! জলাটার ধারে গিয়ে আসপেন্-ঝোপে গা-ঢাকা দিয়ে ভুঁয়ের ওপর ব'সে রইল ও আঁধারের পানে তাকিয়ে। ব'সে ব'সে নিজের জখমী ব্বক, আর কাঁচা ঘ্বম ভাঙা ছেলেটাকে শান্ত করার জন্য গ্বনগ্বনাতে লাগল।

'আ-আ-আ! আ-আ-আ! আ-আ-আ!'

কতক্ষণ যে অমনি ব'সে রইল তার ঠিক-ঠিকানা নেই। কি যেন একটা কালো পাখী নিঃশব্দে উড়ে গেল কাছ দিয়ে। ভয় পেয়ে দ্বঃখ ভুলে উঠে দাঁড়াল মা। ঠক্ঠকিয়ে সারা দেহ শীতে কাঁপছে। বাড়ীর দিকেই চলতে লাগল পা—সেই নিত্যিকার মার-পিট্ আর অপমানের আস্তাকুঁড়ের মধ্যে...

শেষ কর্ডটা বাজছে। হিম, নির্লিপ্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে থেমে গেল সঙ্গীতের রেশ...

সোফিয়া ভায়ের দিকে তাকায়। শান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করে :

'কেমন লাগল?'

ঘ্বম ভেঙে যেন জেগে উঠল নিকলাই। বলল :

'চমৎকার! অপ্বর্ব!'

স্মৃতির রেশ ব্বকের মধ্যে গানের মত কেঁপে কেঁপে বেজে চলেছে এক দিকে। আর একদিকে ভাবছে :

'দিব্যি তো আপন জনের মত মিলে মিশে এক সাথে আছে মান্বষ—মদ গিলে গিলে মাতলামিও করে না; অহোরাত্র খেয়ো-খেয়িও করে না, আমাদের ওই নরকের মত...'

আর একটা সিগারেট ধরায় সোফিয়া। বড় বেশি ধ্বমপান করে সোফিয়া—তাতে প্রায় কোন বিরতি থাকে না।

'বড় ভালোবাসত এটা কোস্তিয়া।' সিগারেটে লম্বা একটা টান দিয়ে আবার বাজনায় হাত দেয়। একটা ঘন ব্যথার স্বর বেজে ওঠে। বলে : 'কি ভালোই বাসতাম ওকে বাজিয়ে শোনাতে। কি অদ্ভুত নরম মন ছিল ওর। সব কিছ্ব নাড়া দিত ওর মনকে...ভরাট ব্বকটা ঠেলে উপ্‌চে উঠত সব সময়ে...'

'ও নিশ্চয়ই ওর স্বামীর কথা ভাবছে,' আপন মনে ভাবে মা, 'কেমন হাসি ফ্বটেছে ম্বখে!...'

'ও যখন ছিল, কী স্বখেই না কেটেছিল দিনগ্বলি! খ্বব ভালোভাবেই ও জানত, কি-ভাবে বেঁচে থাকতে হয়।' সোফিয়া বলে চলে আর কথার সঙ্গে সঙ্গে আনমনে টুং-টাং শব্দের স্বর তোলে।

দাড়িতে হাত ব্বলোতে ব্বলোতে নিকলাই সায় জানায়, 'ঠিক কথা। খাঁটি সমঝদার লোক ছিল ও।'

সদ্য-জ্বালান সিগারেটটা ছ্বঁড়ে ফেলে মায়ের দিকের ফিরে বলে সোফিয়া : 'যা হট্টগোল শ্বর্ব করেছি, আপনি নিশ্চয়ই অস্থির হয়ে উঠেছেন।'

মনের উদ্বেগটুকু মা আর গোপন করতে পারেনা, বলে : 'বাজনা টাজনা আমি বুঝিইনা। চুপচাপ বসে শুনছি আর নিজের ভাবনা ভাবছি। আমার জন্য ভাবার দরকার নাই।'

সোফিয়া বলে, 'দরকার নাই বলবেন না। আমি চাই যে আপনি বুঝুন। সঙ্গীত বোঝা বিশেষ করে মেয়েমানুষের বড় দরকার। বিশেষ করে দুঃখের দিনে খুব কাজে লাগে।'

পিয়ানোর একেবারে মর্মস্থলে এসে আঘাত পড়ে—আচমকা রীড্গুলো ঝন্-ঝনিয়ে ওঠে। যেন হঠাৎ দুঃসংবাদ পেয়ে আর্তনাদ করে উঠল কেউ। মর্মভেদী কান্নার স্বর। সাথে সাথে যেন ভয়-পাওয়া কতগুলি কচি কচি গলাও চীৎকার করে উঠল।। পরক্ষণেই বিপুল ক্রোধে যেন গর্জন করে উঠল যন্ত্রটা। ওই শব্দ-তাণ্ডবের তলায় আর সব তলিয়ে গেল। যেন মস্ত এক দুর্ভাগ্যের সংবাদ এসেছে কিন্তু সেজন্য দুঃখ হয়নি, জেগে উঠেছে ক্রোধ। এর পরেই শোনা গেল কোন বলিষ্ঠ কণ্ঠের সরল সহজ সরল সুধাবর্ষী সঙ্গীত। মনকে গলিয়ে ভুলিয়ে কোথায় টেনে নিয়ে যায়।

মায়ের বড় ইচ্ছে হয় এদের সাথে দুটো ভালো করে কথা কয়। গানের সুরে নেশা লাগছে। মাথা টলমল করছে। মুখে আত্ম-প্রত্যয়ের হাসি ফুটে ওঠে। না... শক্তি-হীন নয় মা...পারবে ওদের কাজ করতে।

চারদিকে চায়। কি করা যায় এখন? চুপচাপ রান্নাঘরে এসে সামোভারটা জ্বালিয়ে দেয়।

এ আর কতটুকু। মন ভরে না। এদের সেবায় বৃহৎ কিছু দেবার জন্য মন উন্মুখী। চা ঢালতে ঢালতে বিব্রত হাসি হেসে কতকটা যেন নিজকে সান্ত্বনা দেওয়ার সুরেই বলে :

'আমরা মুখ্যু সুখ্যু মানুষ কিনা। বোঝাতে পারিনা, কিন্তু বুঝতে পারি সব। বুকের মধ্যে সব ছট্ফট্ করে কিন্তু বোঝাবার মত অত কথা খুঁজে পাই না। লজ্জায় মরে যাই। মাথা কুটতে ইচ্ছে করে। কইতেই যদি না পারবে তবে বুকের মধ্যে অত কথা ঠেলে ওঠে কেন? এক লহমা কি তিষ্ঠুতে দেয়? এদিকে তো ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে সংসারের মার খাওয়া. কি মারটাই খাচ্ছি। ইচ্ছে হয় দুদণ্ড একটু শান্তিতে থাকি। কিন্তু তার কি আর জো আছে, এই মনটার জ্বালায়!'

শুনতে শুনতে বারবার চশমা মোছে নিকলাই। ডাগর ডাগর চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে সোফিয়া। সিগারেটটা নিবে আসে, খেতে ভুলে যায়। ভাইয়ের দিকে অর্ধেক ফিরে পিয়ানোর সামনে ব'সে আছে তখনও; ডান হাতটা আলতো ভাবে মাঝে মাঝে পিয়ানোর রীড্ ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। মায়ের হৃদয়-নিংড়ানো সরল কথা-গুলোর সহজ সুরের সাথে এক হ'য়ে মিশে যায় তার হালকা টুং টাং।

'এখন একটু একটু ব'লতে পারি। নিজের কথাও পারি, অন্যের কথাও পারি। এখন বুঝতে শিখেছি কিনা! তুলনাও ক'রতে পারি। আগে পারতাম না। তুলনা ক'রবার ছিলই বা কি। আমাদের সবই তো সেই থোড়-বড়ি খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড়। কিন্তু এখন দেখছি দুনিয়ায় আর দশজন কেমন ভাবে থাকে। কিসের মধ্যে যে ছিলাম সেই কথাই মনে প'ড়ে যায়। ভাবতে গায়ে কাঁটা দেয়। উঃ কি সাংঘাতিক!'

স্বর নামিয়ে ব'লে যায় : 'কে জানে ঠিক বোঝাতে পারছি কিনা। হয়তো বা

এসব বলার কোন মানেই নেই। আপনাদের তো অজানা...'

গলার স্বরটা যেন কান্নায় থম্‌থম্‌ করে। কিন্তু চোখ ওদের দিকে চাইতে গিয়ে হাসিতে ভরে ওঠে। বলে :

'কিন্তু তোমাদের যে আমার বুকটা বেবাক খুলে না দেখালেই নয়। আমি যে সমস্ত প্রাণ দিয়ে চাইছি তোমাদের মঙ্গল হোক, কল্যাণ হোক! কি ক'রে বোঝাব সে কথা!'

কোমল স্বরে নিকলাই বলে : 'জানি!'

কিছুতেই যেন আজ মন ভরছে না মায়ের। বলে বলে কথা যেন আর শেষ হ'তে চায় না। চোখের সামনে আজ এক নতুন পৃথিবী—অসীম মহিমায় সমুজ্জ্বল। নিজের জীবনের কথা ব'লে যায় মা...মসীলিপ্ত তিক্ত ইতিহাস...। অসীম ধৈর্যে বুক বেঁধে দুঃখ সয়েছে; নীরবে দিনের পর দিন স্বামীর অমানুষিক মার খেয়েছে; অবাক হ'য়ে শুধু ভেবেছে; নিজের অপরাধ কোথাও খুঁজে পায়নি। কোনমতে নিজেকে বাঁচাতেও পারেনি। তবু আজ এসব কথা বলতে গিয়ে মনে কোন রাগ দুঃখ নেই মায়ের। শুধু একটু জ্বালা এসেছে।

স্তব্ধ হয়ে শোনে নিকলাই আর সোফিয়া। অভিভূত হ'য়ে যায়। সামান্যা মেয়ে; পশুর বাড়া দাম সে কোন দিন কারো কাছে পায়নি; নম্র শিরে প্রাপ্য বলে সংসারের এই আচরণ গ্রহণ করেছে। কিইবা তার জীবনের ইতিহাস। কিন্তু এই সামান্যের মধ্যে একি অসামান্যের প্রকাশ! তারই মত নেহাৎ তুচ্ছ, নিপীড়িত, ধূল্যবলুণ্ঠিত সহস্র সহস্র জীবনের ভাষা যেন মুখর হ'য়ে উঠছে ওর কণ্ঠে। জনতার বৃহত্তম অংশের জীবন রূপ পেয়েছে এই একটি মানুষের জীবনের আলেখ্যে। টেবিলের কনুই ভর দিয়ে, হাতের তেলোয় মাথাটা রেখে চশমার ফাঁক দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে নিকলাই। চেয়ারের পিঠে দেহ এলিয়ে ব'সে আছে সোফিয়া। থেকে থেকে দেহটা তার কেঁপে উঠছে; মাথাটা ঘন ঘন নড়ছে। মুখখানা যেন আরো রোগা আর ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। হাতের সিগারেট অমনি পুড়ে ছাই হ'য়ে যায়—খাবার কথা মনে নেই।

চোখ নীচু করে শান্ত স্বরে বলে সোফিয়া :

'ওঃ সেই সেবারে যখন অন্তরীণ ছিলাম একটা ছোট্ট শহরে, মনে হত আমার মত দুর্ভাগা আর বুঝি কেউ নাই। না ছিল কোন কাজকর্ম, না ছিল নিজের কথা ছাড়া আর ভাববার মত কিছু। তাই নিজের কথাই ষোল কাহন করতুম। বাবাকে ভীষণ ভালোবাসতুম, অথচ তাঁর সাথেই হ'ল ঝগড়া। স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিলে। আমার মতন অমন খারাপ মেয়ে নাকি আর হয় না। তারপর গেলুম জেলে এক ঘনিষ্ঠ কমরেডের কৃপায়। এদিকে স্বামীও ধরা প'ড়ল; তারও সাজা হ'ল। দিলে ঠেলে কোন্‌ অঠাঁইয়ে। তারপর সে মারা গেল। বাস্‌রে! সে সব দিন! বুক ফেটে যেত। মনে হ'ত আমার মত অমন দুঃখী বুঝি দুনিয়ায় নেই। কিন্তু এখন তো দেখছি, সারা জীবন ধ'রে, যে দুঃখ সয়েছেন আপনি, তার তুলনায় আমি মহা-সুখী। আপনি একটা মাসে যা সয়েছেন, আমি সারা জীবনে তো তার দশ ভাগের এক ভাগও সইনি। বছরের পর বছর, দিনে দিনে তিল তিল ক'রে জ্বলা, সেকি সহজ কথা? সইলেন কি ক'রে এত? এত সইবার শক্তি মানুষ পায় কোথায় বলুন তো!'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে মা : 'অভ্যেস হ'য়ে যায়।'

চিন্তিত মুখে নিকলাই বলে : 'দুনিয়াটাকে দেখলুম তো আর কম নয়। পুঁথি পড়ে নয়, নিজের কষ্ট-কল্পনাও নয়, চোখের সামনে জলজ্যান্ত এমনি একখানি ছবি যখন দেখা যায়...উরে বাসরে!...ছোট ছোট খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো আরো বিশ্রী...দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, ওরা জমা হ'য়েই চলে...।'

কথার পিঠে কথা জড়ো হয়; এই দুর্ভাগা জীবনের পুরো ছবিটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। স্মৃতির অতলে তলিয়ে যায় মা, অতীতের আবছায়া থেকে টেনে তোলে যৌবনের রুদ্ধশ্বাস দিনগুলি, প্রতিদিনকার নানা লাঞ্ছনা ও অপমান। হঠাৎ এক সময় চমক ভাঙে তার। বলে :

'দেখছ! আমিও যেমন! বক্ বক্ ক'রেই চলেছি। রাত যে দুপুর গড়াল। না না। আজ আর নয়। সব বিছানায় এবার। এসব কথার কি আর শেষ আছে গো! সে যে অথৈ সমুদ্দুর।'

নিঃশব্দে বিদায় ওরা। নমস্কার ক'রতে গিয়ে নিকলাই-এর মাথাটা রোজকার চাইতে আজ যেন আর একটু বেশী নুয়ে পড়ে; করমর্দন ক'রতে গিয়ে হাতের স্পর্শে সমবেদনা নিবিড় হ'য়ে ওঠে। সোফিয়া সঙ্গে সঙ্গে দোর পর্যন্ত এগিয়ে আসে। তারপর শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নেবার সময় আবেগে ভরে ওঠে তার গলা, কটা চোখদুটো মেলে মায়ের মুখখানার দিকে ভারি দরদের সঙ্গে তাকিয়ে থাকে। মা নিজের দুই হাতের মধ্যে সোফিয়ার হাতখানি চেপে ধ'রে বলে :

'ধন্যবাদ!'

চার

কয়েক দিন পরের কথা। সোফিয়া আর মা নিকলাই-এর সামনে এসে দাঁড়ায়; শহুরে বস্তীর মেয়েদের মত সাজ। পরনে সুতী পোষাক, কাঁধে থলি আর লাঠি। এই বেশে সোফিয়াকে অনেকটা খাটো দেখাচ্ছে; পাণ্ডুর মুখখানা দেখাচ্ছে আরো গম্ভীর।

বোনের হাতে গভীর ভাবে চাপ দিয়ে বিদায় নিল নিকলাই। মা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে, কি অনাড়ম্বর, শান্ত, সহজ সুর এই দুই ভাইবোনের ব্যবহারে। উচ্ছ্বাস নেই, চুমু খাওয়া নেই—শুধু আছে হৃদয়ে হৃদয়ে এক অনভিব্যক্ত গভীরতা অথচ ঠিক এরই বিপরীত দেখেছে আর এক জগতে। সেখানে আদর আছে, উচ্ছ্বাস আছে, গদগদ হ'য়ে মধু-ঢালা কথা আছে—আবার আছে ঠিক ততখানিই হিংসা-দ্বেষ, লাঠালাঠি, আর মারামারি।

নীরবে পথ চলে সোফিয়া আর মা। মাঠের মধ্য দিয়ে চওড়া এবড়ো-খেবড়ো পথ। দুই ধারে বুড়ো বার্চগাছের সারি। চলতে চলতে মা শুধায় :

'পারবে হাঁটতে অতটা?'

'কি ভাবছ? কত রাস্তা ভাঙলুম সারা জীবন! ওতো আমার জলভাত!' সোফিয়া জবাব দেয়।

সোফিয়া খুশিতে তরল হ'য়ে ওঠে। বিপ্লবী জীবনের কাহিনী বলে হাল্কা

সুর লাগিয়ে, যেন ছোটবেলাকার দুষ্টুমির কাহিনী বলছে। বারেবারে কত নতুন নামই না নিতে হয়েছে। শুধু কি তাই! পরিচয়-পত্র অবধি জাল করতে হয়েছে। রকম বেরকমের বহুরূপী সেজে টিকটিকিদের চোখে ধুলো দিয়ে—রাশি রাশি নিষিদ্ধ বই সব এ শহর থেকে ও শহরে পাচার ক'রেছে; সাজা-পাওয়া কমরেডদের পালাবার পথ করে দিয়েছে, সাথে ক'রে অন্য মুলুকে নিয়ে পৌঁছে দিয়েছে নিরাপদ আস্তানায়। সেবারে নিজের বাড়ীতেই বসাল এক গুপ্ত ছাপাখানা। পুলিশ তো গন্ধ পেয়ে এসে হানা দিলে। দরজা খুলে দিলে এসে বাড়ীর ঝি। তারপর টিন হাতে তেল কিনতে বেরিয়ে পড়ল সে। শীতের দিন। কনকনে ঠান্ডা। পাতলা একটা জামা গায়ে ঝিয়ের, মাথায় সুতী-রুমাল বাঁধা। ওই নিয়েই তেল কেনার অছিলায় সে শহর পাড়ি দিলে।

আর একবার, সেও এক মজার ব্যাপার। ভিন্ শহরে গেছে কোন বন্ধুর সাথে দেখা ক'রতে। তার বাড়ী গিয়ে তো চক্ষুস্থির। দরজায় পুলিশ। বন্ধুর ফ্ল্যাটে খানাতল্লাশী হচ্ছে। ফেরার উপায় নেই। কি করে! গট্ গট্ ক'রে গিয়ে নীচের তলার আর এক ফ্ল্যাটের ঘণ্টা বাজালে। সব অচেনা মুখ। খুলে বলল ইতিবৃত্ত।

'এখন আমি আপনাদের হাতে। ধরিয়ে দিতে চান দিন। কিন্তু জানি অমন কাজ আপনারা ক'রবেন না!'

সে কি ভয় ওদের। সারা রাত্তির দু'চোখের পাতা এক করলে না কেউ। শুধু ঐ এলো, আর ঐ এলো। ঐ বুঝি দরজায় পুলিশের ঘা প'ড়ল। কিন্তু ধরিয়ে দেয়নি তারা। পরদিন ওর এই ব্যাপার নিয়ে সে কি হাসির ধুম!

সেবারে তো আরো মজা। যে টিকটিকি পেছু নিয়েছিল, সন্ন্যাসিনী সেজে এক গাড়ীতে তারই পাশে ব'সে সফর ক'রল ও। নিজের বুদ্ধি নিয়ে কি গুমর লোকটার। ভারী নাকি চালাকী ক'রে, বুদ্ধি খাটিয়ে মেয়েটাকে ধাওয়া করেছে। চাঁদ এই গাড়ীতেই যাচ্ছেন, তাতে আর ভুলভ্রান্তি নেই। তবে বোধ হয় সেকেন্ড ক্লাসে। প্রত্যেক স্টেশনে নেমে নেমে খোঁজে। তারপর হতাশ হ'য়ে ফিরে এসে সন্ন্যাসিনীকে দুঃখের কথা বলে :

'না : দেখতে পেলুম না। বোধহয় ঘুমিয়ে-টুমিয়ে প'ড়েছে। ওদের কি আর এক দন্ড স্বস্তি আছে? আমাদেরই মত হন্যে হয়ে ছুটোছুটি ক'রতে হয়।'

মা হাসে; গল্প শুনতে শুনতে ওর দিকে তাকিয়ে চোখ দুটি স্নেহ-সিক্ত হ'য়ে ওঠে। সুঠাম পা দু'খানির হাল্কা ছন্দে দীঘল তনু দেহখানি কি সুন্দর চলেছে। ওর চলনে বলনে, খুশিভরা কণ্ঠ-স্বর—অবশ্য একটু মোটা—শুধু ওটুকুই বা কেন, ওর ঋজু দেহটির অঙ্গ অংগ ছেয়ে কি যেন এক অদ্ভুত শুচিতা আর দুঃসাহসিকতা লেখা! অদ্ভুত তারুণ্য ওর দৃষ্টিভঙ্গিতে। যে দিকেই তাকায় দুই হাতে খুশি লুটে নেয়।

'ও মা! কি সুন্দর পাইন গাছটা!' কোন্ একটা গাছের দিকে আঙুল দেখিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে সোফিয়া। মা থম্‌কে দাঁড়িয়ে আঁতি-পাঁতি ক'রে খোঁজে—কোথায় সোফিয়ার সুন্দর গাছ! মায়ের চোখে সব এক।

'বাঃ, সুন্দর নয়, সুন্দরই তো!' বলে সোফিয়া হেসে ওঠে আর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে মায়ের পাকা চুল বাতাসে উড়ে উড়ে কানের ওপর এসে পড়ছে।

কখনও বা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে ও : 'লার্ক! লার্ক!' চোখদুটিতে কোমলতা উছলে

ওঠে। অশরীরী সেই সংগীত শোনার জন্য ওর সর্বাঙ্গ কান পেতে স্থির হয়ে থাকে। কখনও বা চলতে চলতে ঝুপ ক'রে নীচু হ'য়ে বুনো ফুল একটা কুড়িয়ে নেয়। পাঁপড়িগুলি ওর হাতের মধ্যে থিরথিরিয়ে কাঁপে। ও গুন্ গুন্ করে গান গায় আর সরু সরু চঞ্চল আঙুলগুলি দিয়ে আদর বুলিয়ে দেয় তাদের পর।

মায়ের মন বাঁধা প'ড়ে যায় এ মেয়ের সাথে। পাশে চলতে চলতে একান্ত কাছে স'রে আসে মা। কিন্তু মাঝে মাঝে কেমন যেন রুক্ষ হ'য়ে ওঠে ওর কথাগুলি। বড় বাজে মায়ের মনে। ভাবনা হয়, মিখাইলো কি ভাববে!

কিন্তু পরক্ষণেই আবার যে সোফিয়া সেই সোফিয়া। মা হেসে ওর মুখের দিকে চায়। দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। বলে :

'মনটা তোমার কি কাঁচাই রয়েছে এখনও!'

'সে কি! বত্রিশ বছর বয়স হ'লো জানো?' চীৎকার ক'রে ওঠে সোফিয়া।

মা হেসে বলে : 'বয়সের কথা বলছি না। চেহারার দিক থেকে আর একটু বেশী বললেও আপত্তি করতাম না। কিন্তু যতই তোমার কথা শুনি, তোমার চোখের দিকে চাই, ততই অবাক হ'য়ে যাই আমি। ঠিক যেন ষোল বছরের মেয়ে! অথচ আরামের মুখ দেখলে না কোন দিন; আর জীবন গেল তো বিপদের সমুদ্দুরে সাঁতরে সাঁতরে। কিন্তু হ'লে হবে কি! প্রাণখানাকে হাসি দিয়ে মুড়ে রেখেছে।'

'কি যে বলো! দুঃখ কষ্ট! টেরই পাই না ওসব। বরঞ্চ মনে হয় দুঃখ আছে ব'লেই তো রসে টইটম্বুর হ'য়ে আছে জীবনটা। কজনের আছে অমন জীবন, বল তো। দুর্ ছাই আপনি-টাপনি আর পোষায় না। এবারে কিন্তু নাম ধ'রে বলব। কিন্তু পেলাগেয়া বলতে কেমন যেন বাধ বাধ লাগে। আমি পদবী ধ'রেই বলব—কেমন! নিলোভনা! বেশ মিঠে! বেশ লাগে আমার।'

কি যেন ভাবতে ভাবতে জবাব দেয় মা : 'বেশ তো, যা ভালো লাগে, তাই ব'লো। আমি শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি তোমায়। দেখে দেখে আর তোমার কথা শুনে আমার যেন আশ মেটে না। তুমি মানুষের মন কেড়ে নেবার যাদু জান। বড় ভালো লাগে আমার দেখে। তোমার কাছে মন আপনি খুলে যায়! লাজ ভয় থাকে না। কি মনে হয় আমার জানো? জয় তোমাদের হবেই। অকল্যাণের বিরুদ্ধে লড়ছ তোমরা; চরম জয় তোমাদেরই।'

'হবেই তো! আমরা যে মেহনতী জনতার সাথে হাত মিলিয়েছি।' গভীর আত্মবিশ্বাসে ব'লে ওঠে সোফিয়া। 'কি শক্তি লুকিয়ে আছে ওদের মধ্যে জানো? ওরা সব পারে। অসাধ্য সাধন করতে পারে। শুধু একটুখানি ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়া, চোখ খুলে একটু আত্মদর্শন করানো। তারপর নিজের হাতেই ওরা পথ করে নেবে।...'

সোফিয়ার কথা শুনে মায়ের মনে এক বিচিত্র অনুভূতি জাগে। সোফিয়ার জন্য বড় দুঃখ হয় মায়ের; তবে সেই দুঃখের মধ্যে জ্বালা নেই, তিক্ততা নেই। মায়ের ইচ্ছা হয়, সোফিয়া আরো কথা বলুক, আরো সহজ সরল ভাষায় কথা বলুক।

'এত মেহনত যে ক'রছ, কি পাবে, বলতো!'

'পাওয়া! সে তো পেয়ে গেছি!' জবাব দেয় সোফিয়া, মায়ের মনে হয়, সোফিয়ার কথায় যেন একটু গর্ব ফুটে উঠেছে, 'জীবনের যা হোক একটা পথ তো খুঁজে পেয়েছি, সমস্ত প্রাণ মন ঢেলে দিয়ে আমরা বাঁচতে শিখেছি, জীবনকে উপভোগ ক'রতে শিখেছি। এর বাড়া আর কি পুরস্কার চাইব বলতো!'

মা ওর দিকে একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নেয়। আবার ভাবনা হয়, মিখাইলোর যদি না ভালো লাগে ওকে!

খুব তাড়াতাড়ি হেঁটে চলেছে ওরা। চলার মধ্যে ত্বরা আনলেও তাড়া নেই। মিঠে হাওয়ায় বুক ভ'রে উঠছে মায়ের মনে হয় যেন তীর্থ ক'রতে চলেছে। ছোট-বেলার কথা মনে পড়ে। দূর গাঁয়ে ছিল এক আশ্রম। ছুটি-ছাটার দিনে সেখানকার গির্জায় যেত উপাসনা ক'রতে। সেখানে ছিল একটি খৃস্টমূর্তি, আশ্চর্য সব কাহিনী প্রচলিত ছিল সেই মূর্তিটি সম্পর্কে। কি আনন্দ যে হ'ত যাবার সময়। সেইদিনের সেই আনন্দ আজ আবার নতুন ক'রে ফিরে এসেছে। কখনও গান গায় সোফিয়া; খোলা আকাশের গান বা প্রেমের গান। কখনও বা কবিতা আবৃত্তি করে; মাঠ-প্রান্তর-বন-অরণ্যের কবিতা, ভল্‌গা নদীর কবিতা। তন্ময় হ'য়ে যায় মা, হাসে, গানের সুরে ডুবে গিয়ে তালে তালে অজান্তে শুধু মাথাটি দোলে।

সমস্ত অন্তরলোক ছেয়ে কি উষ্ণতা, কি প্রশান্তি! কি গভীরতার সুর! যেন গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় বাগানের নিরালা একান্তের আবেশ।

পাঁচ

তৃতীয় দিনে গন্তব্য-স্থানে পেঁছুল এসে। মাঠে কাজ করছিল একজন কৃষক। আলকাতরার কারখানাটার রাস্তা তাকে ডেকে শুধিয়ে নিলে মা। খাড়া নেমে গেছে বুনো পথ। গাছের মোটা মোটা শিকড়গুলো সিঁড়ির মত হয়ে আছে। পথের শেষে কারখানার হাতা—কয়লার গুঁড়ো কাঠের টুকরো আর চাপ-বাঁধা শুকনো আলকাতরা ছড়ান চার ধারে।

অস্বস্তি-ভরা দৃষ্টিতে চারদিকে তাকিয়ে মা বলে :

'এই যে এসে গেছি আমরা!'

মঙ্গলের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গা। তারি একধারে একটা চালার সামনে মাটিতে খুঁটি পুঁতে তার ওপরে খানকয় তক্তা ফেলে তৈরী হ'য়েছে টেবিল। খেতে ব'সেছে রীবিন, ইয়েফিম আর দুটি ছোকরা। সারা গায়ে আলকাতরা লাগা রীবিন-এর। জামাটার বুক আগাগোড়া খোলা।

রীবিনই প্রথম দেখতে পেল ওদের। চোখে হাতের আড়াল ক'রে তাকিয়ে নিঃশব্দে ব'সে রইল ও। দূর থেকেই ব'লে উঠল মা : 'শুভ দিন, মিখাইলো ভাই!'

ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে রীবিন। কাছে এসে চিনতে পেরে একটু হেসে থমকে দাঁড়ায়। ময়লা হাতটা দিয়ে দাড়িতে বিলি কাটতে থাকে।

কাছে এসে মা বলে : 'ও গাঁয়ে যাচ্ছিলাম গির্জায়। ভাবলাম পথেই তো প'ড়বে, তোমার সাথে দেখাটা ক'রে যাই। এই আমার বন্ধু আনা।'

চট্ করে এমন বুদ্ধিমানের মত কথা বলতে পেরেছে বলে মা'র বুকখানা ফুলে ওঠে, আড়চোখে তাকায় সোফিয়ার থমথমে মুখের দিকে।

রীবিন শুকনো হাসি হেসে সোফিয়ার করমর্দন করতে করতে বলে :

'মিথ্যে কথা। শহরে আজকাল থাকোই না তুমি। সব আমাদেরই লোক গো,

মিথ্যে কথার দরকার নেই।'

ইয়েফিম নিজের জায়গায়ই ব'সে ছিল এতক্ষণ। তীর্থযাত্রীদের দিকে তাকিয়ে কি জানি বলছিল বন্ধুদের কানে কানে। ওরা কাছে আসতেই নিঃশব্দে নমস্কার ক'রে উঠে দাঁড়াল। ছোকরা দুজন যেমন ছিল তেমনিই ব'সে রইল যেন দেখতেই পায়নি অতিথিদের।

রীবিন বলে মা'য়ের কাঁধে আলতো একটু টোকা মেরে :

'দিব্যি সন্ন্যেসী হ'য়ে আছি আমরা। কালেভদ্রেও কেউ আসে না এখানে। মালিকও নেই; তার বউ হাসপাতালে। আমিই একরকম হর্তাকর্তা এখন। ব'সো ব'সো। ক্ষিদে-টিদে নিশ্চয়ই পেয়েছে। যা'তো রে ইয়েফিম, দুধ নিয়ে আয়।'

ইয়েফিম চ'লে যায় চালার দিকে। অতিথিরা পিঠ থেকে ঝোলা-ঝুলি নামায়। ছোকরাদের মধ্যে একজন উঠে সাহায্য করে ওদের। রোগা লম্বা চেহারা এর। কিন্তু আর একজন তার বিরাট লোমশ বপুটি নিয়ে ব'সেই থাকে কনুই দুটি টেবিলে ভর দিয়ে। চিন্তিত ভাবে ওদের নিরীক্ষণ ক'রে মাথা চুলকোয় আর গুন্‌গুনিয়ে কি একটা সুর ভাঁজে।

আলকাতরা আর পচা পাতার গন্ধে মিলে বাতাস যেন গুলিয়ে উঠেছে। ওদের মাথা ঘুরতে থাকে।

লম্বা ছেলেটিকে দেখিয়ে রীবিন বলে : 'ওর নাম হচ্ছে ইয়াকভ। আর ঐ যে ব'সে আছে ওর নাম ইগনাত। তারপর, তোমার ছেলের খবর কি?'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে জবাব দেয় মা : 'সে তো জেলে।'

'আবার।' চীৎকার ক'রে ওঠে রীবিন, 'জেলটা দেখছি ওর ভারী মিঠে লেগে গেছে!'

ইগনাতের গান থেমে যায়। মায়ের হাত থেকে লাঠিটি নিয়ে ইয়াকভ বলে : 'বসুন।'

'সে কি, দাঁড়িয়ে কেন? বসুন বসুন।' রীবিন বলে সোফিয়াকে। সোফিয়া ব'সে প'ড়ে নিবিষ্ট চিত্তে রীবিনকে নিরীক্ষণ করে।

রীবিন মায়ের মুখোমুখি বসে। শুধায় :

'কবে, কবে ধরা প'ড়ল? কি যে কপাল নিয়ে এসেছিলে, নিলোভনা!'

'তাতে আর কি হয়েছে।' জবাব দেয় মা।

'গা-সওয়া হ'য়ে গেছে, কি বল!'

'এখনও হয়নি। কিন্তু উপায় তো নেই আর।'

'হুঁ। বলুন দেখি এবারে! শুনি।'

এক জগ দুধ নিয়ে আসে ইয়েফিম। টেবিলের ওপর থেকে একটা পেয়ালা নিয়ে, ভালো ক'রে ধুয়ে, দুধ ভ'রে এগিয়ে দেয় সোফিয়াকে। কান থাকে মায়ের দিকে। অতি সন্তর্পণে কাজ করে যেন এতটুকু শব্দ না হয়। সংক্ষেপে মা কাহিনী শেষ করে। কারো মুখে কথা নেই। কেউ কারো দিকে তাকাতে পারে না। ইগনাত ব'সেই আছে তেমনি ভাবে; আঙুলের ডগা দিয়ে হিজিবিজি এ'কে চলেছে টেবিলের ওপর। রীবিনের কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে ইয়েফিম। ইয়াকভ দাঁড়িয়ে আছে একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে। হাত দুটো তার আড় ক'রে বুকের ওপর রাখা; মাথাটা নীচু। সোফিয়া বসে বসে সকলের মুখ নিরীক্ষণ করছে।

ক্ষুব্ধ স্বরে রীবিন বলে ধীরে ধীরে :

'হুঁ...হুঁ...একেবারে খোলাখুলি?'

তিক্ত হাসি হেসে ইয়েফিম বলে, 'আমরা যদি এমন খোলাখুলি একটা জলুস বার করি তাহলে মুজিকরা আমাদের মেরে শেষ করে ফেলবে।'

ঘাড় নেড়ে সায় জানিয়ে ইগনাত বলে, 'তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। আমি ভাবছি কোন একটা কারখানায় কাজ নিয়ে চলে যাব। অনেক ভালো জায়গা সেটা।'

রীবিন জিজ্ঞাসা করে : 'তাহলে বিচার হবে পাভেলের? কি সাজা হবে শুনেছ?'

শান্তভাবে জবাব দেয় মা : 'হয় ঘানি, নয় সাইবিরিয়া—চিরজীবনের মত।'

তিনজনের চোখ একসঙ্গে মায়ের মুখের ওপর পড়ে। রীবিন মাথা নীচু ক'রে জিজ্ঞাসা করে :

'পাভেল কি জানত এ-কাজের পরিণাম কি?'

'জানত বৈকি!' জোরের সঙ্গে বলে সোফিয়া।

সবাই স্তব্ধ...পাথর...একই ভাবনায় স্তম্ভিত।

তারপর আবার ব'লে চলে রীবিন; মুখে চোখে গাম্ভীর্যে ভরা এক গভীর মর্যাদার অভিব্যক্তি।

'আমিও তো তাই বলি—জেনে শুনেই সে গেছে। আঁধারে ঝাঁপ দেবার ছেলে সে নয়। ছ্যাবলামি করে না সে। ও মানুষই আলাদা। শুনছিস্ রে, ও ছোঁড়ারা? জেনে শুনেই গেছে সে বেয়নেটের খোঁচায় ভুঁড়ি ফাঁসবে, নয় দেবে ঠেলে সাইবিরিয়া। তাই কি ওকে দমাতে পেরেছে! গট্‌মট্ ক'রে এগিয়ে গেল। ওর মা বেটি পথ আগলে শুয়ে প'ড়লেও হয়তো তাকে মাড়িয়েই চ'লে যেত ও! তাই না গো, নিলোভনা?'

'তা যেত।' চমকে উঠে মা বলে। বুক ভেঙে দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে আসে। চারদিকে চায়। সোফিয়া কাছে স'রে এসে ওর হাতের ওপর আস্তে আস্তে হাত বুলোয় আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভ্রু কুঁচকে চায় রীবিনের দিকে।

কালো চোখ দুটি দিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে শান্তভাবে বলে রীবিন : 'মানুষের মত মানুষ একটা।'

আবার নিশ্চল নির্বাক পাথর হ'য়ে থাকে দু'টি মানুষ। সূর্যকিরণের সরু সরু ফালিগুলি সিল্কের ফিতের মত বায়ুমণ্ডলে দোলে। কোথায় যেন একটা কাক ডাকছে। পয়লা মের স্মৃতি পাগল ক'রে তোলে মাকে। পাভেল আন্দ্রিয়েইর জন্য মন আকুল হ'য়ে ওঠে।

ছোট ফাঁকা জায়গাটুকুতে খালি আল্‌কাতরার টিন ছড়িয়ে আছে, গাছের ভাঙা ডাল পোঁতা আছে চারদিকে। ওক্ আর বার্চগাছের ঘন বেষ্টনী, ডালগুলো নিশ্চল—ঘন উষ্ণ ছায়া পড়েছে মাটির ওপরে।

হঠাৎ ইয়াকভ লাফিয়ে এক ধারে সরে যায়। মাথাটাকে ঝাঁকানি দিয়ে চীৎকার ক'রে বলে :

'মানুষ ঠ্যাঙাবার জন্য নিচ্ছে নাকি আমাদের!'

'তবে? কোথায় আছ হে সোনার চাঁদ! আমাদের শিল নোড়া দিয়েই আমাদের দাঁতের গোড়া ভাঙে ওরা। বুঝেছ? ওই হ'ল ওদের চালাকী।'

'কি হ'ল কি তাতে! এ শর্মা সৈন্যদলে যাবেই।' জেদের সুরে বলে ইয়েফিম।

ইগনাত চটে ওঠে : 'কে যেন ওকে মাথার দিব্যি দিয়ে মানা করছে। যা না তুই।'

তারপর হেসে বলে : 'কিন্তু দেখিস বাবা, গুলিটুলি যদি করিস আমায় কখনও, হাত পা খোঁড়া করে ছেড়ে দিসনে। মাথার খুলিটা উড়িয়ে দিস।'

ইয়েফিম জবাব দেয় : 'মেলাই বকিসনে। তোর ঘ্যানর ঘ্যানর শুনতে শুনতে কান পচে গেল।'

হাত তুলে রীবিন বলে : 'থামরে বাপু তোরা।' তারপর মায়ের দিকে দেখিয়ে বলে : 'দেখছিস ওঁকে! এ'র ছেলে বোধ হয় সাবাড়...'

মায়ের বুক মোচড় দিয়ে ওঠে। বলে : 'ও কি! ওসব কেন বলছ!'

গম্ভীর ভাবে জবাব দেয় রীবিন : 'বলতে হয় বৈকি। অমনি অমনি তোমার চুলে অমন পাক ধরেছে! দেখরে ছোঁড়ারা দেখ... কেমন মা দেখ। ছেলেকে মারলেও মাকে মারতে পারেনি। হ্যাঁগা, এনেছ কাগজপত্র?'

মা তাকায় রীবিনের দিকে।

তারপর একটু থেমে বলে : 'এনেছি!'

টেবিলে একটা কিল মেরে ব'লে ওঠে রীবিন : 'দেখি! তোমায় দেখেই বুঝেছি। নইলে এখানে কি করতে আর আসা। এই, দেখ তোবা, ভালো করে দেখ। ছেলেকে নিয়ে গেছে রাক্ষসেরা, তার মা এসে তার ঠাঁই নিয়েছে কেমন।'

বদ্ধ মুষ্ঠি আস্ফালন করে রাগে। ওদের গাল দেয়।

ওর চীৎকারে ভয় পেয়ে যায় মা। ওর মুখের দিকে গভীর ভাবে চায়। চেহারাটা বদলে গেছে। অনেকটা রোগা হয়ে গেছে। উস্কখুস্কু দাড়ি; তার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় বেরিয়ে আসা চোয়ালের হাড়গুলো। চোখের নীলাভ সাদা মণির ওপর ভেসে আছে সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম লাল শিরা—যেন ঘুমোয়নি ও কত কাল। নাকটা শিকারী বাজের ঠোঁটের মত। জামার কলারটা এককালে বোধহয় লাল ছিল। এখন আলকাতরা লেগে লেগে সে রং ঢেকে গেছে। বোতাম খোলা জামাটার, মোটা মোটা গলার হাড়গুলি বেরিয়ে আছে হাঁ করে। বুকে একরাশ মোটা মোটা কালো লোমের যেন জঙ্গল। সমস্ত চেহারাটায় একটা অদ্ভুত গাম্ভীর্য। দেখলে কেমন যেন লাগে। লাল ভাঁটার মত চোখ দুটো রাগে ধক্‌ধক্ করে জ্বলছে। কালো মুখখানাও তার আঁচ লেগে জ্বলছে। সোফিয়া চুপচাপ্ বিমর্ষ মুখে বসে বসে মানুষগুলোকে দেখছে একদৃষ্টে। ইগনাত মাথা ঝাঁকায় আর চোখ মিটমিট করে। ইয়াকভ আবার গিয়ে বসে পড়ে চালার ধারে; বসে বসে খুঁটিগুলো থেকে ছাল তোলে খিমচে খিমচে। ইয়েফিম মায়ের পিছন দিয়ে টেবিলটার ধারে ধারে পায়চারি করে। রীবিন আবার বলতে আরম্ভ করে :

'এই তো সেদিন আমাদের গাঁয়ের মোড়ল আমায় ডেকে বললে—পাজী! নচ্ছার! কি ব'লেছিস তুই পাদ্রী সাহেবকে? আমি বললাম—গালমন্দ করো না বলছি; মাথার ঘাম পায়ে ফেলে গতর খাটিয়ে খাই। কারো খাইও না, পরিও না! কারো পাকা ধানে মইও দিতে যাই না। ওরে বাবা! তারপর—কি...? ব'লে চেঁচিয়ে উঠে মারল এক রদ্দা আমার মুখে। তারপর তিন দিন আমায় আটকে রেখে দিলে জেলে। শালারা আমাদের মত ছোটলোকের সাথে এমনি ব্যাভার করে। শালা বুড়ো শয়তান! ও আমি ভুলব! সাত জন্মেও না, খোদাই হ'য়ে আছে বুকের মধ্যে। ছাড়ব ভেবেছিস! এর শোধ তুলব। আমি না পারি আর কেউ তুলবে। তাদের ঝাড়বংশ উপড়ে ফেলবে! শালারা। শালাদের হাত নয়তো লোহার থাবা। আর তাই দিয়ে আমাদের বুকগুলেকে চষে চষে তার মধ্যে ঘেন্নার বীজ বুনে দিয়েছে। শয়তান। ওদের ওপর

মায়াদয়া! এক বিন্দুও না...।'

ভেতরে টগবগ করে রাগ ফুটছে। লাল টক্‌টক্‌ করছে মুখ। মা ভয় পেয়ে যায়।

রীবিন আবার বলতে আরম্ভ করে; একটু শান্ত আগের থেকে : 'আসলে কি ব্যাপার হয়েছিল জান? একদিন দেখি পাদ্রী সাহেব এক জায়গায় ব'সে কয়েকজন কৃষকের সাথে কথা বলছে। চাল যদি দেখতে—আমরা চাষাভুষোরা যেন সব ভেড়ার পাল, ওনাদের রাখালী না হ'লে যেন আমাদের চলে না। পিত্তি জ্বলে গেল। হেসে, একটু ঠাট্টা করে বললাম—শেয়ালকে পশু পাখীদের সর্দার করে দাও—পাখপাখালি আর উড়বে না, উড়তে লাগবে তাদের পালকগুলো। বাস্‌ গট্‌মটিয়ে আমার দিকে চেয়ে এক লম্বা বক্তৃতা শুনিয়ে দিলে—মানুষ তো জীবন ভোর দুঃখু করতেই এসেছে। ভগবানের কাছে হাত জোড় করে প্রার্থনা কর, দুঃখু সইবার তাকত পাবে। আরো কত কি। আমি বললাম—তা গরীবেরা ধন্না ধুন্না দিতে কি আর কসুর করে। ফলটা কি হয়! গরীবের কথা শোনবার সময় কই দেবতার! পাদ্রী সাহেব আমাকে শুধোলে—তা কি প্রার্থনা কর শুনি! আমি বললাম—করি; আমরা মুখ্যু গরীবরা আর কি বলব, ঠাকুর। বলি : 'দেবতা! পাথর খেয়ে ক্ষিদেটাকে চাপান দিয়ে যেন ভদ্দর-লোকদের জন্য খেটে খেটে মুখে রক্ত তুলতে পারি ঠাকুর। শিখিয়ে দাও, দেবতা, এই বিদ্যেটা শিখিয়ে দাও।' শেষ কত্তে দিলে না ব্যাটা আমায়।'

হঠাৎ সোফিয়ার দিকে ফিরে রীবিন জিজ্ঞাসা করে :

'আপনি ভদ্দরলোক?'

চম্‌কে উঠে জবাব দেয় সোফিয়া : 'কেন?'

গর্জন করে ওঠে রীবিন : 'কেন? আমার চোখে ধুলো দিতে পারবেনা। সুতী রুমাল মাথায় বেঁধেছ—ভাবছ ওই দিয়ে ভদ্দরলোকের পাপ ঢাকা পড়বে। আমরা মানুষ চিনতে পারি। টেবিলের ওপর কি একটু পড়ে গিয়েছিল, তাতে তোমার কনুইটা গিয়ে লাগতেই মুখখানা অমন কাঁচুমাচু হয়ে উঠল কেন শুনি? মেহনতী মানুষের পিঠের শিরদাঁড়া অমন সোজা হয়!'

কি বলতে কি বলে বসে গোঁয়ার মানুষটা—মা বলে মাঝখান থেকে :

'আমার বন্ধু মানুষ গো, আমার বন্ধু। অমন মানুষ হয়না। আমাদের লড়াইয়ে খেটে খেটে মানুষটার চুল পেকে গেল। অমন করে ব'লোনা তুমি...'

দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ে রীবিনের :

'কেন? কি বলেছি? কড়া কথা বলেছি নাকি কিছু?'

শুকনো ভাবে সোফিয়া বলে : 'আমাকে কিছু বলতে চাইছিলে বোধ হয়!'

'আমি? ও হ্যাঁ, হ্যাঁ। এই তো সেদিন ইয়াকভের খুড়তুত ভাই এসেছে। যক্ষ্মা হয়েছে ছেলেটার। ডাকব তাকে?'

'ডাকো, ডাকো। ডাকবে বই কি!' সোফিয়া বলে।

রীবিন চোখ কুঁচকে সোফিয়াকে একবার দেখে নিলে। তারপর ইয়েফিমের দিকে ফিরে আস্তে আস্তে বললে :

'যাতো রে, ব'লে আয় ওকে, সন্ধ্যাবেলায় যেন আসে।'

ইয়েফিম কোন দিকে চাইলে না, কারো সাথে একটি কথা কইলে না। টুপীটা মাথায় চড়িয়ে সটান বনের পথে উধাও হ'য়ে গেল।

রীবিন সেই দিকে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে বলল :

'ভারী মুশ্‌কিলে পড়েছে ছোঁড়ারা। ওর আর ইয়াকভের ডাক পড়েছে... কনস্‌ক্রিপশন। তা ইয়াকভ্‌ হাড়গোঁয়ার; সোজা ব'লে দিয়েছে—নেহি যায়েঙ্গে। ইয়েফিমেরও ইচ্ছে নেই, কিন্তু যাবে। ও বলছে ও সৈন্যদের মধ্যে গিয়ে আন্দোলন চালাবে। কিন্তু বাপুহে, মাথা ঠুকে ঠুকে কি আর পাথরের দেয়াল ভাঙা যায়! হাতে বেয়নেট এলে সবাই ভিড়ে যায় দলে। ভারী ফ্যাসাদে প'ড়েছে ছোঁড়া। আর এই হতভাগা ইগনাত ওই কথা নিয়ে দিন রাত্তির ওর পেছনে লেগে আছে। কেনরে বাপু, তোর দরকারটা কি শুনি।'

গোমড়া মুখে ইগনাত বলে : 'দরকারটা কি শুনি! দেখনা দু'দিনে কেমন গুরুমারা ওস্তাদ হয় ও। দু'হাতে মানুষ মারবে।'

চিন্তিত ভাবে বলে রীবিন : 'যাঃ যাঃ মেলাই বাজে বকিসনে। ওসব আমি বিশ্বাস করিনা। অবশ্যি না গেলেই ভালো করত। লুকিয়ে থাকলে এত বড় দেশটায় কে বা কার খোঁজ রাখে। কোনমতে একটা বাজে পাসপোর্ট জোগাড় করা। তারপর আজ এ গাঁ, কাল সে গাঁ, দিব্যি ঘুরে বেড়াও।'

লাঠিটা পায়ে ঠুকে ইগনাত বলে : 'আমি তো তাই করব। ভিড়েছি যখন একবার, থামা টামা বুঝিনে। কদম কদম বাঢ়ায়ে যা...। সোজা কথা।'

কথাবার্তা থেমে যায়। বোলতা আর মৌমাছিরা দলে দলে ঘুরে ঘুরে উড়ে বেড়ায়। তাদের গুঞ্জনে আকাশ ভরে ওঠে। পাখীরা কলকলিয়ে ওঠে। মাঠের ওপার থেকে ভেসে আসে কি এক গানের সুর।

খানিক চুপ ক'রে থেকে রীবিন বলে : 'বেলা হ'ল। তোমরাও একটু গা গতর এলিয়ে নাও। চালার মধ্যে কাঠ পাতা আছে। যা তো রে ইয়াকভ, শুক্‌নো পাতা কিছু নিয়ে আয় কুড়িয়ে। কাগজ কি এনেছ, দাওতো মা!'

মা আর সোফিয়া তাদের ঝোলাঝুলি খুলতে ব'সে। বইগুলির ওপর ঝুঁকে পড়ে রীবিন। চোখ দুটো ওর চকমক্‌ করে খুশিতে। বলে : 'করেছ কি! এযে পাহাড় নিয়ে এসেছ! অনেক দিন থেকেই তাহ'লে এসব কম্ম হচ্ছে, অ্যাঁ! কি নাম জানি তোমার?' শুধায় সোফিয়াকে।

জবাব দেয় সোফিয়া : 'নাম আন্না ইভানোভনা। তা বছর বারো ধরে করছি। কেন বলতো?'

'নাঃ, অমনি। শ্রীঘর দর্শন হয়েছে তাহ'লে!'

'হুঁ।'

মা একটু ঝাঁঝিয়ে ওঠে : 'দেখছ তো? তুমি তো বেচারাকে যা খুশি তাই বলছিলে...'

চুপ ক'রে থেকে একটা বইয়ের বাণ্ডিল তুলে নেয় রীবিন। তারপর খিলখিল ক'রে হেসে বলে : 'রাগ টাগ করো না বাপু, ঘাট মানছি। বড়লোক, ছোটলোক আর তেল-জল—বুঝলে কি না! মিশ খায়না।'

সোফিয়া হেসে আপত্তি তোলে : 'আমি বড়লোক টোক নই। আমি স্রেফ মানুষ।'

'তা হবে।' রীবিন বলে। 'শুনেছি কুকুররা নাকি আগে নেকড়ে ছিল। যাই, এগুলোকে চাপাচুপি দিয়ে রেখে আসি।

ইগনাত আর ইয়াকভ হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসে।

'দাও না দেখি একটু,' ইগনাত বলে।

'সবই কি এক রকম নাকি?' সোফিয়াকে জিজ্ঞাসা করে রীবিন।

'না, কয়েক রকম ইস্তাহার আছে, খবরের কাগজও আছে।'

'সত্যি?'

ইয়াকভ, ইয়েফিম আর রীবিন চালার দিকে যায়।

মা চিন্তিত ভাবে রীবিনের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর বলে:

'মানুষটা আগুন হ'য়ে রয়েছে।'

সোফিয়া বলে: 'সত্যি আগুন। অমন একখানা মুখ কখনও দেখিনি আমি। এরাই শহীদ হ'তে জানে। চল আমরাও যাই ভেতরে। ওদের দেখব আমি।'

'লোকটার কথাবার্তা অমনি, মাজাঘষা নেই। দুঃখ পেওনা তুমি।' মা কোমল ভাবে বলে।

সোফিয়া হাসে।

'কি মানুষ গো তুমি, নিলোভনা?'

দরজার কাছে এসে দেখে, হাঁটুর ওপর খোলা বইয়ের ওপর ঝুঁকে আছে ইগনাত; চকিতে একবার শুধু চোখ তুলে তাকিয়ে আবার ডুবে গেল সে। চালের ফাঁকে যে রোদের ফালিটুকু এসেছে, তাতে একখানা বই তুলে ধ'রে বিড়বিড় ক'রে পড়ছে রীবিন। আর ইয়াকভ হাঁটু গেড়ে ঝুঁকে আছে, সামনে তার মেজের ওপর এক রাশ বই পত্তর ছড়ান।

মা এক কোণে গিয়ে চুপচাপ ব'সে পড়ে। তার কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সোফিয়া নিরীক্ষণ করে মানুষগুলোকে।

চোখ না তুলেই আস্তে আস্তে ইগনাত বলে: 'আমাদের চাষা-ভুষোদের মধ্যে এরা কেমন ক'রে আসছে দেখেছ?'

রীবিন ওর দিকে চেয়ে হেসে বলে: 'তা আসবে না। ভালোবাসে যে আমাদের।'

গম্ভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মাথা তোলে ইগনাত। বলে:

'কি লিখেছে, দেখ—"কিষাণেরা যে মানুষ তার চিহ্ন মাত্র নাই তাদের অস্তিত্বে..."।' সরল মুখখানা আঁধার হ'য়ে ওঠে, যেন আঘাত পেয়েছে। বলে: 'আলবৎ আছে। এসো না, আমার এই পোষাকখানা পরো না দেখি একবার! দেখি কোথায় থাকে ভদ্দর-লোকী পালিশ!'

মা বলে সোফিয়াকে, 'বড্ড ক্লান্ত লাগছে। উঃ, কি বিশ্রী গন্ধ। বমি আসছে। একটু শোব আমি। তুমি?'

'নাঃ, আমি ঠিক আছি।'

লম্বা হ'য়ে শুয়ে পড়ে মা। ঝিমুনি এসে যায় শুতে না শুতেই। সোফিয়া ব'সে থাকে পাশে। মুগ্ধ হ'য়ে তাকিয়ে থাকে বইয়ে-ডোবা মানষগুলোর দিকে; আর মাঝে মাঝে হাত নেড়ে মায়ের মাছি তাড়ায়। আধ-বোজা চোখ দিয়ে দেখে মা; বড় ভালো লাগে এই আদরটুকু।

রীবিন কাছে এসে মোটা গলায় ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলে:

'ঘুমিয়েছে?'

'হাঁ।'

মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে রীবিন। তার পর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে কোমল স্বরে:

'এ রাস্তায় এসে ছেলের কাজ মা হাতে তুলে নিয়েছে, এই প্রথম দেখলাম।'

সোফিয়া বলে : 'চুপ, ঘুম ভেঙে যাবে। চলুন, বাইরে যাই।'

'কাজে যেতে হবে যে! তোমার সাথে কথাও আছে। নাঃ, এখন না, সেই সন্ধ্যে-বেলা তখন হবে। চলরে তোরা!'

চলে গেল তিনজনে।

আরামের নিশ্বাস ফেলে মা : 'বাঁচলাম, ওদের ভাব হ'য়ে গেছে।'

বুনো গাছপালার আর আলকাতরার গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে ঘুমিয়ে পড়ে মা।

ছয়

দিনের শেষে কাজ সেরে ঘরে ফেরে ওরা ছুটির আনন্দে।

ওদের কোলাহলে ঘুম ভেঙে যায় মায়ের। হাই তুলতে তুলতে হাসিমুখে বেরিয়ে আসে সে। বলে :

'এই দেখ দিকিন। তোমরা গেলে খাটতে, আর আমি আমিরী চালে শুয়ে ঘুমুলাম!'

'বড্ড অপরাধ হয়েছে তো! যাক্ মাপ করা গেল।' সে উপচে পড়া তেজ নেই। ক্লান্তিতে ঝিমিয়ে পড়ছে রীবিন। তাই এখন শান্ত অনেকটা।

ইগনাতকে ডেকে বলে : 'ওরে চা টা দিবি আজ? এখানে সব পালা করে কাজ করি আমরা। আজ খাওয়ার ব্যবস্থা করার পালা ইগনাতের।'

আগুন জ্বালবার জন্য কাঠকুটো কুড়োতে কুড়োতে ইগনাত বলে :

'কে আমার সাথে পালা বদলাবে আজ?'

সোফিয়ার পাশে জায়গা ক'রে নিতে নিতে বলে ইয়েফিম :

'উঃ, উনিই একা থাকেন এখানে। আমরা যেন সব ভেসে এলাম।'

'ভয় নেই রে! আমি তোকে সাহায্য করব।' ইয়াকভ বলে। তারপর চালার মধ্যে গিয়ে একটা রুটি এনে কেটে কেটে রাখে টেবিলের ওপর।

ইয়েফিম বলে : 'শোন, কে যেন কাশল।'

কান খাড়া ক'রে শোনে রীবিন। মাথা নেড়ে বলে :

'কে আর! জ্যান্ত নজীর, আসছেন।' সোফিয়াকে বোঝায় :

'বুঝলে আমার যদি ক্ষমতা থাকত, লোকটাকে শহরে শহরে ঘোরাতাম আর ওর কথা শোনাতাম সব্বাইকে। বাপ্‌রে বাপ্, এক কথা নিয়ে কি ঘ্যানর ঘ্যানরই করতে পারে মানুষটা।'

সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে আসে। চারদিক নিঝুম হ'য়ে ওঠে। অতি সাবধানে, ধীরে ধীরে হাঁটে পুরুষেরা। সতর্ক দৃষ্টি রাখে অতিথিদের ওপর।

বনের মধ্য থেকে লাঠিতে ভর দিয়ে বেরিয়ে আসে একটি মানুষ। দীর্ঘ দেহ তার নুয়ে পড়েছে। হাঁপানীর শব্দ উঠছে সাঁই সাঁই ক'রে।

'এসেছি হে!' বলতে বলতেই বেদম কাশি ওঠে।

পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ঝোলা একটা ফালি ফালি ছেঁড়া কোট গায়ে; দুমড়ান টুপীটার নীচ দিয়ে ঝাঁটার কাঠির মত পিঙ্গল চুলগুলি যেমন তেমন ভাবে বেরিয়ে

আছে খোঁচা খোঁচা হয়ে। হাড়-বের-করা, হলদে মুখখানার শোভা হ'য়ে আছে সোনালী দাড়ির গোছা। ঠোঁট দুটি সর্বদাই ফাঁক। কালো কোটরের মধ্যে বসে-যাওয়া চোখ দুটো জ্বলছে যেন জ্বরের তাড়সে।

রীবিন পরিচয় করিয়ে দেবার পর সোফিয়াকে বলে সে :

'শুনলাম অনেক রকম বইপত্তর নাকি এনেছেন সব!'

'তা এনেছি কিছু।'

'ধন্যবাদ, ধন্যবাদ! এখানকার সব মানুষের হ'য়ে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে। ওরা এখনও বোঝে না কিছু। আমি তো বুঝি, তাই আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

আরো জোরে হাঁপাতে থাকে। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চায়। মুঠো মুঠো বাতাস ছিনিয়ে নিয়ে যেন গিলতে চায় লোভীর মত। দুর্বল অস্থিসার আঙুল-গুলি বুকের ওপর জামার বোতাম হাতড়ে ফেরে।

সোফিয়া বলে : 'এত রাত্তিরে এই জঙ্গলের মধ্যে বাইরে থাকা তো আপনার পক্ষে ভালো নয়। গাছ-পাতারা যে বাতাস ভারী করে!'

অতি কষ্টে এক ঢোঁক নিশ্বাস নিয়ে জবাব দেয় সে :

'আমার আর ভালো কিইবা আছে! মরতে পারলেই বাঁচি!'

সে কি গলার স্বর! শুনলে বুকের পাঁজর খান খান হ'য়ে ভেঙে যায়। আর ওই মূর্তি...করুণা হয়? হয় বৈকি...অসীম করুণা। কিন্তু ব্যর্থতায় নিষ্ফলতায় সেই করুণা তীব্র তীক্ষ্ম বেদনার হলাহল হ'য়ে ওঠে শুধু। পা দু'খানি ভাঁজ করে অতি সন্তর্পণে, একটা পিপের ওপর চ'ড়ে বসে সে, ভয় বুঝি ভেঙে যাবে। ধীরে ধীরে কপালের ঘাম মোছে।

আগুন জ্বালায় ইয়েফিম। দপ্‌ ক'রে জ্বলে ওঠে একবার। চারদিকে সব কিছু যেন চম্‌কে, থর্‌ থর্‌ ক'রে কেঁপে ওঠে। ভীত, ঝলসে-যাওয়া ছায়ারা বনের দিকে ছুটে পালায়। ইগনাতের ফোলা গাল-ওয়ালা মুখটা স্থির হ'য়ে থাকে আগুনের ওপর। আগুনটা নিবে যায়। ধোঁয়ার গন্ধ ছড়িয়ে থাকে বাতাসে। স্তব্ধতা... আর অন্ধকার...জমাট বেঁধে ওঠে। হাঁপানী রোগীর কথাগুলি শোনার জন্য যেন কান পেতে, সর্বাঙ্গ মেলে আছে।

'এখনও কাজকর্ম করার ক্ষমতা আছে। দশের সেবায় লাগতে পারি। ...আমায় দেখে শিখবে তারা...এক অতি ঘোর বর্বরতার ...জলজ্যান্ত নজীর আমি।...আমার দিকে তাকাও...তাকিয়ে দেখ একটু... সবে আঠাশ বছর বয়েস আমার। আর! মাত্র দশ বছর আগে—হেসে খেলে ছয় মণ বোঝা এই কাঁধে বয়েছি। ভেবেছিলাম লোহার শরীর আমার। সত্তরটা বছর তো বাঁচবই। কিন্তু কোথায় গেল সেই সত্তর বছর! এতো আমি নই আজ...আমি তো শেষ, একেবারে নিঃশেষ হ'য়ে গেছি। মালিকেরা চল্লিশটা বছর চুরি ক'রে ছিনিয়ে নিয়েছে আমার জীবন থেকে ...চল্লিশটা বছর...'

রীবিন বিরক্ত স্বরে বলে : 'রোজ রোজ এই এক গাওনা।'

আবার দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে। ছায়ারা আবার ছুটে পালায় বনের দিকে, আবার নাচতে নাচতে ফিরে আসে নিঃশব্দে...বীভৎস উন্মত্ত, মারণ-নাচ। ভিজে কাঠ ফট্‌ ফট্‌ ক'রে ফাটে আর শোঁ শোঁ শব্দ করে। হঠাৎ উষ্ণ হাওয়ার ছোঁয়ায় মাতল লাগে পাতার দলে। লাল হলদে শিখার দল পরম উল্লাসে পরস্পরের অঙ্গে জড়িয়ে এলিয়ে খেলায় মাতে; চারদিকে স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে উঠে যায় ঊর্ধ্বাকাশে।

একটা জ্বলন্ত পাতা উড়ে যায়; নৈশ আকাশে তারারা মৃদু হেসে হাতছানি দিয়ে ডাকে পৃথিবীর বুকের অগ্নি-কণাদের।

'আমার গাওনা নয় হে, শুধু আমার একার গাওনা নয়। হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষের বুকের ফরিয়াদ। বোকাগুলো জানে না মানুষের দুনিয়ায় তারা কি চেহারা রেখে যাচ্ছে। কত মানুষ কাজের চাকায় পিষে হাত পা ভেঙে নুলো হয়ে, উপোস করে বোবার মত মুখটি বুজে বেধড়ক্ মরছে এট্টু এট্টু ক'রে...'

আবার কাশি আসে। কাশতে কাশতে দেহটা কুঁকড়ে যায়।

ইয়াকভ ডাকে : 'এসো সাভেলি, দুধ এনেছি।'

মাথা নাড়ে সাভেলি। ইয়াকভ এসে হাত ধরে ওকে টেবিলের কাছে নিয়ে যায়।

সোফিয়া রীবিন-এর ওপর রাগ করে : 'একে এখানে টেনে এনেছেন কেন? কোন সময় যে টুক্ ক'রে ম'রে যাবে তার ঠিক নেই।'

'জানি,' স্বীকার করে রীবিন : 'কিন্তু ক'দিন আর! যদ্দিন পারে ব'লে নিক ওর কথা। জীবনটা তো ভূতের বাপের শ্রাদ্ধে বেগার খেটে খেটে ফুঁকে দিলে; এখন না হয় কাজের কাজ ক'রে আর একটু যাক। ভেবো না তার জন্য।'

'ফূর্তি লাগছে তোমার না?' তেতে ওঠে সোফিয়া।

রীবিন ওর দিকে তাকিয়ে বিরক্তির সঙ্গে জবাব দেয় :

'ফূর্তি আমাদের লাগে না; লাগে তোমাদের ভদ্দরলোকেদের। যীশুকে ক্রুশে লট্‌কে তার কাৎরানি শুনে বাঃ বাঃ বলে চক্ষু মুদে গদ্‌গদ হয়ে হাততালি দিয়ে বাহবা তোমরাই দিয়েছ। ওকে দেখে আমাদের চোখ খুলবে। তোমাদেরও খুলুক।'

মা ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে। বলে :

'হয়েছে গো, হয়েছে! থামো এবার।'

নিজের জায়গায় বসে বসেই সাভেলি বলতে থাকে :

'খাটিয়ে খাটিয়ে কেন ওরা মানুষকে এমন ক'রে জবাই ক'রবে? কেন বাঁচতে দেবে না মানুষকে? নেফেদফ্ কারখানায় কাজ করতাম আমি। মালিকের কীর্তি জানো? নিজের এক পোষা বাইজীকে হাত মুখ ধোবার জন্য সোনার গামলা আর রাত্তির বেলা পেচ্ছাব করবার জন্য সোনার ডাবর গড়িয়ে দিলে। দেহটাকে ফোঁকলা করে ফোঁটাটা অবধি যে রক্ত ঢেলে দিলাম, এরি জন্যে? আমায় ঘানিগাছে পেষাই করে সেই রক্তে বেশ্যা মাগীর ফূর্তির ভেট এলো? য়্যাঁ? আর কি না আমার জানের কড়ি দিয়ে সোনার ডাবর!...ওঃ হোঃ হোঃ...'

ইয়েফিম টিট্‌কিরী দেয় : 'মানুষ যে ভগবানের দোসর গো! আছে না বাইবেলে? এখন দেখ দশচক্রে কেমন ভূত হয়েছে তোমাদের ভগবান।'

টেবিলে কিল মেরে রীবিন চীৎকার করে : 'সইব না এসব।'

'সইব না।' ইয়াকভ বলে আস্তে আস্তে।

হেসে ওঠে ইগনাত। মা লক্ষ্য করে, রীবিন যখন কথা বলে ইয়াকভরা সর্বাঙ্গ দিয়ে চেয়ে থাকে তার মুখের দিকে; ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত তৃপ্তিহীনতা নিয়ে শোনে তার কথা। সাভেলির কথা শুনে বিদ্রূপে ওদের মুখ বাঁকা হ'য়ে ওঠে। মানুষটার জন্য ওদের এতটুকু করুণা নেই।...

সোফিয়ার দিকে একটু ঝুঁকে কানে কানে জিজ্ঞাসা করে মা :

'ও যা বলছে, সত্যি?'

'সত্যি, একেবারে বর্ণে বর্ণে সত্যি,' সোফিয়া বলে কণ্ঠ তুলে, 'এই নিয়ে মস্কোর

সংবাদপত্রে লেখালেখিও হয়েছে মেলা।'

ক্রুদ্ধ-স্বরে বলে রীবিন : 'কিন্তু দস্যুটার শাস্তি হয়নি। মানুষের হাটের মধ্যে ওকে টেনে এনে, টুকরো টুকরো ক'রে কেটে তারপর ওর পচা মাংস কুত্তাকে খাওয়ালে তবে ওর শাস্তি হ'ত। কিন্তু যাই হোক এক মাঘে শীত যাবে না। এমনি ক'রে বোবা হ'য়ে থাকবে না মানুষ। দিন আসবে হে, দিন আসবে। সে-দিন দেখবে শাস্তি কাকে বলে। যে অন্যায়, অবিচার আর জুলুম মানুষ এতকাল স'য়ে এসেছে, পাহাড় হ'য়ে জমে আছে সব। বহু রক্ত দিয়ে এ পাপের প্রাচিত্তির কত্তে হবে বাছাধনদের। রক্ত—কার রক্ত জান? আমাদেরই রক্ত, জনগণের রক্ত। মানুষগুলানের গতর থেকে চোঁ মেরে রক্ত শুষে দেহ ফুলিয়েছে রক্ত-শোষারা। ওদের গতরে যে-রক্ত আছে সে তো তা'লে আমাদের রক্ত। আমাদের বীজ নিয়ে যা খুশি করব আমরা।'

হেঁপো রোগীটি বলে : 'ঠান্ডা প'ড়ে গেছে।'

ইয়াকভ ওকে ধ'রে আগুনের কাছে নিয়ে যায়।

গনগন ক'রে আগুন জ্বলছে। তার চারদিকে মুখ-চোখহীন ছায়ার দল... অগ্নি-শিখাদের মাতামাতি দেখে অবাক হ'য়ে যেন কাঁপছে।

একটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসে সাভেলি শুক্‌নো কাঠের মত হাড্ডিসার স্বচ্ছ হাতখানা বাড়িয়ে আগুন তাপায়। রীবিন ওর দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে সোফিয়াকে বলে :

'বই প'ড়ে আর কি বুঝবে তুমি? এই মানুষটাকে দেখ। বিলকুল সাফ হ'য়ে যাবে সব। কাজ ক'রতে করতে কলে কাটা পড়ে মানুষ—'ব্যাটার নিজের দোষ' ব'লে খালাস পান কত্তারা। কিন্তু যখন রক্ত শুষে ছিব্‌ড়ে বানিয়ে জ্যান্ত মানুষটাকে ভাগাড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, তখন? তখন কার চোখে ধুলো দেবে? হ্যাঁ? সোজাসুজি খুন—বরং বুঝতে পারি। কিন্তু স্রেফ মজা দেখবার জন্য তিল তিল ক'রে জবাই করা—উঃ! কেন অমন অত্যাচার ক'রে ওরা মানুষের ওপর? কেন আমাদের অমন ক'রে পিষে মারে? কেন করে? করে মজা দেখবার জন্য, নিজেদের ফুর্তির জন্য; আমাদের রক্তের কিম্মতে দুনিয়াটাকে ষোল আনা ভোগ করবার জন্য—গাড়ী, বাড়ী, সোনার থালা, রুপোর কাঁটা চামচ, রেসের ঘোড়া, মেয়েমানুষ, বাচ্চাদের জন্য দামী দামী খেলনা, মানুষের রক্ত দিয়ে কেনে ওরা। শালার তোমরা খাটো, আরো কষে খাটো। খেটে খেটে মুখে রক্ত উঠে মর। আমরা মুনাফা লুটি। আর লুটের কড়ি দিয়ে মেয়েমানুষকে সোনার মুতের ডাবর গড়িয়ে দি।'

মা নিরীক্ষণ ক'রে দেখে, শোনে। যে পথে পাভেল গেছে, গেছে তার সাক্ষীরা, রাতের আঁধারে সেই পথখানি ভাস্বর হ'য়ে আবার চোখের সামনে জ্ব'লে ওঠে।

রাতে খাবার পর আগুনের চারদিকে এসে বসে সব। লক্ লক্ জিহ্বা দিয়ে ইন্ধনকে লেহন করছে বৈশ্বানর। সম্মুখে আলো; পশ্চাতে আঁধার যবনিকা বন-বনানী, আকাশকে রেখেছে আড়াল ক'রে। বিস্ফারিত দুই চোখে আগুনের দিকে তাকিয়ে ব'সে আছে হেঁপো সাভেলি; অনর্গল চলেছে কাশি। কাশির ঝোঁকে থরথর ক'রে কাঁপছে ও—যেন ব্যাধি-ক্ষয়িত দেহখানা থেকে অবশিষ্ট প্রাণটুকু বেরিয়ে আসার জন্য আকুলি-বিকুলি ক'রছে। আগুনের লাল কেলি করছে ওর মুখে; তবু নিষ্প্রাণ ত্বকে জীবনের রং ধরছে না। কিন্তু চোখে ওর নির্বাণোন্মুখ আগুনের জ্বালা।

ইয়াকভ সাভেলির ওপর একটু ঝুঁকে প'ড়ে বলে :

'ভেতরে চল বরং এখন।'

কথা বলতে গিয়ে কষ্ট হয় সাভেলির। অনেক কষ্টে বলে :

'কেন? না যাবো না। মানুষের মধ্যে আর কদিনই বা থাকব!'

চারদিকে তাকায়। নীরবে চ'লে যায় কয়েক মুহূর্ত। তারপর কেমন একটা আচ্ছন্ন হাসি হেসে আবার বলে সাভেলি :

'তোমাদের কাছে থাকতে আমার বড় ভালো লাগে। তোমাদের দেখে দেখে কি মনে হয় জানো? পারবে তোমরা দুশমনদের অত্যাচারের শোধ নিতে—! তোমরাই পারবে। একজনের লোভকে চরিতার্থ করবার জন্যে যারা সর্বস্বান্ত হয়েছে ও খুন হয়েছে—তাদের হয়ে প্রতিশোধ নিতে পারবে তোমরা।'

ওর কথার জবাব দেয় না কেউ। ধীরে ধীরে ওর ঘুমন্ত মাথাটা ঝুঁকে পড়ে বুকের ওপর। রীবিন ওর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে শান্ত ভাবে বলে :

'এসে এসে ব'সে থাকে এখানে। আর ওই একই কথা...মানুষ কি করে মানুষকে ঠকাচ্ছে। কেচ্ছা। এ ছাড়া বলার ওর আছেই বা কি! সারা জীবন ধ'রে তো শুধু ঠকলই। আর তো পায়নি কিছু! বুকের মধ্যে ওর দগদগে ঘা। সংসারের আর কোন ছবি ও দেখেনি। কি ক'রে দেখবে!'

মা চিন্তিতভাবে বলে : 'তাইতো! দেখার আর আছেই বা কি। লাখো মানুষ মুখে রক্ত উঠে মরছে রোজ। আর সেই মুখে-রক্ত-ওঠা মেহনতের কড়ি দিয়ে ছিনি-মিনি খেলছে ডাকাতেরা। এই তো সর্বত্র। আর নতুন কি আছে দেখার?'

'তা ঠিক। কিন্তু ওর কথা শুনতে শুনতে কান পচে গেছে। একবার শুনলে এমনিতেই তো কলজের মধ্যে পাকা হ'য়ে গেঁথে যায়। তার ওপর রোজ রোজ...!' ইগনাত বলে।

রীবিন গম্ভীর হ'য়ে বলে : 'আর আছে কি আমাদের জীবনে? সব ঝ'রে পু'ড়ে গিয়ে ওই দুঃখের গানই আমাদের সম্বল হ'য়েছে। আমি তো বহুবার ওর মুখে ওই এক কথা শুনেছি—কিন্তু তবু এক এক সময় একটুও বিশ্বাস ক'রতে ইচ্ছে হয় না যে মানুষ এত খারাপ, এত নির্বোধ। বড়লোক, গরীব, সব্বাইকে ভালো লাগে তখন—তা বড়লোকরাই কি ধোঁকা কম খেয়েছে! অন্ধ সবাই—কেউ অন্ধ শীতের তাড়সে, আর কেউ সোনার জলুষে। এই যা তফাৎ। ইচ্ছে হয় বলে উঠি, এসো ভাইসব, এসো সব সাচ্চা মানুষ, অন্তরের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হও—নিজেকে ফাঁকি দিও না।'

একটু ন'ড়ে চ'ড়ে চোখ খোলে সাভেলি। ঘুম-কাতর দেহটা তার মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। ইয়াকভ নিঃশব্দে উঠে গিয়ে চালা থেকে একটা ভেড়ার চামড়া এনে ভাইয়ের গায়ে চাপা দিয়ে দেয়। তারপর আবার এসে বসে সোফিয়ার পাশে।

অগ্নিকুণ্ড ঘিরে ব'সে আছে মানুষগুলি। আগুনের কেলি-চঞ্চল আলো নাচছে ওদের আঁধার মুখে। ওদের কথা-বার্তার উদ্বেগ-গম্ভীর সুর জ্বলন্ত আগুনের মন্থর শোঁ শোঁ শব্দের সাথে মিশে যায় বিচিত্র গম্ভীর ছন্দে।

সোফিয়া শোনায় দেশ-বিদেশের কাহিনী—মানুষের দুঃখ আর দুঃখ-মোচনের সংগ্রামের ইতিহাস। জার্মানীতে বিদ্রোহ ক'রেছিল নির্যাতিত কিসানেরা... আজাদীর লড়াইয়ে কি প্রচণ্ড আঘাত এসে পড়েছিল আইরিশদের ওপর, কিন্তু মাথা নোয়ায়নি তারা। ফরাসী দেশের সংগ্রামী জনতারা জান-কবুল, দুঃসাহসিক

লড়াই লড়েছিল...এমনি আরো কত কি। লোভী দানবের কুক্ষিগত দুনিয়ার ভিৎ বারে বারে কেঁপে উঠেছে...মুক্তি-সংগ্রামে আত্মাহুতি দিয়ে শহীদ হয়েছে কত সত্যান্বেষী বীর...অমর মানুষের অমর কাহিনী ব'লে যায় সোফিয়া আঁধার-ঝরানো রাতটির মখমলের মত কোমল কালোয় ঢাকা এই আরণ্য-প্রাঙ্গনে ব'সে। চারদিকে গাছ দিয়ে ঘেরা; মাথার ওপরে কালো আকাশ...অগ্নিকুণ্ডের আলোর টীকা পরা কালো পৃথিবী নীচে। মুগ্ধ চোখের সামনে দিয়ে মিছিল ক'রে চলে রণক্লান্ত... শোণিত-স্নাত বীর যোদ্ধার দল...

ধীরে ধীরে বলে যায় সোফিয়া। ওর মন্থর নীরস কণ্ঠে যেন কোন্ অতীতের বাণী ভেসে আসে। আশায় বিশ্বাসে মানুষগুলির বুক নেচে ওঠে...। সারা দুনিয়ার মানুষ এক হ'য়ে গেছে লড়াইয়ের ময়দানে। একই পবিত্র লক্ষ্য সামনে রেখে মুক্তি-সংগ্রামে এগিয়ে চলেছে বিশ্ব-মানবতা। এই মেয়েটির ক্ষীণ পাণ্ডুর মুখের দিকে তাকিয়ে আজ যেন আরো স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে এই সংগ্রামের মর্ম-কথা।

আজ নিজেদের বুকের আশা, আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্নের প্রতিধ্বনি খুঁজে পায় ওরা সুদূর অতীতের বুকেও...এক অন্ধকার রক্তাক্ত যবনিকা আড়াল ক'রে রেখেছে সেই মানুষদের। যাদের কথা শোনেওনি কোনও দিন। সেই সাত সমুদ্র তের নদীর পারের অচিন দেশের অচিন মানুষের বুকেও যেন ওই একই ভাষা। প্রাণে প্রাণে মনে মনে বিশাল দুনিয়ার সংগ্রামী মানুষের সাথে রাখীবন্ধন হ'য়ে যায়। দুনিয়াতে ন্যায়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠা ক'রবে ব'লে তারাও যে শপথ নিয়েছে। নতুন পৃথিবী, নতুন নামে অসহ্য দুঃখ বরণ ক'রেছে এরা; অঝোরে ঝরিয়েছে বুকের লোহু। মানুষে মানুষে এক নিবিড় আত্মিক বন্ধনের বোধ জ্ব'লে ওঠে সর্ব হৃদয়ে। বিশ্ব-জিজ্ঞাসায়, বিশ্বের সর্ব অনধিগতকে করায়ত্ত করার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় উন্দাম, উদ্বেলিত এক নতুন প্রাণ জন্ম নেয় মাটির বুকে।

বিশ্বাস-দৃঢ় স্বরে বলে সোফিয়া :

'একদিন আসবেই, যেদিন সারা দুনিয়ার মেহনতী মানুষ এক হ'য়ে আওয়াজ তুলে বলবে; "বাস্ আর নয়—আর নয় এ জীবন." সে-দিন ধ্বংস হ'য়ে যাবে লোভী মানুষের দল—যারা শুধু লোভের হাতিয়ার দিয়ে দুনিয়াকে দাবিয়ে রেখেছিল পায়ের তলায়। ওদের পায়ের তলা থেকে হ'টে যাবে সেই দুনিয়া—আঁকড়ে ধরার মতও কিছু থাকবে না আর।' .

'ঠিক বলেছ,' মাথা নীচু ক'রে রীবিন, বলে 'কি না করতে পারি আমরা যদি সব খুইয়ে একটিবার নামতে পারি।'

মা ভ্রূ দু'টিকে ওপরে তুলে শোনে—মুখে বিস্ময় ভরা সুখের হাসি বিচ্ছুরিত। এ যেন সেই সোফিয়া নয়—সেই কলকণ্ঠে কথা কওয়া, চঞ্চল উচ্ছল, খাম-খেয়ালী মেয়ে নেই আর। গল্প বলার এই ব্যগ্র প্রাণ-ঢালা সুসম শান্ত সুরের মধ্যে মানুষটার মধ্যে যা কিছু বেমানান ছিল, সব মিলিয়ে যায়। রাত্রির শান্তিটুকু, অগ্নিশিখার কেলি, আর সোফিয়ার মুখখানা—সবই বড় ভালো লাগে মায়ের—কিন্তু সব থেকে ভালো লাগে সাধারণ এই মানুষগুলোর সংযত, গভীর আগ্রহ। পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ, স্থির হ'য়ে বসে আছে ওরা—এতটুকুও নড়ছে না—মানুষের যে-বিরাট কাহিনী ক্রমশ উদ্ঘাটিত হ'য়ে চলেছে, পাছে তাতে ক্ষণিকের ছেদও পড়ে; যে সোনার সুতোয় বিশ্বের সাথে ওদের রাখী-বন্ধন হচ্ছে পাছে তা ছিঁড়ে যায়। অনেকক্ষণ পরে পরে অতি সন্তর্পণে কেউ একখানা কাঠ ফেলে দেয় আগুনে; ধোঁয়া

বা ফুলকি উঠলে হাত দিয়ে হাওয়া ক'রে সোফিয়া আর মায়ের দিক থেকে সরিয়ে দেয়।

একবার ইয়াকভ উঠে চুপি চুপি বলে :

'একটুখানি থামুন।' বলেই ছুটে চালার মধ্যে চলে গেল। একটা চাদর নিয়ে এসে ইগনাত আর ও দু'জনে মিলে অতিথিদের গায়ে পায়ে জড়িয়ে দিল।

যে-দিন জয় হবে, সে-দিনের ছবি এ'কে, শ্রোতাদের আত্ম-বিশ্বাসের উদ্বোধন করে; লোভীর খেয়াল মেটাবার জন্য নিষ্ফল শ্রমে তিলে-তিলে নিঃশেষ হ'য়ে যাচ্ছে দুনিয়া-জোড়া যে মেহনতী মানুষ তাদের সাথে একাত্মবোধে জাগিয়ে দিয়ে ব'লে যায় সোফিয়া ওর কাহিনী। দুর্ভাগা বন্দী-মানুষের জীবনে প্রেম, সত্য, শিব, সুন্দরকে প্রতিষ্ঠা করবে ব'লে সর্বস্ব পণ ক'রেছে যারা, শুনতে শুনতে তাদের ওপর শ্রদ্ধায় মা'র মন ভ'রে ওঠে।

চোখ বন্ধ ক'রে মনে মনে প্রার্থনা করে :

'ভগবান ওদের সহায় হোন।'

রাত হয়। সোফিয়া থামে ক্লান্ত হয়ে। চারধারের চিন্তা-গভীর আনন্দোচ্ছ্বল মুখগুলির দিকে চেয়ে মৃদু হাসিতে ওর মুখ ভ'রে যায়।

মা মনে করিয়ে দেয়, যাবার সময় হ'ল।

'তাই তো।' জবাব দেয় সোফিয়া।

একজন জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

রীবিন বলে : 'চ'লে যাচ্ছ! একটুও ভালো লাগছে না।' এমন কোমল সুরে ওর কণ্ঠে কেউ শোনেনি আর। 'বড় সুন্দর করে কথা বল তুমি। সব মানুষ যে এক এ মন্ত্র প্রাণের মধ্যে ঢেলে দেওয়া—সে কি চাট্টিখানি কথা! যখন বুঝতে বুঝতে পারি, আমি যা চাইছি লাখ লাখ কোটি কোটি মানুস তাই চাইছে, আঃ। না, বোঝাতে পারব না। মমতায় বুক ভ'রে যায়। প্রচণ্ড শক্তি পাই। ও যে শক্তিরই মন্ত্র।'

ইয়েফিম বলে : 'মিখাইলো-কাকা, ওঁরা চট্‌পট্ চ'লে যান কেউ দেখবার আগে! বইগুলো বিলি ক'রলেই তো কর্তারা শিং নাড়া দেবেন, কে আনলো এ সব? কোত্থেকে কে ব'লে বসবে—সেই যে মুসাফিররা এসেছিল...!'

রীবিন বাধা দিয়ে বলে : 'ধন্যবাদ মা। এত কষ্ট ক'রে এসেছ এখানে। তোমার দিকে তাকালেই আমার পাভেলকে মনে পড়ে। খুব বড় কাজ করছ মা, তুমি।'

আগুনের ধারে ব'সে আস্তে আস্তে কথা কয় ছেলেরা। সাভেলি ভেড়ার চামড়া ঢাকা দিয়ে তখনও মাটিতে শুয়ে। আকাশ ফিকে হ'য়ে আসে; ছায়ারা মিলিয়ে যায়; অরুণ আলোর আশায় পাতায় পাতায় শিহরণ জাগে।

রীবিন হাত বাড়িয়ে দেয় সোফিয়াকে : 'এবার বিদায় নিতে হয়, না? শহরে গেলে তোমায় খুঁজে পাব কেমন ক'রে বলতো!'

মা বলে : 'আমায় খুঁজো, তাহ'লেই হবে।'

এক এক ক'রে ছেলেরা এসে করমর্দন ক'রে বিদায় নেয় তাদের গ্রাম্য ধরণে। ওদের বুকের মধ্যে গভীর প্রীতিতে সুন্দর কি এক আনন্দ থৈ থৈ করে। এক নতুন অনুভূতি! এমন তো কখনও হয়নি। কেমন যেন বিব্রত হ'য়ে ওঠে ওরা। সোফিয়ার মুখের দিকে চেয়ে স্নিগ্ধ হাসি হাসে। নিদ্রাহীন চোখগুলি জ্বালা ক'রতে থাকে।

ইয়াকভ শুধায়, 'যাবার আগে একটু দুধ খেয়ে যাবেন না?'

'আছে তো?' ইয়েফিম জিজ্ঞাসা করে।

চুলগুলি ঠিক ক'রতে ক'রতে ইগনাত বলে : 'দুধ নেই, প'ড়ে গিয়েছে।'

তিন জনে হেসে ওঠে।

মা বোঝে, মুখে ওরা দুধের কথা বলছে বটে; কিন্তু প্রাণ ওদের অতিথিদের কল্যাণ কামনায় আকুল হ'য়ে উঠেছে। সোফিয়ার বুক দুলে ওঠে। কিছু ব'লতে পারে না। শুধু বলে :

'বিদায়, কমরেড্!'

মুখ চাও-চাওয়ি করে তিন জনে। এ যে নতুন কথা! কমরেড্! কে যেন কোমল হাতে দোলা দিয়ে কোন্ ঊর্ধ্ব-লোকে নিয়ে যায় ওদের!

হঠাৎ কাশির বেগ ওঠে সাভেলির। আগুন নিভে এসেছে প্রায়। অঙ্গার ভস্ম হ'য়ে গেছে।

শান্ত কোমল স্বরে কিসানেরা বলে :

'বিদায়।'

বিদায়—যেন বিরহের বাণী। বহুক্ষণ ধ'রে কানের মধ্যে বাজতে থাকে।

তখনও ভোর হয়নি। আবছা আলোয় অলস ভাবে এগিয়ে চলে ওরা।

মা বলে : 'কি চমৎকার না? যেন স্বপ্ন দেখলাম। সত্য জানতে চায় মানুষ। কি আকুলি বিকুলি দেখেছ? বড় ছুটির দিনে সকাল বেলাকার প্রার্থনার আগে গির্জায় যেমন হয় ঠিক তেমনি। পাদ্রী তখনও এসে পৌঁছাননি। চারদিক অন্ধকার নিঝঝুম—গা ছম্‌ছম্ করে। সেই সাত ভোরে লোকজন আসতে শুরু করেছে। এক এক ক'রে প্রদীপ জেবলে দেয় সবাই আইকনের সামনে। একটু একটু ক'রে দেবতার দেউলের আঁধার কেটে যায়।'

'ঠিক, একেবারে ঠিক! শুধু দেবতার দেউল ব'লতে এখানে সারা পৃথিবী, এই যা তফাৎ!'

'সারা পৃথিবী?' চিন্তান্বিত ভাবে মাথা নেড়ে বলে মা। 'সে কি আর আমাদের ভাগ্যে হবে? কিন্তু তোমার কথাগুলি ভারী সুন্দর মা, ভারী মিষ্টি। আমার কি ভয় হয়েছিল জান? তোমায় বুঝি ওদের ভালো লাগবে না।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে রইল সোফিয়া। তারপর অতি ধীরে অতি গম্ভীর ভাবে ব'লল :

'ওদের মাঝে থাকতে পারলে মনটা সরল হয়ে যায়।'

কথা কইতে কইতে পথ চলে ওরা—রীবিনের কথা, হাঁপানী রোগীর কথা, ছেলে তিনটির কথা। কি গভীর মন দিয়ে একেবারে স্থির হ'য়ে ব'সে কথা শুনছিল! ভারী লাজুক ছেলেগুলি। কিন্তু মা আর সোফিয়ার জন্য কি যে ক'রবে ভেবে পায়নি। এটুকু সেটুকু ক'রে যেন কৃতার্থ হ'য়ে গেছে। বন ছেড়ে মাঠে এসে পড়ে ওরা। সূর্য ততক্ষণ পূব-দিগন্তে দেখা দিয়েছে। যতক্ষণ চোখের আড়াল ছিল তার স্বচ্ছ গোলাপী ছটা আকাশ জুড়ে ডানা মেলে ছিল। ঘাসের শীষে শিশির বিন্দুরা নির্ভীক বাসন্তী দিনের রং বেরং-এর আলোয় ঝলমল করে। পাখীদের ঘুম ভেঙেছে; প্রভাতী আকাশে তাদের গানে গানে খুশির ঢেউ দিয়েছে। মোটা মোটা দাঁড়কাকের দল ডানা দিয়ে আকাশকে যেন সাপটে নিয়ে উড়ে চলেছে। কোথা থেকে ভেসে আসছে ওরিয়ল পাখীর শিস। পাহাড়ের ওপর থেকে রাতের

ছায়া মিলিয়ে গিয়ে—দূর দূরান্তরের দ্বার খুলে যায় সবিতার আবাহনের জন্য।

'এক এক সময় কি হয় জানো?' আরম্ভ করে মা, 'একজন হয়তো অনেকক্ষণ ধরে মেলাই বক্‌বক্‌ ক'রে যাচ্ছে; কিছুতেই ধ'রতে পারা যাচ্ছে না কি ব'লতে চায় সে। কিন্তু হঠাৎ একটা অতি ছোট্ট কথায় বেবাক্‌ সাফ হ'য়ে যায়। সেই হেঁপো-রোগীর কথাই দেখ না। কারখানায়, শুধু কারখানায়ই বা কেন—সর্বত্র—মজুরদের যে খেটে খেটে কি হাল হয় তা তো আর কারু জানতে বাকী নেই! শুনেছি, নিজের চোখে তো নিত্য দেখেছি। রোজ রোজ দেখে কেমন যেন অভ্যেস হ'য়ে যায়। ক'দিন পরে কিচ্ছু লাগে না আর। কিন্তু ও মানুষটা যা বললে সটান গিয়ে কলজের মধ্যে সেঁধুল। একেবারে বিঁধে গেল। ঠাকুর, এ কি বিচার তোমার? কতগুলো রাক্ষসের জন্য এমনি ক'রে মানুষকে তার জান-প্রাণ ফুঁকে দিতে হবে? এ তোমার কেমন ঠাট্টা?'

ওই হতভাগ্যকে জড়িয়ে থাকে মায়ের সারা চিন্তা। আরও এমনি কত হতভাগার কত ইতিহাস শুনেছিল। ভুলেও গিয়েছিল। আজ আবার সব মনে প'ড়ে যায়।

'এত পায় রাক্ষসগুলো! বোধহয় পেয়ে পেয়ে মাথার ঠিক থাকে না। এক গাঁয়ের এক হাকিমের কথা শুনেছি—ওর ঘোড়াটাকেও সবার সেলাম ঠুকতে হবে। না হ'লেই হাতকড়ি! বলতে পার এর মানে কি? কেন অমন ক'রত লোকটা?'

সোফিয়া আস্তে আস্তে একটা খুশির গান ধরে।

সাত

অদ্ভুত শান্ত ভাবে গড়িয়ে চলে মায়ের জীবন। নিজেই অবাক হ'য়ে যায় অনেক সময়। ছেলে জেলে—জানে কড়া সাজা হবে। তবু কেন জানি এসব কথা মনে হ'লেই মনে প'ড়ে যায় আন্দ্রিয়েই, ফিওদর এবং আরো অনেককে। এদের—এবং আরো যারা এ পথে গেছে—সবার মধ্যেই ছড়িয়ে আছে পাভেল। সে আর শুধু মায়ের বুক জোড়া একটি মাত্র মানুষ নেই আজ। বড় বেশী ভাবে মা আজকাল। নিজের অজান্তে অনিচ্ছায়, পাভেলের ভাবনা ডাল-পালা মেলে চারদিকে ছড়িয়ে যায়। এই ভাবনার আলোয় সব কিছু দেখতে, সব কিছুকে একই নক্‌শায় গেঁথে নিতে চেষ্টা করে মা। এবং করতে গিয়ে ওই ক্ষীণ আলোটুকু হাতড়াতে হাতড়াতে গিয়ে যেন সবখানে পড়ে, সব কিছুকে স্পর্শ করে। কোনও একটা জিনিষে তাই আর আজকাল মায়ের মন বসে না। ছেলেকে কাছে পাবার জন্য মন এত আকুলি বিকুলি করেছে, ছেলের জন্য এত ভয় ভাবনা, কিন্তু এখন যেন কিছুই মনকে স্পর্শ করে না।

ক'দিন পরে কোথায় চ'লে গেল সোফিয়া। পাঁচ দিন পরে ফিরে এল অত্যন্ত খোশ মেজাজে। কিন্তু মাত্র কয়েক ঘণ্টা থেকেই আবার চলে গেল। ফিরে এল দু'সপ্তাহ পরে। ও যেন পথেরই মানুষ, ঘরের নয়। মাঝে মাঝে আসে, ভাইয়ের ঘরখানিকে সাহসে সঙ্গীতে ভ'রে দিয়ে আবার চলে যায়।

সঙ্গীত এখন ভালো লাগতে আরম্ভ করেছে মায়ের। শুনতে শুনতে মনে হয় বুকের তটে উষ্ণ খুশির ঢেউ ভাঙছে। হৃদ্‌পিণ্ডটার ছট্‌ফটানি শান্ত হয়ে আসে। প্রচুর জল পেলে গভীর মাটির তলাকার বীজ যেমন অঙ্কুরিত হয়, তেমনি সঙ্গীতের স্পর্শে মায়ের মনের ভাবনারাও অতি অবলীলায় অঙ্কুরিত হয়ে, বলিষ্ঠ ডাল-পালা মেলে, ভাষার ফুলে ছেয়ে যায়।

ভারী এলোমেলো স্বভাবের মেয়ে সোফিয়া। যেমন তেমন ক'রে চারধারে জিনিষ-পত্র ছড়িয়ে রাখে। যেখানে সেখানে সিগারেটের ছাই ফেলে। অসহ্য লাগে মার। কথাবার্তায় ভাইয়ের একেবারে বিপরীত। নিকলাই, শান্ত সংযত—ওর কথাবার্তায় চমৎকার একটা মার্জনা আর গাম্ভীর্য থাকে। সোফিয়ার কথাবার্তা যেন নেহাৎ বাইরের জিনিষ, হৃদয়ের স্পর্শ নেই। ওর যেন এখনও বয়ঃসন্ধির কাল কাটেনি। মানুষের কাছে নিজকে বড় দেখাতে চায়, অথচ ওর কাছে মানুষ শুধু কৌতুকের বস্তু। শ্রমের মর্যাদা নিয়ে প্রচুর হাঁকডাক করে—কিন্তু ওদিকে জিনিষ-পত্র ছড়িয়ে ভেঙে ফেলে ঘর নোংরা করে মায়ের কাজ বাড়ায়, নিজে হাত ছোঁয় না। স্বাধীনতার বড় বড় বুলি কপচায়, কিন্তু সে শুধু নিজের সুবিধার বেলায়। অন্যের ব্যাপার হ'লেই দাঁতকপাটি। স্বভাব অত্যন্ত অসহনশীল—মানুষের পক্ষে রীতিমত জুলুম হ'য়ে দাঁড়ায়। আগাগোড়াই মানুষটা যেন এক রাশ বিরোধ দিয়ে তৈরী। বড় সাবধানে চলতে হয় মাকে। নিকলাইকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে মা—গাঢ় অবিচলিত শ্রদ্ধা। কিন্তু তা নেই এ মেয়ের জন্য।

দিনের পর দিন—একেবারে ঠাস-বুনট করা একঘেয়ে জীবন নিকলাইয়ের; তারই মধ্যে সকলের জন্য ওর ভাবনা। সকাল আটটায় চা খেতে খেতে খবরের কাগজ প'ড়ে খবর শোনায় মাকে। শুনতে শুনতে আঁতকে ওঠে মা—দুনিয়া জুড়ে পেষাই কলে ফেলে মানুষকে পিষে গুঁড়িয়ে রাত্তির দিন টাকা তৈরী হচ্ছে! গোটা দুনিয়াটাই টাঁকশাল! এই নির্মম সত্যই সর্বত্র? আন্দ্রিয়েইর সাথে কোথায় যেন এ ছেলের মিল আছে। মানুষের ওপর বিদ্বেষ নেই আন্দ্রিয়েইর। নিকলাইয়েরও নেই। দুনিয়াটা টাঁকশাল হ'য়ে গেছে—দুনিয়া-জুড়ে মানুষ পেষাই হচ্ছে, সে মানুষের দোষ নয়, সমাজ-ব্যবস্থারই দোষ নিকলাই-এর মতে। কিন্তু যে-নতুন জীবনের স্বপ্ন ওদের সামনে—তার ওপর আন্দ্রিয়েইর যেমন একটা গভীর আস্থা আছে—তা নেই নিকলাইয়ের। অত্যন্ত শান্ত ভঙ্গিতে কথা কয়—কড়া জজের মত ঠিক যতটুকুনি দরকার, ততটুকুনি। অত্যন্ত শান্ত মানুষ, কিন্তু কোন কোন ব্যাপারে এই শান্ত মানুষটির বিষণ্ণ শান্ত হাসির আড়ালে মা বজ্র-বিদ্যুতের আগুন দেখেছে। ওই আগুনকে ভালো ক'রে চেনে মা—আপোষ-হীন, ক্ষমাহীন ক্রোধের অনির্বাণ জ্বালা ও। অত্যাচারীকে ভুলবে না নিকলাই—ক্ষমাও করবে না। মা বোঝে কি কঠিন এই অন্তরের সংগ্রাম! মায়া হয়। প্রতিদিন মায়ের স্নেহ যেন এই কারণেই উথলে ওঠে।

ন'টার সময় ও কাজে চলে যায়। তারপর মা ব'সে রান্না করে, ঘরদোর সাফ করে। সব কাজ হয়ে গেলে, নেয়ে ধুয়ে পরিষ্কার জামা কাপড় প'রে ঘরে এসে বসে বই হাতে নিয়ে। ছবি দেখে। একটু একটু পড়তেও শিখেছে। অবশ্যি এখনও সড়গড় হয়নি, তাই অনেক সময় লাগে, মনোযোগ লাগে। কিন্তু একটুতেই ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে মা। পড়তে পড়তে খেই হারিয়ে যায়। তার চেয়ে বরং ছবি ভালো। ছবি দেখে ছেলেমানুষদের মতই খুশি হ'য়ে ওঠে মা। একটা বিচিত্র নতুন জগতের দ্বার খুলে যায় ওর চোখের সামনে। বুঝতে পারে এ জগৎটাকে; ধরবার ছোঁবার

মত কিছু পাওয়া যায়। বিরাট বিরাট শহর, জাঁকাল ইমারত, জাহাজ, মেশিন... মানুষের সৃষ্ট কি অনন্ত সম্পদ! তার সাথে আছে প্রকৃতির অজস্র আশ্চর্য সৃষ্টি-সম্ভার। এ রূপ তো কখনও দেখেনি এর আগে! জীবন ক্রমশই ওর চোখের সামনে দিগ্-দিগন্ত জুড়ে দল মেলছে। এত রূপ! এত ঐশ্বর্য! দেখে, আর নতুন-জাগা পিয়াসী হৃদয়ের পিয়াস বাড়ে। ভাবে কত বড় এই পৃথিবী...বুঝি এর আদি অন্ত নেই।

নিকলাইকে একদিন বললে সে-কথা : 'মস্ত বড় এই পৃথিবীটা না?' প্রাণীতত্ত্বের মানচিত্রখানা দেখতে ওর সব চেয়ে ভালো লাগে। বিশেষ ক'রে প্রজাপতি, পোকা-মাকড়ের ছবি। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ও। বলে :

'অদ্ভুত সুন্দর! তাই না নিকলাই ইভানোভিচ্? আমাদের চারদিকেই দেখছি আছে এ-সব। অথচ দেখতে পাইনে। চোখে ঠুলি পরান আমাদের। ঘানিগাছে ঘুরছি যেন ঠুলি পরে। জানবার দেখবার সময়ও নেই, ইচ্ছেও নেই। সত্যি যদি সবাই জানতাম এ দুনিয়া কত সুন্দর, কত আশ্চর্য, কত জিনিষ আছে এতে, অনেক দুঃখ আমাদের কমে যেত। প্রত্যেকটি জিনিষই তো আমাদের জন্য, তাই না? প্রত্যেকের জন্য, সকলের জন্য। ঠিক বলিনি?'

হেসে বলে নিকলাই : 'নিশ্চয়ই।' আরেকখানা ছবির বই নিয়ে আসে।

সন্ধ্যা বেলাটা প্রায়ই লোকজন আসে নিকলাইয়ের কাছে। সেই সুন্দরপানা ভদ্দরলোক—আলেক্সেই ভাসিলিয়েভিচ্ আসেন নিত্য নিয়মিত। ফ্যাকাশে রং, কালো কুচ্কুচে দাড়ি, রাশভারী চেহারা—সবটা জড়িয়ে চোখে পড়বার মত। আর আসে রোমান পেত্রভিচ্, ইভান দানিলভিচ্, ইয়েগর, আরো অনেকে। পেত্রভিচ্এর মাথাটা গোল, মুখময় মেচেতার দাগ। সব কিছুতে ওর আফ্শোষ—আর তাই প্রকাশ করতে গিয়ে সর্বক্ষণ জিভ দিয়ে চ্চ্ চ্চ্ শব্দ করে। ছোট্টখাট্ট রোগা ছট্-ফটে মানুষটি এই দানিলভিচ্—ছুঁচলো দাড়ি, বাজখাঁই গলায় সোরগোল তুলে কথা বলে। আর অহর্নিশ ঠাট্টা তামাশা নিয়ে আছে ইয়েগর। সবার পেছনে লাগে—নিজকেও বাদ দেয়না। এ ছাড়াও নানান জায়গা থেকে, নানান ধরনের লোক আসে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চাপা স্বরে কথা চলে শ্রমিকদের সম্বন্ধে। তুমুল তর্ক, হাত পা ছোঁড়াছুঁড়ি, সাথে সাথে গেলাস গেলাস চা খাওয়া চলে অনেক রাত অবধি। নিকলাই কি সব লেখে, পড়ে শোনায়। অন্যরা তাড়াতাড়ি লিখে নেয়। খসড়ার ছেঁড়া টুক্রোগুলো সাবধানে কুড়িয়ে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলে মা।

শ্রমিকদের অদৃষ্ট, ওদের অবস্থার সম্বন্ধে ওরা আলোচনা করে। বাস্তব অবস্থা বুঝিয়ে কি করে ঘুমন্ত মানুষগুলোকে জাগান যায়, কি করেই বা নিজেদের চেষ্টা আরো জোরদার করা যায় এই সব সম্বন্ধে কি আগ্রহ আর ব্যগ্রতা নিয়ে কথা বলে ওরা—চা ঢালতে ঢালতে অবাক হয়ে শোনে মা। মাঝে মাঝে রেগে ওঠে সবাই আর তখন উল্টো মত জাহির করতে থাকে, একজন অপরজনের ওপর দোষ চাপায়, মনে আঘাত দিয়ে কথা বলে আর তুমুল তর্কবিতর্ক শুরু করে দেয়। মায়ের মনে হতে থাকে, শ্রমিকদের সম্বন্ধে কত কম ওদের জ্ঞান—তার চাইতে মা অনেক বেশী জানে। কি বিরাট কাজ যে ওরা হাতে নিয়েছে সে ধারণাও নেই পাগলগুলোর। অনুকম্পা হয় মার, দুঃখও হয়। শিশুরা খেলাঘরে যখন বর-বউ খেলে, সংসার-নাট্যে বর-বউএর যে কি অর্থ আর কি ভূমিকা তা তারা জানেও না। বড়রা প্রশ্রয় আর দীর্ঘশ্বাসে মিলিয়ে ওদের সে-খেলা দেখে। অনেকটা সেই দৃষ্টিতেই মা এই ছেলেদের দিকে

তাকায়। পাভেল আর আন্দ্রিয়েইর কথা মনে পড়ে যায়। তাদের সাথে কোথায় যেন এদের তফাৎ আছে। ঠিক ধরতে পারেনা মা। কখনও কখনও মনে হয় এরা বড্ড বেশী চ্যাঁচায়। কই পাভেলরা যখন বস্তীর সেই ছোট্ট ঘরে বসে কথা কইত এত চ্যাঁচাত না তো! ভাবে :

'হয়তো এরা বেশী জানে, তাই এত চ্যাঁচায়!'

এদের কথাবার্তা শুনে একটা কথা প্রায়ই মায়ের মনে আসে। এরা ইচ্ছে করে খোঁচাখুঁচি করে, কথায় কথায় নিজেদের বিক্রম ফলাতে চায়। প্রত্যেকেই যেন কমরেডদের কাছে প্রমাণ করতে চাইছে, অন্যদের তুলনায় সে-ই সত্যকে সবচেয়ে বেশি বুঝেছে, সত্যের জন্যে নিষ্ঠা তারই সবচেয়ে বেশি। একথার উত্তরে অন্যরাও পাল্লা দিয়ে চোটপাট করে, তারাও তেমনি তীব্র তীক্ষ্ম যুক্তি দেখিয়ে প্রমাণ করতে চেষ্টা করে যে সত্যের সঙ্গে তাদের সম্পর্কটাই ঘনিষ্ঠতর। দেখেশুনে মায়ের মনে হয়, এরা প্রত্যেকেই চেষ্টা করে, কি করে একজন আর-একজনের মাথায় চেপে বসবে। মায়ের বিশ্রী লাগে, কেমন একটা বিষণ্ণতায় মনটা ছেয়ে যায়। ওদের দিকে তাকিয়ে থাকবার সময় মায়ের ভুরুদুটো কাঁপে, চোখদুটোতে মিনতি ঝরে পড়ে, আর মনে মনে ভাবে মা :

'পাশার কথা আর তার কমরেডদের কথা ওরা ভুলে গেছে...'

ওদের সব বাক্-বিতন্ডা বোঝেনা মা, কিন্তু মন দিয়ে শোনে। অন্তত ভাব বুঝতে চেষ্টা করে। মা উপলব্ধি করে যে ভালো সম্পর্কে ধারণার মধ্যে শ্রমিকদের বস্তিতে আর এখানে পার্থক্য আছে। বস্তীর আলোচনা শুনে মায়ের মনে হত, ওদের ধারণার মধ্যে ফাঁকি নেই, ভালোকে ওরা সামগ্রিক অর্থেই ধরতে পেরেছে। কিন্তু এখানে এই সামগ্রিকতাটুকু নেই—ভাঙা ভাঙা, টুক্‌রো টুক্‌রো ধারণা, তুচ্ছ অর্থহীনতায় সংকীর্ণ। বস্তীর সেই ছোট্ট ঘরখানায় ছিল ঐকান্তিকী নিষ্ঠা, এখানে নিষ্ঠা গৌণ, বিভক্ত। সেখানে ছিল গভীর অনুভূতি, এখানে শুধু উত্তেজনা। এখানে এরা শুধু ভাঙার কথা কয়—সেখানে ছিল নূতন-সৃষ্টির স্বপ্ন। তাই আন্দ্রিয়েই আর পাভেলের কথা এত ভালো লাগত।

মা লক্ষ্য করে, শ্রমিকরা এলে নিকলাই কেমন যেন অন্যরকম করে কথা কয়, স্বরে মধু ঢেলে দেয়, খুব সহজ হ'তে চায়। মা ভাবে, ওরা যাতে বুঝতে পারে, তাই অমন করে কথা কইছে।

কিন্তু ভালো লাগেনা মায়ের। যারা আসে, নিকলাইয়ের সাথে কথা কইতে গিয়ে তারাও যেন কি রকম আড়ষ্ট হ'য়ে থাকে। বরঞ্চ মায়ের সাথে ওরা সহজ হ'য়ে দিল খুলে কথা কয়। সে-দিন নিকলাই বাইরে গেলে, সেই ফাঁকে মা ওদের একজনকে জিজ্ঞাসা করল :

'এত ভয় কিসের বলতো! তোমাদের দেখে মনে হয় ঠিক যেন গুরু-মশায়ের কাছে ছোকরা-পোড়ো পড়া বলছে।'

দাঁত বের ক'রে হেসে বলে ছেলেটি : 'জলের বাইরে থাকলে চিংড়ি মাছ যে লাল হ'য়ে ওঠে গো। উনি তো আর আমাদের মত নয়...'

সাশাও আসে মধ্যে মধ্যে। কিন্তু থাকেনা বেশীক্ষণ। মুখে হাসি টাসি নেই। ঠিক কাজের কথাটি ব'লে চলে যায়। যাবার সময় রোজ শুধায় : 'পাভেল মিখাইলোভিচ্ কেমন আছে?

'হেসে খেলে দিব্যি আছে...,

'আমার নমস্কার দেবেন তাকে।' বলেই চলে যায়।

একদিন মা ব'সে ব'সে বলছিল সাশাকে : 'কতদিন হ'ল আটকে রেখে দিয়েছে ছেলেটাকে—বিচার টিচারের বালাই নেই।'

সাশার কপাল কুঁচকে যায়; হাতের আঙুলগুলো মোচড়াতে থাকে।

মা বলতে চায় : 'আমি জানিরে বাছা, তুই ভালোবাসিস্ ওকে।'

কিন্তু সাহস হয়না। সাশার গম্ভীর মুখ, চাপা ঠোঁট দেখে এগুতে পারেনা। কাজের কথা ছাড়া কথা কয় না ও। সবে মিলে মানুষকে যেন দূরে সরিয়ে রাখে ও। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মা ওর বাড়ানো হাতখানায় নীরবে একটু চাপ দেয়। আর ভাবে :

'মনে ওর এতটুকু সুখ নেই।'

নাতাশা এল একদিন। মাকে দেখে ভারী খুশি। চুমু খেয়ে হঠাৎ বলে আস্তে আস্তে :

'মা মারা গেছেন আমার...' মাথাটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি চোখ মুছে ফেলে বলে :

'পঞ্চাশ বছরও তো হয়নি। কত বছর বেঁচে থাকতে পারতেন আরো। কিন্তু যে-ভাবে থাকতেন, ভালোই হয়ছে—মুক্তি পেয়েছেন। চিরটা কাল একা একা কাটল। আপনার জন বলতে কেউ ছিলনা আশপাশে। বেচারাকে কোন কিছুতে কারো দরকার হ'লনা কোন দিন। সারাটা জীবন বাবার জুলুমে আর মাথা তুলতে পারলেন না। এর নাম বেঁচে থাকা? বলুন তো? মানুষ আশা নিয়েই না বেঁচে থাকে? বাবার লাঞ্ছনা ছাড়া আশা করার মত মায়ের আমার আর কিছুই ছিল না।'

চিন্তিত ভাবে বলে মা : 'ঠিকই বলেছ নাতাশা। আশায়ই বেঁচে থাকে মানুষ। সেই আশাই যদি না রইল, তা হ'লে কি নিয়ে সে বাঁচবে!'

নাতাশার হাতে হাত বুলাতে বুলাতে বলে মা :

'একলা প'ড়ে গেলে বড্ড!'

'একদম।' হাল্কা ভাবে জবাব দেয় নাতাশা।

একটু থেমে মা বলে : 'কিছু ভাবনা নেই। ভাল লোক কখনও একলা থাকেনা। মানুষ আপনি এসে তাদের কাছে ধরা দেয়।'

আট

কোন এক কাপড়-কলের এক স্কুলে মাষ্টারী নিল নাতাশা। মা ওকে জোগাতে লাগল যত বেআইনী বই, পুস্তিকা আর খবরের কাগজ। এই হ'ল ওর কাজ এখন। মাসের মধ্যে বার কয় বেশ বদলে, কখনও ফিরিওয়ালী, কখনও সন্ন্যাসিনী, কখনও বিলাসিনী নাগরিকা, কখনও মুসাফির সেজে, ঝোলা কাঁধে নয়তো সুটকেস হাতে, চক্কর দিয়ে আসে। ভয় ডর নেই। ট্রেণে, জাহাজে, নৌকায়, হোটেলে, যেখানেই যাক, সেই শান্ত শিষ্ট সহজ সরল মানুষটি সবার সাথে নিঃসঙ্কোচে আগে গিয়ে আলাপ করে। অত্যন্ত মিশুক স্বভাব; মুখে বহু অভিজ্ঞতা প্রসূত একটা আত্ম-প্রত্যয়ের ছাপ। মানুষ সহজেই কাছে আসে।

মানুষজনের সাথে কথা কইতে, তাদের সুখদুঃখের কথা শুনতে ওর খুব ভালো লাগে। বিশেষ করে যাদের জীবন অসন্তোষে ভ'রে আছে, যারা দুর্ভাগ্যের মার খেয়েছে, অদৃষ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে; আর আজ নিজের অবস্থাকে মেনে নিতে না পেরে জীবনের বিশিষ্ট কতগুলি প্রশ্নের উত্তর খুঁজে ফিরছে—সেই সব মানুষের সাথে কথা কইতে ওর আরো ভালো লাগে। অতৃপ্ত, অশান্ত, সংগ্রামী মানুষের জীবন রূপে রূপে উদ্ঘাটিত হ'তে লাগল ওর সামনে--সর্বত্রই সেই এক ইতিহাস। মানুষকে বোকা বানিয়ে রেখে তার রক্ত শুষে খায় মানুষ ব্যক্তিগত লাভের জন্য। মা দেখে সংসারে কিছুর অভাব নেই—অজস্র হাতে রয়েছে দুনিয়ার দান—সেই প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেও অধিকাংশ মানুষ, অর্ধাশনে অনশনে, চির দারিদ্র্যে ধুঁকে ধুঁকে মরে। শহরের গির্জায় গির্জায় কি অঢেল ঐশ্বর্য! সোনা রূপো দুই হাতে ছড়ান—তার এক কণারও দরকার নেই ভগবানের; দেখেছে গির্জার পুরোহিতদের সোনার সুতোয় বোনা পরিচ্ছদের চোখ-ঝলসান আড়ম্বর; আর সেই গির্জারই দরজায় অর্ধ-উলঙ্গ ভিখারীর দল অবহেলায় ছুঁড়ে-ফেলা ছিঁটে-ফোঁটার জন্য শীতে কাঁপতে কাঁপতে হাত পেতে বসে থাকে। আজন্ম এই দেখে এসেছে! পার্থক্যটা কাঁটার মত চোখে বিঁধেছে। কিন্তু স্বীকার ক'রে নিয়েছে ওতো হ'য়েই থাকে ব'লে। কিন্তু এখন যেন আর সহ্য হয় না। মনে হয় দরিদ্রের এত বড় অপমান আর নেই। গির্জার দরকার তো দীন-দুঃখীরই বেশী।

ছবিতে, বইয়ে, আরও নানাভাবে যতটা জেনেছে, পড়েছে, সর্বত্র দেখেছে যীশু-খৃষ্টকে—অতি সাধারণ বেশেই দেখেছে—কারণ দীন-দুঃখীরই বন্ধু তিনি। কিন্তু গির্জায় গির্জায় সেই খৃষ্টেরই মূর্তি সোনা-জহরৎ, সিল্ক-সাটিনে মোড়া। শান্তির আশায় ভিক্ষুকের দল সেই দেবতার দুয়ারে যখন এসে দাঁড়ায়, তাঁর অঙ্গের জলুস যেন লাজে ম্লান হ'য়ে যায়। রীবিনের কথা মনে পড়ে। বলত সে :

'দেবতার চেয়েও ব্যাটারা আমাদের বোকা বানিয়ে রেখেছে।'

টেরও পেলে না মা, ভেতরটা ওর জন্মান্তরে পাড়ি জমিয়েছে। প্রার্থনা আর করেনা আগের মত; কিন্তু যীশুর কথা, এবং যারা তাঁর নাম দিনান্তে মনে না ক'রেও তাঁরই আদর্শে দুনিয়াকে জানে দীনের দুনিয়া ব'লে; দুনিয়ার ঐশ্বর্যের মালিকানা সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চায়—তাদের কথা মনের মধ্যে আরো বেশী ক'রে ওলট পালট্ করে; ফুলে ফেঁপে ওঠে—সারা চিত্ত ছেয়ে যায়; হৃদয়ের গভীরে গিয়ে বাসা বাঁধে। যা কিছু দেখে শোনে, ওই একই ভাবনায় রঙ্গীন হ'য়ে ওঠে; ওই ভাবনাই ওর প্রাণের আরাধনা হ'য়ে তার সম-বিচ্ছুরিত আলোয়, আঁধার পৃথিবীকে, সমগ্র জীবনকে, প্রতিটি মানুষকে জ্যোতির্ময় ক'রে তোলে। যীশুখৃষ্টকে বরাবর ভালোবেসে এসেছে, এক বিচিত্র কোমলতা দিয়ে, ভয়ে ভরসায়, আশায় আনন্দে মিলিয়ে। আজ সেই প্রিয় হয়েছে প্রিয়তর। আলোয়, আনন্দে আরো মহিমান্বিত হয়েছে; দেবতা হয়েছেন কাছের মানুষ। পুনরুজ্জীবিত হয়েছেন তিনি। রূপান্তর হয়েছে তাঁর। তাঁর দক্ষিণ মুখকে সবার কাছ থেকে আড়াল করে রেখে, তাঁর নাম নিয়ে পৃথিবীকে বারে বারে রক্তে ভাসিয়েছে স্বার্থপর মানুষ। সেই রক্ত-স্নানে শক্তিমান হ'য়ে জীবনের দেউলে আজ তাঁর সত্যিকার পুনরুত্থান হয়েছে।

প্রত্যেকবার নবনব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রে, উত্তেজনায় আনন্দে ডগমগ হয়ে নিকলাইয়ের কাছে ফিরে আসে মা।

নিকলাইকে বলে একদিন : ভারী ভালো লাগে ঘুরে বেড়াতে। জীবনটাকে চেনা

যায়। ঠেলা খেয়ে জীবনের একেবারে একপ্রান্তে সরে দাঁড়িয়ে আছে সাধারণ মানুষ। কি যে হয়েছে বুঝতে পারে না ওরা; তবে অবাক হয়ে ভাবে মানুষ হ'য়ে মানুষের ব্যবহার পায়না ওরা কোন্ অপরাধে? কেন অমন দূর্ দূর্ করবে ওদের? চারদিকে এত অঢেল খাবার থাকতে, কেন ওরা পেটের খিদেয় জ্বলবে? চারদিকে শিক্ষার এত ব্যবস্থা, তবে কেন পাবেনা ওরা শিক্ষা, কেন অমন ক'রে অন্ধকারে থাকবে? ভগবানের কাছে তো ধনী-দরিদ্রের তফাৎ নেই—সবাই তাঁর সন্তান—তবে কোথায় তিনি? জানো, ওরা আজকাল অনেকটা বুঝতে পারছে নিজেদের অবস্থা। বুঝেছে, যে অবিচার অন্যায় চলছে ওদের ওপর, এখন যদি কিছু না করে তবে পৃথিবীতে আর ওদের চিহ্ন থাকবে না।'

এক এক সময় নিজেকে যেন আর দমিয়ে রাখতে পারে না মা—ইচ্ছে হয় চীৎকার ক'রে ওই মানুষগুলোকে তাদের বঞ্চনার ইতিহাস শোনায়।

অনেক সময় নিকলাই অনেক আশ্চর্য কথা শোনায় মাকে। ও যেন হক্চকিয়ে যায়। অত বড় কাজ হাতে নিয়েছে মানুষ! ওর মুখ দিয়ে কথা বেরয় না। থেমে থেমে জিজ্ঞাসা করে :

'সত্যি বলছ? সত্যি হবে?'

স্থির অচঞ্চল বিশ্বাস দিয়ে ভাবীদিনের স্বপ্ন দেখেছে নিকলাই। চশমা-পরা চোখ দুটির দৃষ্টি স্নেহে কোমল হয়ে ওঠে। বলে :

'মানুষের ইচ্ছারও সীমা নেই, তার শক্তিরও সীমা নেই। তবু পৃথিবী আত্মিক সম্পদে তেমন বড় হ'তে পারছে কই! তার কারণ হ'চ্ছে টাকার মাপকাঠিতেই মাপা হয় সব। মানুষ ভাবে স্বাধীন হওয়া মানে অনেক টাকা জমানো। জ্ঞান-সঞ্চয়ের চেয়ে অর্থ-সঞ্চয়ের দিকেই তাদের নজর বেশী। কিন্তু এদিন থাকবেনা। একদিন আসবে মানুষ যখন লোভ থেকে মুক্ত হ'বে, জবরদস্তির এই মেহনত তাকে যখন আর করতে হবে না...'

সব কথা বুঝতে পারেনা মা। কিন্তু যে শান্ত বিশ্বাস নিকলাইদের অনুপ্রাণিত করে রেখেছে, সেই বিশ্বাসখানিকে ও চিনে নিতে পারে। নিকলাই বলে :

'কিন্তু মুশ্কিল হয়েছে, ক'জনই বা আছে অমন লোক!'

মাও জানে তা। লোভ-দ্বেষহীন মুক্ত মানুষ দেখেছে ও। বোঝে অমনি মানুষ আর ক'জন থাকলে সংসারটার আঁধার দু'দিনে ঘুচে যেত।

বিমর্ষভাবে নিকলাই বলে : 'কি করবে, অবস্থায় কঠিন করে মানুষকে।'

খখলকে মনে পড়ে মায়ের।

কাজ থেকে রোজ ঠিক সময়েই ফেরে নিকলাই। সে-দিন বড় দেরী হ'য়ে গেল। এসে কাপড় জামা না ছেড়েই কেমন অপ্রতিভ ভাবে হাত কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে বলল :

'একজন কমরেড্ জেল থেকে পালিয়েছে শুনলাম। কে বুঝলাম না। এখনও শুনিনি...'

মা'র মাথা টলে। তাড়াতাড়ি ব'সে পড়ে বলে :

'পাভেল নয়তো!'

'আশ্চর্য কি! কিন্তু কোথায় পাব ওকে খুঁজে? এতক্ষণ তো ওজন্যই টহল দিলাম রাস্তায়। যদি দেখতে পাই। অবশ্যি জানতাম ও ভাবে দেখা হওয়া সম্ভব নয়...। কিন্তু করতে হবে তো কিছু। আমি আবার যাচ্ছি...।'

মা চীৎকার ক'রে ওঠে : 'আর আমি?'

'আপনি ইয়েগর-এর ওখানে যান, দেখুন সে যদি কিছু জানে।' দৌড়ে বেরিয়ে যেতে যেতে বলে নিকলাই।

মা বুক-ভরা আশায় তাড়াতাড়ি রুমালটা মাথায় বেঁধে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল নিকলাইয়ের পেছন পেছন। পাগলের মত প্রায় দৌড়ুতে লাগল। কোন দিকে লক্ষ্য নেই। বুকের মধ্যে হাতুড়ীর ঘা পড়ছে। অজানা এক সম্ভাবনার দিকে ছুটে চলেছে মা দিশেহারা হ'য়ে। বিদ্যুৎ চমকের মত আশার ঝলক খেলে যায় : 'যদি খোকা সত্যি থাকে ওখানে!'

পা দুটো আরো ছুটে চলে!

গরম প'ড়ে গেছে। ক্লান্তিতে হাঁপাতে লাগল মা। ইয়েগর-এর বাড়ীর সিঁড়ির কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। পা আর চলে না। পেছন ফিরে একবার তাকিয়েই চীৎকার ক'রে উঠে চোখ বন্ধ ক'রে দুই হাতে। পকেটে হাত দিয়ে দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে নিকলাই ভেসভশ্চিকফ্। চোখ তুলে আর একবার তাকিয়ে দেখে কেউ নেই সেখানে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ভাবে—চোখের ভুল। কিন্তু উঠোনে কার যেন পায়ের শব্দ। ঝুঁকে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখে—পরিচিত সেই বসন্তের দাগওয়ালা মুখখানা ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে।

'নিকলাই! নিকলাই!' ডাকতে ডাকতে নীচে ছোটে মা। আশা ভঙ্গে কলজেটা যেন দুম্‌ড়ে মুচ্‌ড়ে ভেঙে যেতে লাগল।

হাত নেড়ে শান্তভাবে বলে নিকলাই : 'এসো না, যাও যাও!'

ছুটে ওপরে এসে ইয়েগর-এর ঘরে ঢোকে মা। ডিভানের ওপরে শুয়ে ছিল ইয়েগর।

মা হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে বলে : 'শুনেছ, নিকলাই পালিয়ে এসেছে জেল থেকে।'

বালিশ থেকে মাথাটা একটু তুলে মোটা গলায় জিজ্ঞাসা করে ইয়েগর : 'নিকলাই! কোন নিকলাই? দু'জন আছে তো।'

'ভেসভশ্চিকফ্। এই যে এসে গেছে।'

'বাঃ বাঃ! খাসা!'

ঠিক সেই মুহূর্তেই নিকলাই এসে ঘরে ঢোকে। সাবধানে দরজা বন্ধ ক'রে টুপি খুলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসে আর চুলে হাত বুলায়।

ইয়েগর কনুইতে ভর দিয়ে একটু উঠে ওকে অভ্যর্থনা করে :

'আরে! এস! এস!'

নিকলাই হাসতে হাসতে কাছে এসে মায়ের হাতখানি ধ'রে বলে :

'ভাগ্যিস তোমার সাথে দেখা হ'য়ে গেল! নইলে গিয়ে আবার জেলখানার অতিথি হ'তে হ'ত। কাউকে চিনি না শহরে। ভাবছিলাম কি করি, বস্তীর বাড়ীতে ফিরে গেল সাথে সাথেই ধ'রে নিয়ে যাবে। নাঃ পালিয়ে এসে কাজটা ভালো হয়নি—ভাবতে ভাবতে আসছি, হঠাৎ দেখি আমাদের নিলোভনা। গট্‌গটিয়ে কোথায় জানি চলেছেন—বাস, আর যায় কোথায়! অমনি পেছু ধরলাম।

'কিন্তু বাপু! বেরুলে কি ক'রে, বলো দেখি!'

নিকলাই বসে এসে চৌকিটার ধার ঘেঁষে। বড় অস্বস্তি লাগে ওর। কাঁধ নেড়ে বলে :

'জুটে গেল মৌকা। এই বাইরে হাওয়ায় একটু বেরিয়েছিলাম। দেখি কি সাধারণ কয়েদীরা ওদের জমাদারকে ধ'রে খুব ঠ্যাঙ্গানি দিচ্ছে। ব্যাটা নাকি টিকটিকি, চব্বিশ ঘণ্টা সকলের পেছনে লেগে থাকে, এক লহমার জন্য কাউকে শান্তিতে তিষ্ঠুতে দেয় না। তাই কয়েদীরা হাড়ে হাড়ে চ'টে ছিল। বাস্, বাগে পেয়ে গেল, আর যায় কোথায়! চার দিকে সব ছত্রখান; পাগলা ঘণ্টি বাজছে। জমাদারেরা পাগলের মত ছুটোছুটি করছে সিটি বাজিয়ে বাজিয়ে।—সে এক কাণ্ড। হঠাৎ সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি সদর দরজাখানা সপাট খোলা,—ওধারে দেখা যাচ্ছে পার্কটা। পা পা ক'রে এগুলাম। আমার কি আর তখন হুঁশ চৈতন্য আছে! যেন স্বপ্ন দেখছি—অনেকটা দূর চ'লে এলাম অমনি ক'রে। তখন হুঁশ হ'ল। তাকিয়ে দেখি—আরে এ-যে সদর রাস্তা! কোথায় যাই? পেছন ফিরলাম, দেখি জেলের দরজাও বন্ধ হ'য়ে গেছে...'

'হুঁ!' ইয়েগর বলে, 'তা লক্ষ্মীছেলেটির মত গুটি গুটি ফিরে গিয়ে কড়া নাড়া দিলেনা কেন? একটু হাত কচলে এবারকার মত না হয় ঘাট্-টাট্ মানতে!'

নিকলাই হাসে : 'তা বৈকি! বাজে বকো না। কিন্তু কমরেড্‌দের কাউকে কিছু না ব'লে তো পালিয়ে এলাম। কাজটা ভাল হয়নি মনে হচ্ছিল। তা কি আর করি তখন? এগুন ছাড়া আর উপায় কি! দেখি ছোট্ট একটা বাচ্চা কার বুঝি মরেছে। তাকে নিয়ে চলেছে কবরখানায়। মেলা লোকজন সাথে। মাথাটি হেঁট ক'রে ভিড়ে পড়লাম সেই দঙ্গলে; কারু দিকে আর তাকান টাকান নেই। অনেকক্ষণ ব'সে রইলাম গিয়ে সেই কবরখানায়—ঠাণ্ডা হাওয়ায় মগজটা একটু ঠাণ্ডা হবে। হঠাৎ একটা কথা মাথায় এল...'

'মাত্র একটা!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে ইয়েগর, 'তোমার মগজখানায় আর কিছু থাকার জায়গা আছে?'

হাঃ হাঃ করে ভেসভশিচকফ্ হাসে মাথা নেড়ে নেড়ে।

'এখন আর আগের মত ফোঁকলা নেই হে মগজটা! তুমি যে দেখছি এখনও ভুগছো।'

'যার যেমন সাধ্যি! আমি ভুগতে পারি, ভুগছি। রাখ ওসব কথা। তারপর বল।'

'হাঁটতে হাঁটতে যাদুঘরে গিয়ে ঢুকলাম। ঘুরছি আর ভাবছি—যাই কোথায় এখন! কোনই রাস্তা দেখি না। পাগলের মত লাগতে লাগল। ক্ষিদেয় পেট

জ্ব'লে যাচ্ছে। আবার বেরিয়ে এলাম রাস্তায়। কিন্তু যে মার্কা-মারা! গ্যাট্ গ্যাট্ ক'রে পুলিশ তাকাচ্ছে—কখন জানি গাঁক ক'রে ধরে এসে! ভয়ে মরছি. হঠাৎ দেখি আমাদের নিলোভনা আমারি দিকে আসছে। একটু পাশ কাটিয়ে দাঁড়ালাম, তারপর আর কি—এসে গেলাম পেছন পেছন। বাস্। আমার কথাটি ফুরুল...'

মার অপরাধী মনে হয় নিজেকে। বলে : 'দেখতে তো পাইনি তোমায়!' নিরীক্ষণ ক'রে দেখতে লাগল ভেসভশিচকফ্‌কে। একটু যেন রোগা হ'য়ে গেছে।

মাথা চুলকে বলে নিকলাই : 'কমরেড্‌রা ভেবে অস্থির হবে, কোথায় গেল লোকটা।'

'হুজুরদের কথা তো ভাবছ না। তারাও ভেবে সারা হবেন!' ইয়েগর বলে। মুখটা খুলে ঠোঁট দুটোকে নাড়তে থাকে, যেন হাওয়া চিবিয়ে খাচ্ছে। আবার বলে :

'ঠাট্টা ইয়ার্কি রাখো। তোমার ব্যবস্থা তো ক'রতে হবে একটা! চাট্টিখানি কথা নয়। যদিও তুমি এসেছ, খুব ভালো লাগছে। আমি যে ছাই উঠতে পারি না।' দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। হাত দু'খানা এলিয়ে প'ড়ে ক্ষীণ ভাবে বুকটাকে ঘষতে থাকে।

নিকলাই বলে : 'ভারী রোগা দেখাচ্ছে তোমায় ইয়েগর ইভানোভিচ!' মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ছোট্ট ঘরখানার চারদিকে চায়।

'আছে অসুখ, আমার আছে! ও নিয়ে তোমাদের মাথাব্যথার দরকার নেই;' ইয়েগর বলে, 'আর আদিখ্যেতা না ক'রে, যাওতো এখন ছেলের কথা শুধোও গে।'

ভেসভশিচকফ্ হাসে :

'দিব্যি আছে পাভেল। জেলখানায় ওই তো আমাদের সর্দ্দার। কর্ত্তাদের সাথে সরাসরি ওই কথাটথা বলে। সব্বাই পাভেল বলতে অজ্ঞান।'

নিলোভনা ভেসভশিচকভের কথা শুনে মাথা নাড়ে আর আড়-চোখে ইয়েগর-এর ফোলা, ফ্যাকাশে মুখখানার দিকে তাকায়। অদ্ভুত মুখ! নিষ্প্রাণ, নিশ্চল, ভাবলেশহীন। শুধু চোখ দুটি তার মধ্যে খুশিতে ঝলমল করছে।

হঠাৎ ব'লে ওঠে নিকলাই, 'কিছু খাবার টাবার আছে হে! সাংঘাতিক খিদে পেয়েছে।'

ইয়েগর বলে : 'দেখতো মা, ওই তাকটার ওপর রুটি আছে খানিকটা বোধ হয়। তারপর একবার যাও, হলের বাঁ দিকের দ্বিতীয় দরজাটায় কড়া নাড়লেই একজন মেয়েমানুষ দরজা খুলে দেবে। তাকে ব'লে এসোগে যা খাবার আছে সব নিয়ে যেন আসে এখানে।'

'সব? তোমার মাথা খারাপ হয়েছে?' বাধা দিয়ে বলে নিকলাই।

'ভয় নেই হে! ভয় নেই। সব মানে এমন কিছু দশ ধামা নয়। নেহাতই সামান্য।'

মা বেরিয়ে গেল। নির্দ্দিষ্ট দরজায় ধাক্কা দিয়ে নিস্তব্ধতার মধ্যে কান পেতে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মনে হয় ইয়েগরের কথা :

'আর বাঁচবে না ও!' ভাবে মা।

ঘরের মধ্য থেকে কে যেন শুধায় : 'কে ওখানে?'

মা জবাব দেয় : 'আমি ইয়েগর ইভানোভিচের কাছ থেকে আসছি। আপনাকে ডাকছেন একবার তিনি।'

'একটু দাঁড়ান, এই এলাম ব'লে', দরজা না খুলেই জবাব দেয় মহিলা। কয়েক

মুহূর্ত যায়, আবার কড়া নাড়ে মা। এবারে দরজা খুলে বেরিয়ে আসে এক দীর্ঘাঙ্গিনী। বলে :

'কি চাই?'

'ইয়েগর ইভানোভিচ্ আমায় পাঠিয়েছে।'

'আসুন! কিন্তু চেনাচেনা ঠেকছে যেন! এই যে ভালো তো? বড্ড অন্ধকার এখানে।'

নিরীক্ষণ ক'রে দেখে মা। নিকলাইয়ের ওখানেই দেখেছে বার কয়। মনে মনে ভাবে : 'সব আমাদেরই লোক দেখছি!'

যেতে যেতে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করে : 'ওর শরীর কি বেশী খারাপ হ'লো?'

'হ্যাঁ, শুয়ে তো আছে। খাবে, খাবার দিয়ে আসতে বলেছে।'

ইয়েগরের ঘরে এসে ঢোকে ওরা। সাঁই সাঁই করে ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে। ইয়েগর বলে :

'চল্‌লাম আমি...লুদমিল্লা ভাসিলিয়েভনা! জেল থেকে পালিয়ে এসেছে এই লোকটা! আগে ওকে খাওয়াও, তারপর একটু ঢাকা চাপা দিয়ে রাখবে। সে ব্যবস্থা কর।'

মাথা নাড়ে স্ত্রীলোকটি। রোগীর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

'আরো আগে ডাকোনি কেন, ইয়েগর! করেছ কি! দু'বার ওষুধ পড়েনি, তাইতো এরকম। আচ্ছা, বন্ধু, চলুন আমার সাথে। ওকে এক্ষুনি হাসপাতালে নিতে হবে।'

'সত্যি সত্যি আমায় হাসপাতালে পাঠাতে চাও!'

'হ্যাঁ, আমিও থাকব তোমার সাথে!'

'সেখানেও? হায় আমার কপাল!'

'থাম তো!'

কথা বলতে বলতে স্ত্রীলোকটি কম্বলখানা ভালো ক'রে ইয়েগরের গায়ে দিয়ে দেয়। নিকলাইকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ ক'রে দেখে। তারপর ওষুধের শিশি-গুলো তুলে দেখে কতটা বাকী আছে। গলাটা ওর ভাবী মোলায়েম, জল-তরঙ্গ খেলানো স্বর; চলে যেন ছন্দে। দীপ্তি নেই মুখে, ঘন কালো ভ্রু-জোড়া নাকের ওপর এসে মিশে গেছে। মায়ের ভালো লাগেনি ওর মুখখানা—বড় উদ্ধত যেন। সত্যি ওর চোখ কখনও হাসে না, কখনও একটুখানি ঝিলমিল ক'রেও ওঠে না কোনো কারণে; আর ও তো কথা বলে না, যেন হুকুম করে।

'আমি আসি এখন,' মহিলা বলে, 'এই যাব আর আসব। দেখুন এই ওষুধটা এক চামচ ওকে দেবেন তো। আর দেখবেন, কথা যেন না বলে। কিছুতেই কথা বলতে দেবেন না ওকে।'

নিকলাইকে নিয়ে চ'লে গেল মহিলা।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে ইয়েগর :

'আশ্চর্য মেয়ে! সত্যি সত্যি আশ্চর্য মেয়ে! ওর সাথেই এসে থাকো, মা। বড় মুষড়ে পড়ে ও...।'

'চুপ, কথা নয়, এই ধর, ওষুধটা খেয়ে নাও!' মা বলে। ওষুধটা খেয়ে নিয়ে এক চোখ বুজে ইয়েগর আবার বলতে আরম্ভ করে :

'তা চুপ ক'রে থাকলেই কি আর আমার মরণ ঠেকবে!' আর একটা চোখ দিয়ে

মাকে দেখে। ধীরে ধীরে একটু হাসি ফুটে ওঠে, ঠোঁট দুটি ফাঁক হ'য়ে যায়। মায়ের মাথাটা ঝুঁকে পড়ে, গভীর করুণা তীব্র ব্যথা হ'য়ে ওর চোখ ভিজিয়ে দেয়।

ইয়েগর বলে : 'তাতে কি হ'য়েছে! এতো প্রকৃতির বিধান! বেঁচে থাকাতে এত সুখ ব'লেই না মরণও দরকার! মরণ আছে ব'লেই তো জীবনের এত স্বাদ!'

মা হাতটা ওর কপালে রেখে কোমল স্বরে বলে :

'একটু চুপ ক'রে থাকো লক্ষ্মীটি!'

চোখ বুজে প'ড়ে থেকে যেন বুকের ঘড়ঘড়ানি শোনে ইয়েগর। তারপর একটু শক্ত হ'য়ে বলে। কণ্ঠে জেদ উদ্দাম হ'য়ে ওঠে :

'কেন কথা ব'লবনা, মা? চুপ ক'রে থেকে এমন কি লাভ হবে বলতে পারো? মরবই তো, শুধু একটু বেশী আগে থেকে মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করব চুপ ক'রে থেকে। তোমার মত মায়ের সাথে কথা ব'লে একটু আনন্দ পাই। সেটুকুও আমায় দেবে না? ইহলোকে তোমরা যারা আছ, তার চাইতে ওপারের মানুষেরা বেশী মিঠে নয়গো, এ আমি ঠিক বলতে পারি।'

ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে মা। ওকে থামাতে চেষ্টা করে :

'লক্ষ্মী তো চুপ করো, নইলে মহিলাটি এসে যদি দেখে তুমি কথা বলছ তাহলে ভারী রাগ করবে আমার ওপর।'

'মহিলা টহিলা নয় ও। কে জানো? এক বিপ্লবী মেয়ে। কমরেড। কিন্তু ভারী ভালো। তা খাবে বৈকি বকুনি! ও সব্বাইকে বকে।'

বিপ্লবী মেয়ের কাহিনী বলতে আরম্ভ করে ইয়েগর। মা বোঝে কথা কইতে ওর কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু ওর চোখে হাসি খেলছে। ওর নীল, ঘর্মাক্ত মুখের দিকে চেয়ে চম্‌কে ওঠে মা।

লুদ্‌মিল্লা ফিরে এলো। ঘরের দরজাটা ভালো ক'রে বন্ধ ক'রে দিয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে বলে :

'সেই ভদ্দরলোকের আর বেশীক্ষণ এখানে থাকা চলবেনা। যত শিগ্গির হয় এখান থেকে সরা দরকার। ভোল বদলাতে হবে। আপনি তাড়াতাড়ি গিয়ে কিছু জামা কাপড় কিনে নিয়ে আসুন। সোফিয়াও নেই এসময়। এসব "মাটির তলার ব্যাপারে" সেই হ'লো আসল লোক।'

চাদরটা গায়ে দিতে দিতে মা বলে : 'কাল আসছে সে।'

কোনও কাজের ভার পেলে মা ধন্য হ'য়ে যায়। এবং কাজটা একেবারে কি ক'রে তাড়াতাড়ি এবং নিখুঁত ক'রে করবে কেবল সেই ভাবনা। লুদ্‌মিল্লাকে শুধায় :

'কি রকম বেশ চাই, বলতো?'

'হ'লেই হয় একরকম, রাতেই তো যাবে।'

'রাত! রাতেই তো অসুবিধা বেশী। রাস্তায় লোকজন কম থাকে। পুলিশের নজর থাকে বেশী। আর আমাদের নিকলাইও খুব একটা কিছু চতুর নয়।'

ইয়েগর ধরা গলায় হাসে।

মা শুধায় : 'হাসপাতালে আসব তোমায় দেখতে?'

কাশতে কাশতে মাথা নাড়ে ইয়েগর।

কালো চোখ দুটি মায়ের দিকে তুলে লুদ্‌মিল্লা জিজ্ঞাসা করে :

'আমার সঙ্গে পালা ক'রে একটু দেখাশোনা করবেন ওকে? করবেন! আঃ বাঁচলাম। আচ্ছা, এখন তাহ'লে চট্‌ ক'রে আসুন।'

হাত ধ'রে দরজার দিকে নিয়ে যায় মাকে। হাতে স্নেহের সাথে হুকুমের ইঙ্গিত। দোরগোড়ায় এসে বলে লুদ্‌মিল্লা :

'এমনিভাবে আপনাকে তাড়াচ্ছি ব'লে রাগ করেননি তো? কি ক'রব কথা ব'ললে যে ওর খারাপ হয়। এখনও যে আশা ছাড়তে পারিনি...'

চোখ দুটি নেমে আসে। হাতের স্পর্শে আবেগ, মায়ের মনে হয় আঙুলগুলো ভেঙে গেল। বিব্রত বোধ করে মা। বলে :

'না, না। ছিঃ তা কেন হবে। ঠিকই তো!'

'আচ্ছা তাহ'লে একটু ভালো ক'রে দেখেশুনে যাবেন, গোয়েন্দা তো রয়েছে সর্বত্র।'

ঠোঁট দুটো ওর কাঁপতে থাকে, কোমল হ'য়ে ওঠে মুখখানা।

'আমি জানি।' একটু গর্বের সুরেই মা বলে।

গেট থেকে বেরিয়ে, একটু থেমে গায়ের চাদরটা ঠিক ক'রে নেয় মা, চারদিকে তাকিয়ে দেখে ভালো করে। তীক্ষ্ম দৃষ্টি, কিন্তু সহজ। হাজার ভিড়ের মধ্যেও ঠিক বুঝতে পারে মা, কে গোয়েন্দা। চলনে বলনে সহজ হতে গিয়ে ওরা বাড়াবাড়ি করে, তীক্ষ্ম শ্যেন দৃষ্টির তলায় ওদের অসীম অবসাদ আর বিরক্তি কিছুই লুকোন থাকে না মায়ের কাছে।

আজ কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেনা মা রাস্তায়। একটা গাড়ী-ওয়ালাকে ডেকে চ'ড়ে বসল, বাজারে যাবে। নিত্যি নিত্যি জামা কাপড় ছেঁড়ার অপরাধে, কল্পিত মাতাল স্বামীকে গাল দিতে দিতে বিস্তর দর কষাকষি ক'রে কিনলে নিকলাইয়ের পোষাক।

ওর মাতাল স্বামীর কাহিনীতে দোকানীর কোনও ভাবান্তর দেখা গেলনা, কিন্তু মা নিজে খুশি হয় মনে মনে। ভেবেছিল পুলিশ সতর্ক থাকবে আজ, ঠিক জানে তারা পালানো-কয়েদীর পোষাক কেনার দরকার হবে। তাই এই গল্প ফাঁদা।

অতি সাবধানে ইয়েগরের বাসায় ফিরে আসে মা। তারপর নিকলাইকে সাথে ক'রে শহরের বাইরে নিয়ে যায়। রাস্তার দুই পাশ ধ'রে চলে দু'জন। কেউ কারো দিকে চায় না। লম্বা কোটটায় নিকলাইয়ের পা প্রায় ঢাকা প'ড়ে গেছে, মাথার টুপিটা বার বার নেমে আসছে চোখের ওপর। রাস্তায় দেখা সাশার সাথে। ভেসভশ্চিকভের দিকে তাকিয়ে একটু মাথা হেলিয়ে বাড়ী ফিরে আসে মা।

'আন্দ্রিয়েই পাভেল এখনও জেলে'...বুকটা টনটন করে ওঠে।

মায়ের সাথে দেখা হ'তেই অত্যন্ত উত্তেজিত হ'য়ে বলে নিকলাই :

'ইয়েগরের অবস্থা খুব খারাপ। ওকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। লুদ্‌মিল্লা এসেছিল, তোমায় যেতে ব'লে গেছে।'

'হাসপাতালে?'

বিব্রতভাবে চশমাটা ঠিক করে নিয়ে মাকে কোট গায়ে দিতে সাহায্য করে নিকলাই; তারপর একটা পোঁটলা এগিয়ে দিয়ে বলে : 'এটা নিয়ে যাবেন।'

মায়ের হাতটা নিজের শুক্‌নো উষ্ণ হাতের মধ্যে নিয়ে কম্পিত স্বরে আবার বলে : 'ভেসভশিচ্‌কভের ঠিক বন্দোবস্ত করা হয়েছে তো?'

'হাঁ, হ'য়েছে।'

'আমিও যাব ইয়েগরকে দেখতে।'

শ্রান্তিতে দেহ আর চলে না মায়ের। নিকলাইয়ের কথার ধরনে অজানা আশংকায় মনটা ছেয়ে যায়। 'ইয়েগর...!' অশুভ চিন্তায় শিউরে শিউরে ওঠে বুক।

কিন্তু গিয়ে দেখে, ছোট্ট ঝলমলে সুন্দর একখানা ঘরে, ফর্সা ধবধবে বালিশের স্তূপে প্রায় আড়াল হ'য়ে ব'সে হাসছে ইয়েগর। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে মা। দুয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনে সে ব'লছে ডাক্তারকে :

'রোগীর চিকিৎসা করাও একরকম সংস্কারমূলক কাজ...'

ডাক্তার বিরক্ত হয়ে ধমকে দেয় : 'বকবকানি থামালে!'

'আমরা বিপ্লবীরা সংস্কার টংস্কার মানিনে, বুঝলে!'

ইয়েগরের হাতখানা তার হাঁটুর ওপর নামিয়ে রেখে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায় ডাক্তার। ওর মুখের ফোলাটা পরীক্ষা করতে করতে চিন্তিত ভাবে দাঁড়িতে হাত বুলায়। ডাক্তারটি চেনা মার; নিকলাইয়ের বিশেষ বন্ধু। নাম ইভান দানিলভিচ্‌। মা এগিয়ে আসে, ইয়েগর জিভ্‌ ভেংচে অভ্যর্থনা করে। ডাক্তার ফিরে তাকায়।

'আরে! নিলোভনা যে! খবর কি? হাতে কি ওটা?'

'বই বোধ হয়।' ইয়েগর বলে।

'উঁহুঁ! পড়া টড়া স্রেফ নয়।' ডাক্তার বলে।

'আমায় গরু বানাতে চায়, ডাক্তার।' নালিশ করে রোগী।

হঠাৎ বুকের মধ্যে কফের ঘড়ঘড়ানি ওঠে; দম বন্ধ হ'য়ে হেঁচকি ওঠার মত ক'রে হাঁপাতে থাকে ইয়েগর। বিন্দু বিন্দু ঘামে মুখখানা একেবারে নেয়ে ওঠে। হাতটা তুলে মুখ মোছে। অতটুকু পরিশ্রমেও যেন হাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু অদ্ভুত স্থির মুখ। এত কষ্ট, অথচ ফোলা গালে এতটুকু পেশীর কুঞ্চন নেই। অদ্ভুত লাগে। কোথায় সে কোমলতা! এ তো মুখ নয়, মুখোশ! প্রাণহীন—মরা মানুষের মুখ—মুখোশ। ফোলা মাংসের মধ্যে ডোবা চোখ দুটি শুধু স্বচ্ছ উদার হাসি জড়িয়ে জেগে আছে।

'ওহে ধন্বন্তরী, শুনছ! বড় ক্লান্ত লাগছে, আর পারছিনা, একটু শুই?'

'না শোবেনা।' রুক্ষ কাটা জবাব দেয় ডাক্তার।

'যাও না এখান থেকে, দেখ শুই কিনা!'

'খবরদার মা, ওকে একটুও শুতে দেবেননা যেন। বালিশগুলো ঠিক ক'রে দিন তো একটু। আর দেখুন একটুও কথা বলতে দেবেননা; খুব খারাপ হবে তাহ'লে।'

মা মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। ছোট ছোট দ্রুত পা ফেলে ডাক্তার বেরিয়ে গেল। ইয়েগর মাথাটা পেছন দিকে হেলিয়ে চোখ বুজে স্থির হয়ে আঙুলগুলো মোচড়াতে লাগল। ছোট্ট ঘরখানির সাদা দেয়ালগুলো থেকে উঠছে শুকনো হিমেল নিশ্বাস। ঘরের মধ্যে বড় বড় জানালা। তার মধ্য দিয়ে দেখা যায় লেবু গাছের ঝাঁকড়া মাথা---ধূলি-ধূসর ঘন-শ্যামল পাতার ফাঁকে ফাঁকে হলুদ রঙের ছোপ পড়েছে---সর্বনেশে পাতা-ঝরানো ঋতুর সর্বনাশের লিখন এসেছে ওই আগুনের হরফে।

চক্ষু বুজে স্থির হ'য়ে ব'সে আছে ইয়েগর; আপন মনে ব'লে চলেছে : 'পা পা ক'রে মরণ এগিয়ে আসছে---নেহাৎ অনিচ্ছায় আসছে। আমায় নিয়ে তো কোনো দিন কোন হাঙ্গামা পোয়াতে হয়নি, তাই মায়া হয়েছে আমার ওপর..'

মা আস্তে আস্তে ওর হাতে হাত বুলতে বুলতে বলে .

'ছিঃ কথা বলতে নেই, ইয়েগর ইভানোভিচ্। একটু চুপ কর।'

'দাঁড়াও...দাঁড়াও...চুপ! হ্যাঁ চুপ ক'রব বৈকি '

হাঁপাতে লাগল পরিশ্রমে। দম বন্ধ হ'য়ে আসে। ক্লান্তিতে, দুর্বলতায় এলিয়ে পড়ে। অনেকক্ষণ থেমে দম নিয়ে আবার বলে :

'কি যে ভালো লাগছে, তুমি আমার কাছে বসে আছ। তোমার মুখখানা দেখতে আমার বড় ভালো লাগে। এক এক সময় ভাবি তোমার কথা—কি হবে তোমার! হয়তো আর সবার মত তোমায়ও জেলে পচতে হবে। আমার বড় খারাপ লাগে ও কথা ভাবতে। আচ্ছা, জেলে যেতে ভয় করে তোমার?'

'না।' সংক্ষিপ্ত সহজ জবাব দেয় মা।

'ভয় তোমার করবেনা, সে আমি জানি। কিন্তু জেল, সে নরকের বাড়া। যেতেই হবে ও নরকে। পালাবার রাস্তা নেই। আমার এ হাল কি ক'রে হল! ওই জেলে গিয়েই তো। বলবো! শুনবে সত্যি কথা? সত্যি মরতে আমি চাইনা, একটুও ইচ্ছে করে না ..।'

'না না, যাট্! এখন মরবার কি হয়েছে!' বলতে যায় মা। কিন্তু ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মুখের কথা মুখেই থেকে যায়।

'এখনও আমি কাজ করতে পারতাম .না পারলে অবশ্যি বেঁচে থাকার কোন মানে হয় না.. '

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মা। যেন ঝড়ের মধ্য দিয়ে গেছে সারাটা দিন। ক্লান্তিতে দেহ আর বইছেনা। ক্ষিদেও পেয়েছে। রোগীর একটানা চাপা স্বরের কথায় ঘরের বাতাস ভরে আছে; বাইরে আঁধার হ'য়ে আসে; গাছগুলি দেখায় দিগন্ত-লীন মেঘের সারির মত। এমনি কালো, দেখলে গা ছম্ ছম্ করে। চারদিক আশ্চর্য শান্ত, স্তব্ধ—কালো সন্ধ্যাখানি রাত্রির প্রতীক্ষায় থম্থমে।

'বড় খারাপ লাগছে!' বলে ইয়েগর। চোখ বুজে নিঃশব্দে প'ড়ে থাকে।

'ঘুমোও একটু, ভালো লাগবে দেখো।' মা বলে।

হাত দিয়ে দেখে নিশ্বাস পড়ছে কিনা। চারদিকে তাকায় তারপর স্তম্ভিত হয়ে ব'সে থাকে কয়েক মুহূর্ত তীব্র বেদনায় মুহ্যমান হয়ে। ধীরে ধীরে তন্দ্রা আসে। হঠাৎ দরজার কাছে একটা চাপা শব্দ শুনে ধড়্ফড়্ ক'রে জেগে ওঠে মা। ইয়েগর তাকিয়ে আছে। লজ্জিত হয় মা।

'ছিঃ ছিঃ, ঘুমিয়ে প'ড়েছিলাম। ক্ষমা ক'রো।'

'ক্ষমা তো তুমি আমায় করবে, মা!' ইয়েগরের স্বরও মায়ের মতই কোমল।

খোলা জানালার পথে ঘরের পানে চেয়ে আছে সন্ধ্যার কালো চোখ। ঘরের মধ্যে আঁধার নেমে এসেছে, আঁধার ছায়ায় আঁধার হ'য়ে আছে রোগীর মুখ।

খস্‌খস্‌ শব্দ...ন   গলা শোনা যায় :

'অন্ধকারে বসে দিব্যি গুজ্‌গুজ্‌ ক'রছ দু'জনে...সুইচ্‌টা আবার কোথায়!'

হঠাৎ তীব্র তীক্ষ্ণ সাদা আলোয় ঘর ভরে গেল। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণ-বসনা লুদ্‌মিল্লার ঋজু, দীর্ঘ মূর্তি।

ইয়েগরের সর্বাঙ্গে শিহরণ খেলে গেল। হাতটা তুলে বুকের ওপর রাখল।

কি হ'ল? কি হ'ল? ব'লে চীৎকার ক'রে ছুটে এ'ল লুদ্‌মিল্লা। মায়ের মুখের ওপর স্থির হ'য়ে আছে ইয়েগরের দৃষ্টি। অদ্ভুত বড় আর উজ্জ্বল দেখাচ্ছে চোখগুলি।

মুখটা মস্ত বড় হ'য়ে হাঁ হ'য়ে গেল। মাথাটা খাড়া হ'য়ে উঠল। মা ধ'রে ফেলল মাথাটা; অপলক চোখে চেয়ে রইল ওর মুখের দিকে—নিশ্বাস নেবারও সাহস নেই। হঠাৎ প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে ঘাড়টা বেঁকে গিয়ে মাথাটা ঢ'লে পড়ল। একটা চীৎকার বেরিয়ে এ'ল :

'ওঃ আর পারিনা...চল্লাম!'

দেহটা একটু কেঁপে উঠল : কাঁধের ওপর মাথাটা প'ড়ল এলিয়ে। ঝোলান বাতিটার আলো নিষ্প্রাণ হিম ঔদাস্যে ঠিকরে পড়ল ওর বিস্ফারিত চোখের ওপর।

মা কাতরে ওঠে। লুদ্‌মিল্লা আস্তে আস্তে স'রে যায় বিছানার কাছ থেকে; জানালার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

'চলে গেল? চলে গেল!' লুদ্‌মিল্লার কণ্ঠ ফেটে হঠাৎ অস্বাভাবিক চীৎকার বেরিয়ে এল। তারপর স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল সে জানালায় ঝুঁকে। পরক্ষণেই হঠাৎ যেন মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে এমনি ভাবে দুই হাতে মুখ চেপে মাটিতে আছড়ে প'ড়ে আর্তনাদ ক'রে উঠল।

মা ইয়েগরের ভারী হাত দু'খানা আড়াআড়ি ক'রে ওর বুকের ওপর রেখে দিল; মাথাটা সযত্নে বালিশের ওপর তুলে রাখল। তারপর এসে বসল লুদ্‌মিল্লার কাছে। ধীরে ধীরে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। লুদ্‌মিল্লা তার বিস্ফারিত, আচ্ছন্ন চোখ দুটি মায়ের মুখের ওপর রেখে টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল।

'এক সাথে জেল খেটেছি...নির্বাসনে থেকেছি...' ঠোঁট কাঁপে থর্‌থর্‌ ক'রে লুদ্‌মিল্লার, 'কি অমানুষিক খাটুনি...কত জন শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়েছে...'

শুক্‌নো ফোঁপানির মত একটা প্রবল চীৎকার বেরিয়ে আসে। জোর ক'রে চেপে রাখতে গিয়ে পাঁজর যেন গুঁড়িয়ে যায়। মায়ের অতি কাছে মুখ নিয়ে আসে। গভীর বেদনায় কঠিন মুখখানা কোমল হ'য়ে উঠেছে। সেই কোমলতায় বয়সের অনেকগুলো অঙ্ক মুছে গিয়ে বড় কচি দেখাচ্ছে লুদ্‌মিল্লাকে আজ।

'কিন্তু কি হাসিখুশিই ছিল...' চোখে জল নেই, শুকনো কান্নায় দেহ আলোড়িত, 'যত কষ্টই হোক ভেতরে, অন্যদের সাহস দেবার জন্য সর্বদা তা চেপে রেখে হাসি-ঠাট্টায় সর্বদা আসর জমিয়ে রাখত। সকলের জন্য কি দরদই না ছিল। আবার ওদিকে বুদ্ধি ছিল ধারাল। সাইবেরিয়ায় অধিকাংশ মানুষ খারাপ হ'য়ে যায়। কাজ কর্ম থাকে না, তাই মন্দ স্বভাব জেগে ওঠে। কিন্তু ও জানত কি করে মানুষকে মানুষ রাখতে হয়। যদি জানতেন, কি মানুষ ছিল! জীবনে কি একটি দিন সুখ পেয়েছে? কিন্তু ওর মুখ থেকে এতটুকু নালিশ কেউ কোনও দিন শোনেনি।

কোনও দিন না। আমিই ছিলাম ওর বড় বন্ধু। ওর অগাধ মনের দৌলতের যতখানি পারে ও আমায় দিয়ে গেছে। কিন্তু এতটুকু কিছু আমার কাছে চায়নি।'

ইয়েগরের কাছে গিয়ে নীচু হয়ে ওর হাতে চুমু খায় লুদ্‌মিল্লা।

'কমরেড, বন্ধু, আমার একান্ত আপনার জন! ধন্যবাদ, ধন্যবাদ! আমার অন্তরের ধন্যবাদ নাও!' নীচু স্বরে বলে। 'বিদায়! যাও তুমি, যত দিন বেঁচে আছি আমি এমনি ভাবেই কাজ ক'রে যাব—এমনি অনলস, এমনি অটুট বিশ্বাসে। জেনে যাও, বন্ধু। বিদায়!'

কান্নায় ওর সারা দেহ তোলপাড় হ'তে থাকে; ইয়েগরের পায়ের ওপর মাথা রেখে আছড়ে পড়ে লুদ্‌মিল্লা। মায়ের চোখে নীরব অশ্রুর বন্যা। চাপতে চেষ্টা করে মা; সান্ত্বনা দিতে চায় লুদ্‌মিল্লাকে—যে সান্ত্বনায় বুকে বল আসবে, দেহে শক্তি আসবে। বাষ্পাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে ইয়েগরের দিকে চায়—আধখোলা চোখ, যেন এই মাত্র ঘুমিয়ে পড়েছে; নীল ঠোঁট দুটিতে মৃদু হাসি লেগে আছে। চারধারে সব শান্ত, স্তব্ধ, উজ্জ্বল। এত তীব্র উজ্জ্বল যে চোখ ব্যথা করতে থাকে।

ইভান দানিলভিচ্ আসে তার অভ্যস্ত দ্রুত ছোট ছোট পা ফেলে। ঘরের মাঝখান পর্যন্ত এসেই থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ে। দুইহাত পকেটে রেখে ভীত কণ্ঠে চীৎকার ক'রে ওঠে :

'এ কি? এ কেমন ক'রে হ'ল?'

উত্তর নেই। টলতে টলতে এগিয়ে যায় ইয়েগরের কাছে। করমর্দন ক'রে স'রে আসে এক ধারে।

'আশ্চর্য হবার কিছু নেই। হার্টের অবস্থা যা ছিল...এত দিন যে ছিল সেই বেশী...অন্তত...'

মৃতের বিছানার পাশে শোকাচ্ছন্ন মানুষ দুটির দিকে তাকিয়ে থাকে স্তব্ধ হ'য়ে; দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে উন্মাদের মত দাড়ি পাকাতে থাকে দানিলভিচ্।

শান্ত স্বরে বলে : 'আরেকজন চলে গেল।'

লুদ্‌মিল্লা উঠে গিয়ে জানালা খুলে দেয়। গভীর অন্তরঙ্গতায় একান্ত কাছাকাছি তিনটি মানুষ জানালার পাশে দাঁড়িয়ে তামসিনী শারদ-রাত্রির দিকে তাকিয়ে থাকে। অন্ধকার তরু-শিরের ঊর্ধ্বে অনন্ত আকাশের অনন্ত অবকাশকে গভীর ক'রে দিয়ে তারারা আলো জ্বেলে বসে আছে।

নিঃশব্দে মায়ের হাত ধ'রে, তার কাঁধে মাথা রাখে লুদ্‌মিল্লা। ডাক্তার মাথা নীচু ক'রে চশমা-জোড়া ঘষে। বাইরের আঁধার বেয়ে ভেসে আসে শহরের অবসাদগ্রস্ত নৈশ কোলাহল। হিমেল হাওয়া ওদের চুল উড়িয়ে মুখে আদর বুলিয়ে দিয়ে যায়। গাল বেয়ে এক ফোঁটা চোখের জল পড়ে, চমকে ওঠে লুদ্‌মিল্লা। বাইরের বারান্দায় কাদের যেন দ্রুত পায়ের শব্দ, কার যেন চাপা ভীত স্বর, কান্না, কানাকানি। কিন্তু ওরা তিনজন, নিস্তব্ধ, নিস্পন্দ, নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে উৎসারিত রাত্রির দিকে তাকিয়ে।

মার মনে হয়, ও থাকলে এরা বিব্রত হবে। আস্তে আস্তে লুদ্‌মিল্লার হাত সরিয়ে চলে যায়। দরজার কাছ থেকে মৃতের প্রতি মাথা নুইয়ে বেরিয়ে আসে।

'যাচ্ছেন?' জিজ্ঞাসা করে ডাক্তার, কোনও দিকে না তাকিয়ে।

'হাঁ...'

রাস্তায় চলতে চলতে ভাবে মা : 'কাঁদতেও জানেনা মেয়েটা...' মনে প'ড়ে যায়

ইয়েগরের শেষ কথাকটি। চোখের সামনে ভাসে ওর হাসি হাসি চোখ, ওর সেই গল্প-বলা,...ফুর্তিবাজ মানুষ ছিল ইয়েগর। ভালো মানুষরা বাঁচেনা। টুক্ ক'রে ম'রে যায়। 'আমার মরণ কি ক'রে হবে কে জানে!' মনে মনে ভাবে মা।

মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে অত্যুজ্জ্বল সাদা সেই ঘরখানা...জানলার ধারে দাঁড়িয়ে আছে লুদ্‌মিল্লা আর ডাক্তার...তাদের পেছনে ইয়েগরের স্থির নিশ্চল প্রাণহীন দুই চোখ...। মানুষের জন্য বিশাল করুণায় হঠাৎ মায়ের বুক কানায় কানায় ভরে ওঠে। পাঁজর-ভাঙা দীর্ঘ-নিশ্বাস বেরিয়ে আসে ঠেলে; কোন এক নাম-গোত্র-হীন আবেগ ওকে যেন তাড়িয়ে ঠেলে নিয়ে যায়। মাথা নত করে মা সেই শক্তির কাছে, ভেতর থেকে যে ওকে মাভৈঃ মন্ত্রে পথের দীক্ষা দিলে। 'তাড়াতাড়ি! তাড়াতাড়ি! তাড়াতাড়ি যেতে হবে আমায়।' মনে মনে বলে মা।

এগার

পরের দিন মায়ের সারাটা বেলা গেল ইয়েগরের শেষকৃত্যের ব্যবস্থা করতে। সন্ধ্যাবেলা সোফিয়া, নিকলাই আর মা চা নিয়ে ব'সেছে। এল সাশা। কিসের জন্য কে জানে ও মেয়ে আজ বড় খুশি। টগ্‌বগ্ করছে খুশিতে। গাল দু'খানি লাল টুকটুক, যেন খুশির ফুলঝুরি ঝরছে। মায়ের মনে হয় ওর মনে বুঝি কোন্ রঙ্গীন আশার জেল্লা লেগেছে। এখানে এই শোকের পরিবেশের সাথে ওর আজকের এই ভাবটা একেবারে বেখাপ্পা। অন্ধকার আকাশে হঠাৎ-আলোর ঝল্‌কানির মত। অন্যদের ভাল লাগছে না।

চিন্তিত ভাবে নিকলাই বলে টেবিলে টোকা মারতে মারতে।

'তুমি যেন আজ তোমার মধ্যে নেই, সাশা!'

খুশির হাসি হাসতে হাসতে উত্তর দেয় সাশা : 'তাই নাকি? হবে!'

মা ওর দিকে তাকায়। নীরব তিরস্কার তার চোখে। সোফিয়া ওকে মনে করিয়ে দেয় : 'আমরা ইয়েগর ইভানোভিচের কথা বলছি, বুঝলে!'

সাশা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ব'লে ওঠে : 'কি আশ্চর্য মানুষ ছিল ইয়েগর। হাসি-ঠাট্টা ছাড়া এক মুহূর্তেও দেখিনি মানুষটাকে। আরে বাবা! কাজ ক'রত কি? বিপ্লব তো অনেকেই ক'রেছে। কিন্তু ও লোকটা শুধু বিপ্লবীই নয়, বিপ্লবের শিল্পী। বিপ্লবী চিন্তাধারার অত বড় স্রষ্টা আর কোথায় পাবে! কি সহজ সুন্দর ক'রে, অথচ কি জোরাল ভাষায় ও মানুষের জুলুমবাজী, অন্যায়, অত্যাচার মিথ্যের কাহিনী ব'লে গেছে,' শান্তভাবে বলে সাশা; চোখে ওর ধীর মন্থর চিন্তার হাসি। কিন্তু সে হাসিতে ওর আনন্দের আগুন নেবেনি; সবাই দেখেছে সে আগুনকে, কিন্তু বোঝেনি কেউ। সাশা নিয়ে এসেছে আনন্দ; কিন্তু এই প্রিয়-বিচ্ছেদের দিনে শোক ভুলে আনন্দ ক'রতে রাজী নয় ওরা। শোক করার অধিকার আছে, সেই জোরেই ওরা শোক করবে; এবং সাশাকেও খুশি ভুলিয়ে কান্নার পাঠ দেবে।

সোফিয়া বলে : 'চ'লে গেল মানুষটা! য়্যাঁ!'

সাশা সকলের দিকে তাকায় সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে। নিঃশব্দে নত মস্তকে দাঁড়িয়ে থাকে সে।

'চলে গেছে! কি বলছ? চলে গেছে? মারা গেছে? কে? কি মারা গেছে? ইয়েগরকে শ্রদ্ধা করেছি! মৃত্যু ঘটেছে সে শ্রদ্ধার? ভালোবেসেছি কমরেড, সাথী, বন্ধুকে; তার কর্ম তার চিন্তাধারা বুকে গাঁথা হ'য়ে আছে। মৃত্যু ঘটেছে সে ভালোবাসার? সেই ঐশ্বর্যভরা স্মৃতির? নির্ভীক, খাঁটি সেই মানুষের মত মানুষকে জেনেছি, বুঝেছি...সেই জানা, বোঝা, ভালোবাসা সব ফুরিয়ে গেল! না যায়নি, যেতে পারে না, যাবে না। ক্ষয়হীন, মৃত্যুহীন আমার সে অন্তরের অর্ঘ্য। মুহূর্তে কত সহজে ব'লে ফেলি—মরে গেছে। সত্য বটে, নীরব হয়েছে তার মুখ আজ; কিন্তু যে কথা সে রেখে গেছে—অমর হ'য়ে থাকবে তা, যারা বেঁচে রইল তাদের বুকে।'

গভীর উত্তেজনায় আবার এসে বসে টেবিলে। কনুই দু'টি টেবিলের ওপর ভর দিয়ে ব'লে যায় সে আরো শান্ত, আরো গভীরভাবে। আবিষ্ট আচ্ছন্ন চোখ, হাসে ওদের দিকে চেয়ে।

'হয় তো বাজে কথাই বলছি। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যাঁরা খাঁটি, সাচ্চা মানুষ, মৃত্যু নেই তাদের। না, মৃত্যু নেই। অমর তাঁরা, যাঁদের দক্ষিণ হস্তের উদার দানে আশ্চর্য এই পৃথিবীতে এই আমার আশ্চর্য জীবনখানি পেয়েছি, সহস্র বৈচিত্র্যে রোমাঞ্চিত—অসীম তার ঐশ্বর্য; চিন্তার জগতে নিত্য নূতন পথে নূতন তার অভিসার। কৃপণ আমরা; মনের কোমল ভাবগুলিকে দাবিয়ে রাখি। নিজের চিন্তাতেই ডুবে থাকি। ঐতেই তো সর্বনাশ হয়। আমরা মানুষের মূল্য-বিচার করি—হৃদয় দিয়ে নয়, আঁক ক'ষে।'

'কি হে, ব্যাপার কি আজ? বলতো! কিছু পাওয়া-টাওয়া ঘটেছে নাকি?'

সুধায় সোফিয়া হেসে।

'হয়তো সত্যি তাই।' সাশা বলে, 'নইলে এমন আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে কি করে? জানো? সারা রাত ব'সে কাল ভেসভশিচকভের সাথে কথা ব'লেছি। অথচ দু'চক্ষে দেখতে পারতাম না লোকটাকে। যেমনি জংলী, তেমনি আকাট মূর্খ। কারো সাথে কি ভালো ক'রে কথা ক'য়েছে? সবার ওপর ভ্রূ কুঁচকেই থাকতো। সব সময় সব কিছুতে গিয়ে মাঝখানে পড়বে, সবার সাথে খারাপ ব্যবহার—আর সর্বক্ষণ আমি! আমি! আমি! যেন আমি ছাড়া এ দুনিয়ায় আর কিছু ছিল না। ভারী ছোট মন ছিল।'

হাসিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে সাশার মুখ। প্রদীপ্ত দুই চোখ তুলে তাকায় ওদের দিকে।

'কিন্তু আজকাল সেই মানুষ কি হ'য়েছে! এখন সবাইকে ডাকে কমরেড্ ব'লে। আর কি সেই ডাক! লাজুক লাজুক, অত্যন্ত নরম, ভালোবাসায় ভরা সেই ডাক! ব'লে বোঝাতে পারব না। আশ্চর্য বদলে গেছে ও। কাজের কি আগ্রহ! ফাঁকি-টাকি আর নেই ওর মধ্যে এখন। অদ্ভুত সহজ সরল খাঁটি মানুষ। কি ক'রে হ'ল বল তো? ও নিজের দেখা পেয়েছে। ভালোয় মন্দয় নিজেকে ও চিনেছে আজ স্পষ্ট ক'রে। সব থেকে বড় কথা কি জানো—মানুষকে আপন ব'লে ভাবতে শিখেছে এখন।'

সেই কাঠখোট্টা জঙ্গলীটা এমনি বদলে গেছে! সাশার মুখে শুনে বড় ভালো

লাগে মায়ের। মনের গোপনে একটা খোঁচাও বাজে—'পাভেল? পাভেলের কথা বলছো না কেন?'

'এখন জেলে যারা আছে তাদের জন্যই ওর সারাক্ষণ ভাবনা। বলে, বের করে আনতেই হবে ওদের। পালানো আর কি! ও তো জলের মত সহজ!'

সোফিয়া মাথা তুলে সাগ্রহে বলে : 'ঠিক ঠিক! ঠিক কথা। তুমি কি বল?'

মায়ের হাতে চায়ের বাটিটা কেঁপে ওঠে। সাশা ভ্রূ কুঁচকে ভেতরের উত্তেজনা চাপতে চেষ্টা করে। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থাকে। তারপর বলে—স্বরটা গম্ভীর কিন্তু মুখে যেন সুখের স্মিত হাসি :

'ওর কথা যদি সত্যি হ'য়ে থাকে, তাহ'লে তো চেষ্টা ক'রে দেখতে হয়। আর ক'রতেও হবে।'

হঠাৎ ওর মুখটা লাল হ'য়ে ওঠে; কিছু না ব'লে চেয়ারে ব'সে পড়ে ধপ্ ক'রে।

মা স্নিগ্ধ হাসে। সোফিয়াও মৃদু হাসে। নিকলাই ওর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আস্তে আস্তে হাসতে থাকে। সাশা মাথা তোলে—মুখটা ফ্যাকাশে হ'য়ে গেছে, চোখ লাল, গলার স্বর শুক্‌নো—মনে হয় যেন রেগেছে।

'বুঝেছি, তোমরা সব কেন হাসছ; ভাবছ নিজের স্বার্থেই বলছি। ওই জন্য আমার এত আগ্রহ।'

সোফিয়া উঠে ওর কাছে যায়। একটু বাঁকা সুরে বলে : 'কেন সাশা?' মায়ের মনে হয়, সাশা আঘাত পেল সোফিয়ার কথায়। না বললেই পারত সোফিয়া। দীর্ঘ-শ্বাস ফেলে নীরব তিরস্কারে সোফিয়ার দিকে তাকায়।

সাশা উত্তেজিত হ'য়ে বলে : 'বেশ তো, তোমরা যদি ওই ভেবে থাক, আমি এর মধ্যে নেই...।'

শান্তভাবে নিকলাই বলে : 'বাস্, সাশা, বাস্! আর নয়।'

ওর পাশে ব'সে মাথায় হাত বুলায় মা। সাশা মায়ের হাতখানা শক্ত ক'রে ধ'রে, আগুন রং-এর মুখখানা মায়ের দিকে তুলে ধরে। স্নিগ্ধ মৃদু হাসে মা। কথা জোগায় না মুখে; বুকটা ফুলে ফুলে ওঠে দীর্ঘশ্বাসে। সোফিয়া পাশের চেয়ারে এসে ব'সে ওর গলা জড়িয়ে ধ'রে বলে :

'আচ্ছা মেয়ে তো তুই!'

'আমারি অন্যায় হ'য়ে...'

'আচ্ছা তুই কি ক'রে ভাবতে পারলি?' সোফিয়া বলে। বাধা দেয় নিকলাই। কাজের কথায় আসে সে :

'সত্যি আমাদের চেষ্টা ক'রে দেখতে হবে ভালো ক'রে। তার আগে জানা দরকার জেলের কমরেডদের মত কি এ বিষয়ে। তাঁরা চান কি না।'

সাশার মাথা ঝুঁকে পড়ে।

সোফিয়া একটা সিগারেট ধরায়।

মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে : 'তারা চাইবে না, একি হ'তে পারে? কিন্তু ভাবছি, পারবে কি? আমার তো বিশ্বাস হয় না।'

আকুল ব্যগ্রতায় তাকিয়ে থাকে মা—ওরা বলুক একবার—পারবে, পারবে, অসাধ্য নয়। কিন্তু ওপক্ষ চুপ। কারো মুখে কথা নেই।

সোফিয়া বলে : 'ভেসভশ্চিকভের সাথে একটু দেখা করা দরকার।'

সাশা বলে : 'কাল বলব, কখন কোথায় দেখা হবে।'

ঘরের মধ্যে পায়চারি করে সোফিয়া। জিজ্ঞাসা করে :

'ও কি ঠিক ক'রেছে জানো?'

'নূতন ছাপাখানায় টাইপ বসাবার কাজে লাগিয়ে দেওয়া হবে ওকে। ততদিন যেখানে আছে ওখানেই থাকবে।'

মা চায়ের পেয়ালা ধুচ্ছিলেন. নিকলাই উঠে তাঁর কাছে গিয়ে বলে : 'পরশু যখন পাভেলের সঙ্গে দেখা ক'রতে যাবে, ওকে একটা চিঠি দিয়ে আসবে। বুঝতে পারছ তো? আমাদের জানা দরকার।'

'বুঝেছি, বুঝেছি, আর ব'লতে হবে না। যাই হোক, কোন রকমে দিয়ে আসব চিঠি।'

'আচ্ছা আমি আসি তাহ'লে।' ব'লে তাড়াতাড়ি সকলের সাথে করমর্দন ক'রে বেরিয়ে যায় নিঃশব্দে; কাঠের মত সোজা দেহ, পা ফেলায় কঠিন অঙ্গীকারের ভাষা।

ও চ'লে গেলে সোফিয়া মায়ের কাঁধ ধ'রে দোল দিতে দিতে হঠাৎ শুধায় : 'আচ্ছা, নিলোভনা, নেবে এ মেয়েকে?'

'নেব? শুধু নেব! আঃ একটিবার অন্তত যদি ওদের দু'টিকে এক ক'রে দেখতে পারতাম!' প্রায় জল এসে যায় চোখে মা'র।

নিকলাই আস্তে আস্তে বলে : 'সুখ অল্পই ভালো। বেশী হ'লেই সস্তা হ'য়ে যায়। কিন্তু মুশকিল অল্পে কারোই যে সুখং নাস্তি!'

সোফিয়া পিয়ানোয় গিয়ে বসে। একটা রাগ বাজাতে আরম্ভ করে।

বার

পরদিন ভোরবেলা হাসপাতালের গেটে জন ত্রিশ-চল্লিশ লোক এসে দাঁড়াল। তাদের প্রিয় কমরেডের শবাধার কখন আসবে বাইরে, তার প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে আছে তারা। ভিড়ের মধ্যে মিশে আছে মেলা টিকটিকি; লোকের কথাবার্তা, চালচলন ও মুখগুলোকে মনের মধ্যে গেঁথে নেবার চেষ্টা করছে। রাস্তার ওধারে কোমরে রিভলভার ঝুলিয়ে একদল পুলিশ। পুলিশের মুখের বাঁকা হাসি আর টিকটিকিদের বেয়াড়াপনায় সবাই তেতে আছে। মুখিয়ে আছে তারা একবার মওকা হলেই নিজেদের তাকতটা দেখিয়ে দেবে। কেউ কেউ হাসি-তামাশা করে রাগ চাপে; কেউ বা মাটি থেকে চোখই তোলে না অপমানের ভয়ে। আবার কেউ বা কর্তাদের মশা মারতে কামান দাগা দেখে বাঁকা বাঁকা টিপ্পনী কাটে—হেতের নেই, অস্ত্র নেই, নিরীহ মানুষ, শুধু দুটো মুখের কথা সম্বল, তাদের এত ভয়?

ঝরা-পাতা বিছানো এব্ড়ো খেব্ড়ো খোয়ার রাস্তা—শরতের ফিকে নীল আকাশ থেকে অঝোর ঝরায় আলো ঝরে তার বুকে।

মাও আছে এই ভিড়ের মধ্যে।

গেট খুলে যায়। শবাধার এগিয়ে আসে। লাল সিল্কের ফিতে আর ফুলে সাজান ওপরটা। শবাধার দেখামাত্রই প্রত্যেকে টুপি তুলে ধরে। মনে হ'ল, এক ঝাঁক কালো পাখী যেন হঠাৎ আকাশে ডানা মেলে দিল। ঢ্যাঙ্গা একজন পুলিশ

অফিসার—তার লাল মুখে ইয়া মোটা এক জোড়া কালো গোঁফ দুলিয়ে ছুটে এসে ঢুকল ভিড়ের মধ্যে, অভদ্রভাবে দুই হাতে মানুষ ঠেলতে ঠেলতে পেছনে এল সৈন্যের দল। তাদের ভারী বুটপরা পায়ের দাপটে মাটি কাঁপতে লাগল।

রুক্ষ মোটা গলায় হাঁকে পুলিশ অফিসার :

'এই, সব রিবন খুলে ফেল।'

উত্তেজিত ভাবে কথা বলতে বলতে জনতা ওদের চারদিকে ঘিরে আসে। ফ্যাকাশে উদ্বিগ্ন মুখগুলি মায়ের চোখের সামনে ছুটোছুটি করে। ওদের ঠোঁট কাঁপছে; কে একজন মহিলার গাল বেয়ে চোখের জল পড়ছে। রাগে কাঁদছে সে।

তরুণ কণ্ঠে কে যেন গর্জন ক'রে ওঠে : 'জুলুমবাজী চলবে না!'

মায়ের বুকে গিয়ে বিঁধছে। অত্যন্ত দীন-হীন বেশে ওর পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল একজন যুবক। মা তার কাছে গিয়ে বলে :

'একি? মানুষটা ম'রে গেছে, তাকে একটু ইচ্ছেমত সাজিয়ে-গুছিয়ে নিয়ে যাব, তাও পারব না? এত বড় অপমান?'

ক্রমেই আবহাওয়া গরম হ'য়ে ওঠে। জনতার মাথার ওপর দিয়ে দেখা যায় শবাধারটা—দুলছে এদিক ওদিক। লাল রিবনগুলি হাওয়ায় উড়ে উড়ে মানুষের মাথায় মুখে পড়ে; একটা ভীরু খস্‌খসানি আওয়াজ ওঠে তা থেকে।

মা ভয় পেয়ে যায়, এখনি বুঝি মারামারি লাগবে। কেবলি এদিক ওদিক ছুটোছুটি করে আর বলে : 'ম'রবে ব্যাটারা ম'রবে! সব তাতেই ওদের সন্দেহ। রিবন চায়? নিক না, নিয়ে যাক! দিচ্ছি খুলে সব।'

সব কোলাহল ছাপিয়ে কার তীব্র তীক্ষ্ম জোরালো স্বর শোনা যায় :

'তোমাদের জুলুমে প্রাণ দিয়েছে আমাদের এই কম্‌রেড্‌। আমাদের প্রিয় কম্‌রেড্‌কে মিছিল ক'রে আমরা নিয়ে যাবো সেই অধিকার দাবী করি।'

উদাত্ত কণ্ঠে গান ধ'রল কে :

'মরণেরে বরি মরণে করিলে জয়,
হে মহান্‌!'

'হটাও রিবন জলদী! ইয়াকভলেভ! কেটে ফেল সব রিবন!'

খাপ থেকে তলোয়ার বেরিয়ে আসে। মা চক্ষু বোজে ভয়ে। কিন্তু লোকগুলি ক্রুদ্ধ নেকড়ের মত গোঁ গোঁ করে শুধু; একটা চাপা প্রতিবাদের গুঞ্জন ওঠে। তারপর নীরবে, মাথা নীচু ক'রে জনতা সামনের দিকে এগিয়ে চলে।

মাথার ওপরে দোলে লাঞ্ছিত শবাধার, ছেঁড়া ফুলের মালায় সেজে। পাশে আর পেছনে সওয়ারী পুলিশ। মা ফুটপাথ ধ'রে হেঁটে চলেছে; শবাধারটা আর দেখা যায় না মানুষের অরণ্যে। কখন যে এসে এত মানুষ জুটল কে জানে! রাস্তায় আর পা ফেলার জায়গা নেই। দুইধারে তলোয়ার-ধারী পুলিশ চলেছে—তলোয়ারের বাঁটে হাত দিয়ে। চারদিকে গোয়েন্দা গিস্‌ গিস্‌ করছে—সব মায়ের চেনা মুখ।

'দুটি করুণ কণ্ঠের গান শোনা যায় : 'বিদায় বন্ধু! বিদায়!'

কে একজন চীৎকার ক'রে ওঠে : 'না, গান নয় আজ। আজ নীরবে মার্চ ক'রে যাব আমরা।'

কঠিন আদেশের সুর! গান থেমে যায়, থেমে যায় কথা; খোয়ার বুকে শুধু

মানুষের পায়ের শব্দ বাজে। মাটির বুক থেকে ধীরে ধীরে ঊর্ধ্বে উঠে সে শব্দ জনতার মাথার ওপর দিয়ে স্বচ্ছ আকাশের বুকে ছড়িয়ে পড়ে। এ যেন সম্ভাবিত ঝড়ের সংকেতে স্তব্ধায়িত আকাশে প্রথম মেঘ-গর্জন। ঠাণ্ডা কন্‌কনে হাওয়া বইছিল। ক্রমেই তার বেগ বেড়ে ওঠে। ধুলো বালি, রাস্তার আবর্জনা উড়িয়ে এনে ছুঁড়ে ফেলছে ওদের চোখে মুখে। চুল, জামা, কাপড় উড়িয়ে ছিঁড়ে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। চোখ অন্ধ; বুকে লাগছে বাতাসের মার, পায়ের ফাঁকে ফাঁকে বাতাসের ঘূর্ণী খেলে...

নিঃশব্দ মিছিল, পুরোহিত নেই, শোকের গাথা নেই ..শুধু কতগুলি চিন্তাকুল মুখ আর কুঞ্চিত কপাল। বড় ভয় করে মা'র।

ধীরে ধীরে সারা মন ছেয়ে বেদনার রাগিনী বাজে :

'সত্যের জন্য জান কবুল করার মত মানুষ কই ..?'

নত মস্তকে হেঁটে চলেছে মা। কাকে নিয়ে চলেছে ওরা? মায়ের মনে হয়, এ তো ইয়েগর নয়—অন্য কিছু—এমন কিছু, যা মায়ের একান্ত প্রিয় এবং একান্ত প্রয়োজন। বড় বিশ্রী লাগে। এদের মধ্যে বড় বেমানান মনে হয় নিজেকে। ইয়েগরের শেষকৃত্য ক'রতে চলেছে এরা। কোথাও যেন এদের সাথে ওর মিল নেই। এই কথাটাই একটা কুৎসিত চেহারা নিয়ে অভিভূত ক'রে ফেলে মাকে। মনে মনে ভাবে :

'ইয়েগর ছিল নাস্তিক, এরাও তো তাই '

আর ভাবতে পারে না, সাহস হয় না। একটা বিষম বোঝা যেন বুকের ওপর চেপে আছে...

'ভগবান! ভগবান! আমিও? আমিও কি এদের মত?'

গোরস্থানে এসে পৌঁছে যায় মিছিল। কবরের ফাঁকে ফাঁকে এঁকেবেঁকে একটা খোলা জায়গায় এসে পৌঁছায়। নীচু নীচু সাদা ক্রুশ চারদিকে। একটা খোঁড়া কবরের চারদিকে ওরা ঘিরে দাঁড়ায়। মৃতের রাজ্যে জীবিত মানুষের এই কঠিন নীরবতা—মায়ের বুক কাঁপে; হৃৎপিণ্ডটার ধুক্‌পুকানি যেন থেমে যেতে চায়। পাগল বাতাস হেঁকে হেঁকে যায় কফিনের ছেঁড়া ফুলগুলিকে নাড়া দিয়ে। সমাধির ফাঁকে ফাঁকে ওঠে তার দীর্ঘশ্বাস।

পুলিশের দল তাদের সর্দারের দিকে তাকিয়ে প্রস্তুত হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঘন ঘন পুলিশ অফিসারের হাঁক শোনা যায়।

কবরের মাথার দিকে গিয়ে দাঁড়ায় এক ছোকরা রক্তহীন মুখে কালো-চওড়া এক জোড়া ভ্রূ...

'বন্ধুগণ!' আরম্ভ করে সে।

অফিসার গর্জে ওঠে : 'খবরদার! বক্তৃতা করা চলবে না এখানে।'

যুবকটি অতি শান্তভাবে বলে : 'বেশী নয়, সামান্য দুটি কথা ব'লব মাত্র। বন্ধুগণ! আজ আমাদের শপথ নেবার দিন। আমাদের গুরুর, বন্ধুর সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে বল, তাঁর শিক্ষা আমরা কোনোদিন ভুলব না, ভুলব না। যে অত্যাচারী, স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রী শাসন-ব্যবস্থা আমাদের মাতৃভূমির সর্ব অকল্যাণের মূল, আজ এই খোঁড়া কবরের পাশে দাঁড়িয়ে শপথ নিলাম, আমরণ সেই স্বৈরাচারের কবর খোঁড়াই হবে আমাদের দিবা-রাত্রির, স্বপ্ন-জাগরণের একমাত্র ব্রত!'

অফিসার চীৎকার ক'রে ওঠে : 'পাক্‌ড়ো, পাক্‌ড়ো।' তার চীৎকার জনতার কোলাহলে ডুবে যায়।

'রাজতন্ত্র মুর্দাবাদ!'

ভিড় ঠেলে বক্তার দিকে পুলিশ ছুটে আসে। কিন্তু এক পা ন'ড়ল না সে। বন্ধুরা এসে ঘিরে আড়াল ক'রে দাঁড়াল। দুই হাত নেড়ে কম্বুকণ্ঠে সে ধ্বনি

'স্বাধীনতা জিন্দাবাদ!'

ঠেলায় ঠেলায় একধারে ছিটকে পড়ে মা। একটা ক্রুশে হেলান দিয়ে ভয়ে কাঁটা হ'য়ে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে মিনিট গোণে কখন এসে মার পড়ে মাথার ওপর। চারপাশের প্রচণ্ড চীৎকারে কান যেন ফেটে যায়। পায়ের তলা থেকে স'রে যায় মাটি; হাওয়ার ঝাপটায় আর ভয়ে দম বন্ধ হ'য়ে আসে। ঘন ঘন শোনা যায় পুলিশের সংকেতসূচক সিটি আর পুলিশ-কর্তাদের কর্কশ গলার হুকুম; তার সাথে স্ত্রীলোকদের উন্মত্ত চীৎকার...শুকনো মাটির ওপর ভারী বুটের আওয়াজ; ওদিকে কবরখানার বেড়া ভেঙে খুঁটি শিক উপড়ে ছিটকে ছড়িয়ে ফেলে ছত্রখান করছে জনতা। প্রলয় কাণ্ড। অমন ক'রে চোখ বন্ধ ক'রে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে আর সাহস হয় না মার।

চোখ খুলে একবার তাকিয়েই হাত বাড়িয়ে সামনের দিকে ছুটতে আরম্ভ করে মা। কাছেই কবরের ফাঁকে ফাঁকে চ'লে যাওয়া একটা শরু রাস্তার ওপর সেই ছেলেটিকে ঘিরে রেখেছে পুলিশ। ওকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য চারদিক থেকে জনতা ছুটে আসছে। পুলিশ তাদের মেরে ঠেঙিয়ে পিছু হঠাবার চেষ্টা ক'রছে। খোলা তলোয়ারগুলি কঠিন, হিম শুভ্র জেল্লা তুলে শূন্যে চমকে চমকে উঠছে। কখনও মাথার ওপর, কখনও বা নেমে আসছে জনতার মধ্যে। ও পক্ষ থেকেও লাঠি, ছড়ি, ভাঙা রেলিং, ছুটে আসছে বেপরোয়া ভাবে। সেই তরুণ ছেলের পাণ্ডুর মুখখানি জনতার চিত্তকে জ্বালিয়ে দিয়েছে—প্রলয়-তাণ্ডবে মেতে উঠেছে তারা। খ্যাপা মানুষের এই পাগলামির তুফানের কলরোল ছাপিয়ে বলিষ্ঠ কণ্ঠ বেজে উঠে :

'বন্ধুগণ! শক্তি ক্ষয় করছ কেন?'

জনতা বুঝতে পারল। হাতের লাঠি ফেলে তারা ছুটল এদিক ওদিক। মা শুধু এগিয়ে চলল সামনের দিকে--ভেতর থেকে কে যেন অদম্য শক্তিতে তাকে ঠেলে দেয়। নিকলাই প্রাণপণ বলে মত্ত জনতাকে ঠেকাতে চেষ্টা করছে।

'কি করছ?' তিরস্কার করে ও, 'পাগল হ'লে সব?' মায়ের যেন মনে হয়—নিকলাইয়ের একটা হাত লাল।

'পালাও, পালাও, নিকলাই ইভানোভিচ্।' চীৎকার ক'রতে ক'রতে ছুটে আসে মা।

'কোথায় যাচ্ছ? মার খাবে যে!'

কার যেন হাত পড়ে মায়ের কাঁধে। তাকিয়ে দেখে, সোফিয়া। টুপি নেই মাথায়; আলুথালু চুল, একটি ছোট্ট ছেলে হাতে ধরা। নেহাৎ কচি ছেলে, মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে। রক্ত মুছতে মুছতে বলে ও; ঠোঁট দুটো থরথর্ ক'রে কাঁপছে :

'কিছু লাগেনি আমার, ছেড়ে দাও, যাই।'

'না না, ওকে বাড়ী নিয়ে যাও। এই রুমাল, ঘা-টা বেঁধে দিও। ছেড়ে দিও না যেন।' ক্ষিপ্র নির্দেশ দিয়ে, ছেলেটির হাত মায়ের হাতে তুলে দিয়ে ছোটে সোফিয়া। যেতে যেতে বলে :

'শিগ্গির যাও এখান থেকে, নয় তো ধরা প'ড়বে।'

জনতা ছত্রভঙ্গ হ'য়ে চতুর্দিকে ছুটে পালায়। সওয়ারী পুলিশ কবরখানার ঘুরে বেড়াচ্ছে খোলা তলোয়ার উঁচিয়ে। মুখে গাল দিচ্ছে, গায়ে বিরাট বিরাট ঝোলা ওভারকোট, চলতে গিয়ে ওদের পা আটকে যায়।

মা তাড়া দেয় : 'চল খোকা শিগ্‌গির চল।'

খোকা বলে, 'রোসো। আমার জন্য ভেবোনা। কিচ্ছু লাগেনি আমার।' বলতে বলতে মুখ দিয়ে রক্ত ওঠে খানিকটা। 'কি করে হ'ল, জানো? তলোয়ারের বাঁট দিয়ে ঠুকেছে। আমিও ছাড়িনি—এমনি লাঠির বাড়ি মেরেছি যে বাছাধন চেঁচিয়ে অস্থির। দাঁড়াও না একটু, দেখাচ্ছি।' বলে রক্তে-ভেজা মুঠিটা শূন্যে নেড়ে চীৎকার করে ওঠে :

'এ আর কি হয়েছে আজ! এতো কিছুই না! দেখ না কি হচ্ছে। থেঁৎলে মাটির সাথে মিশিয়ে দেব একেবারে। লড়াই করা দূরে থাক্, আঙুলটি তুলতে হবে না বাছাধনদের। দাঁড়ানা, একবার শ্রমিকরা সব একজোট হয়ে নিক।'

মা ওকে টেনে নিয়ে কবরখানার ছোট দরজাটার দিকে যায়। মার মনে হয়, বেড়ার ওধারে খোলা ময়দানটায় ওৎ পেতে আছে পুলিশেরা। এখান থেকে বেরুলেই হ'ল একবার। অমনি ওরা ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু গেটের কাছে পেঁৗছে ওধারে তাকিয়ে দেখে—শরৎ-গোধূলির ধূসর আলোয় আল্‌পনা আঁকা খোলা মাঠ বুক পেতে আছে। কোন কোলাহল নেই। নিস্তব্ধ শূন্যতার দিকে তাকিয়ে বুকে বল আসে।

'চলো ঘা বেঁধে দিই!' মা বলে।

'না না লাগবেনা। লজ্জার কিছুতো করিনি। সামনা সামনি লড়েছি! সেও মেরেছে, আমিও মেরেছি। বাস্।'

ক্ষিপ্র হস্তে ছেলেটির ক্ষত বেঁধে দেয় মা। রক্ত দেখে মনটা করুণায় ভ'রে যায়। উষ্ণ রক্ত চট্‌চটে হ'য়ে হাতে লাগে—সারাটা দেহ শিউরে ওঠে। কন্‌কনে হিমেল স্রোত যেন ব'য়ে যায় শিরায় শিরায়। নিঃশব্দে ছেলেটিকে টেনে নিয়ে মাঠের পথে নেমে পড়ে মা।

মুখ থেকে পট্টিটা একটু ফাঁক করে একটু ঠাট্টার সুরে শুধায় খোকা : 'আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন কম্‌রেড্? ধরতে হবে না, আমি নিজেই যেতে পারব।'

কিন্তু মায়ের হাতের মুঠিতে ওর হাত কাঁপছে থর্ থর্ ক'রে; পা দুটো টল্‌ছে। ক্ষীণ দুর্বল স্বরে ও অনর্গল কথা কয়ে চলেছে—এটা ওটা হাজার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, উত্তরের জন্য অপেক্ষা করে না।

'আপনি কে? আমি একজন টিনমিস্ত্রী। আমার নাম ইভান। জানেন? আমরা তিনজন ছিলাম ইয়েগরের পাঠচক্রে। সবশুদ্ধ ছিল এগার জন। আমরা সবাই খুব ভালোবাসতাম ইয়েগরকে। ভগবান শান্তি দিন ওকে! অবশ্যি ভগবান টগবান বিশ্বাস করিনা আমি।'

কিছুদূর গিয়ে একটা গাড়ী ডাকে মা। ওকে বসিয়ে চুপি চুপি বলে দেয়, এখন যেন আর কথা টথা না বলে। রুমাল দিয়ে আবার ভালো ক'রে মুখ বেঁধে দেয়।

হাত তুলে বাঁধনটা আল্‌গা করতে চেষ্টা করে ইভান। কিন্তু দুর্বল হাতখানা এলিয়ে প'ড়ে যায় কোলের ওপর। বাঁধনের মধ্য দিয়েই বক্ বক্ ক'রে চলে :

'বাছাধনরা ভাবছে, আমি ভুলব। সাতজন্মে ভুলবনা এসব কথা।...ইয়েগর আসার আগে—একজন ছাত্র ছিল, নাম ছিল তার তিতোভিচ্। সে আমাদের পড়াত রাজনৈতিক অর্থনীতি।...কিন্তু একদিন ওকে ধ'রে নিয়ে গেল..'

মা ওর মাথাটা বুকের মধ্যে টেনে নেয়। হঠাৎ কেমন নেতিয়ে পড়ে ইভান। কথা কয়না। ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল মার। তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে চারদিকে চায়—কোন্ আনাচে কানাচে পুলিশ ঘাপ্‌টি মেরে আছে, কে জানে? এই বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়ল। ইভানের ব্যাণ্ডেজ করা মুখ দেখলে আর রক্ষে রাখবে না; ছিনিয়ে নিয়ে খুন ক'রে ফেলবে ছেলেটাকে।

পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখে গাড়োয়ান। দিলখোলা হাসি হেসে জিজ্ঞাসা করে . 'খুব গিলেছে বুঝি?'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মা বলে : 'ওকে কি আর গেলা বলে! এক ঢোক, তাও জিভে ছুঁয়েছে কি না ছুঁয়েছে। জিভ যাকে বলে পুড়ে খাক্।'

'তোমার ছেলে?'

'হ্যাঁ। মুচির কাজ করে ও, আর আমি করি রান্নার কাজ।'

'আ হাঃ হাঃ, ভারী কষ্ট তো!'

তারপর ঘোড়াটাকে চাবুক মেরে আবার এদিকে ফিরে আরম্ভ করে :

'আজ কবরখানায় কি কাণ্ডটা হ'য়ে গেল শুনেছ? সাংঘাতিক মারামারি হয়ে গেছে। শুনলাম—কাকে যেন, রাজনৈতিক দল না কি! তাদেরই একজন মারা গেছে, তাকে নাকি কবর দিতে এসেছিল তার বন্ধুবান্ধব, আর দলের লোকেরা। বড়লোকদের পেছনে খালি খালি নাকি লাগত লোকটা। তারপর পুলিশ এসে সব ঠ্যাঙ্গাতে শুরু করে। শুনলাম সব বলাবলি ক'রছে ঠ্যাঙ্গাতে ঠ্যাঙ্গাতে নাকি মেরেই ফেলেছে কটাকে। তা তেনারাও গুঁতুনি কম খাননি।'

একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে আবার আরম্ভ করে। গলার স্বরটা কেমন অদ্ভুত, অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথাটা নেড়ে নেড়ে বলে :

'মরা মানুষগুলোকে অবধি একটু শান্তিতে তিষ্ঠুতে দেয়না শালারা!'

গাড়ীর ঝাঁকানিতে ইভানের মাথাটা ন'ড়ে ওঠে মায়ের বুকের মধ্যে। কোচ্‌বাক্‌সে আধ-ফেরা হ'য়ে ব'সে আপন মনে বক্ বক্ করে চলে কোচ্‌ম্যান্।

'চারদিকে অশান্তি। মানুষগুলো সব ক্ষেপে গেছে। ভুঁই ফুঁড়ে যত ঝামেলা উঠছে। এই তো কাল রাত্তিরেই—পুলিশ এল আমাদেরই পাড়ায় এক বাড়ীতে। সারা রাত্তির ধরে বাড়ীটা ওলটপালট্ তচ্‌নচ্ করে ছাড়ল। তারপর একজন কামারকে ধ'রে নিয়ে চলে গেল। লোকে ব'লছে কি জানো? মাঝরাত্তিরে নাকি ওকে নদীতে নিয়ে ডুবিয়ে মারবে। আ হা হা! বড় ভালো লোক ছিল গো..।'

'নাম কি লোকটার?' মা শুধায়।

'কার? সেই কামারের? সাভেল। সাভেল ইয়েভচেংকো। কি বা বয়েস! ছেলেমানুষ! কিন্তু কি বিদ্যে ঐটুকু বয়সে। তা দেখছি তো বিদ্যে টিদ্যে থাকলেই ফ্যাসাদ। প্রায়ই আসত আমাদের কাছে; বলতো, কিসের মধ্যে আছ তোমরা গাড়োয়ানেরা, দেখতে পাওনা? কুকুরও তো থাকে না অমনি করে। তা আমরা আর কি বলব! শুধু মাথা নাড়তাম!'

'এই থামো, থামো!' মা বলে।

গাড়ীর ঝাঁকানিতে ইভান জেগে ককিয়ে ওঠে।

কোচ্‌ম্যান বলে : 'খুব ভদ্‌কা খাও! মজাটা টের পাও এখন!'

টলতে টলতে নামে ইভান—তবু বলে :

'আমি ভালো আছি...নিজেই পারব, ছেড়ে দাও।'

সোফিয়া আগেই বাড়ী পৌঁছে গেছে। দাঁতের ফাঁকে সিগারেট চেপে উত্তেজনায় ছট্‌ফট্‌ ক'রে বেড়াচ্ছে ও।

ইভানকে শুইয়ে দেওয়া হ'ল। নিপুণ হাতে ব্যাণ্ডেজটা খুলে ফেলল সোফিয়া।

'এই যে ছেলেটি, ইভান দানিলভিচ্‌! খুব ক্লান্ত হ'য়েছ, নিলোভনা, না? বড্ড ভয় পেয়েছিলে নিশ্চয়! তা যাও, এখন একটু বিশ্রাম করোগে। নিলোভনাকে একটু পোর্ট ঢেলে দাওতো, নিকলাই।'

ধাক্কা এখনও সামলে উঠতে পারেনি মা। এখনও হাঁপাচ্ছে, বুকে কেমন একটা ব্যথা। ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে।

মুখে বলে বটে গুন্‌গুনিয়ে: 'আমার জন্য ব্যস্ত হয়োনা', কিন্তু ওর সারা অস্তিত্ব চায়, কেউ আসুক, ওর কাছে বসুক, যত্ন করুক। একটু দরদ একটু স্নেহের জন্য ওর সারা দেহমন পিয়াসী হ'য়ে উঠেছে।

ঘরে এসে ঢোকে নিকলাই—একটা হাত বাঁধা। সাথে ডাক্তার ইভান দানিলোভিচ্‌। আলুথালু পোষাক, আলুথালু চুল—খাড়া হ'য়ে আছে সজারুর কাঁটার মত। তাড়াতাড়ি ইভানের বিছানার কাছে এসে ঝুঁকে প'ড়ে ওকে দেখতে আরম্ভ করে।

'জল চাই। অনেকখানি বেশী ক'রে এনো। আর খানিকটা তুলো আর পরিষ্কার কাপড়।'

মা রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াতেই নিকলাই এসে হাত ধরে ওকে খাবার ঘরে নিয়ে যায়।

'তোমাকে বলা হয়নি। বলা হয়েছে সোফিয়াকে।' কোমল স্বরে বলে নিকলাই, 'খুব ঘাবড়ে গেছো, না মা?'

ওর দরদভরা, সন্ধানী দৃষ্টির সামনে মা আর নিজেকে ধ'রে রাখতে পারেনা। ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে:

'উঃ কি সাংঘাতিক!' কাঁদতে থাকে মা, 'অমন ক'রে মারলে মানুষকে? ধ'রে ধ'রে কেটে...!'

পোর্টের গ্লাস এগিয়ে দিয়ে নিকলাই বলে: 'আমি দেখেছি। দু'দিকেরই মাথা কিছু গরম হ'য়ে গিয়েছিল। শান্ত হন আপনি। কাপ্তেন কাউকে, তলোয়ারের উল্টো দিক দিয়ে মেরেছে। একজন মাত্র খুব বেশী রকম জখম হয়েছে। ওঃ ঠিক আমার চোখের সামনে। কোনো মতে ভিড় থেকে টেনে বের করি ওকে।'

ঘরখানার আলোয়, উষ্ণতায়, আর নিকলাইয়ের দরদভরা স্বরে মা প্রকৃতিস্থ হ'য়ে ওঠে। কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে: 'তোমাকেও মেরেছে?'

'ঠিক ওরা মারেনি। আমার নিজের দোষেই হাতটা কিসের সাথে ঘষটে খানিক চামড়া উঠে গেছে। এই ধর, চাটা খেয়ে নাও তো! বাইরে বড় ঠাণ্ডা, গরম কাপড়-টাপড় পরোনি দেখছি!'

হাত বাড়িয়ে পেয়ালাটা নিতে গিয়ে নজর পড়ে হাতের আঙুলে খানিকটা শুক্‌নো রক্ত। হাতটা প'ড়ে যায় কোলের ওপর—জামাটাও ভিজে। চোখ কপালে তুলে ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ ক'রে তাকিয়ে ব'সে থাকে মা। বুক ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ করে; মাথাটা ঘুরে ওঠে। 'পাভেল—পাভেলকেও হয়তো—অমনি...!'

ডাক্তার এসে ঘরে ঢোকে। শুধু একটা গরম গেঞ্জি পরা—কনুই অবধি আস্তিন গোটান। নিকলাই ইসারায় কি একটা জিজ্ঞাসা ক'রেছিল, জোরে জোরেই জবাব দেয় ডাক্তার :

'না, মুখের চোটটা তেমন সাংঘাতিক নয়। কিন্তু মাথার খুলিটা জখম হ'য়েছে—খুব বেশী নয় অবশ্যি। শক্ত আছে ছেলে। কিন্তু রক্ত প'ড়েছে মেলাই। হাসপাতালে পাঠিয়ে দেব?'

'কেন? থাক না এখানে!' নিকলাই বলে।

'তা থাকতে পারে, আজ আর কাল। কিন্তু তারপরে হাসপাতালে থাকলে সুবিধা হয়। বাড়ী বাড়ী যাবার অমার সময় কোথায় বলতো! তা ঘটনাটা সম্পর্কে একটা ইস্তাহার লিখে ফেল না।'

'তা তো লিখবই।' জবাব দেয় নিকলাই।

মা নিঃশব্দে উঠে রান্নাঘরের দিকে যায়। থামিয়ে দিয়ে বলে ও, 'উঠছ কেন? আজ সোফিয়াই সব ক'রে নেবে'খন। বেশ পারবে।'

নিকলাইয়ের দিকে তাকিয়ে কেঁপে ওঠে মা। অদ্ভুত ভাবে হেসে বলে : 'আমি যে রক্তে একদম ভিজে গেছি!'

কি আশ্চর্য ঠাণ্ডা এই মানুষগুলি! এত বড় ব্যাপারটা কত সহজে এরা সামলে নিলে! নিজের ঘরে গিয়ে কাপড় ছাড়তে ছাড়তে অবাক হ'য়ে যায় মা। যত ভয় সব চলে গিয়ে সাহস ফিরে আসে। ইভান যেখানে শুয়েছিল সেই ঘরে এসে দেখে মা, সোফিয়া ইভানের মুখের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে বলছে :

'ছিঃ! ওসব ব'লতে নেই, কমরেড্!'

'না, না, আপনাদের অসুবিধা হবে।' ক্ষীণ প্রতিবাদ আসে।

'কথা ব'লে না। চুপ ক'রে থাকলে আরো চট্ ক'রে ভালো হ'য়ে যাবে...' সোফিয়ার কাঁধে হাত রেখে পিছনে এসে দাঁড়ায় মা। ইভানের ফ্যাকাশে মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে। আমরা যাচ্ছি, ঘুমোও তো একটু লক্ষ্মী ছেলে!'

খাবার ঘরে এসে বসে সবাই, আজকের ঘটনা নিয়ে আলোচনা চলে অনেকক্ষণ। উত্তেজনা শেষ হ'য়েছে—এ যেন অনেক দিন আগের ঘটনা। বর্তমানে এর মূল্য নেই, তাই চলে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা। ওদের চোখে মুখে ক্লান্তির ছায়া; কিন্তু চিন্তা চলে দুঃসাহসী পথে। কাজের কথার সাথে সাথে চলে আত্ম-সমালোচনা। নিজেকে ওরা লুকয় না। ডাক্তার অস্থির ভাবে উস্‌খুস্ ক'রে চেয়ারে ব'সে।

উঁচু তীক্ষ্ন গলাটাকে যথাসাধ্য নরম ক'রে নিয়ে বলে ডাক্তার :

'আজকাল আর শুধু প্রচারে কাজ হয় না। তরুণ শ্রমিকরা ঠিকই বলে, আমাদের কাজকর্ম বাড়ানো দরকার। ঠিক বলেছে ওরা।'

ডাক্তারেরই সুরে জবাব দেয় নিকলাই : 'সব দিক থেকে খালি নালিশই শুনছি, যথেষ্ট কাগজপত্র নেই। দিতে সত্যি পারছি না। এখনও একটা ভালো ছাপাখানা ক'রতে পারিনি। লুদ্‌মিল্লা খেটে খেটে শেষ হ'য়ে গেল। তাকে সাহায্য করা দরকার। নইলে মারা পড়বে সে বেচারী।'

'ভেসভশিচকফের খবর কি?' জিজ্ঞাসা করে সোফিয়া।

'তার পক্ষে শহরে থাকা সম্ভব নয়। নতুন ছাপাখানা চালু হ'লে তবে তো তার কাজ। কিন্তু ওকে ছাড়াও আর একজন লোকের দরকার।'

ধীরে ধীরে মা বলে : 'আমায় দিয়ে চলবে না?'

তিনজনেই স্তব্ধ হ'য়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর সোফিয়া উল্লসিত হ'য়ে ওঠে। 'চমৎকার! চমৎকার! কেন চলবে না?'

কিন্তু নিকলাই ব'লে বসে : 'তা তো হবে না। ভারী অসুবিধা হবে যে আপনার! থাকতে হবে শহরের বাইরে। পাভেলের সাথে দেখাসাক্ষাৎ তো হবে না! তা ছাড়া এমনিতেও...'

মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে : 'দু'দিন দেখা না হ'লে মরে যাবে না পাভেল। আর আমি! সত্যি কথা বলতে, ও দেখা না হ'লেই ভালো। ওর নাম দেখা? নিজের ছেলে, তার মুখের দিকে তাকিয়ে বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকি। দু'টো কথা কইতে পারি না, শকুনিরা সব হাঁ ক'রে থাকে, কখন কোন সর্বনেশে কথা বলে ফেলে।'

পরপর ক'দিনের ঘটনায় মায়ের মনের ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে। হাঁপিয়ে উঠেছে মা। শহরের এই বিষম ডামাডোল থেকে দূরে পালিয়ে যেতে পারলে যেন বাঁচে। প্রাণ ওর আঁকু পাঁকু করছে। আজ সম্ভাবনাটুকু হ'তেই তাই লোভীর মত দুই হাত পেতে এসে দাঁড়ায়।

কিন্তু নিকলাই কথার মোড় ঘুরিয়ে দেয়। ডাক্তারের দিকে ফিরে বলে : 'কি ভাবছ হে, ইভান?'

গোঁজ হ'য়ে ব'সে ছিল ডাক্তার। মাথাটা তুলে আঁধার মুখে জবাব দেয় :

'ভাবছি কি জান? মাত্র এই ক'জন আমরা? আরো বেশী ক'রে, আরো মন দিয়ে কাজ ক'রতে হবে আমাদের। পাভেল আর আন্দ্রেইকে বোঝাতে হবে, যে ক'রেই হোক ওদের বেরিয়ে আসা কাজের দিক থেকে অত্যন্ত দরকার। ওখানে মিছেমিছি ব'সে থেকে লাভ নেই।'

মায়ের দিকে তাকিয়ে ভ্রূ কুঁচকে মাথা নাড়ে নিকলাই। মা বোঝে, ছেলের কথা ওরা ওর সামনে আলোচনা ক'রতে চায় না। উঠে বেরিয়ে আসে। নিজে যেচে বলেছিল, কাজ ক'রবে; কিন্তু সে আবেদন প্রত্যাখ্যাত হ'য়েছে। বড় অপমান লাগছে। বিছানায় শুয়ে ঘুম আসে না চোখে। ওঘর থেকে ওদের কথাবার্তার কোমল গুন্‌গুনানি ভেসে আসে। হঠাৎ কেমন ভয় করে।

আজকের দিনটা যেন মস্ত বড় একটা দুঃস্বপ্ন। কিন্তু না, আর ভাববে না ও কথা। এখন শুধু পাভেলের কথা, পাভেলের চিন্তা। কবে যে সে আবার খোলা হাওয়ায় বেরিয়ে এসে বুক ভ'রে নিশ্বাস নেবে, কে জানে? কিন্তু চারদিকের অবস্থা যা দেখা যাচ্ছে, একটা বড় রকম গোলমাল অনিবার্য! তখন? বড় ভয় করে পাভেলের জন্য। মানুষ নিঃশব্দে বুকে পাথর বেঁধে এতকাল সয়েছে। আজ সে পালা সাঙ্গ। আজ অধীর প্রতীক্ষা। চারদিকেই মা শুনতে পায় ধারাল ঝাঁঝাল কথা; দিনে দিনে অসন্তোষ অস্থিরতা অত্যন্ত স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে। একটা ইস্তাহার বের হোক, তা নিয়ে হাঠে-মাঠে, দোকানে-বাজারে, কামার-কুমোর, কুলি-মজুর, ঝি-চাকর সবার মধ্যেই জোর আলোচনা আর তর্ক চলে। কেউ গ্রেপ্তার হ'লে, কেন হ'লো, তার কারণ নিয়ে নানা রকম টিকাটিপ্পনি, হল্লা চলে। কেউ ভয় পায়, কেউ হাসে, কেউ অবাক হয়, কারু বা রাগ হয়। সাধারণ মানুষেরাও আজকাল বিপ্লব, সমাজতন্ত্রী, রাজনীতি ইত্যাদি কথা নিয়ে সদা সর্বদাই নাড়াচাড়া করে। আগে এসব কথা উচ্চারণ করতে ওরা ভয়ে মরে যেত। আজকাল সব বেপরোয়া। ঠাট্টাও করে কেউ কেউ। যারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে এসব নিয়ে, বেশ বোঝা যায় ঠাট্টাটা মুখোশ, তার পেছনে আছে কৌতূহল। অনেকে চটেও যায়; কিন্তু তাদের রাগের

পেছনে থাকে ভয়। তারপর অনেকে এসব নিয়ে চিন্তাভাবনাও করে। তাদের চিন্তা ভাবনার সাথে জড়িয়ে থাকে সংশয় মেশান আশা। ধীরে ধীরে ওদের স্রোতহীন জীবনের কালো জলের বুকে অসন্তোষের ঢেউ ছড়াতে থাকে। তাসের দেশ ভেঙে পড়ে। প্রতিদিবসের প্রাণধারণের গ্লানিকে ললাটের লিখন ব'লে নীরব হয়ে থাকতে মানুষ আর রাজী হচ্ছে না। আজ সবার সব ধৈর্য তিতিক্ষা ভেঙে চুরমার হ'য়ে যাচ্ছে। খোলা চোখে দেখতে পাচ্ছে মা। রুদ্ধ-জীবনের এই ভাঙন মায়ের চোখেই ধরা পড়ছে বেশী, কারণ জীবনকে মা চেনে। যতই মানুষের বিক্ষোভ বাড়ে ততই খুশি হয় মা। এ ভাঙন যে তার ছেলের নিজের হাতের রচা নতুন-সৃষ্টির বনিয়াদ। তবু কেমন জানি ভয়ে বুকটা দুরু দুরু করে। কারণ জেল থেকে পালিয়ে এসে পাভেল কিছু আর ঘরে ব'সে থাকবে না। সবার আগে নিজের ঠাঁইয়ে গিয়ে দাঁড়াবে আবার। সব চেয়ে যে বিপদের ঠাঁই। অতএব এবার তাকে বাঁচায় কার সাধ্য।

এক একবার ছেলেকে ওর মস্ত বড় মনে হয়। যত ভালো লোক দেখেছে মা, যত ভালো কথা শুনেছে, সব কিছুর চাইতে সবার চাইতে বহু ঊর্ধ্বে যেন পাভেল। এত বড়, এত ওপরে যে মনে হয় ও কল্পলোকের বীর রাজপুত্তুর। বুকে বল পায়। ভয়ডর কিছু থাকে না। মন তখন উদাত্ত স্বরে হাঁকে—মাভৈঃ!! মাভৈঃ!! মায়ের বুক গর্বে, বাৎসল্যে উছলে ওঠে। প্রকাশহীন অমিত আনন্দে পুত্র-চিন্তা প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠে। মনে হয় : 'সব ঠিক হ'য়ে যাবে। সব!'

ঢেউ-দিয়ে-ওঠা বাৎসল্য পরক্ষণেই চুপ্‌সে এতটুকু হ'য়ে যায় বেদনায়। মাতৃ-ধর্মের কাছে মানবধর্ম হার মানে। মাতৃস্নেহের সূক্ষ্ম পাবকশিখায় পুড়ে যায় মানব-ধর্ম। আনন্দকে গ্রাস করে ভয়। একটি চিন্তা সবার ওপর দিয়ে জেগে থাকে :

'মরবে পাভেল...মরবে...।'

চৌদ্দ

জেল আফিসে মুখোমুখি ব'সে আছে পাভেল আর মা। হাতের মধ্যে আঙুলের ফাঁকে দুমড়ান মোচড়ান চিঠিখানি।

ধীর ভাবে শুধায় পাভেল : 'কেমন আছে আর সবাই? আমি বেশ ভালোই আছি। তুমি কেমন আছ?

পুতুলের মতন ব'লে যায় মা। সবাই ভালো। ইয়েগর ইভানোভিচ মারা গেছে।'

'সত্যি?' চীৎকার ক'রে ওঠে পাভেল। ধীরে ধীরে মাথাটা ঝুঁকে পড়ে।

'কবরখানায় একটা হাঙ্গামা হয় পুলিশের সাথে। এক জনকে ধ'রে নিয়ে গেছে।'

সহকারী জেল-সুপার আগুন হ'য়ে লাফিয়ে ওঠে :

'এই খবর্দার! জানো না এসব কথা বলা নিষেধ জেলে? রাজনীতি আলোচনা

চলবে না।'

অপরাধীর মত উঠে দাঁড়ায় মা। বলে :

'না, দেখুন, আমি রাজনীতি ভেবে বলিনি। একটা হাঙ্গামা হ'য়েছিল, শুধু সেই খবরটা দিচ্ছিলাম। শুধু কি হাঙ্গামা? এক জনের মাথা অবধি ফেটে গেছে।'

'ও একই কথা। বাস্ এক দম চুপ্। মানে নিজেদের কথা বা বাড়ীঘরের কথা ছাড়া আর কিছু বলা চলবে না।'

কথা বাড়বে, বোঝে অফিসার। নিজের ডেস্কে গিয়ে ব'সে কতগুলি কাগজপত্র ওল্‌টাতে থাকে। ক্লান্ত ভাবে বলে :

'তোমরা কি বল, না বল, তার জন্য আমাকেই কৈফিয়ৎ দিতে হয়, বুঝলে!'

এই সুযোগে তাড়াতাড়ি পাভেলের হাতে চিরকুটটা গুঁজে দেয় মা। বুকটা যেন হাল্কা হ'য়ে গেল।

অফিসার বলে : 'বাপুহে, কি বলতে আছে আর নেই, নাই যদি জানো, তবে নাহক্ এখানে আসা কেন? যত ঝামেলা।'

মা জিজ্ঞাসা করে : 'মামলা আরম্ভ হবে শিগ্‌গিরই না?'

'হাঁ, ক'দিন আগে উকিল এসেছিল। বলছিল তাই।'

এমনি সাধারণ এদিক সেদিকের কথা চলে। মা দেখে ঠিক তেমনি আছে পাভেল, তেমনি শান্ত, ঠাণ্ডা মেজাজ। এতটুকু বদ্‌লায়নি, শুধু এক মুখ দাড়ি হয়েছে, আর হাতটা বড় সাদা। ওই দাড়ির জন্য বয়স বেশী দেখায় অনেকটা। মার ইচ্ছে করে নিকলাইয়ের কথা বলে ওকে, শুনে হয় তো খুশি হবে পাভেল। এতক্ষণ যে সুরে কথা হ'চ্ছিল ঠিক সেই সুরেই বলে :

'তোর ধর্মছেলেকে দেখলাম সেদিন..'

পাভেল অবাক হয়ে নীরবে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চায় মায়ের দিকে। মা নিজের গালে টোকা মারতে থাকে—নিকলাইয়ের মুখে বসন্তের দাগ আছে তারই ইসারা।

'বেশ ভালোই আছে দেখলাম। একটা কাজ পাবে শিগ্‌গিরই।'

পাভেল বোঝে। হাসি মুখে মাথা নাড়ে। বলে

'বাঃ বেশ!'

পাভেলের মুখে হাসি দেখে নিজের ওপর খুশি হ'য়ে ওঠে মা। গভীর আবেগে মায়ের হাতখানি ধ'রে বিদায় নেয় পাভেল। হাতের স্পর্শে মাতা পুত্রের হৃদয়ে হৃদয়ে নিবিড় অন্তরঙ্গতার স্বাক্ষর পড়ে। মায়ের যেন নেশা লাগে। প্রকাশের ভাষা নেই—ছেলের হাতখানি নিবিড় ক'রে চেপে ধরে বাক্যহীনা মা।

বাড়ী ফিরে দেখে সাশা এসে বসে আছে। পাভেলের সাথে মায়ের দেখা করার দিনটিতে ও আসবেই; কিন্তু কখনও কিছু জিজ্ঞাসা করে না। মা যদি নিজে থেকে কিছু না বলে, তবু নয়। তার চোখের ভাষায় সব খবর প'ড়ে নেয়। কিন্তু আজ ওর মুখে উদ্বেগ।

'কেমন আছে ও?'

'বেশ ভালোই আছে।'

'কাগজটা দিয়েছিলেন?'

'দিয়েছি বৈকি! কম চালাকী ক'রতে হয়েছে?'

'পড়েছে?'

'ওখানে দাঁড়িয়ে কেমন ক'রে পড়বে?'

'তা বটে। আমার খেয়াল ছিল না।' ধীরে ধীরে বলে সাশা।

'আরেক সপ্তাহ অপেক্ষা ক'রতে হবে দেখছি। আপনার কি মনে হয়, রাজী হবে?'

ব্যগ্র দৃষ্টিতে মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে সাশা। মা যেন আপন মনেই বলে: 'কে জানে! কিন্তু রাজী না হবার কি আছে? বিপদআপদ তো নেই এতে!'

সাশা মাথা নাড়ে। তারপর জিজ্ঞাসা করে:

'ইভানকে কি খেতে দেওয়া হয় জানেন? ওর খিদে পেয়েছে।'

'সব খেতে পারে। দাঁড়াও...'

রান্না ঘরে যায় মা। সাশা ধীরে ধীরে সাথে সাথে যায়।

'দিন, আমি ক'রে দি।'

'দূর! লাগবে না, আমিই ক'রে নিচ্ছি।'

মা স্টোভের উপর ঝুঁকে একটা বাটি তুলে আনে। সাশা বলে: 'দাঁড়ান একটু...'

মুখখানা ওর কালো হয়ে গেছে। চোখ দুটো যেন তীব্র ব্যথায় বিস্ফারিত; ঠোঁট কাঁপছে। চাপা স্বরে তাড়াতাড়ি বলে মায়ের কানে কানে:

'আমার মনে হচ্ছে কি জানেন? ও কিছুতেই রাজী হবে না। আমি বলছিলাম কি, আপনি ওকে একটু ভালো ক'রে বোঝান। ওকে আমাদের এখানে বড় দরকার। কাজের জন্যই দরকার। বলুন ওকে। এটুকুও বলবেন যে ওর শরীরের জন্য বড় ভাবছি আমি। কবে যে বেরুবে তার ঠিক নেই, মামলার তারিখই পড়েনি এখনও...'

বলতে ওর বড় কষ্ট হচ্ছে, বেশ বোঝা যায়। সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে ঘরের কোণার দিকে তাকিয়ে আছে ঠোঁট কামড়ে। গলার স্বর রুদ্ধ, বড় ক্লান্তিতে চোখের পাতা দুটি ঝিমিয়ে আছে। মুঠো-করা হাতের হাড়গুলি মড়্‌মড়িয়ে ওঠে, শুনতে পায় মা।

প্রথমটায় হক্‌চকিয়ে গেলেও, বুঝতে পারে মা। ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে, ব্যথায় বুক টন্‌ টন্‌ করে। অত্যন্ত কোমল স্বরে বলে:

'মা আমার! ও কি নিজের কথা ছাড়া আর কারো কথা শোনেরে?'

নিবিড় নিঃশব্দ আলিঙ্গনে স্তব্ধ হ'য়ে থাকে দু'জনে। কতক্ষণ কে জানে। তারপর আস্তে আস্তে মায়ের হাতখানা সরিয়ে বলে সাশা। ওর সারা শরীর থর্‌ থর্‌ ক'রে কাঁপে:

'ঠিক ব'লেছেন। কিন্তু কোন মানে হয় না। শুধু জেদ।'

হঠাৎ সহজ হ'য়ে ওঠে ও। অত্যন্ত শান্তভাবে বলে:

'যাক্‌গে ছাই। ছেলেটাকে খাওয়াইগে চলুন।'

ইভানের পাশে গিয়ে ব'সে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করে:

'কেমন আছ ভাই? মাথার ব্যথাটা আছে?'

'বেশী নেই। কিন্তু বড় দুর্বল। আর সব যেন বড় ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা লাগে।' কম্বলটা থুতনির নীচ পর্যন্ত টেনে দেয় ইভান; চোখ দুটো কোঁচকায় যেন হঠাৎ তীব্র আলো লেগেছে। সাশা লক্ষ্য করে, ওর সামনে খেতে লজ্জা ক'রছে ইভান। উঠে বাইরে চ'লে গেল ও। ইভান উঠে ব'সে তাকিয়ে থাকে ওর অপসৃয়মান মূর্তির দিকে।

'কী সুন্দর!' আপন মনে বলে ইভান।

ঝল্‌মলে নীল দুটি চোখ ওর। ঘন-সন্নিবিষ্ট ছোট ছোট মুক্তোর মত দাঁত। গলার স্বর সবে মোটা হতে শুরু করেছে।

চিন্তান্বিত ভাবে জিজ্ঞাসা করে মা : 'তোমার বয়স কত, বাবা?'

'সতেরো।'

'মা বাবা কোথায় আছেন?'

'গাঁয়ে। আমি দশ বছর বয়স থেকেই তো এখানে। ইস্কুলের পড়া শেষ হ'তেই পালিয়ে এসেছিলাম শহরে। আপনার নাম কি, কমরেড্?'

কমরেড্ ব'লে ডাকলে মায়ের ভারি মজা লাগে, ভালও লাগে। হেসে জিজ্ঞাসা করে : 'কেন বল তো?'

বিব্রত হয় ইভান। একটু চুপ ক'বে থেকে বলে : 'কেন জানেন? আমাদের পাঠচক্রের একজন ছাত্র—মানে আমাদের প'ড়ে শোনাত সে পাভেল ভ্লাসফের মায়ের কথা বলেছিল আমাদের কাছে। সেই পয়লা মের মিছিল [illegible]?'

মা মাথা নেড়ে কান খাড়া করে।

'পাভেলই সব চেয়ে আগে আমাদের পার্টির ঝাণ্ডা [illegible] সামনে, জানেন?' গর্বিত ভাবে বলে ইভান। ওর গর্বের প্রতিধ্বনি সুর [illegible] মায়ের অন্তরে বাজে।

'আমি ওখানটায় ছিলাম না তখন। আমাদের এলাকায়ও মিছিল বার করবার কথা ছিল কিনা! পারিনি অবশ্যি, ভেস্তে গেল সব। বেশী লোক জোটাতে পারা যায়নি। আমরা মাত্র ক'জনই ছিলাম! সে যাই হোক গে, দেখুন না, আসছে বছর কি কাণ্ডটা করি।'

উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে ইভান। ভবিষ্যতের কথা কল্পনা করে হাঁপাতে থাকে।

'হাঁ, পাভেল ভ্লাসফের মায়ের কথা বলছিলাম না!' চামচটা দুলিয়ে আবার আরম্ভ করে ইভান, 'তারপর থেকে তিনিও পার্টীর একজন কর্মী। সবাই বলে, অদ্ভুত মানুষ নাকি।'

হাসিতে মায়ের মুখ উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে। ছোট্ট ছেলের মুখে নিজের প্রশংসা শুনতে মন্দ লাগছে না। আবার লজ্জাও করে। ইচ্ছে হয় নিজের পরিচয় দেয়। কিন্তু না, থাক এখন। নিজেই নিজেকে ঠাট্টা করে বলে, 'ভীমরতি ধরেছে আর কি!'

হঠাৎ উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে মা। ওর মুখের কাছে মুখ এনে বলে :

'খাও খাও, আর একটু খাও। চট্‌পট্ ভালো হ'য়ে ওঠ- ভালো না হলে কাজ করবে কি করে?'

রাস্তার দিকের দরজাটা খুলে যায়। এক ঝট্‌কা ঠাণ্ডা ভেজা বাতাস এসে ঘরে ঢোকে। চোখ তোলে মা—দরজায় দাঁড়িয়ে সোফিয়া, হাসছে, খুশিতে ঝলমল করছে।

'বাপরে বাপ্, যেমন ক'রে টিকটিকি লেগেছে পেছনে, যেন কোন কোটিপতির ধন-দৌলত পেতে যাচ্ছি। আর টেঁকা গেল না এখানে দেখছি। কেমন বোধ হচ্ছে ইভান? ভালো লাগছে একটু? পাভেলের কোনো খবর আছে নাকি, নিলোভ্না? সাশা আছে এখানে?'

মা আর ইভানের ওপর আদরের দৃষ্টি বুলিয়ে একটা সিগারেট ধরায় সোফিয়া। সাথে সাথে চলে ওর প্রশ্নের ঝড়, উত্তরের অপেক্ষা না রেখেই।

মা হাসে মনে মনে : 'ওদেরই একজন আমি এখন!'

আর একবার ইভানের দিকে ঝুঁকে প'ড়ে বলে : 'শিগ্গির ভাল হ'য়ে ওঠ বাবা।'

রান্নাঘরে গিয়ে দেখে মা, সোফিয়া সাশাকে বলছে :

'এরই মধ্যে তিনশো কপি তৈরী ক'রে ফেলেছে, বুঝলে? এমনি ক'রে তো খুন ক'রবে ও নিজেকে! এত খাটুনি সয়! এ ওর বাড়াবাড়ি। কিন্তু সাশা! এমন সব মানুষের সঙ্গে থেকে কাজ ক'রতে পাওয়াও মস্ত সৌভাগ্যের কথা।'

'সত্যি তাই।' সাশা বলে আস্তে আস্তে।

সন্ধ্যেবেলা চায়ের টেবিলে সোফিয়া মাকে বলে :

'আরেকবার গাঁয়ে যেতে হচ্ছে তোমায়, নিলোভনা।'

'বেশ তো! কবে?'

'দিন তিনেকের মধ্যে? পারবে?'

'কেন পারবো না?'

গোমড়া মুখে ব'সে ব'সে ভ্রূ কোঁচকাচ্ছিল নিকলাই। স্বভাব-শান্ত সংযত মানুষ। আজকের এ মুখ যেন ওর সাথে মানাচ্ছিল না।

'এবারে ডাকগাড়ীতে যাবে বরং। অন্যরাস্তায় যেতে হবে, নিকোল্স্কয়ে ভোলস্ত-এর রাস্তাই ভালো হবে।' উপদেশ দেয় নিকলাই।

মা উত্তর দেয় : 'ও তো বড্ড ঘুরপথ হবে! আর সারা পথ গাড়ীতে...'

'আসলে আমার ইচ্ছেই নয় আপনি যান।' নিকলাই বলে, 'ওখানকার অবস্থাও ভালো নয়, ধর-পাকড় হয়েছে। কয়েক জন মাস্টারকেও ধরেছে শুনেছি। আমাদের একটু সাবধান হওয়া দরকার, সময় না হয় যাবে কিছু।'

সোফিয়া টেবিলে আঙুল ঠুকে বলে : 'কিন্তু কাগজপত্র পাঠান বন্ধ হ'লে তো চলবে না। ওটা তো বজায় রাখতেই হবে!' তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা ক'রে বসে : 'তোমার যেতে ভয় ক'রছে নাকি, নিলোভনা?'

মা আহত হয়।

'ভয় পেতে দেখেছ কখনও? প্রথমবার যখন গেছি, তখনই ভয় ক'রল না, আর এখন...হঠাৎ...' কথা শেষ না ক'রেই মাথা নীচু ক'রে মা। ভয়ের কথা, বা আপনি পারবেন তো? কষ্ট হবে না তো? এই সব কথা জিজ্ঞাসা ক'রলেই মায়ের মনে হয় ওরা দূরে সরিয়ে দিচ্ছে ওকে, পর মনে ক'রছে। ধরা গলায় বলে :

'কেন? ও কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন? কৈ নিজেদের মধ্যে যখন কাউকে কিছু করতে বল, তখন তো করনা?'

নিকলাই বিব্রতভাবে চশমাটা খুলে আবার পরে। বোনের দিকে তাকিয়ে থাকে ব্যগ্র ভাবে। সবাইকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে ঘাব্ড়ে যায় মা। অপরাধী মনে হয় নিজেকে। টেবিল থেকে উঠে দাঁড়ায়। কি যেন বলতে চায়। কিন্তু সোফিয়া সস্নেহে হাত ধ'রে এসে বলে :

'ক্ষমা কর, আর কখনও বলবনা।'

মায়ের মুখে হাসি ফোটে। অল্পক্ষণের মধ্যেই যাওয়ার ব্যাপার নিয়ে আলোচনায় মেতে ওঠে তিনজনে।

পনেরো

ভোরবেলা রওনা হ'য়ে গেল মা। হেমন্তের বৃষ্টিভেজা রাস্তা দিয়ে ঝ্যাঁকর ঝ্যাঁকর ক'রতে ক'রতে গাড়ীটা চলেছে। বিশ্রী এলোমেলো বাতাস; কাদা ছিটকে উঠছে প্রতি মুহূর্তে। কোচ্‌বাক্স থেকে ঘাড় ফিরিয়ে কোচ্‌ম্যান্‌ নাকী সুরে নালিশ করে :

'ওটাকে, মানে ভাইটাকে গো, বললাম—চল বাপু ভাগে চালাই। তাই ভাগ..'

বাঁ দিকের ঘোড়াটার পিঠে সপাং ক'রে চাবুক কষে খেঁকিয়ে উঠল লোকটা : 'শালা ডাইনীর বাচ্চা, চল্‌ চল্‌ ..'

হেমন্তের সুপুষ্ট কাকগুলি ব্যস্তভাবে রিক্ত খেতের আলে আলে ঘুরে বেড়ায়। পাগলা হাওয়ার ঝাপ্‌টার আগে শক্ত হ'য়ে দাঁড়ায় তারা, কিন্তু টাল সামলাতে না পেরে, উল্টে উল্টে পড়ে; পালকগুলো আলুথালু হ'য়ে যায়। অলসভাবে ডানা ঝট্‌পটিয়ে অন্য জায়গায় সরে যায়।

কোচ্‌ম্যান ব'লে যায় : 'তারপর ক'রল কি জান? আমায় কলাটি দেখালে! হাত ঠেকাবার মত কুটোটি অবধি রইল না '

শোনে মা.. কিন্তু যেন স্বপ্নের ঘোর লেগে আছে চেতনায়। গত কয়েক বছরের ঘটনা নদীর স্রোতের মত ব'য়ে যায় স্মরণের কূল ছাপিয়ে। প্রত্যেকটি ঘটনার সাথে মা জড়িয়ে আছে সক্রিয় ভাবে। আগের দিনে সে ছিল আরেক রকম। কোথায় কোন অজানা দূরে জীবনের সৌধ-রচনা হ'য়েছিল। কে করেছিল, কেনই বা ক'রেছিল কেউ জানে না তা। কিন্তু আজ মায়ের জাগ্রত দৃষ্টির সামনে জীবনের অভ্যুদয় হচ্ছে—তাঁর আপন হাতের অবদানে ভাবী তৃপ্তি লাগে, আবার অবিশ্বাস আসে নিজের পর; আত্ম-তৃপ্তি আর আত্ম-অবিশ্বাস, বিস্ময় আর এক প্রশান্ত ব্যথা এক সাথে ঢেউ খেলে যায় বুকের মধ্যে।

ধীরে মন্থর গতিতে পট বদলায়। কালো মেঘের দল পরস্পরকে ধাওয়া ক'রে ছুটে চলেছে আকাশের এপার থেকে ওপারে। পথের দুধারের ভেজা গাছেরা শাখা নেড়ে স্বাগত জানায় মাকে; মাঠ ফুরিয়ে যায়, দেখা দেয় নীচু নীচু পাহাড়ের সারি; আবার কখন তারাও মিলিয়ে যায় কোন দিগন্তে।

কোচ্‌ম্যানের নাকী সুর, ঘোড়ার গলার ঘণ্টার রিনিঠিনি, বাতাসের মাতলামি সব এক হ'য়ে মিশে কলস্বনা নদীর মত অন্তহীন প্রবাহে ব'য়ে যায় মাঠের বুকের ওপর দিয়ে।

কোচ্‌বাক্সে ব'সে হেলে দুলে কোচ্‌ম্যান বলে : 'সঙ্গে নিয়ে রাজা করে দাওগে, তবু বড়লোকেরা নাক সিঁটকোবে। সেই জন্যই ও ব্যাটা আমায় শুষছে অমন করে। কর্তারা সব ওর দোস্ত কিনা..'

ঘাঁটিতে এসে ঘোড়া খুলে দিয়ে মাকে বলে চিন্তিত ভাবে :

'গোটা পাঁচেক কোপেক দিয়ে যান খেতে।'

কোপেক ক'টা বাজিয়ে নিয়ে বলে : 'তিনটে দিয়ে একটু ভদ্‌কা খাব, আর দুটো দিয়ে খাব রুটি।'

বিকেল বেলা নিকোলস্কোয়ে পেঁছুল মা। ক্লান্তিতে ঠাণ্ডায় দেহ অবসন্ন। স্টেশনে গেল চায়ের খোঁজে। ভারী সুটকেসটা বেঞ্চির তলায় ঠেলে দিয়ে জানালার ধারের চেয়ারটায় এসে বসল। জানালা দিয়ে দেখা যায় ছোট্ট একটা পার্ক; মানুষের

পা-মাড়ানো হলদে ঘাসে ঢাকা। আর দেখা যায় কালো রঙের নীচু ছাদ-ওয়ালা বাড়ী—সরকারী শাসন-দপ্তরের বাড়ী। বারান্দায় ব'সে পাইপ টানছে সার্টগায়ে দাড়িওলা এক টেকো চাষী। একটা শুয়োর পার্কে ঘাসের গোড়া খুঁড়ছে—বিরক্তির সাথে কান নেড়ে মাটির মধ্যে নাক গুঁতিয়ে মাথা নাড়ছে।

স্তরে স্তরে পুঞ্জিত কালো মেঘের চাপ। চারদিক নিঃশব্দ আঁধার, গা ছম্ ছম্ করে, জীবন যেন কিসের প্রতীক্ষায় স্তব্ধ হ'য়ে আছে।

হঠাৎ একজন পুলিশ সারজেণ্ট ঘোড়া হাঁকিয়ে এলেন। আফিস্ বাড়ীটার সামনে এসে দাঁড়িয়ে হাওয়ায় চাবুক আছড়ে মানুষটাকে গাল দিতে শুরু করলেন। ওর চীৎকার জানলায় লেগে ঝন্ঝন্ ক'রে উঠল চাষীর কথা ডুবিয়ে। চাষী উঠে দূরে আঙুল দিয়ে কি দেখাল। সারজেণ্ট ঘোড়ার লাগাম চাষীর হাতে দিয়ে টলতে টলতে সিঁড়ি বেয়ে উঠে রেলিং ধরে ধ'রে কোন মতে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল।

আবার সব নিস্তব্ধ। ঘোড়াটা বার দুই মাটিতে পা ঠুকল। বছর বারো তের'র একটি ফুটফুটে মেয়ে একটা ভাঙা ট্রেতে ক'রে কয়েকটা প্লেট নিয়ে ঘরে ঢুকল। গোল মুখখানা, স্নিগ্ধ চোখ, সোনালী চুল বেণী ক'রে বাঁধা। চলতে চলতে ঠোঁট কামড়ায় আর মাথা নাড়ে মেয়ে।

'শুভ-সন্ধ্যা,' বলে স্বাগত করে মা।

টেবিল সাজাতে সাজাতে হঠাৎ উত্তেজিত ভাবে বলে মেয়েটি : 'জানো, একটা ডাকাত ধরা পড়েছে?'

'কে?'

'জানিনে।'

'কোথায় ডাকাতি করল?'

'জানিনে,' মেয়েটি বলে। 'ওরা সব বলছিল যে ডাকাত ধরা পড়েছে। পুলিশ-সাহেবকে খবর দিতে গেছে।'

মা জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়। পার্কে ভিড় জমছে। কেউ আসছে ধীরে সুস্থে বেশ শান্তভাবে, আবার অনেকে আসছে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে। বারান্দার সামনেই ভিড়টা জমছে। সবাই বাঁ দিকে তাকিয়ে কি জানি দেখে।

মেয়েটি জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে একবার তাকিয়েই ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। মা চম্কে উঠে, বাক্সটা আর একটু ভেতর দিকে ঠেলে দেয়। তারপর শালটাকে মাথার ওপর দিয়ে তাড়াতাড়ি দরজার কাছে চ'লে আসে। অদম্য ইচ্ছে হয় ছুটে পালায়। কিন্তু দমন করতে হয় ইচ্ছাটাকে।

বারান্দায় এসে দাঁড়ায় মা। হাড়-জমানো ঠাণ্ডা বুকে চোখে ঝট্কা মারে। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। পা যেন জমে যায়—মাঠের ওপারে ও কে? পিঠ-মোড়া ক'রে বাঁধা রীবিনকে নিয়ে আসছে; দু'ধারে দু'জন পুলিশ; মাটিতে অনবরত লাঠি ঠুকছে রাগে। জনতা নিঃশব্দে আফিস্-বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

মা যেন পাথর হ'য়ে গেল। ঘটনাস্থলে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। কি যেন বলছে রীবিন, ওর গলাটা শোনা যায় বটে, কিন্তু কথাগুলি কোন প্রতিধ্বনি জাগায়না ওর প্রাণের আঁধার শূন্যতায়।

লম্বা একটা নিশ্বাস নিয়ে নিজকে সামলে নেয় মা। বারান্দার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল এক চাষী—নীল চোখ, চওড়া দাড়ি—মায়ের দিকে তাকিয়ে ছিল স্থির দৃষ্টিতে। মা একটু কেশে ভয়ে অবশ হাতখানা গলায় বুলায়।

'কি হয়েছে?' জিজ্ঞাসা করে মা—অতি কষ্টে গলার স্বর বেরোয়।

'চোখের মাথা খেয়েছ?' ব'লে মুখ ঘুরিয়ে সে চ'লে যায়। আর একজন এসে দাঁড়ায় মায়ের পাশে।

ভিড় বাড়ে। পুলিশ রীবিনকে নিয়ে এসে বারান্দার সামনে জমায়েৎ জনতার সামনে দাঁড়ায়। নিস্তব্ধ জনতা। হঠাৎ রীবিনের গলার আওয়াজ তাদের মাথার ওপর দিয়ে শূন্যে ঝন্‌ঝনিয়ে উঠল :

'আমার সাচ্চা-দিল ভাইরা! জানো তোমরা, সেই বইএর কথা, জানো? যার মধ্যে আমাদের চাষীদের অবস্থা সম্বন্ধে সব সত্যি কথা লেখা ছিল! সেই সত্য কথার কিম্মত দিচ্ছি আমি। এই শর্মাই তা বিলিয়েছে।'

জনতা রীবিনের কাছে স'রে আসে। ধীর শান্ত স্বর। মা বুকে বল পায়।

নীল-চোখওলাকে একটা ধাক্কা দিয়ে প্রথম লোকটি বলে : 'হেই শুনছিস?' নীল-চোখ জবাব দেয়না। মাথা তুলে আর একবার মার দিকে চায়। দ্বিতীয় চাষীও মার দিকে চায়। প্রথম লোকটির চাইতে বয়স ওর কম; কালো পাতলা দাড়ি, মেচেতা-পড়া রোগা মুখ। দু'জনেই চ'লে যায় ওখান থেকে।

মা ভাবে, ওরা ভয় পেয়েছে।

আরও সতর্ক হয় মা। যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল মিখাইলো ইভানোভিচ্‌কে—তার ক্ষত বিক্ষত মুখ, আর চোখের অচঞ্চল স্থির জ্বালা। মার ইচ্ছা, মিখাইলো দেখুক ওকে; তাই পায়ের আঙুলে ভর ক'রে গলা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বাক্যহীন জনতা তাকিয়ে আছে গম্ভীর অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে। শুধু ভিড়ের পেছন দিকটায় কিছু চাপা স্বরের কথা-বার্তা শোনা যায়।

আবার কণ্ঠ তোলে রীবিন :

'চাষী-ভাইরা, যে বইয়ের কথা বললাম, তাতে যা লেখা আছে বিশ্বাস ক'রো। হয়ত আমায় জান দিয়ে তার মাশুল শুধতে হবে। কোথা থেকে ওগুলো আমি পেয়েছি সে কথা বার করবার জন্য ওরা আমার ওপর অকথ্য জুলুম করেছে, মারপিট করেছে, আবারও করবে। মারুক, ভয় করিনে আমি। বইয়ের প্রতিটি অক্ষর সত্য। প্রতিটি অক্ষর। নিত্যিকার রুটির চাইতে সত্যের কিম্মত বেশী, বুঝেছ?'

বারান্দার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল এক চাষী—সে বলে : 'ওসব কথা বলছে কেন ও?'

'আরে বলতে দাও!' নীল-চোখ বলে, 'যা হবার তা হ'য়ে গেছে। মানুষ একবারই মরে।'

গম্ভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে এক ভাবে দাঁড়িয়ে আছে জনতা। একটি কথা নেই মুখে। একটা অদৃশ্য গুরুভার যেন ক্রমশই তাদের ওপর চেপে বসছে।

দপ্তর থেকে পুলিশ সার্জেণ্ট টলতে টলতে বেরিয়ে আসে। নেশা জড়িত স্বরে চীৎকার ক'রে উঠল : 'কে কথা কয় ওখানে?'

মুখের কথা শেষ না হতেই তর্‌তর্‌ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে রীবিনের চুল মুঠো ক'রে ধ'রে পাগলের মত মাথাটাকে ঝাঁকাতে লাগল।

'তুই? তুই? কুত্তীর-বাচ্চা তুই?' চেঁচায় সার্জেণ্ট।

জনতা চঞ্চল হ'য়ে ওঠে; অস্ফুট গুঞ্জনের ঢেউ ছড়িয়ে যায় সারা ভিড়ের মধ্যে। মা আর দেখতে পারেনা। অসহায় যাতনায় মাথা নীচু ক'রে নেয়। আবার রীবিনের কণ্ঠ বেজে ওঠে,

'ভাইসব, দেখ...'

কানের ওপর এক ঘুষি মেরে সার্জেণ্ট বলে : 'চোপরাও শালা।' রীবিনের কাঁধ বেঁকে যায়, টাল সামলাতে পারেনা ও।

'দেখ সব, হাত পা বেঁধে রেখে জুলুম চালায় ওরা মানুষের ওপর...'

'সেপাই! নিয়ে যাও ওকে। এই ভাগো সব ইহাঁসে।'

মাংস-মুখে কুকুরের মত পাগল হয়ে লাফাতে লাফাতে রীবিনের বুকে মুখে পেটে কিল-চড়-ঘুষি মারতে লাগল।

ভিড়ের মধ্য থেকে কে একজন চেঁচিয়ে উঠল : 'খবরদার আর মেরেছ তো!'

সমর্থন শোনা যায় : 'অমন ক'রে মারবে কেন শুনি?'

নীল-চোখ মাথা নেড়ে ইসারায় সঙ্গীকে বলে : 'চলহে, যাই এখান থেকে।'

ধীরে ধীরে দুজনে বারান্দার ওপরে ওঠে। মা কোমল দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে পেছন পেছন যায়। সার্জেণ্ট ছুটে বারান্দায় উঠে হাঁকে : 'নিয়ে আয়, শালাকে এখানে নিয়ে আয়।' ও যেন পাগল হ'য়ে গেছে।

ভিড়ের মধ্য থেকে কড়া গলায় কে গর্জন ক'রে ওঠে :

'খবরদার!' মা চেনে, নীল-চোখের গলা।

'ভাইসব! ঠেকাও ওদের। ভেতরে আনতে দিওনা। তাহ'লে ঠেঙিয়ে মেরে ফেলবে মানুষটাকে। তারপর আমাদের ওপর দোষ চাপিয়ে খালাস হবে যে আমরা মেরেছি। ভেতরে যেন আসতে না পারে ওরা।'

মিখাইলো চীৎকার ক'রে বলে : 'চাষীভাইরা, চোখ খুলে দেখ, কি আমাদের জীবন। বুঝতে পারছনা, কেমন করে ওরা আমাদের সব ঠকিয়ে, লুটে নিয়ে, রক্ত শুষে ফোঁপরা ক'রে ছেড়ে দিচ্ছে! দুনিয়ার যা কিছু সব তোমাদেরই দৌলতে... দুনিয়ার সবচেয়ে বড় শক্তি তোমরা ..কিন্তু কতটুকু হক আছে তোমাদের? হ্যাঁ আছে —না খেয়ে তিলে তিলে পেট শুকিয়ে মরার হক্ আছে!'

চারদিকে এলোমেলো চীৎকার ওঠে চাষীদের মধ্য থেকে :

'একদম সাচ্চা কথা বলছে হে, মানুষটা।'

'ডাকো ডাকো, পুলিশ-সাহেবকে ডাকো! কোথায় সে?'

'ছোট সাহেব নিজেই ডাকতে গেছে।'

'কে? ওই মাতাল শালা?'

'ওঃ কর্ত্তাদের ডাকতে যাবে না আরো কিছু! কোন্ চৌদ্দ পুরুষের দায় ঠেকেছে হে?'

গোলমাল বেড়ে ওঠে।

'বল হে বল! সামনে এসে বল! শালারা কেমন মারে দেখি একবার!'

'হাতটা খুলে দাও না বেচারার!'

'দেখো বাবা, ধরাটি পড়োনা যেন।'

'বড্ড লাগছে দড়িটায়!' রীবিন বলে। স্বর ওর স্থির, শান্ত। কিন্তু উদাত্ত কণ্ঠ সব কোলাহল ছাপিয়ে ওঠে। 'ভয় নেই, চাষী ভাই! পালাবোনা আমি। কোথায় পালাব? সত্যের হাত থেকে নিস্তার কি আছে? সে যে আমার কলজের খুন! আসল কথা, পালিয়ে যাব কোথায়?'

কয়েকজন ভিড় থেকে আলাদা হ'য়ে এক ধারে দাঁড়িয়ে মাথা নেড়ে নেড়ে টিপ্পনি কাটে।

কিন্তু দলে দলে পাগলের মত ছুটে আসে জীর্ণ-বেশ অর্ধ নগ্ন মানুষ। রীবিনকে ঘিরে ফুলে ফেঁপে ওঠে তাদের ভিড়। অগনিত মানুষের অরণ্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে রীবিন, আরণ্য মন্দিরের মত। শূন্যে হাত নেড়ে চীৎকার ক'রে বলে সে :

'ধন্যবাদ। ভাইসব, ধন্যবাদ। এমনি ক'রে আমরাই যদিনা আপোসে হাতের বাঁধন খুলে দি, কে দেবে আর?'

দাড়ি মুছে, আর একবার হাত তুলে ধরে—রক্তাক্ত লাল হাত। 'এই দেখ রক্ত! আমার রক্ত। সত্যের জন্য রক্ত ঝরেছে।'

মা বারান্দা থেকে নেমে আসে। কিন্তু ভিড়ের মধ্যে মিখাইলোকে দেখা যায়না। তাই আবার ওপরে উঠে আসে।

আবছা একটা অচেনা সুখ, বুকের মধ্যে উঁকি মারে।

'ভাইসব, চোখ খোলা রেখো। হদিস্ রেখো। কাগজ আসবে। পড়ো, ভালো ক'রে প'ড়ো। পাদ্রী সাহেব, আর কত্তারা বলবে কাফের; মিথ্যে কথা বলেছে কাফেরবা! বিশ্বাস করোনা ওদের বুজরুকী সব। চুপিসারে দুনিয়ার মানুষের বুকে ঠাঁই খুঁজে ফিরছে সত্য। কত্তারা তাকে আগুন আর তলোয়ারের মত ভয় করে। সত্যকে হাত পেতে নেবার হিম্মৎ নেই তেনাদের—খুন হ'য়ে যাবে যে। পুড়ে মরবে। সত্য ওদের দুষমন, কিন্তু তোমার আমার মত সর্বহারা মানুষদের সে দোস্ত। সেই জন্যই তো সত্য অমন চুপিসারে চলে।'

ভিড়ের মধ্যে আবার কোলাহল ওঠে।

'শোন, আমার সাচ্চা ভাইরা শোন!'

'বুঝবে এখন ঠ্যালাটা, দোস্ত!'

'কে তোমায় ধরিয়ে দিয়েছে হে?'

'পাদ্রী সাহেব।' একজন পুলিশ বলে।

দু'জন চাষী গাল দিয়ে ওঠে।

কে একজন সাবধান করে : 'ভাইসব, হুঁশিয়ার!'

ষোল

পুলিশ সাহেব আসছেন। লম্বা, ভারী গড়নের মানুষ; গোল মুখ, টুপীটা একধারে তেরচা ক'রে পরা। গোঁফের একটা ডগা ওপর দিকে তোলা, আর একটা নীচের দিকে। তার ওপরে মুখে কেমন একটা ফিকে মরা হাসি। ঐ কারণে মুখটাকে দেখায় বাঁকা, বিকৃত। বাঁ হাতে একটা তলোয়ার, ডান হাতখানা নানা ভঙ্গিতে নড়ছে। কঠিন ভারী পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে, সবাই শুনতে পাচ্ছে। ভিড় সরে রাস্তা ক'রে দেয়। সকলের মুখের ওপর উৎকণ্ঠার কালো ছায়া জমে। কোলাহল ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে যেন মাটির গভীরে ডুবে যায়। চোখ জ্বালা করে মায়ের, কপালের পেশীগুলো দপ্ দপ্ করে। জনতার মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতে চায় মন। কে যেন ঠেলে ভেতর থেকে। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে পাথরের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

রীবিনের সামনে এসে থামেন সাহেব। ওর আপাদমস্তক ভালো ক'রে নিরীক্ষণ ক'রে বলেন : 'ব্যাপার কি? হাত বাঁধা নেই কেন? সিপাহী! বাঁধো!'

বাজখাঁই গলাটা ঝম্ ঝম্ ক'রে বাজে, কিন্তু প্রাণ-হীন।

একজন সেপাই জবাব দেয় : 'হুজুর মালিক! হাত বাঁধাই ছিল। লোকেরা সব খুলে দিয়েছে!'

'মানে? কি বলছ? লোকেরা মানে কারা?'

অর্ধ-বৃত্তাকারে সামনে দাঁড়িয়ে আছে জনতা। সাহেব তাকিয়ে দেখে।

'কই কারা? দেখি কারা?' বলে সাহেব—ওঠা পড়া নেই, সেই এক টানা নির্জীব কণ্ঠ। তলোয়ারের উল্টো দিক দিয়ে এক গুঁতো মারে নীল-চোখকে :

'হুঁ! চুমাকফ্? লোকেরা মানে তুমি? আর কে? মিশিন? ডান হাত দিয়ে খপ্ ক'রে একজনের দাড়ির মুঠো ধ'রে চ্যাঁচায় :

'ভাগো সব এখান থেকে! শালা বেজন্মারা। নইলে হাড়মাস আলাদা করে ছাড়ব।'

মুখে রাগের কোন চিহ্ন নেই; বলার ভঙ্গিও ঠান্ডা। শুধু অভ্যাস হিসেবেই লম্বা লম্বা হাত দুটো এলোপাতাড়ি মেরে চলেছে মানুষগুলোকে। মুখ ফিরিয়ে, মাথা নীচু করে সব পালাচ্ছে সাহেবের সামনে থেকে।

সেপাইদের বলে : 'হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে দেখছিস্ কি? বাঁধ, জলদি।'

খানিকটা গালি-গালাজ উগড়ে রীবিনের দিকে তাকায়।

'এই শালা, হাত পেছনে।' চীৎকার ক'রে ওঠে সাহেব।

'নাই বাঁধলে, সাহেব! আমি পালাবও না, নড়বও না।'

এক পা এগিয়ে এসে সাহেব বলে : 'কি বলছ?'

'কি বলছ? জানোয়ার! অনেক মানুষ ঠেঙিয়েছ। বাস্, আর না। তোদের দিন ঘনিয়ে আসছে, ভাবছিস্ কি?'

পুলিশ সাহেব তাকিয়ে থাকে রীবিনের দিকে। ওর গোঁফের ডগা শুধু কাঁপতে থাকে। এক পা পিছিয়ে গিয়ে উন্মাদের মত চীৎকার করে ওঠে : 'কি বললি রে কুত্তীর বাচ্চা, কি বললি?'

বলেই মস্ত বড় এক রদ্দা কসিয়ে দিল রীবিনের মুখে।

'আমায় মারতে পারিস্। কিন্তু রদ্দা মেরে সত্যকে মারা যায় না, বুঝলি?' রীবিন চীৎকার করে ওর সামনে এগিয়ে এসে বলে।

'সাবধান! গায়ে হাত তুলেছিস্ তো গেছিস্! মারবার কে রে তুই?'

'কি? আমি মারবার কে? কি বললি?' চীৎকার করে সাহেব।

আবার ঘুষি ওঠায় রীবিনের মাথা বাগিয়ে। কিন্তু রীবিন ব'সে পড়ে। ঘুষি ফশকে যায়। প্রায় উল্টে পড়ে সাহেব। ভিড়ের মধ্যে কে একজন ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে। রীবিনের ক্রুদ্ধ স্বর আবার ভেসে ওঠে :

'হুঁশিয়ার, শয়তান! ফের গায়ে হাত উঠিয়েছিস তো!'

সাহেব চারদিকে চায়। আরো কাছে চেপে এসেছে জনতার ব্যূহ। তার চেহারাটা ঝড়ের রক্ত-চক্ষু আকাশের মত।

সাহেব ডাকে : 'নিকিতা! এই নিকিতা!'

ভেড়ার চামড়ার জামা গায়ে এক বেঁটে মোটা চাষী বেরিয়ে আসে ভিড়ের মধ্য থেকে। মস্ত বড় আলুথালু মাথাটা নুয়ে আছে।

'দেতো শালার কানটা আচ্ছা ক'রে মলে দে দেখি!' গোঁফ চুমরে নিতান্ত

উত্তাপহীন কণ্ঠে বলে পুলিশ সাহেব।

এগিয়ে এসে রীবিনের সামনে দাঁড়ায় লোকটা। রীবিন একেবারে নির্ভুল তাক্ ক'রে কথার বোমা ছুঁড়ে মারে ওর মুখে :

'দেখ, দেখ, ভাইসব। আমাদের শিল নোড়া দিয়েই আমাদের দাঁতের গোড়া ভাঙে পাষণ্ডেরা। দেখে রাখো ভালো ক'রে।'

ধীরে ধীরে হাত উঠিয়ে রীবিনের মাথায় মৃদু আঘাত করে লোকটা!

প্রায় আর্তনাদ ক'রে ওঠে পুলিশ-কর্তা : 'ও কি রকম হ'ল রে, কুত্তীর বাচ্চা?'

ভিড়ের মধ্য থেকে কার হাঁক শোনা যায় : 'এই নিকিতা, ধম্ম ভুলিসনি যেন!'

নিকিতার ঘাড় ধ'রে চীৎকার করে সাহেব : 'মার বলছি, মার!'

কিন্তু নীচু হ'য়ে ঘাড় ছাড়িয়ে নিয়ে এক ধারে স'রে যায় নিকিতা। নীচু স্বরে বলে : 'ঢের করেছি, আর না।'

'কি?'

সাহেবের মুখের ওপর দিয়ে যেন দমকা আগুন ছুটে যায়। মাটিতে পা আছড়ায় রাগে, মুখে তুব্‌ড়ীর মত গাল ছোটে। মাতালের মত টলতে টলতে রীবিনের দিকে ছুটে যায়। একটা ঘুষির আওয়াজ শোনা যায়, তার পরেই মথা ঘুরে প'ড়ে যায় রীবিন। হাতটা ওঠাতে চেষ্টা করে কিন্তু আরেকটা ঘুষি এসে একেবারে শুইয়ে ফেলে ওকে। পুলিশ সাহেবের এলোপাথাড়ি লাথি এসে পড়ে ওর মাথায়, বুকে, পিঠে, পাঁজরে—সর্বত্র।

জনতার মধ্যে ক্রোধের গুঞ্জন ওঠে। মারমুখো হ'য়ে তারা এগোয়। লক্ষ্য করে সাহেব। তলোয়ারটা বোঁ বোঁ করে ঘোরাতে ঘোরাতে লাফ দিয়ে পেছনে স'রে যায়।

'য়্যাঁ? বিদ্রোহ? বিদ্রোহ? হুঁ, আচ্ছা...'

ওর স্বর কাঁপে। মুখে কথা সরে না। হঠাৎ সমস্ত শক্তি উবে যায়। মাথাটা নেতিয়ে প'ড়তে চায়। চোখ অন্ধকার। পা দিয়ে আঁচ ক'রে ক'রে পেছনে সরতে থাকে।

মোটা ধরা গলায় চীৎকার ক'রে বলে : 'যা নিয়ে যা ওকে। আমি চলে যাচ্ছি। জানিসনে বেজম্মারা যে ও এক রাজনৈতিক গুন্ডা! জানিসনে তোরা ও জারের বিরুদ্ধে মানুষ খ্যাপাচ্ছে? আর তোরা এসেছিস ওর পক্ষ নিতে? তোরাও বিদ্রোহী, তাহ'লে, য়্যাঁ!'

মা ভয়ে স্থির মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। পলক অবধি পড়েনা; চিন্তাও করতে পারছেনা কিছু, করবার শক্তিও নেই। জনতার উন্মত্ত, ক্রুদ্ধ চীৎকার, পুলিশ-সাহেবের ভাঙা গলার খন্‌খনে আওয়াজ, তার সাথে কার যেন ফিস্‌ফিস্ মিশে মায়ের কানে ক্রুদ্ধ ভীমরুলের

'যদি দোষী হ'য়ে থাকে—আদালতে পাঠান।'

'হুজুর মালিক, দয়া করুন.'

'এরকম অত্যাচার কোন আইনে নেই।'

'যা বলেছ, ভায়া। তাহ'লে সবাই তো মারবে কথায় কথায়। মন্দ হবে না...'

দু'দল হয়ে যায় জনতা। একদল পুলিশ সাহেবকে ঘিরে রীবিনের জন্য কাকুতি মিনতি করে। আরেকটা ছোট দল রীবিনকে ঘিরে গজর গজর করে। তাদের চোখে-মুখে হিংস্রতা। রীবিনকে তুলতে চেষ্টা করে ওরা পুলিশ আসে ওর হাত বাঁধতে। ওরা চীৎকার ক'রে ওঠে :

'দাঁড়া, পাজীরা! অত তাড়াহুড়ো কিসের!'

দাড়ি চোখ মুখ থেকে ধুলো রক্ত মুছে চারদিকে চায় মিখাইলো। মায়ের দিকে চোখ পড়ে। মা চমকে উঠে ওর দিকে ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু চোখ ফিরিয়ে নেয় রীবিন। কয়েক মিনিট পর আবার যেন মায়ের মুখখানা খুঁজে ফেরে ওর দৃষ্টি। মায়ের মনে হয়, ও সোজা হ'য়ে মাথা টান ক'রে দেখতে চেষ্টা করছে ওকে। ওর রক্তাক্ত গাল দুটো থির্‌থিরিয়ে কাঁপছে।

'চিনেছে আমায়, চিনেছে। সত্যি চিনতে পেরেছে!' মা ভাবে।

মা মাথা নুইয়ে সম্ভাষণ জানায়। কি এক বিপুল আকাঙ্ক্ষায় মায়ের সারা সত্তা শিহরিত। পরের মুহূর্তেই খেয়াল হয় লাল-চোখ চাষীটি রীবিনের পাশে দাঁড়িয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে আছে। আশংকায় বুক কেঁপে ওঠে। ভাবে: 'কি করছি বোকার মত? আমিও তো ধরা প'ড়ব!'

রীবিনকে কি জানি বলে চাষী। রীবিন মাথা নেড়ে উত্তর দেয়:

'হোক না!' গলা কাঁপছে, কিন্তু স্পষ্ট পরিষ্কার স্বর, ভয়লেশহীন। 'আমি তো একা নই দুনিয়ায়। সারা দুনিয়ার সত্যকে পাকড়ে নিয়ে জেলে পুরতে তো আর পারবেনা। যেখানে যেখানে গেছি, সবাই আমাকে মনে রাখবে। আমাদের নীড় যদি ভেঙেও ফেলে, সব কম্‌রেড্‌দের যদি..' মা ভাবে তাকেই বলছে রীবিন।

'...কিন্তু দিন আসবে হে, দিন আসবে। সেদিন আগল ভেঙে মুক্ত আকাশে ডানা মেলবে ঈগল পাখী। হাত-পায়ের শিকল ভেঙে সোজা হ'য়ে দাঁড়াবে মানুষ।'

একজন স্ত্রীলোক জল এনে মিখাইলোর মুখ ধুইয়ে দিতে লাগল, আহা উহু করতে করতে। মিখাইলোর কথার তলায় তার গলার স্বর ডুবে যায়, মা একটা কথাও বুঝতে পারে না। পুলিশ সাহেবকে সাথে নিয়ে একদল লোক এ'ল। কে একজন চেঁচিয়ে উঠল:

'একটা গাড়ী নিয়ে এসেছে, কয়েদীকে নিয়ে যাবার জন্য। কার পালা আজ?'

পুলিশ সাহেব কথা কইল এবার। এ যেন একেবারে নূতন স্বর—ধীর গম্ভীর:

'আমি তোকে ধরে মারতে পারি, কিন্তু আমার গায়ে হাত তোলার হিম্মত আছে তোর রে কুত্তা?'

'তাই নাকি?' রীবিন চীৎকার ক'রে বলে। 'নিজেকে কি ভাব শুনি? বিধাতা-পুরুষ?'

একটা চাপা উল্লাস ফেটে পড়ে। রীবিনের চীৎকার ডুবে যায়।

'কার সঙ্গে মুখোমুখি করছ, ভাই? উনি যে কর্তাদের স্যাঙ্গাৎ! জান না?'

হুজুর! ওর মাথার ঠিক নেই। ওর ওপর রাগ-মন্যি করবেন না।'

'চোপরাও বেয়াকুফ!'

'তোমাকে এখন শহরে নিয়ে যাবে ভাই।'

'আমাদের এই পাড়াগাঁয়ের মত নয়। সেখানে আইন আছে।'

জনতার চীৎকার নরম হয়ে এসেছে; এখন যেন সন্ধির পথ খোঁজে! একটা অস্ফুট গুঞ্জনের তলায় ডুবে যায় সব। পুলিশেরা রীবিনকে হাত ধ'রে তুলে ওকে দপ্তরবাড়ীর বারান্দায় নিয়ে যায়। সেখানে ওকে রেখে ওরা দরজা দিয়ে হাওয়া হ'য়ে যায়। ধীরে ধীরে চাষীরা চলে যায়। মা লক্ষ্য করে নীল-চোখো লোকটা ওদিকেই আসছে মার দিকে তাকাতে তাকাতে। পা দুটো যেন ভেঙে পড়ছে। নৈরাশ্যে কলজেটা অবধি শুকিয়ে যায়। বার বার ন্যক্কার আসতে চায়।

মা মনে মনে ভাবে : 'না না আমি যাবনা, যাবনা এখান থেকে।' রেলিংটা শক্ত ক'রে ধ'রে প্রতীক্ষা করে।

দপ্তরবাড়ীর বারান্দায় দাঁড়িয়ে পুলিশ-সাহেব হাত নেড়ে নেড়ে গালাগাল দেয়— আবার ঝিমিয়ে প'ড়েছে স্বর, সেই বর্ণহীন, নিষ্প্রাণতা।

'কুত্তীর বাচ্চা কহীঁকা! বেয়াকুফ! তোদের এর মধ্যে মাথা গলান কেনরে? এসব সরকারী ব্যাপার। যার কাজ তারে সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে। পাজি, নচ্ছারের দল! জানিস্! ইচ্ছে হ'লে তোদের এই ভেড়ার পালকে পাল ধ'রে কালা-পানি ঠুকতে পারতাম! মরতিস্ ঘানি ঘুরিয়ে। আমি যাই ভালোমানুষ তাই তোদের সাথে ভাল ব্যবহার করেছি, কোথায় পায়ে লুটিয়ে মাথা কুটবি, না যত সব ইয়ে!'

জন চব্বিশ পঁচিশ চাষী খালি মাথায় দাঁড়িয়ে কথা শুনছিল। আকাশে মেঘ জমেছে, ভুঁইয়ে মেঘের আঁধার। নীল-চোখ মানুষটা গাড়ী বারান্দায় মার পাশে এসে দাঁড়াল।

'দেখলে তো সব কাণ্ড!' বলে মাকে।

'দেখলাম তো।' মা নীচু স্বরে বলে।

মায়ের চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে শুধায় মানুষটা : 'তা এখানে কি করতে এসেছিলে গো, মেয়ে?'

'আমি চাষী-মেয়েদের কাছ থেকে লেস, কাপড় কিনি।'

নীল-চোখ আস্তে আস্তে দাড়িতে হাত বুলোয়। বলে :

'হেথা তো আমাদের মেয়েরা ওসব করে না।'

মা ওর সর্বাঙ্গে চোখ বুলিয়ে দেখে। কোন ফিকিরে যে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকবে, সেই হদিসে আছে মা। ভারী সুন্দর দেখতে মানুষটা; চিন্তাশীল মুখ, চোখ দুটো বিষাদ-ভরা। এই এতখানি লম্বা, চওড়া কাঁধ; গায়ের জামাটায় তালি, ধবধবে সুতী-কাপড়ের সার্ট আর বাদামী রঙের ঘরে-বোনা কাপড়ের পাৎলুন পরা। জুতো জোড়া শত-ছিন্ন।

কেন জানি একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে মা। হঠাৎ বলে ফেলে : 'রাতে আমায় একটু থাকতে দেবে গা!' এতক্ষণ উপায় হাতড়ে বেড়াচ্ছিল মা। চিন্তাটা দানা বাঁধবার আগেই সহজ বুদ্ধিতে বেরিয়ে এল কথাটা।

এ প্রশ্ন যে করে বসবে একটুও ভাবেনি মা। তাই ব'লে ফেলেই চিন্তাটা ওর উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠল। সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মানুষটার দিকে। কিন্তু মনের মধ্যে যেন বিঁধতে লাগল কাঁটার মত : 'সর্বনাশ হয়ে যাবে আমারই জন্য নিকলাই ইভানোভিচের। পাভেলকেও দেখতে পাবনা কতদিন কে জানে। কত মার না জানি মারবে আমায়।'

চাষী মাটি থেকে চোখ তুললেনা, কোটের বোতামটা লাগাতে লাগাতে মাথা নীচু ক'রেই ধীরে আস্তে জবাব দিলে :

'রাত্তিরে থাকবার জায়গা? আলবৎ! তবে কিনা গরীবের কুঁড়ে।'

'আমি আর কোন্ রাজপ্রাসাদে থাকি,' মা বলে।

'বেশ, তাহ'লে আর কি!' মাথা তুলে মাকে নিরীক্ষণ করে চাষী। আঁধার হয়েছে গাঢ়। সাঁঝের আলো-আঁধারিতে ওর মুখটা ফ্যাকাশে দেখায়, চোখ জ্বলে একটা হিম জ্বালায়।

মা যেন পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ছে। কেমন একটা লাগে মনের মধ্যে। নীচু স্বরে বলে : 'চল তাহ'লে। আমার বাক্সটা একটু নিয়ে যাবে?'

'নেব বৈকি!'

কোটটা ঠিক করতে করতে কাঁধটা উঁচু ক'রে বলে :

'এই যে গাড়ী আসছে!'

গাড়ী-বারান্দায় রীবিনের মূর্তি দেখা যায়। ওর মাথা, মুখ কিছু দিয়ে জড়ান, হাত আবার বাঁধা হয়েছে।

হিম প্রদোষের বায়ুমণ্ডলে রীবিনের স্বর কাঁপে : 'বিদায় বন্ধুগণ! সত্যকে তালাশ করো। বড় জবর জিনিষ। যত্ন ক'রে রেখো। খাঁটি কথা যে ব'লবে তাকে বিশ্বাস ক'রো। সব ডালি দিয়েও সত্যকে রেখো, ভাই সব!'

পুলিশ-সাহেব চেঁচিয়ে ওঠে : 'চোপরাও! এই সিপাহী, উল্লু কহীঁকা, লাগাও চাবুক ঘোড়াকে।'

'নিজেদের পানে একবার চাও তো! কি আছে খোয়াবার?' গাড়ী চলতে আরম্ভ করে। দুইদিকে দুই সেপাই, মাঝখানে রীবিন। সেখান থেকেই চেঁচিয়ে বলে :

'কেন উপোস ক'রে ধুঁক্‌তে ধুঁক্‌তে মরবে! বাঁধন খসাও, দোস্ত সব! রুটি পাবে, রুটির সাথে পাবে ইমান। এই হ'লো কথা। আচ্ছা বিদায়, বিদায়, ভাই!'

চাকার ঘর্ঘর, ঘোড়ার পায়ের শব্দ আর পুলিশ সাহেবের চীৎকারে ডুবে যায় ওর কণ্ঠ!

হাত নেড়ে চাষী ব'লে : 'বস্, শেষ।' তারপর মায়ের দিকে ফিরে অত্যন্ত নীচু স্বরে বলে : 'একটু থাক, এখানেই থেকো কিন্তু, আমি এলাম ব'লে।'

মা ঘরের মধ্যে গিয়ে সামোভারের সামনের চেয়ারটায় বসে। এক টুক্‌রো রুটি হাতে তুলে নিয়ে, খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া ক'রে আবার যথাস্থানে রেখে দেয়। আবার ঠেলে বমি আসে ভেতর থেকে। কিছু খেতে পারলে না। বিশ্রী গরম লাগছে, রক্ত শুকিয়ে কলজেটা যেন খালি হ'য়ে গেছে; মাথা ঘুরছে। চোখের সামনে নীল-চোখ লোকটার চেহারা ভাসছে...অদ্ভুত মুখ! ওটা গড়তে গিয়ে কি যেন বাকী থেকে গেছে! দেখলেই সন্দেহে ভ'রে যায় মনটা। ধরিয়ে দেয় যদি! না, ভাববে না, ও কথা মা! কিন্তু মনের মধ্যে কথাটা উঁকি মারছে কখন থেকে। শুধু উঁকি মারছে না—বুকের ওপর নিশ্চল হ'য়ে ব'সে আছে চেপে।

দুর্বল চিন্তা ওঠে : 'আমায় লক্ষ্য করেছে লোকটা! ঠিক বুঝতে পেরেছে!'

কিন্তু আর বেশীদূর এগোয় না চিন্তাটা। দেহের অসুস্থতা, আর মনের অবসাদে সব গুলিয়ে যায়।

কয়েক মুহূর্ত আগে প্রচণ্ড কোলাহল। তারপর এই কঠিন নিস্তব্ধতা। সারা গাঁ খানা যেন ভয় আর অত্যাচারের আশংকায় থম্‌থম্ করছে। একাকীত্বের অনুভূতি তীব্র হ'য়ে ওঠে। ভস্মের মত ধূসর কোমল, এক প্রদোষের ছায়া নেমে আসে চিত্তের আকাশে।

মেয়েটি আবার দেখা দেয় এসে দোর-গোড়ায়।

'ডিম-ভাজা এনে দি?' শুধায়।

'না গো না, তুমি ব্যস্ত হয়োনা। একটুও খেতে ইচ্ছে করছেনা। যা চ্যাঁচামেচি, বাবা! আমায় ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল।'

মেয়েটি টেবিলের কাছে এসে চাপা গলায় বলে :

'বাপ্‌রে বাপ্‌ কি মারটাই পুলিশ সাহেব ওকে মারলে! যদি দেখতে গো! আমি কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলুম কিনা! ক'টা দাঁত অবধি ভেঙে গেছে। নিজের চোখে দেখলাম, রক্ত ফেলল মুখ থেকে! কি ঘন রক্ত আর কি গাঢ় লাল রং...। চোখ দুটো ফুলে গেছে ওই এতখানি হয়ে। আলকাতরার কারখানায় কাজ ক'রে লোকটা। ছোট সাহেবটার কাণ্ড জান? কি গেলাই গিলেছে! ওপরে গড়াগড়ি দিচ্ছে এখন মাতাল হ'য়ে। তবু আরো মদ চাইছে। বলে কি জান? মস্ত নাকি একটা দল আছে সেই ওদের। ওই দাড়ি-ওয়ালাটা নাকি দলের চাঁই। তিনজনকে নাকি ধ'রেছিল, একটা পালিয়ে যায়। একজন ইস্কুল-মাস্টারও নাকি ওদের দলে আছে, সেও নাকি ধরা পড়েছে। ওরা নিজেরা ভগবান-টগবানে বিশ্বাস করে না। অন্যদেরও বিধর্মী বানাবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। য়্যাঁ, সে কি কথা গো! কোনদিন জানি গির্জা সুদ্ধু লুট করবে! আমাদের চাষীদের মধ্যে কারো কারো ভারী দুঃখু হয়েছে ওর জন্য। আবার কেউ কেউ বলছে কি জান? পাজীটাকে সাবড়ে দিল না কেন একেবারে? কি ছোটলোক বলতো? কিন্তু জানো, আমাদের মধ্যে অনেকেই এমনি!'

হড়বড়িয়ে কত কি যে আবোল তাবোল বকে চলেছে মেয়েটি। নিবিষ্ট-চিত্তে শোনে মা, মনটা একটু অন্য দিকে থেকে তবু ডর ভয় চলে থাকবে। এমন একজন শ্রোতা পেয়ে মহা খুশি মেয়েটি। উত্তেজিত ভাবে অত্যন্ত চাপা গলায় অনর্গল বকে চলেছে ও :

'আমার বাবা বলে কি জান? ফসল কম হয়েছে তো, তাই নাকি এমন-ধারা সব হচ্ছে। দু দুটো বছর এক দানা ফসল হয়নি। জমি শুকিয়ে ফেটে চৌচির। ঐ জন্যই নাকি আমাদের মুজিকরা এমন কুচুটে হচ্ছে। গাঁয়ের সভা-সমিতিতে অবধি গিয়ে ওরা মারামারি করে। এই ধর না ভাসুকভের কথা। দেনা শোধ করতে পারেনি বলে ওর জমি বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছিল; হঠাৎ করলে কি, গাঁয়ের মোড়লকে ধরে মুখের ওপর এমনি এক চড় কষায়! বলে কিনা, এই আমার দেনা শোধ করলাম!'

বাইরে ভারী বুটের শব্দ শোনা যায়। মা শক্ত ক'রে টেবিলটা ধরে উঠে দাঁড়ায় সোজা হ'য়ে। নীল-চোখ চাষী এসে ঢোকে টুপী না খুলেই; মাকে বলে :

'কই গো তোমার বাক্স-প্যাঁটরা কই?'

অবলীলায় উঠিয়ে নিয়ে ঝাঁকাতে লাগল বাক্সটা।

'খালি! মার্কা! মহিলাকে আমার বাড়িটা দেখিয়ে দাও তো!' বলেই বেরিয়ে গেল মুজিক। পেছনে তাকাল না। মেয়েটি জিজ্ঞাসা করে

'আজ রাত্তিরে থাকবে এখানে?'

'হুঁ, লেস কিনতে এসেছি। লেস কেনা-বেচাই করি কিনা।'

মেয়েটি বলে : 'কিন্তু লেস তো হয়না এখানে! তিনকোভা আর দারিয়ানায় হয়।'

'কাল যাব ওখানে।' মা বলে।

চায়ের দাম মিটিয়ে দিয়ে, মার্কাকে তিনটি কোপেক বকশিস্‌ দেয় মা। মার্কা ভারী খুশি হ'য়ে ওঠে। দুজনে বাইরে আসে। মেয়েটি খালি পায়েই ভেজা মাটির ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে।

'যদি বল তো কাল দারিয়ানায় গিয়ে সবাইকে এখানে লেস নিয়ে আসতে ব'লে দি। তোমায় আর যেতে হবেনা কষ্ট ক'রে। নেহাৎ কম দূর নয় কিন্তু। বারো ভার্স্ট।...'

মাকে প্রায় ছুটতে হয় ওর সঙ্গে সঙ্গে। বলে : 'না গো, বাছা, অত হাঙ্গাম

করতে হবেনা তোমায়।' ঠাণ্ডা হাওয়ায় অনেকটা আরাম বোধ করে মা। অস্পষ্ট একটা শপথ ধীরে ধীরে রূপ নেয় ওর আত্মার গভীরে। ধীরে ধীরে আরো বড় হ'য়ে ওঠে। কিন্তু অস্পষ্টই থেকে যায়।

মা অস্থির হয়ে ওঠে, কি করলে নিরবয়ব সেই ছায়া রূপ ধরবে। ভাবে : 'কি করা যায় এখন? আচ্ছা...সব যদি খুলে বলি...'

চারদিকে কনকনে ঠাণ্ডা, অন্ধকার আর ভেজা ভেজা। কুঁড়ে ঘরগুলোর জানালা লালচে আলোয় রাঙ্গা দেখাচ্ছে। চারদিক স্তব্ধ ও মাঝে মাঝে একটু আধটু চীৎকার, আর গরু ভেড়ার ডাক শোনা যায়। আঁধার গ্রামখানা যেন কি এক ক্লিষ্ট ধ্যানে মগ্ন।

'এই যে এসে গেছি। কিন্তু থাকতে তোমার খুব কষ্ট হবে। বড্ড গরীব কিনা ওরা!'

হাতড়ে হাতড়ে দরজাটা খোলে। তারপর ঘরের মধ্যে মুখ বাড়িয়ে চীৎকার ক'রে ডাকে :

'তাতিয়ানা মাসী!'

তারপর দৌড়ে পালিয়ে যায়। অন্ধকারের মধ্যে ভেসে আসে : 'চল্লাম!'

সতের

চৌকাঠ পেরিয়ে ভেতরে ঢোকে মা। চোখে হাতের আড়াল দিয়ে ভালো ক'রে দেখে ঘরখানা। ছোট্ট একটুখানি ঘর; কিন্তু কি পরিষ্কার। ঝকঝকে তকতকে। অবাক হ'য়ে গেল মা। অল্পবয়সী একটি মেয়ে এক কোণে ষ্টোভের পাশে বসেছিল। একবার একটুখানি তাকিয়েই সে মাথা নাড়ল। একটিও কথা কইলনা।

টেবিলের ওপর একটা বাতি জ্বলছে। বাড়ীর কর্তা টেবিলে ব'সে অস্থিরভাবে টেবিলের ওপর টোকা মারছিল। মা আসতে তার দিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে চায়। কয়েক মুহূর্ত পরে মাকে ডেকে এনে ঘরে বসায়। তারপর সেই স্ত্রীলোকটিকে বলে : দৌড়ে যাও তো পিওতরের কাছে। খুব তাড়াতাড়ি আসবে কিন্তু।'

মায়ের দিকে না তাকিয়েই স্ত্রীলোকটি বেরিয়ে গেল। মা একটা বেঞ্চি টেনে গৃহকর্তার সামনে এসে বসে। তাকায় চারদিকে। সুটকেসটাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। ঘরখানা নিঝুম। মাঝে মাঝে শুধু বাতিটা থেকে ফর্‌ফর্‌ শব্দ ওঠে। মায়ের চোখের সামনে লোকটার বিরক্ত উদ্বিগ্ন মুখখানা দুলতে থাকে। অস্পষ্ট একটা দুশ্চিন্তা ঠেলে উঠতে থাকে মনের মধ্যে।

হঠাৎ জিজ্ঞাসা ক'রে বসে মা : 'আমার সুটকেস কোথায়?' অনর্থক এত চেঁচিয়ে উঠল মা যে নিজের গলা শুনে নিজেই অবাক হয়ে গেল।

কাঁধ নাচিয়ে মুজিক বলে : 'হারাবে না গো, হারাবে না। মেয়েটাকে শোনাবার জন্য ইচ্ছে করেই তখন বলেছিলাম—ওটা খালি। বাপ্‌স্‌! খালি!! পাঁচমণী পাথর!

'ভারী হবে না তো কি হবে?' মা বলে।

উঠে মায়ের কাছে এসে চাপা স্বরে শুধায় সে :

'ও মানুষটা বুঝি চেনা হয় তোমার?'

প্রশ্ন শুনে অবাক হ'লেও বেশ জোরের সঙ্গেই জবাব দেয় মা :

'চিনি!'

ছোট্ট কথাটি। কিন্তু যেন এক ঝলক আলো। সব পরিষ্কার হ'য়ে গেল। বুকের তলা থেকে সব কিছু একেবারে আলোয় আলো হয়ে গেল। আরামের নিশ্বাস ফেলে মা বেঞ্চিতে গুছিয়ে বসল।

খিলখিল করে হেসে উঠল মুজিক।

'হোথা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ইসারা করে জানি বললে সে মানুষটাকে। সেও ঠারে ঠুরে তোমায় জবাব দিল। দেখিনি বুঝি আমি? তখনই তো তার কানে কানে শুধালাম : ঐ গাড়ীবারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে—চেন তুমি?'

ওর মুখের কথা লুফে নিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রে মা : 'তা কি বলল সে?'

'বললে যে, কত লোকই তো আছে আমাদের'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মায়ের দিকে চায় মুজিক, আর হাসতে হাসতে আবার বলতে আরম্ভ করে : 'কি জবরদস্ত মানুষ রে বাবা! কি বুকের পাটা! ব'লে দিলে—সব আমিই করেছি! কি মারটাই খেল—কিন্তু ওর কথা ও বলবেই!'

ওর গলা শুনে, মুখ আর সবল চোখ দুটি দেখে মা ক্রমশ আশ্বস্থ হয়। ওর স্বরটায় জোর নেই। সংশয়ের দোলায় যেন দুলছে। মুখখানাকে ওর অসম্পূর্ণ মনে হয়েছিল মার। ক্রমশ মার সব ভয় ডর কেটে যায়। রীবিনের জন্য বুকটা টন্‌টন্ করতে থাকে।

হঠাৎ রেগে ওঠে মা : 'পাষণ্ড, জানোয়ার সব!' কাঁদতে থাকে রাগে। চাষী উঠে স'রে যায়। অব্যক্ত ব্যথায় সে শুধু মাথা নাড়তে থাকে।

'কর্তাদের জন্যই তো মানুষ ওদের দিকে ভিড়ছে সব!'

আবার মায়ের দিকে ফিরে শান্তভাবে বলে চাষী : 'খবরের কাগজ আছে তোমার সুটকেস্‌এ—কেমন ঠিক বলেছি কিনা বল।'

মা চোখ মুছে, সবল ভাবে বলে : 'আছেই তো! ওর কাছেই নিয়ে যাচ্ছিলাম।'

ভুরু কুঁচকে চাষী মুঠি করে নিজের দাড়ি ধ'রে কোণের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অনেকক্ষণ পরে বলে :

'ওরা এখানেও এসেছিল। ওই লোকটাকে চিনি—দেখেছিলাম একবার। বই পত্তরও পেয়েছিলাম।'

থেমে সেকেণ্ড খানেক কি যেন ভাবে। তারপর শুধায় :

'এটা নিয়ে—মানে সুটকেসটা নিয়ে কি ক'রবে ঠিক করেছ এখন?'

যেন হুমকি দিয়েই বললে মা :

'কেন? তোমাদের কাছে রেখে যাব।' প্রতিবাদ করে না চাষী, অবাকও হ'য়েছে ব'লে মনে হয় না। শুধু মায়ের কথাটাই পুনরাবৃত্তি করে : 'আমাদের কাছে!'

সমর্থন-সূচক মাথা নেড়ে টেবিলে ব'সে ব'সে দাঁড়িতে নিলি কাটে।

রীবিনের ওপর যে অমানুষিক অত্যাচার নিজের চোখের ওপর দেখেছে সেই ছবিই মনের মধ্যে ওলটপালট্ হ'তে লাগল। একটি মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারে না। যেন গেঁথে আছে বুকের পরতে পরতে! সব ভাবনা ছাপিয়ে ডুবিয়ে কেবল রীবিনের সেই মূর্তিখানা জেগে থাকে। এ যে সমগ্র মানবতার অপমান; মানুষের এত বড় অপমানে, মানুষের জন্য অসীম বেদনায় মার সমস্ত অনুভূতি জর্জরিত। সুটকেসটার কথা বা অন্য কোন কিছু ভাবতে পারছে না আর। অঝোরে

চোখের জল ঝরছে। বলে :

'মানুষকে ওরা এমনি ক'রে শুষে ভিখিরি বানিয়ে দেয়? জুলুম ক'রে যে মেরে ফেলে গো! সর্বনাশ হোক্, জাহান্নামে যাক ওরা। চিরকাল নরকে পচে মরুক!'

মুখ কঠিন...স্বর অবিচলিত।

'কিন্তু ওদের যে ভারী জোর, অনেক বেশী জোর!' চাষী বলে।

'কিন্তু জোরটা তারা পায় কোথায় শুনি! সে তো আমাদের এই সাধারণ মানুষদের কাছ থেকেই না পায়! আমাদের সবই তো শুষে নিয়েছে ওরা।'

চাষীর মুখ উজ্জ্বল, কিন্তু কি যেন রহস্য খেলছে। মা চটে যায় দেখে।

'হুঁ', চিন্তিত ভাবে টেনে টেনে বলে লোকটা, 'চাকা...'

হঠাৎ চকিত হ'য়ে দরজার দিকে কান পাতে। বলে : 'আসছে সব।'

'কারা?'

'দুষমন নয় মনে হ'চ্ছে...'

আর একজন চাষীকে নিয়ে ওর বৌ ঘরে ঢুকল। টুপীটা এক কোণে ছুঁড়ে ফেলে গৃহ-কর্তার সামনে এল লোকটা।

'তারপর?' জিজ্ঞাসা করে।

গৃহ-কর্তা মাথা নাড়ে।

স্টোভের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল বৌ, সেখান থেকেই বললে : 'স্তেপান, আমাদের অতিথি কিছু খাবে টাবে না গো!'

মা বলে . 'না বাছা, আজ আর খাবনা কিছু।'

দ্বিতীয় চাষী মায়ের সামনে এসে ভাঙা গলায় তাড়াতাড়ি ক'রে বলে :

'আমার নাম পিয়োত্‌র্ ইয়েগরভ রায়াবিনিন। ডাকে 'অল' ব'লে। তোমাদের কাজকর্ম একটু আধটু বুঝি। লিখতে পড়তেও জানি একটু। আর খুব একটা ভেবড়ে যাওয়ার ছেলে নই...'

মায়ের বাড়ান হাতখানা শক্ত ক'রে ধ'রে গৃহকর্তার দিকে ফিরে বলে :

'দেখেছ তো, স্তেপান! ভারভারা নিকোলায়েভ্‌না। মানুষ তো মন্দ নয়, মনটা নরম সরম আছে। কিন্তু বলে কি জান? এসব নাকি বাজে কাজ, হুজুগে চ্যাংড়ারা আর ছাত্তররা সব ছাইভস্ম দিয়ে নাকি মানুষগুলোর মগজ ঘুরিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু আজ স্বচক্ষে তুমি আমি দেখলাম, ধ'রেছে তো এক চাষার ব্যাটাকে—ষোল আনার ওপর আঠার আনা চাষা, ভালো মানুষ বেচারা। তারপর এখন এই মাঝ-বয়সী মেয়েমানুষটি...চেহারায় তো ভদ্দর লোক টোক মালুম হয় না. .হাঁগা! কিছু মনে করো না, তা তোমার বাপ দাদা কি ছেল গা?'

কথাগুলো ওর দ্রুত, স্পষ্ট। দম না নিয়ে এক নিশ্বাসে ব'লে যায়। দাড়ির গোছা থেকে থেকে কাঁপে; দৃষ্টি দিয়ে মায়ের মুখ আর সর্বাঙ্গ তালাশ করে। শতছিন্ন কাপড় পরনে; মাথার চুলে জটা বেঁধেছে—যেন এই মাত্র যুদ্ধ জিতে, শত্রুর নিপাত ক'রে খুশিতে নাচতে নাচতে ফিরে এল। ওর তেজ দেখে মায়ের বড় ভালো লাগল। আরো ভালো লাগল, ওর কথার মার-প্যাঁচ নেই, মনের কথা সহজ কথায় সরল ক'রে ব'লে ফেলে। মা হাসিমুখে ওর দিকে তাকিয়ে ওর কথার জবাব দেয়। আর একবার মায়ের হাত-ঝাঁকানি দিয়ে শুক্‌নো খন্‌খনে আওয়াজে হাসতে থাকে। বলে :

'এ তো সোজা কথা, স্তেপান! চমৎকার কাজ! আমি বলিনি, আমাদের সাধারণ মানুষদের মধ্য থেকেই আসছে সব। সেই ভদ্দর মহিলা। সে তো আর কিছু সত্যি কথা শোনায়নি তোমাদের! সে বুকের পাটা কোথায়! বিপদ ছিল যে। কিন্তু ছেদ্দা ভক্তি আমি তেনাকে—করি বৈকি! বেশ ভালো লোকটি, আমাদের সাহায্য করতে চায়, অবশ্যি খুব বেশী একটা কিছু নয়। একটু আধটু, নিজের গা বাঁচিয়ে যতটা হয়। আর আমাদের মত সাধারণ লোকেরা, গা বাঁচান টাচান তারা জানে না; ভয় ডর নেই, গোত্তা মেরে সোজা ছুটবে সামনে তারপর যা হয় হোক, জান থাকুক আর যাক। বুঝলে তো তফাৎটা' সারা জীবন তারা লোকসানের কড়িই গোনে; যাতে হাত দেয় তাতেই লোকসান, যাবার ঠাঁই, দুটো কথা কওয়ার ঠাঁই নেই। যেখান দিয়েই যাক, খালি একটা কথাই শোনে—এই রোকো! সামনে পা বাড়াতে পারে না..।'

স্তেপান মাথা নেড়ে ওর কথার পিঠেই বলে : 'সুটকেসটার জন্য ভারী ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছেন ইনি।'

যেন জানে ব্যাপারটা, এমনি চোখের ভঙ্গি ক'রে মায়ের দিকে চেয়ে বলে পিয়োত্‌র : 'ভেবো না গো, মা! সব ঠিক হ'য়ে যাবে। তোমার প্যাঁট্‌রাটা আমার বাড়ীতে আছে। আমায় ও বললে এসে তখন তোমার কথা—আমাদের দলের মানুষ বুঝি রে! ওই যে ধরা পড়েছে—ও লোকটাকে চেনে চেনে লাগছে। আমি তখন বললাম, সাবধান গো! এসব ব্যাপারে হুট্‌ ক'রে গিয়ে প'ড়ো না। তা তোমারও তো সন্দ হ'য়েছিল আমাদের ওপর—সেই যখন তোমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম! তবে ভালো মানুষ দেখলেই চেনা যায়। সে তো আর এমন শ'হাজারে নেই। সুটকেস্‌টার জন্য ভাবনা করো না '

মা'য়ের পাশেই ব'সে পড়ে। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আবার বলে :

'ওগুলো যদি বিলুতে টিলুতে চাও, তবে আমরা ব্যবস্থা ক'রতে পারি। বইপত্তরগুলো পেলে আমাদেরও কাজ হয়।'

স্তেপান বলে : 'আমাদের কাছেই রেখে যেতে চাইছেন সব।'

'তোফা! তোফা, মা! সব ঠিক সামলে রেখে দেব।' হাসতে হাসতে লাফিয়ে উঠে ঘরময় পায়চারি ক'রতে শুরু ক'রে দেয়।

'এত ভাগ্যি! কোথায় পাওয়া যায় এত ভাগ্যি' কিন্তু অবাক হবারও কিছু নেই। দড়ি এক খানে ছেঁড়ে তো আর এক খানে জোড়ে। বেশ, বেশ, মা! বেশ। বড় ভালো খবরের কাগজখানা। অনেক উপকারে আসে। মানুষের চোখের ঠুলি খসিয়ে ছাড়ে। ভদ্দরলোকেরা এসব নিয়ে মাথা টাথা ঘামায় না। এখান থেকে মাইল কয় দূরে এক ভদ্দর মহিলার কাছে ছুতোরের কাজ করি আমি। বেশ মানুষ। মাঝে মধ্যে তার বইটইগুলো পড়তে দেয়। এক একসময় প'ড়তে প'ড়তে এমনি জিনিষ মেলে যে সত্যি চোখ খুলে যায়। একদিন আমাদের কাগজখানা নিয়ে গিয়েছিলাম। আঁৎকে উঠলে। ব'ললে কি—ওরে পিওতর, ওসব পড়িস্‌ টড়িসনি যেন। যত সব আজেবাজে মাথা মুণ্ড লিখেছে বাউণ্ডুলে ইস্কুলের ছোঁড়ারা। বিপদে পড়বি শেষটায়। জেল টেল হবে; দেবে ঠেলে সাইবিরিয়ায়—দেখিস্‌ তখন...'

খানিক চুপ ক'রে থেকে আবার শুধায় :

'ওই লোকটা—ওই যে ধরল গো আজ, তোমার কেউ হয় বুঝি?'

'না।'

পিওতর নিঃশব্দে হাসে আর মাথা নাড়ে। কি একটা নিয়ে যেন বড্ড খুশি হ'য়ে উঠেছে ও। পর মুহূর্তেই মায়ের মনে হয় রীবিনের আত্মীয়তা অস্বীকার ক'রে তাকে অপমান ক'রল। শুধরে বলে :

'না আত্মীয় ঠিক নয়। অনেক দিন থেকেই জানি। ঠিক বড় ভাইয়ের মত দেখি।'

ঠিক মনের ভাবটি বোঝাবার মত কথা খুঁজে পায় না মা। অসহ্য ব্যথায় আবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করে। ক্লিষ্ট স্তব্ধতা ঘরের মধ্যে কিসের সম্ভাবনায় থম্‌কে আছে। মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে পিওতর, যেন শুনছে কিছু। টেবিলে কনুই ভর দিয়ে ব'সে স্তেপান অস্থিরভাবে আঙুল দিয়ে টোকা মেরে যাচ্ছে টেবিলটার ওপর। স্টোভের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওর বৌ একদৃষ্টিতে মায়ের দিকে চেয়ে। বাদামী ধাঁচের রোদে-পোড়া মুখখানা বৌ-এর, টিকলো নাক, কাটা-কোঁদা থুতনি। ফিকে সবুজ তীক্ষ্ণ অভিনিবিষ্ট দুই চোখ।

নরম সুরে পিওতর বলে : 'তোমার বন্ধু! আশ্চর্য মানুষ। কারুর মতো নয়; ও নিজের মতোই নিজে। যত রাজ্যের সব ঝুঁকি নিজের মাথায় নেবে। একটা মানুষের মত মানুষ! য়্যাঁ তাতিয়ানা? তুমি না ব'লেছিলে...'

ছোট্ট মুখখানার ছোট্ট ঠোঁট দু'খানি চেপে মাঝখানেই ব'লে ওঠে তাতিয়ানা : 'বিয়ে থাওয়া ক'রেছে?'

মা বিষণ্ণভাবে বলে : 'ক'রেছিল, বৌ ম'রে গেছে।'

'হুঁ, ঐ জন্যই অত কেরামতি।' গভীর ভরা গলায় বলে তাতিয়ানা। 'বৌ থাকলে আর ওসব চলে না। তখন ভয়ডর আসে।'

ফোঁস ক'রে ওঠে পিওতর : 'কি বললে? আমি? আমি বিয়ে করিনি বুঝি?'

ওর চোখের দিকে না তাকিয়ে দুষ্টুমির হাসি হেসে বলে তাতিয়ানা : 'ওরে বাস্‌রে! কত কাজ ক'রছেন তিনি! কি করছ শুনি? শুধু তো কথার আণ্ডিল। আর মাঝে মধ্যে বইয়ের পাতা ওল্টাও। ঘরের মধ্যে ব'সে যত গুজ্‌গুজ্‌ তোমাদের—এতে লোকের কোন হিতটা হয় শুনি?'

ওর বিদ্রূপ শুনে আহত হয় পিওতর। শান্তভাবে বলে :

'কত লোক আমার কথা শোনে জান? অমন ক'রে ব'লো না।'

স্তেপান নীরবে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে মাথা নীচু করে। তাতিয়ানা শুধায় : 'চাষীর ছেলেরা বিয়ে করে কেন বলতো? বুক ফুলিয়ে বলেন আবার গতর খাটিয়ে গেরস্তির কাজ ক'রবে, ঐ জন্যই তো বৌ ঘরে আনা। লাজ লাগে না বলতে?'

স্তেপান ঝিমুন স্বরে বলে : 'তোমার বুঝি মন ওঠেনি?'

'কি আছে যে মন উঠবে? খেটে খেটে হাড় কালি, তাও আধপেটার বেশী খাওয়া জুটবে না একটা বেলা। তবু দিনমান ঐ জোয়ালেই জুতে থাক—পেটের শত্তুরগুলোর দিকেও তাকাবার ফুরসুৎ নেই।'

মায়ের পাশে ব'সে পড়ে ব'লতে থাকে; স্বরে না আছে নালিশ, না দুঃখ :

'দুটো বাচ্চা হ'য়েছিল এই পোড়া পেটে। একটার বয়স যখন বছর দুই—একদিন ফুটন্ত জলের হাঁড়ির মধ্যে উল্টে প'ড়ে ওটা গেল। আর একটা মরাই হয়েছিল পুরো মাসের আগেই। কেন? ওই খেটে খেটেই তো? কি সুখটা জুটলো আমার ভাগ্যে, শুনি! ঐ জন্যেই তো বলছি চাষা-ভূষোর বিয়ে-থাওয়া কত্তে নেই।

মিথ্যে পায়ের বেড়ী। নইলে তো দিব্যি ঝাড়া হাত পায়ে, এই আমাদের মানুষের মত বাঁচার লড়াইয়ে নামতে পারে, কাজকম্ম যেমন ইচ্ছে করতে পারে। ঠিক বলিনি গো, মা?'

'ঠিক ব'লেছ', মা বলে। 'খাঁটি কথা বলেছ মা লক্ষ্মী। নইলে জীবনটা এমনি এঁদো ডোবা হ'য়েই থাকবে চিরকাল...'

'তোমার সোয়ামী আছে তো?'

'সে চলে গেছে। একটা ছেলে আছে...'

'তোমার কাছে থাকে না?'

'না, জেলে।' মা বলে :

টের পায় মা, ছেলের কথায় নিজের কলজের ঘাটা কাঁচা হ'য়ে ওঠে বটে কিন্তু তার সাথে পুত্র-গর্বে বুকটা ফুলে ওঠে।

'এই নিয়ে দু'বার জেল খাটা হ'ল ছেলেটার-কেন জান? দেবতার সত্যকে মানুষের বুকে বিছিয়ে দিয়েছে বলে। ওই হ'ল তার অপরাধ। কাঁচা বয়েস গো, আর কি সুন্দর, চালাক চতুর, সোনার ছেলে আমার। ওই তো বার করেছে তোমাদের ওই কাগজ। ওর মগজেরই কাজ। মিখাইলো ইভানোভিচের বয়স তো তার ডবল। কিন্তু আমার ছেলেই তো বুঝিয়ে শুনিয়ে এই পথে টেনে আনলে তাকে। আর কি, মামলার দিন তো এ'ল বলে—কি সাজা যে হবে ছেলেটার। দেবে ঠেলে সাইবিরিয়ায়। কিন্তু তাকে কি সেথা আটকে রাখতে পারবে ভেবেছ? পালিয়ে এসে আবার তোমাদের দশজনার সাথে কাজে লেগে যাবে।'

বলতে বলতে আরো ফুলে ওঠে মায়ের বুক। মাতৃগর্বে মানসলোকে পুত্র হ'য়ে ওঠে এক মহাযজ্ঞের মহাহোতা। অন্তরের প্রেরণায় শব্দের রং দিয়ে তার মানস-মূর্ত্তি রচনা করে মাতৃ-হৃদয়। তা ছাড়া অমানুষিকতার যে বিকট কালো রূপ আজ চোখের সামনে দেখেছে মা—ওঃ, সেই ভয়ংকরের, নির্লজ্জ নিষ্ঠুরতার ছবি এখনও মস্তিষ্কের মধ্যে কাঁপছে সেই কালোর ভারসাম্য রাখবার জন্য আলোর প্রয়োজন ছিল মায়ের। যা কিছুকে পবিত্র ব'লে, খাঁটি ব'লে জেনে এসেছে মা, আপনার অজ্ঞাতসারে, আপন পুত-হৃদয়ের টানে তারা সব এক সাথে হ'য়ে এক মহান শিখায় জ্বলে ওঠে। তার তীব্র জ্বালায় মায়ের চোখ ঝলসে যায়।

'ওর মত অনেক মানুষ আছে; আরো জন্মাচ্ছে দিনে দিনে। যত দিন বেঁচে থাকবে তারা লড়েই যাবে সত্যের জন্য, মানুষের মুক্তির জন্য।'

কথার আগল খুলে যায় মায়ের। জনগণের মুক্তির জন্য যে গুপ্ত আন্দোলন চলেছে তার সম্বন্ধে যা কিছু জানা ছিল খেয়ালশূন্য হ'য়ে সব ব'লে গেল কথার ঝোঁকে। অবশ্যি নাম ধাম বললে না কারো। একান্ত প্রিয়-জন যারা, তাদের কথা বলতে গিয়ে মায়ের মুখের ভাষা ভালোবাসা আর আবেগে উচ্ছল হ'য়ে ওঠে। জীবনের কঠিন সংঘাতে মায়ের বুকের এই ভালোবাসা, এই শক্তি কত দেরীতেই না বিকাশের পথ পেয়েছে। নিজের মনের আবেগে উজ্জ্বল আর মহিমান্বিত হয়ে মনের পটে মানুষগুলোর ছবি ফুটে ওঠে।

'দুনিয়া জুড়ে প্রতিটি শহর-বন্দরে এই মুক্তি আন্দোলনের কাজ করছে সাচ্চা মানুষেরা। এ কাজের মধ্যে কি কোন সীমা-পরিসীমা, হিসেব-কিতেব আছে? যতই দিন যাচ্ছে ততই জোর বাড়ছে এর...আরো আরো বাড়বে...বেড়েই চলবে, যতদিন না লড়াইয়ে আমরা জিতি...'

কণ্ঠে দ্বিধা নাই, জড়িমা নাই, সমান লয়ে ব'য়ে চলেছে! মুখর মায়ের আজ আর কথা হাতড়াতে হয় না, কথার দল আপনি এসে ধরা দেয়। সারা দিনের যত ধুলো রক্তের ক্লিন্নতা হ'তে মুক্ত হয়ে সহজ হ'তে চায় মা। সেই তীব্র আকাঙ্ক্ষার সুতোয় রঙ্গীন কথা দুলিয়ে কথার মালা গাঁথে মা। পাথরের মূর্তির মত স্থির হ'য়ে শোনে মানুষগুলো। মায়ের চোখে তাদের চোখ বাঁধা। পাশে ব'সে তাতিয়ানা হাঁপায় উত্তেজনায়—মা শোনে তার দ্রুত-নিশ্বাসের শব্দ। যে বিশ্বাসের বলে এতক্ষণ এত কথা ক'য়েছে মা, এই সবে মিলে সেই বিশ্বাসের মূলে শক্তিসঞ্চার করে; যে-অঙ্গীকার এই মানুষগুলোর সামনে তুলে ধ'রেছে, অন্তরের বিশ্বাসই বলে দেয় মিথ্যে নয় সে-অঙ্গীকার...

'যে যেখানে আছ সব্বাই এস...যারা এক দিনও সুখের মুখ দেখনি; দুঃখে কষ্টে অভাবে জ্বলে-পুড়ে যারা শেষ হ'য়ে যাচ্ছ...ধনীর আর ধনীর নফরদের শোষণে যারা মাটির ধুলোয় মিশে আছ...এস, সবাই এস; কোনো দিকে না চেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়। মানুষের দুঃখ ঘোচাবার জন্য যারা জেলের আঁধারে তিলে তিলে মরছে, পাষণ্ড-দের হাতে অমানুষিক অত্যাচার সইছে, এস, তাদের সাথে হাত মেলাও। নিজের দিকে চায়নি তারা, নিজের ব'লে কিছু রাখেনি—দুনিয়ার মানুষের সুখের পথ তালাশ করতে বেরিয়েছে তারা বৈরাগী হ'য়ে। কাউকে ঠকায়নি, ঠকাতে চায়নি। খোলা-খুলি বলেছে—এ বড় শক্ত পথ! কাউকে তারা জোর করে টেনে আনেনি। কিন্তু একবার যে এসেছে, আর সে পেছন ফেরেনি, কেননা সে যে দেখেছে এখানেই সত্য, এই খাঁটি পথ, এ ছাড়া আর পথ নেই।'

সত্য-প্রচার করতে নেমেছে মা নিজেই। দিন গুনছিল এতদিন। সেই কাজটুকু ক'রতে পেয়ে মা আনন্দে বিহ্বল আজ।

'সরল তোমরা; ওদের সাথে যেতে ভয় পেও না। ক্ষুদ কুড়ো পেয়ে খুশি হবার মানুষ নয় ওরা। যতদিন না সমস্ত পৃথিবী থেকে লোভ, শোষণ, ধোঁকাবাজী একেবারে শেষ হ'য়ে যাবে ততদিন ওরা থামবে না। কারু কাছে মাথা নোয়াবে না। শুধু যেদিন সমস্ত জনতা এক হয়ে কণ্ঠ মিলিয়ে বলবে, আমিই রাজা, আমিই প্রভু; আমাদের আইন আমরা করব—সে আইন সকলের জন্য সমান হবে। সেই দিন সে সেই রাজ-জনতার সামনে মাথা নোয়াবে।'

ক্লান্ত হ'য়ে থেমে যায় মা। চারদিকে চায়। বোঝে, এতক্ষণকার কথাগুলি ব্যর্থ হয়নি।

মা থামে কিন্তু ঘরের মধ্যেকার মানুষগুলো তার দিকে তাকিয়েই থাকে। চোখে মুখে যেন কিসের প্রত্যাশা! পিওতর হাত দুটো আড়াআড়ি ক'রে বুকের ওপর রেখে চোখ কোঁচকায়। ওর ঠোঁটের ওপর একটা মৃদু হাসি খেলে বেড়ায়। স্তেপানের একটা কনুই তখনও টেবিলের ওপর। তার সমস্ত দেহটা উদগ্র ভঙ্গিতে সামনের দিকে ঝুঁকে আছে, মনে হয় এখনও শুনছে সে। ওর মুখের ওপর একটা কিসের ছায়া পড়েছে, ফলে মুখের সেই অসম্পূর্ণ ভাবটুকু নেই। হাঁটুর ওপরে কনুই ভর দিয়ে, মাথা নীচু ক'রে মায়ের পাশেই বসে ছিল ওর বৌ।

ধীরে ধীরে বেঞ্চিতে ব'সে প'ড়ে বলে পিওতর : 'বুঝলে তো সব?'

স্তেপান সোজা হ'য়ে ব'সে বউর দিকে তাকায়। দুই হাত বাড়িয়ে দেয় যেন ঘরশুদ্ধ লোককে আলিঙ্গন ক'রতে চাইছে।

'একবার যদি ও কাজ আরম্ভ কর, তবে আর ছাড়তে পারবে না। দিন রাত্তির

ভুলে ওই নিয়েই ডুবে থাকতে হবে...'

পিওতর লজ্জিতভাবে বলে : 'নিশ্চয়ই! পেছন ফেরা নেই।'

স্তেপান ব'লে যায় : 'মনে হ'চ্ছে মস্ত বড় ব্যাপার!'

পিওতর জুড়ে দেয় : 'তা তো ঠিকই! দুনিয়া জোড়া কাজ!'
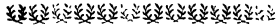
আঠার
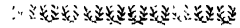
মাথাটাকে পেছন দিকে হেলিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে ব'সে ওদের কথাবার্তা শোনে মা। তাতিয়ানা একবার উঠে চারদিকে চায় তারপর আবার ব'সে পড়ে। দৃষ্টিতে গভীর অসন্তোষ আর তাচ্ছিল্যভরে ও চাষীদের দিকে চায়। ওর সবুজ চোখদুটো একটা হিম দীপ্তিতে জ্বলছে। হঠাৎ মায়ের দিকে ফিরে শুধায় :

'জীবনে তুমি মেলাই কষ্ট পেয়েছ, না গা?'

'তা পেয়েছি বৈকি!' মা বলে।

'তোমার কথা শুনতে আমার বড় ভালো লাগে। কলজের শিরাগুলোকে ধ'রে যেন টান মারে। কি মনে হয় জান? এই তুমি যাদের কথা বলছ—বড় নাকি দয়ামায়া তাদের—যদি এই চক্ষু দু'টো দিয়ে একবার একটুখানি দেখতে পেতাম! জীবনটার চেহারাখানাও একবার দেখতে ইচ্ছে হয়। সব দিয়েও যদি দেখতে পারতাম! জীবনের কতটুকুই বা আমাদের মত মানুষের এখানে আছে, আর কতটুকুই বা তার দেখলাম! চারধারে তো যত ভেড়ার পাল। এই আমার কথাই ধর না; একটু আধটু লিখতে প'ড়তে জানি। পড়িও বই। অনেক ভাবি। ভাবতে ভাবতে এক এক সময় রাত্তিরে ঘুম হয় না। কিন্তু কি লাভটা হচ্ছে তাতে? কিছুই, না। তবু ভাবি ব'লেই আছি; ঐটুকু যদি না করি তা হ'লে আর কি, খতম! যটুকুন আছে তাও মিছিমিছি। আর ভেবেও বা কি হ'চ্ছে' সেও তো অমনি মিছিমিছিই।'

তাতিয়ানার চোখে ব্যঙ্গ। এক এক সময় মনে হয় কথাগুলোকে সুতোর মত করে যেন কামড়ে কামড়ে ছেঁড়ে। পুরুষেরা চুপচাপ বসে আছে, একটি কথাও ওদের মুখে নেই। জানালার সার্শিতে ঘা মেরে, ছাদের খড়গুলোকে নাড়া দিয়ে, চিমনির মধ্যে কোমল সুরে শিস দিয়ে হু হু ক'রে বাতাস ব'য়ে চলেছে। কোথায় একটা কুকুর ডাকছে। মাঝে মাঝে এক আধটা অনিচ্ছুক বৃষ্টির ফোঁটা জানালায় এসে লাগছে। ঘরের বাতিটা কাঁপতে কাঁপতে এক একবার প্রায় নিভে যায়, আবার উজ্জ্বল হ'য়ে উঠে স্থির শিখায় জ্বলতে থাকে।

'তোমার কথা শুনে মনে হয় ফেলনা নয় এই জীবনটা। এটারও দাম আছে। আর কি আশ্চর্য জানো? শুনতে শুনতে মনে হয়েছে, আমি তো এ সবই জানি! কিন্তু কখনও কারো কাছে শুনিনি এমনি কথা; আর আমারও ধারণা ছিল না যে...'

ভ্রূ কুঁচকে ধীরে ধীরে স্তেপান বলে : 'তাতিয়ানা, চল, কিছু খেয়ে নিয়ে বাতিটা নিবিয়ে দেওয়া যাক্। লোকেরা ভাববে চুমাকভের বাড়ীতে আজ এত রাত্তির

অবধি বাতি জ্ব'লছে কেন! আমাদের কিছু হবে না। তবে এই মানুষটার যদি কিছু হয়...'

তাতিয়ানা উঠে স্টোভের কাছে যায়। পিওতর একটু হেসে বলে :

'তা যা ব'লেছ! একটু সাবধানে গা বাঁচিয়েই চলতে হবে। কাগজগুলো বিলি হ'য়ে যাক্ না একবার, দেখো...'

'আমার কথা ভাবছি না, আমায় ধ'রলে বিশেষ কিছু আসবে যাবে না।'

তাতিয়ানা টেবিলের কাছে এসে বলে :

'সরো।'

ও উঠে একধারে দাঁড়িয়ে বৌয়ের টেবিল সাজান দেখে।

'তা তোমার আমার মত মানুষের আর দাম কি দাদা! আমরা কড়িতেও বিকুই না।' ব্যঙ্গের হাসি হেসে স্তেপান বলে।

মায়ের বড় কষ্ট হয় মানুষটার জন্য। বড় ভালো লেগেছে ওকে; যতই দেখে ততই ভালো লাগে । এতক্ষণ কথা বলার পর সারা দিনের গ্লানিটা কেটে গেছে মায়ের মন থেকে, নিজেকেই ভালো লাগছে নিজের, সকলের জন্য দরদে মনটা ভরে উঠেছে। বলে :

'ভুল করছ বাবা! রক্ত-শোষা ডাকাতেরা কানা-কড়িরও দাম দিলে না ব'লে তাই মেনে নেবে নাকি? নিজের দাম তোমরা নিজেরা ঠিক ক'রবে—ঠিক ক'রবে তোমাদের দোস্তরা; দুষমনেরা নয়—ভেতরে কি বস্তু আছে, দাম যাচাই হবে সেই হিসেবে।' মা বলে।

'দোস্ত? দোস্ত আবার আছে নাকি আমাদের?' চাপা বিস্ময়ের সুরে বলে স্তেপান। 'হুঃ, দোস্ত! রুটির টুকরোটি সামনে প'ড়লে তো কামড়াকামড়ির অন্ত নেই।'

'কিন্তু, বলছি আমি, বিশ্বাস কর বাবা, আমাদের এই সাধারণ মানুষের বন্ধু আছে।'

'তা হবে, কিন্তু এখানে নেই। সেই তো হ'লো কথা।' চিন্তিতভাবে স্তেপান বলে।

'তা বন্ধু জোটাও এখানে!'

কিছুক্ষণ ভেবে জবাব দেয় স্তেপান : 'হুঁ! তাই করা দরকার।'

তাতিয়ানা ডাকে : 'ব'সো সব। খাবার তৈরী।'

মায়ের কথাবার্তা শুনে পিওতর এতক্ষণ অভিভূতের মত ছিল। এখন আবার হাসিখুশি হ'য়ে উঠল। বলল :

'খুব সকালে উঠেই পালাতে হ'বে গো, মা! নইলে কোথা দিয়ে কার বা নজর প'ড়বে। শহরে যেওনা, পরের ঘাঁটিতে গিয়ে ঘোড়ার গাড়ী নিও।'

স্তেপান বলে : 'তা কেন? আমি নিয়ে যাব গাড়ী ক'রে।'

'না, তা হবে না। কক্‌খনও যাবে না তুমি। তারপর যখন শুধোবে, মেয়ে-মানুষটা রাত্তিরে ছিল? বলতে হবে, হাঁ ছিল। তা গেল কোথায় এখন? না, আমি দিয়ে এসেছি পরের ইস্টিশানে তুলে! তারপর যখন হাঁকবে, শালার তুমিই ওর সাকরেদ? চল শালা জেলে। তখন কি হবে? সাত তাড়াতাড়ি জেলে গিয়ে ব'সে থাকলে কোন পরমার্থটা লাভ হবে শুনি। সময় মত হবে সব। সময় হ'লে জারকেও তো মরতে হবে। কাজেই বলছি যেও-টেও না। খোঁজ তালাশ হয়, বাস্

ব'লে দেবে, রাত্তিরে ছিল বৈকি। ভোরে উঠেছে, নিজেই গাড়ী ঠিক ক'রেছে, চলে গেছে। সদর রাস্তার ওপর গাঁ, কত লোকই তো রোজ আসছে যাচ্ছে থাকছে। কে তার হিসেব নিকেশ রাখে।'

বিদ্রূপের স্বরে তাতিয়ানা বলে : 'এত ভীতুপনা শিখ্‌লে কোত্থেকে, পিওতর?'

'কাজ কত্তে হ'লে, তার ফন্দিফিকিরও শিখ্‌তে হয়গো, বৌ!' হাঁটুতে চাপড় মেরে বলে পিওতর। 'ভয়ে গত্তেও সেঁধুতে শিখতে হয়, আবার সময়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়াতেও শিখতে হয়। মনে আছে তো, সেবার খবরের কাগজ বিলোবার জন্য ভাগানভ কি ঠ্যাঙ্গানিটাই খেয়েছিল! দাও দিকিন একখানা কাগজ ওর হাতে আবার! হাজার টাকা দিলেও আর ওমুখো হবেনা। কিন্তু আমায় সে পাত্তর পাবেনা, মা। আমি দুঁদে শয়তান। কত কাগজ দেবে বল, সব একেবারে ঠিক ঠিক জায়গায় পাচার করে দিচ্ছি। হাঁ, এটা ঠিক, এখানকার মানুষেরা বেশীর ভাগ লিখতে পড়তে জানেনা, আর ভীতুর একশেষ। কিন্তু তাহ'লে কি হয়! চোখ বন্ধ ক'রে কদ্দিন থাকবে আর! এই সব বইয়ে খুব সাফ, সোজা কথায় লেখা আছে সব। খালি, দু'দণ্ড বসে ভাবনারে একটু! দেখ না দুয়ে দুয়ে কত হয়। এক এক সময় পণ্ডিতদের চেয়ে মুখ্যু লোকেরাই বোঝে বেশী। তার ওপরে যদি লেখাপড়া জানা বাবুদের পেটটি ভরা থাকল তো কথাই নেই। অনেক দেখা আছে আমার; এ তল্লাটে ঘুরি তো সবখানে। যাই হোক, বুদ্ধি শুদ্ধি ক'রে একটু মাথা খাটিয়ে কাজ করতে হবে। গোড়াতেই ধরা পড়লে চলবে কেন? কত্তারা আঁচ করেছেন– এই চাষী ব্যাটারা আর বাপের সুপুত্তুর নেই এখন; তেনাদের দেখলে দাঁত বের ক'রে হাসে না; পীরিতে গদগদ হ'য়ে ওঠে না। কোনদিন জানি লাঠি ধরবে মাথার ওপর। সে-দিন ওই পাশের গাঁয়ে—ওই স্মলিয়াকোভোতে কি হ'ল! ট্যাক্স নিতে এসেছিল। ডাণ্ডা নিয়ে রুখে উঠল সব চাষীরা। আর পুলিশ সাহেব! বাস্ তাকে আর পায় কে! অমনি খেঁকড়ে উঠলেন : কে রে কুত্তীর বাচ্চারা! শালা সব জারের বিরুদ্ধে! ছিল সেই চাষীর-ব্যাটা—স্পিভাকিন নাম—অমনি বুক চিতিয়ে এগিয়ে এসে বলল—মর ব্যাটা। গতর থেকে সুতোটি অবধি খসিয়ে নিলে, কেমন ধারা জার গো! মুখে আগুন অমন জারের! দেখলে তো মা! কদ্দুর গেছে সব! অবশ্যি স্পিভাকিনকে ওরা ছেড়ে দেয়নি; ধরে নিয়ে গারদে ঠুসেছে। তা স্পিভাকিন গেলে কি হবে— যে কথাগুলো মুখ থেকে ওর খসেছে, তা যে পেছন পানে ফেলে গিয়েছে। ছোঁড়াগুলো অবধি মুখস্ত করে রেখেছে সেগুলো। যখন তখন চিল্লায় ওই বলে। এমনি জল-জীয়ন্ত রয়েছে স্পিভাকিনের কথা!'

কিছু খেলেনা ও। কালো কালো দুষ্টুমিভরা চোখ দিয়ে চারদিকে সবার পানে গট্‌গটিয়ে চেয়ে চেয়ে বকর্ বকর্ ক'রে চলল। চাষীদের জীবন সম্বন্ধে ওর নিজের টিকা-টিপ্পনি ঝুরি ঝুরি শোনালে মাকে।

বার দুই স্তেপান ওকে থামিয়ে বললে : 'আরে বাপু, কথা ব'লো পরে, এখন দুটো খেয়ে নাও।'

তক্ষুনি রুটি-চামচ তুলে নিলে; কিন্তু হাতের রুটি হাতেই থাকে। পিওতরের গল্প চলে অঝোর ধারায়—এমনি সহজে এমনি অবলীলায়, যেন লার্ক পাখী গান গাইছে। খাওয়া শেষ হ'তেই লাফিয়ে উঠে বললে :

'রাত হয়েছে, চল্লাম। নমস্কার, মা!' মায়ের হাত-ঝাঁকানি দিতে দিতে বলে : 'আর হয়তো কোন দিন তোমার সাথে দেখা হবে না। কিন্তু মা, এই দেখাটা

হ'য়ে, তোমার কথা শুনে যে কি ভালোই লাগল, তা বোঝাতে পারছি না। আচ্ছা, কাগজ ছাড়া তোমার সুটকেসে আর কিছু আছে? একটা পশমী শাল? বুঝলে, স্তেপান? একটা পশমী শাল। ভুলোনা যেন। সুটকেসটা আর ওটা এক্ষুনি এনে দিচ্ছে ও। এস, স্তেপান! বিদায় মা। ভগবান তোমার ভালো করুন।'

ওরা চলে যায়। আরশোলাদের ছুটোছুটির শব্দ শোনা যায়। ছাদের ওপর বাতাসের মাতামাতি; চিমনির ফোকরে চলছে তার শোঁসানি। জানালার কাঁচে ঝির্-ঝিরিয়ে বৃষ্টি পড়ছে মিহি-ধারায়। স্টোভের ওপর থেকে কাঁথা কম্বল পেড়ে একটা বেঞ্চির ওপর মায়ের বিছানা করে দিলে তাতিয়ানা।

মা বলে: 'ভারী আমুদে মানুষ, না?'

'তা গলাবাজী আর কম কি? কিন্তু ওই পর্যন্ত।'

'তোমার সোয়ামী? কেমন মানুষ?' মা শুধায়।

'আছে ভালোমানুষটি। নেশা-টেশা নেই। মিলে-মিশেই আছি। কিন্তু বড় দুর্বল চরিত্তিরের মানুষ!'

সোজা হ'য়ে বসে তাতিয়ানা। একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলে:

'আমরা কি ক'রব এখন বলতো? বিপ্লব করা উচিত নয় এখন? নিশ্চয়ই উচিত। প্রত্যেকেই ওকথা ভাবছে। সবারই মনে মনে আছে কথাটা। কিন্তু শুধু মনে মনে থাকলে কি হবে! তা ছাড়া শুরু তো করতে হবে একজনকে...'

বেঞ্চির ওপর ব'সে পড়ে হঠাৎ ব'লে উঠল:

'তুমি বলছিলে না, তোমাদের ওদিকে ভদ্দর ঘরের মেয়েরা অবধি একাজে নেমেছে। তারা মজদুরদের সাথে মেলামেশা করে, তাদের প'ড়ে ট'ড়ে শোনায়। এসব কি তাদের যুগ্যি? ভয় লাগেনা ওদের?'

মায়ের জবাব শুনে গভীর একটা শ্বাস ফেলে তাতিয়ানা। তারপর মাথা নীচু ক'রে, মাটির দিকে তাকিয়ে ব'লে চলে:

'কোন কোন বইয়ে 'অর্থহীন জীবন' কথাটা পেয়েছি। খুব বুঝি ওটার মানে! ও আর বুঝিয়ে দিতে হয় না। অর্থহীন জীবন যে কেমন, তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। অর্থ আর থাকবে না কেন! খুব আছে। কিন্তু এমনি এলোমেলো, ছাড়া-ছাড়া হ'য়ে আছে। ঠিক যেন রাখাল ছাড়া ভেড়ার পাল। গুছিয়ে গেঁথে গুথে তুলবার কেউ নেই। একেই বলে মিথ্যে জীবন। সত্যি জীবন যে কি, বুঝতে পারলে অসহ্য লাগে। একদণ্ডও টিঁকতে ইচ্ছে করে না। ইচ্ছে হয় পালিয়ে যাই।'

মা বুঝতে পারে ও মেয়ের বুকের মধ্যে কি আগুন জ্বলছে। ওর কটা চোখের শুকনো জ্বালা, ওর রোগা মুখখানায় আর গলার স্বরে তার হল্কা আছে। ইচ্ছে করে মায়ের, ওকে একটুখানি আদর ক'রে সান্ত্বনা দেয়।

'কি ক'রতে হবে তা তো বুঝতেই পারছ, বাছা...'

'কিন্তু কেমন ক'রে, তা তো জানিনে!' কোমল স্বরে বলে তাতিয়ানা। 'তোমার বিছানা পাতা হ'য়েছে।'

স্টোভের কাছে গিয়ে স্থির গম্ভীর হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে ও গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে। কাপড় না ছেড়েই শুয়ে পড়ে মা। ক্লান্তিতে দেহ যেন ভেঙে যাচ্ছে। যন্ত্রণায় কাতর শব্দ বেরিয়ে পড়ে মুখ দিয়ে। বাতিটা কমিয়ে দিলে তাতিয়ানা। ঘর আঁধার হ'য়ে গেল। উত্তেজনাহীন চাপা স্বরে ব'লতে আরম্ভ করে ও। গলার

স্বর শুনে মনে হয়, ওই নির্বিকার অন্ধকারটা থেকে কি যেন মুছে নিতে চায় ও।

'তুমিও প্রার্থনা কর না দেখছি। ভগবান টগবান, আর তার যাদু আমি মোটেই বিশ্বাস করি না।'

অস্থিরভাবে এ-পাশ ও-পাশ ফেরে মা। তামসী রাত্রি একটা অতল কালো গহ্বরের মত মাকে গ্রাস ক'রবে বলে যেন জানালায় দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারের মধ্যে গুঁড়ি মেরে বেড়াচ্ছে স্তিমিত কথার দল। মা ভয়ে শিউরে ওঠে। বলে প্রায় ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে :

'ভগবানের কথা জানিনে। কিন্তু যীশুখৃষ্টকে তো বিশ্বাস না ক'রে পারিনে! তিনি যে ব'লেছেন—পাড়াপড়শীকে নিজের মত ক'রে ভালোবেসো।'

তাতিয়ানা নীরব। কালো স্টোভটার পটভূমিতে ওর ধূসর ঋজু মূর্তিখানির অস্পষ্ট অবয়ব-রেখা দেখতে পায় মা। স্থির নিশ্চল হ'যে দাঁড়িয়ে আছে তাতিয়ানা। গভীর দুঃখে চোখ বোজে মা। হঠাৎ শুনতে পায় :

'যে ভাবে আমার সন্তানরা ম'রেছে, ভগবান বল, মানুষ বল, কাউকে আমি ক্ষমা ক'রতে পারি না।' হিম জমাট-বাঁধা তাতিয়ানার কণ্ঠ।

উদ্বিগ্নভাবে উঠে পড়ে মা। কি আগুনে যে পাঁজর নিংড়ে অমন কথাগুলো বেরুল, তা বুঝতে বাকী থাকে না মায়ের। কোমল স্বরে বলে :

'তোমার এখনও কাঁচা বয়েস, আবার ছেলে হবে, ভাবছ কেন?'

তক্ষুনি কোন জবাব দেয় না তাতিয়ানা। তারপর ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে বলে :

'না। কি যেন হয়েছে আমার। ডাক্তার ব'লেছে আর সন্তান হবে না আমার।'

মেজের ওপুর দিয়ে একটা ইঁদুর ছুটে গেল। ধ্বনির অদৃশ্য বিদ্যুৎ চমকে নিস্তব্ধতার বুক চিরে কি যেন একটা ভেঙে গেল তীব্র শব্দ ক'রে। আবার বৃষ্টি পড়ে। ছাদের ওপর খড়ের মধ্যে জল-ঝরার রিম্‌ঝিম্‌—মনে হয় কার যেন ভয়-পাওয়া মিহি আঙুলের পরশ কাঁপছে শুক্‌নো খড়ের বুকে। মাটির বুকে টিপ্‌-টিপ্‌ করে বৃষ্টি ঝরার থম্‌থমে সুরে যেন মন্থর হৈমন্তী রাত্রির প্রহর গোণা চলছে।

তন্দ্রার ঘোরে বাইরে কার যেন অস্পষ্ট পায়ের শব্দ শুনতে পায় মা। আস্তে আস্তে দোরগোড়া পর্যন্ত আসে। অতি সন্তর্পণে দরজাটা খুলে কে জানি জিজ্ঞাসা করে :

'শুয়ে প'ড়েছ, তাতিয়ানা?'

'না।'

'উনি ঘুমিয়ে প'ড়েছেন নাকি?'

'মনে তো হ'চ্ছে।'

আলোটা জ্বলে ওঠে; সেকেন্ড খানেক কেঁপে উঠে আঁধারে নিষ্পিষ্ট হ'য়ে যায়। স্তেপান মায়ের বিছানার কাছে আসে; পায়ের ওপরকার কম্বলটা ঠিক ক'রে দেয়। সহজ সরল এই যত্নটুকু বড় ভালো লাগে মায়ের। মৃদু হেসে আবার চোখ বোজে।

স্তেপান নিঃশব্দে জামাকাপড় ছেড়ে ওপরের মাচানে উঠে শুয়ে পড়ে। চতুর্দিক নিঝুম হ'য়ে যায় আবার।

মা নিথর নিস্পন্দ শুয়ে শুয়ে নির্ভুল স্পষ্টতায় অন্ধকারের প্রহর-পরিক্রমার শব্দ শোনে। আর চোখের সামনে তার ভেসে ওঠে রীবিনের রক্তস্নাত মুখ।

মাচানের ওপরে নড়া-চড়ার শব্দ।

'দেখছ তো। বুড়ো বুড়ো লোকেরা সারা জন্ম খেটে আর দুঃখধান্দা করে হাড়

কালি করে কোথায় এখন দ্'দিন ব'সে গতর জ্বড়োবেন, না এই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। আর স্তেপান, তুমি জোয়ান মদ্দ মান্ষ...'

গভীর পরিপূর্ণ কণ্ঠে উত্তর দেয় স্তেপান :

'একট্ব ভাবতে দাও গো আগে...'

'ও তো এ্যাদ্দিন শ্বনে আর্সাছ...'

কয়েক ম্বহূর্ত পরে স্তেপানের কণ্ঠ শোনা যায় :

'দেখ, শ্বর্ব কি করে করব ঠিক ক'রে ফেলেছি। পয়লা আলাদা আলাদা করে ক'জনাকে বলব। যেমন ধর আলেকসি মাকভ—লেখাপড়া জানে, সাহসও আছে। হাকিম-টাকিমদের সাথে কথাটথা বলতে কইতে পারে। তারপর আছে সারগেই শোরিন—আমাদের এ ম্বজিক বড় চালাক লোক। ক্লিয়াজেভও আছে—খাঁটি মান্ষ, ভয় ডর একদম নেই। বস্ শ্বর্র পক্ষে এই ঢের। তারপর যে-সব লোকের কথা ঠাকর্বণ বললেন আমাদের, তাদেরও একট্ব হদিস্-নিরিখ কত্তে হবে। ভাবছি কি জান? একটা কুড়্বল কাঁধে ফেলে শহরে যাব, যেন কাঠ চেরাই ক'রে উপরি-পয়সা কামাতে এসেছি। একট্ব গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে তো! কি না বললে ঠাকর্বণ—নিজের দাম, নিজেই ঠিক করতে হবে। সেই মান্ষটা—ওই যাকে প্বলিশে ধরেছে গো—সেও ঠিক এ কথাই বলেছিল। কি মান্ষ, য়্যাঁ? একেবারে খোদ দ্বনিয়ার মালিকের কাছে নিয়ে যাও, তব্ ও ব্যাটা ভাঙবে তব্ব মচ্কাবে না। য়্যাঁ! বল দিকিন! আর শালা নিকিৎকা! পিত্তি বলে পদাথ নাই ওর।'

'তোমাদের এতগ্বলো মান্ষের এতগ্বলো নাকের ডগায়, একটা মান্ষকে মারতে মারতে শ্বইয়ে দিলে, আর যত মরদ সব হাঁ ক'রে দেখলে!'

'ওই নিয়ে হেদিয়ে মরছ কেন? না ব্বঝে স্বঝে আমরাই যে ওকে ধ'রে ঠ্যাঙ্গাইনি, এ কি কম ভাগ্যি নাকি গো?'

অনেকক্ষণ ধ'রে বৌর সাথে চুপি চুপি কি কথা কয় স্তেপান। এক এক সময় এমনি আস্তে যে একটা কথাও ব্ঝতে পারেনা মা। আবার এক এক সময় বেশ জোরে জোরে কথা কয়। বৌ ধমকায় :

'জাগিয়ে ফেলবে যে ঘ্বমন্ত মান্ষটাকে!'

ঘন মেঘের মত জমজমাট ঘ্বমে আচ্ছন্ন হয়ে আছে মা।

তখনও ভোরের আলো ফোটেনি ভালো করে। গির্জার ঘণ্টায় সবে রাত্রিশেষের বোল ধরেছে। তাতিয়ানা মাকে ডেকে তুলে দিলে।

'সামোভারে আগ্বন দিয়েছি। একট্ব চা খেয়ে যাবে। যে ঠান্ডা বাইরে! বিছানা থেকে উঠেই তো বের্বতে হবে।'

জট-পাকান দাড়িতে বিলি কাটতে কাটতে মার ঠিকানা শ্বধায় স্তেপান। মায়ের মনে হয় রাতারাতি ওর চেহারা বদলে গেছে। অনেকটা যেন ভালো লাগছে দেখে। আগের আধ-খেঁচড়া ম্বখটা যেন এবার সম্পূর্ণ হয়েছে।

চা খেতে খেতে হেসে বলে স্তেপান : 'আশ্চর্য তো!'

তাতিয়ানা জিজ্ঞাসা করে : 'কি?'

'না, এই কি রকম ক'রে আমাদের পরিচয়টা হ'ল! কোন ঘটা না, কিচ্ছ্ব না!...'

মা কি যেন ভাবতে ভাবতে বলে :

'আমাদের সব কাজই অমনি। ঘটা পটার বালাই নেই।'

বিদায়ের ম্বহূর্ত আসে। স্তেপান ধীর সংযত। কথা কেউই বেশী বলে না,

অথচ মায়ের কোথায় কিসে আরাম হবে তাই নিয়ে সবাই অতি ব্যস্ত। হাজারো রকমে কত তার চেষ্টা।

গাড়ীতে ব'সে মায়ের মন বলে স্তেপান সত্যি কাজ আরম্ভ ক'রবে। ছুঁচোর মত অতি সাবধানে, চুপচাপ করে কাজ ক'রবে অনলস ভাবে। বৌয়ের কথার ধার, তার বাদামী চোখের আগুন ওকে চাঙ্গা রাখবে। যদ্দিন বেঁচে থাকবে, ওই সন্তান-হারা অভাগী কি তার মরা ছেলের হিংস্র শোক আর প্রতিশোধের জ্বালা ভুলতে পারবে?

মনে পড়ে রীবিনের কথা—সেই রক্ত, সেই মুখ, সেই জ্বলন্ত চোখ আর জ্বলন্ত কথা! কি অমানুষিক বর্বরতা গোটা মানুষটার বুকে চেপে আছে! একটা তিক্ত অসহায়তায় মায়ের বুকখানা কুঁকড়ে ওঠে। সারা রাস্তায়, ধূসর দিনের পটভূমিতে মিখাইলোর মূর্ত্তি রইল সম্মুখের দৃষ্টি জুড়ে। ছিন্নভিন্ন অঙ্গের বসন, ক্ষতবিক্ষত মাথা; পিছমোড়া ক'রে হাত বাঁধা; যে-সত্যের ধ্বজা ও বহন ক'রে চলেছে, সেই সত্যে গভীর বিশ্বাস আর রাগে অগ্নিগর্ভ সেই বলিষ্ঠ মূর্ত্তি! শ'য়ে শ'য়ে, হাজারে হাজারে, লক্ষে লক্ষে এমনি গ্রাম ধূলোর বুকে মিশিয়ে আছে এই পৃথিবীতে মনে হয় মায়ের : 'যেখানে ধূলোর তলার অগুন্তি মানুষ ন্যায়ের পথ চেয়ে গোপন প্রতীক্ষায় দিন গুনছে—আর হাজার হাজার মানুষ, সেখানে—মূক সবে, ম্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর বেদনার করুণ কাহিনী। কোন মতে ধুঁকে ধুঁকে বেঁচে আছে—কিছুর আশা রাখেনা, কোন নালিশ নেই।'

মার মনে হয় জীবন তো নয়—অচষা, পাহাড়ী জমি—আকুল আশায় পথ চেয়ে আছে, কবে লাঙ্গল হাতে চষবার মানুষ আসবে। দিকে দিকে ডাক পাঠাচ্ছে : 'কে কোথায় আছ ওগো মুক্ত মানুষ, সাচ্চা মানুষ! এস সত্যের বীজ, জ্ঞানের বীজ ছড়িয়ে দাও আমার এই মেলা বুকে। তোমার শ্রমের ধন শতগুণে ফিরিয়ে দেব আমি, দেখো!'

কালকের কথা মনে পড়ে। সার্থক হয়েছে দিনটা, সার্থক হয়েছে মায়ের মেহনত। বুকের মধ্যে আনন্দ উছলে ওঠে। লজ্জা পায় মা, অশান্ত বুককে দুই হাতে চেপে ধরে।

উনিশ

নিকলাই এসে দরজা খুলে দিলে—আলুথালু চেহারা, হাতে একখানা বই। আনন্দে প্রায় চীৎকার ক'রে ওঠে :

'আরে! এরি মধ্যে! ভারী চতুর মেয়ে তো!'

চশমার পেছনে ওর শান্ত ধীর চোখ দুটি মিট্‌মিট্ করে। স্নেহের হাসি হেসে মায়ের হাত থেকে জিনিষপত্র নামিয়ে নেয়। বলে :

'কাল খানাতল্লাশি ক'রেছে বাড়ী। আমায় ধরে নি বটে, কিন্তু তোমার জন্য বড় ভয় হচ্ছিল। তুমি ধরা পড়লে আর আমায় ছেড়ে দিতনা অবশ্য।'

উচ্ছ্বসিত হ'য়ে কথা ব'লতে ব'লতে খাবারঘরে নিয়ে যায় মাকে।

'আমার চাকুরিটি এবার আর থাকবে না। যাক্‌গে। কোন্ চাষীর ঘোড়া নেই,

হাত পা গ্নটিয়ে ডেস্কে ব'সে ওই গ্ননতে আর ভালো লাগে না।'

ঘরখানার দিকে তাকালে মনে হয় কোন গলিয়াথ্ এসে হঠাৎ-খেয়ালে ঘরের পাঁচিল ধ'রে রাম-ঝাঁকানি দিয়েছে। তাই অমন লণ্ড-ভণ্ড অবস্থা। দেয়ালের ছবি-গ্নলো সব মাটিতে ল্নটোচ্ছে; দেয়াল-ঢাকা কাগজ ফালি ফালি হ'য়ে ঝ্নলছে; এক জায়গায় মেজের কাঠ ওঠান, জানলার চৌকাঠ উপড়ে ফেলা। স্টোভের ছাই ছড়ান ঘরময়। মায়ের কাছে এ দৃশ্য নতুন নয়। কিন্তু নিকলাইয়ের ম্নখে আছে নতুন কিছ্ন—তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মা।

টেবিলের ওপর প'ড়ে আছে না-ধোয়া বাসনপত্র, ঠাণ্ডা সামোভার; চীজ্, মাংস অমনি ঠোঙ্গায় প'ড়ে, প্লেটে রাখেনি কেউ। টেবিলখানা বইয়ে, র্নটির ট্নকরোয় আর সামোভারের কয়লায় ঢাকা। মা হেসে ওঠে। নিকলাইও হাসে বিমর্ষভাবে।

'ওরাই সবটা করেনি কিন্তু। আমারও হাত আছে। ভাবলাম আবার তো আসবেই, তাই আর পরিষ্কার টরিষ্কার করিনি। যাক্‌গে—এবারে বল তোমার কথা। কেমন হ'ল সব শ্ননি।'

প্রশ্নটা প্রচণ্ড ধাক্কা দিল মায়ের ব্নকে। রীবিনের চেহারাটা আবার ভেসে উঠল চোখের সামনে। ছিঃ এতক্ষণ বলেনি ওর কথা। মা মরমে ম'রে যেতে লাগল। আসতেই বলা উচিত ছিল। নিকলাইয়ের দিকে একট্ন ঝ্ঁকে ব'লে যেতে লাগল ইতিবৃত্ত—একটি কথা বাদ না দিয়ে, শান্ত সংযত থাকার চেষ্টা ক'রে।

'ধরা পড়েছে সে...'

হঠাৎ যেন একটা প্রবল কম্পন ব'য়ে গেল নিকলাইয়ের ম্নখে।

'সত্যি ?'

হাতের ইসারায় ওকে থামিয়ে দিয়ে ব'লে যায় মা এমনি ভাবে যেন নিজের চোখের সামনে দাঁড়িয়ে দেখেছে এক নিরীহ মান্নষের ওপর স্বৈরতন্ত্রী নিষ্ঠ্নর অত্যাচার—তারি বির্নদ্ধে প্রতিকারের দাবী নিয়ে আজ স্বয়ং এসে দাঁড়িয়েছে মা ধর্মাধিকরণে। পাণ্ডুর ম্নখে, ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে শোনে নিকলাই। ধীরে ধীরে চশমাটা খ্নলে রেখে হাত ব্নলায় ম্নখে, যেন অদৃশ্য একটা মাকড়শার জাল এসে প'ড়েছে, তাকেই ম্নছে ফেলতে চায়।

হঠাৎ ওর ম্নখের প্রতিটি অবয়ব অত্যন্ত তীক্ষ্ম হ'য়ে ওঠে; গালের হাড় ওঠে খাড়া হয়ে; নাসারন্ধ্র কাঁপতে থাকে থর্‌থর্ ক'রে। ভয় পেয়ে যায় মা, এ ম্নর্তি আর কখনও দেখেনি ওর।

মায়ের বর্ণনা শেষ হয়। উঠে পড়ে নিকলাই; ম্নঠো-করা হাত দ্নটো পকেটে প্নরে অস্থির ভাবে ঘরময় পায়চারি ক'রে বেড়ায়। চাপা দাঁতের ভেতর দিয়ে বলে :

'সাধরাণ মান্নষ নয় সে। জেলে খ্নব কষ্ট হবে। এদের মত লোক সইতে পারেনা।'

মনের উত্তেজনা চাপতে গিয়ে ম্নঠো ওর শক্ত হ'য়ে ওঠে। ওর অবস্থা মা ব্নঝতে পারে। ওর মনের আগ্নন এসে ঠিকরে পড়ে মায়ের মনেও। নিকলাইয়ের কোঁচকান চোখের সর্ন ফাঁকটা ছ্নরির ফলার মত দেখায়। পায়চারি করতে করতে আবার বলতে আরম্ভ করে। ওর স্বর কঠিন।

'কি সাংঘাতিক! ক্ষমতা কায়েম রাখার অন্ধ নেশায় মত্ত হয়ে ম্নষ্টিমেয় ক'জন লোক দ্ননিয়া-শ্নদ্ধ মান্নষের ট্নটি টিপে এমন অকথ্য জ্নল্নম ক'রে যাবে! দিন দিন বেড়ে চলছে ওদের অত্যাচার! বর্বরতাই আইন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। ভাব দেখি একবার

অবস্থাটা! ওরা মানুষ মারে, বুনো জানোয়ারের মত যা খুশি তাই করে। কেন? না তারা যে আইনের বাইরে! জুলুম করার এই যে লোভ এ হলো ওদের ব্যাধি। দাসত্বের ব্যাধি। ওরা জন্ম-দাস। তাই দাস-মনোভাবের বিষ ছড়ায়। সুবিধা পেলেই ওদের পশুবৃত্তি বে-আব্রু হয়ে ওঠে। অনেকেরই মনে প্রতিহিংসার আগুন। কেউ কেউ জুলুমের চাবুক খেয়ে খেয়ে বোবা, পাথর হয়ে আছে। মানুষকে ওরা অমানুষ বানিয়ে রেখেছে। সমস্ত মানুষের চরিত্র নষ্ট হ'য়ে গেছে।'

থামে নিকলাই, দাঁত চেপে স্তব্ধ হ'যে থাকে।

'এই পশুসুলভ সমাজব্যবস্থায় বাধ্য হ'য়েই মানুষকে জানোয়ার হ'তে হয়।'

নীরবে কাঁদছে মা। উত্তেজনা দমন ক'রে প্রায় শান্তভাবেই চোখে অচঞ্চল দীপ্তি নিয়ে মার দিকে চায় ও।

'কিন্তু, নিলোভনা! সময় নষ্ট করলে তো চলবে না। তৈরী হ'য়ে নিতে হবে তো এবার...'

বিষণ্ণ হাসি হেসে মায়ের কাছে আসে। আবেগ ঢেলে মায়ের হাতখানা ধ'রে বলে: 'সুটকেসটা কোথায় তোমার?'

'রান্নাঘরে।'

'আমাদের বাড়ীর চারধারে স্পাই। সামান্য জিনিষও লুকিয়ে নিয়ে যাবার সাধ্য নেই। লুকিয়ে রাখব এমন জায়গাও নেই। আজ রাতে আবার আসবে তল্লাসী করতে, ঠিক জেনো। কাজেই যতই খারাপ লাগুক সব পুড়িয়ে ফেলা ছাড়া উপায় নেই।'

'সব! মানে?' শুধায় মা।

'সুটকেসে যা ছিল!'

এতক্ষণে বুঝতে পারে মা। এত দুঃখের মধ্যেও মুখে কৃতিত্বের হাসি ফোটে।

'এক টুকরো কাগজও নেই।' ধীরে ধীরে সামলে উঠে চুমাকভের সাথে সাক্ষাতের কাহিনী ব'লে যায় মা।

শুনতে শুনতে প্রথমটায় উদ্বিগ্ন হ'য়ে ওঠে নিকলাই। ওর কপাল কুঁচকে যায়। কিন্তু ক্রমশ উদ্বেগ কেটে, গভীর বিস্ময় ফুটে ওঠে। আর থাকতে পারে না ও, উত্তেজনায় মাঝখানেই চীৎকার ক'রে ওঠে:

'সাবাস্! করেছ কি? বরাত ভালো বলতে হবে!' মায়ের হাত চেপে ধরে চাপা উল্লাসের স্বরে:

'মানুষের ওপর একি অগাধ বিশ্বাস তোমার!...তুমি আমারও মা। মায়ের মতই ভালোবাসি তোমাকে।'

মৃদু হাসে মা। ভারী অবাক লাগে মায়ের। ভেবে পায়না, এ ছেলের এত আনন্দ, এত উত্তেজনা কিসের আজ!

'সত্যি, বড় সুন্দর। সত্যি চমৎকার! আমারও বড় চমৎকার কেটেছে গত কটা দিন। শ্রমিকদের মধ্যে কেটেছে সারা দিন—পড়ে শুনিয়েছি, ওদের সাথে কথা কয়েছি, আর নিরীক্ষণ ক'রে আশ্চর্যরকম পবিত্র একটা কিসে আমার মনটা কানায় কানায় ভ'রে গেছে। কি অদ্ভুত চমৎকার মানুষ যে ওরা, নিলোভনা, কি বলব! বিশেষ করে তরুণ শ্রমিকরা..., কি শক্তি! কি অনুভূতিশীল মন! আর জ্ঞানের কি অদম্য পিপাসা। ওদের দিকে তাকালেই, তোমার রাশিয়াকে মনে পড়বে। একদিন দুনিয়ার মধ্যে সব চেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দেশ হবে এই রাশিয়া!'

নিজের কথার সমর্থনে শপথ নেবার ভঙ্গিতে হাত ওঠায় নিকলাই। তারপর একটু থেমে আবার বলে :

'ঝর্‌ঝরে পুরানো বই আর আঁক নিয়ে প্রায় একটা বছর কাটিয়ে দিলাম। কি ব্যাপার! য়্যাঁ? অসহ্য! বরাবর মজদুরদের মধ্যে থেকে এসেছি। ওদের কাছ থেকে স'রে গেলেই আমার সব বিগড়ে যায়। মেজাজ খিঁচড়ে যায়। এবার আবার আমি খোলা আকাশে ডানা মেলব। ওদের মধ্যেই থাকব, কাজ করব। সারাক্ষণ ওদের দেখতে পাব। বুঝলে! ওই তরুণ বিশ্বকর্মাদের মধ্যে, ওদের নতুন মনের আলোয় নতুন করে জন্ম লাভ হবে আমার। আশ্চর্য সহজ সরল! ভারী সুন্দর! জাঁকজমক ঘোর-প্যাঁচ কিছ্‌ছু নেই। মস্ত প্রেরণা, বুঝলে? মানুষকে নতুন মানুষ বানিয়ে দেয়। ভারী বল পাওয়া যায় বুকে।'

একটু আত্মসচেতন ভাবে তৃপ্তির হাসি হাসে নিকলাই। মা বোঝে এ সুখ কিসের। ওর আনন্দে নিজেও আনন্দিত হ'য়ে ওঠে।

'আর তা ছাড়া', বলে নিকলাই উচ্ছ্বসিত হ'য়ে, 'তুমিও এক আশ্চর্য মানুষ! আশ্চর্য বোঝ মানুষকে! অদ্ভুত নিখুঁতভাবে মানুষের ছবি আঁকতে পারো তুমি।'

মায়ের পাশে এসে বসে নিকলাই। বিব্রত ভাবটা লুকুবার জন্য উচ্ছল মুখখানা ওপাশ ক'রে চুল ঠিক করতে ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে। মা তার জীবনের নানা অভিজ্ঞতার বিশদ ইতিবৃত্ত ব'লে যায় তার সহজ সরল ভঙ্গিতে। শুনতে শুনতে বিহ্বল হ'য়ে মুখ তোলে নিকলাই :

'অদ্ভুত কপালজোর তোমার।' উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে ও, 'জেলে যেতে যেতে বেঁচে গেছ।..বেশ বোঝা যাচ্ছে, কৃষকরাও জেগে উঠছে। তাতো হবেই। সেই মেয়েটি..মনে হচ্ছে একেবারে স্পষ্ট চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি...। গাঁয়ে কাজ চালাবার জন্য বেছে বেছে লোকের ওপর ভার দিতে হবে। লোক বলছি! ক'জনই বা আছে তেমন লোক! আমাদের যে শ'য়ে শ'য়ে দরকার!'

মা আস্তে আস্তে বলে : 'যদি পাভেল, আন্দ্রিয়েই থাকত এখন!'

নিকলাই মায়ের দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নেয়।

'হয়তো আমার মুখ থেকে একথা শুনে তোমার কষ্ট হবে : কিন্তু আমি পাভেলকে যতদূর জানি, জেল থেকে পালাতে সে রাজী হবে না। ও চায় ওর বিচার হোক; পূর্ণ মর্যাদা নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াবার সুযোগ চায় ও। সুতরাং এ সুযোগ কি ছাড়বে ও ভেবেছ? আর কেনই বা ছাড়বে! পালাতে হয় সাইবিরিয়া থেকে পালাবে।'

মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে বলে : 'যা করার বুঝে শুনেই করবে ও...'

চশমার ফাঁক দিয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে এবার বলে নিকলাই :

'হুঁ! তোমার সেই চাষী বন্ধুটি না আমাদের এখানে আসবে ব'লেছিল! তাড়াতাড়ি এলেই হয় এখন। রীবিনের সম্বন্ধে লিখতে হবে চাষী-ভাইদের জন্য। ওর বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি হবেনা, কারণ ও নিজে তো আর বলতে কিছু বাকী রাখেনি। আজই লিখে ফেলব আমি; লুদ্‌মিল্লা চট্‌পট্‌ ছেপেও ফেলবে...কিন্তু তারপর ওগুলো পৌঁছুবে কি করে ওদের কাছে?'

'আমি নিয়ে যাব।'

'না, সেটি হ'চ্ছে না। ভাব্‌ছি ভেসভশ্চিকভ নিয়ে যেতে পারে কিনা।'

'কথা ব'লে দেখব?'

'দেখতে পার! আর কি ক'রে কি ক'রতে হবে না হবে একটু তো শিখিয়ে

পড়িয়েও দিতে হবে ওকে।'

'আর আমি কি করব তাহ'লে?'

'সে ভাবনা নেই, কাজ ঠিক জুটিয়ে দেব।'

লিখতে বসে যায় নিকলাই। মা টেবিল পরিষ্কার ক'রতে ক'রতে ওর দিকে চেয়ে থাকে। আঙুলের ফাঁকে কলমটা কাঁপছে, আর কাগজের শুভ্র বুকে কালির আখর সাজছে সারবন্দী হ'য়ে। এক এক সময় ঘাড়ের পেশীগুলো লাফিয়ে ওঠে। মাথা পেছনে হেলিয়ে চোখ বন্ধ ক'রে এলিয়ে থাকে কখনও বা; তখন থুতনিটা কেমন কাঁপে, মা লক্ষ্য করে। ভাবনায় অস্থির হ'য়ে ওঠে মা।

তারপর এক সময় উঠে প'ড়ে বলে নিকলাই: 'এই নাও, হয়ে গেছে। জামার মধ্যে লুকিয়ে রেখে দাও। কিন্তু পুলিশ এলে তোমায় ছাড়বেনা, শরীর-তল্লাসী করবেই।'

'মরুক ব্যাটারা!' শান্তভাবে বলে মা।

সন্ধ্যেবেলা এল ডাক্তার ইভান দানিলভিচ্। এসেই ঘরের মধ্যে প্রায় ঘোড়দৌড় শুরু ক'রে দিল।

'কি ব্যাপার হে, বলতো!' ইভান বলে, 'হঠাৎ কর্তাবা অমন ভেবড়ে গেল কেন? কাল রাত্তিরে সাত সাতটা বাড়ী তল্লাসী করেছে। আমার রোগী কোথায় হে?'

'কাল চ'লে গেছে।' নিকলাই বলে। 'আজ হ'লো শনিবার, পাঠচক্রের বৈঠক আছে। সে বাদ দেবে? কস্মিনকালেও না।'

'সে কি হে? ভাঙা মাথা নিয়ে পাঠচক্রে?'

'কম বোঝান বুঝিয়েছি? কার কথা কে শোনে..'

'তা বন্ধুদের কাছে একটু বাহবা নেবে না!' মা বলে, 'এই দেখ, আমারও রক্ত প'ড়েছে!...'

ডাক্তার মায়ের দিকে তাকায়, কপট রাগে মুখ বাঁকিয়ে বলে:

'ইস্! কি পাথুরে জানরে বাবা!'

'এই ইভান! এখানে ঘুটুর ঘুটুর করছ কি! পালাও শিগ্গির। অতিথি আসবে জানো! নিলোভনা, কাগজগুলো দিয়ে দাও ওকে।'

'আবার কাগজ!' চীৎকার ক'রে ওঠে ডাক্তার।

'হ্যাঁ আবার কাগজ। এটাকে ছাপাখানায় দিয়ে দিও।'

'জো হুকুম। আর কিছু?'

'না, বাস্। সদরে স্পাই আছে একজন, জানো?'

'হুঁ, দেখেছি। আমার ওখানেও আছে। আচ্ছা আসি তাহ'লে। শুনছো রাক্কুসী, চল্লাম। হ্যাঁ বুঝলে? কবরখানার ব্যাপারটা হ'য়ে শাপে বর হয়েছে। সবাই বলাবলি ক'রছে। শহরময় ঢি-ঢি। আর খাসা লিখেছিলে হে ব্যাপারটা সম্বন্ধে। পুস্তিকা-খানা বেরুলও একেবারে মোক্ষম সময়ে। আরে এই জন্যই তো আমি বলি সর্বদা—ওঁচা শান্তির চেয়ে জবরদস্ত লড়াই ঢের ভালো।'

'ভালো তো ভালো। ভাগো এখন।'

'অতিথিকে তাড়াচ্ছ! আচ্ছা নিলোভনা। হাতখানা দেখি! ছোঁড়া ভারী অন্যায় ক'রেছে। ওর যাওয়া ঠিক হয়নি! কোথায় থাকে জানো?'

ঠিকানা দিয়ে দেয় নিকলাই।

'কাল গিয়ে দেখে আসব। বেশ ছেলে, না?'

'সত্যি চমৎকার ছেলে।'

'দেখতে হবে ছেলেটাকে ভালো করে। খাসা মগজখানা ওর।' যেতে যেতে বল্লে ডাক্তার, 'এদের মত ছেলেরাই খাঁটি সর্বহারা বুদ্ধিজীবীর জাত গড়বে। আর আমরা যখন একূল ছাড়িয়া ওকূলের পানে ভাসাইব তরী—হ্যাঁ, ওকূলে নিশ্চয় শ্রেণী-সংঘাত-টংঘাত নেই—তখন আমাদের জায়গা নেবে এরা...।'

'ভারী বক্‌বক্ করার স্বভাব হয়েছে কিছুদিন থেকে তোমার, ইভান।'

'খোশ মেজাজে আছি যে হে! দিল এখন দরিয়া। জেলের জন্য পা বাড়িয়ে আছ, তাই না? তা যাও, বিশ্রাম হবে দু'দিন।'

'ধন্যবাদ। বিশ্রামের আমার কোনও দরকার নেই। দিব্যি তাগড়া আছি।'

মজদুর-ঘরের ছেলেটার জন্য ওদের দু'জনের এতটা দরদ দেখে ভারী খুশি হয় মা।

ডাক্তার চ'লে গেছে, নিকলাই আর মা খেতে বসেছে। প্রতীক্ষিত নৈশ অতিথিদের সম্বন্ধে আস্তে আস্তে কথা বলে। গল্প করে নিকলাই, কমরেড্‌দের মধ্যে অনেকে নির্বাসনে আছে; অনেকে আবার পালিয়ে এসে ছদ্মনামে কাজ করছে। নিরাবরণ, নিরাভরণ, পাঁচিলগুলিতে লেগে ঠিকরে ফিরে আসে ওর কথা: যেন নতুন দুনিয়া গড়বার জন্য এ যুগের দধীচিদের এই আত্মদানের কাহিনী বিশ্বাস করতে পারেনি তারা। কোমল একটা ছায়া যেন গভীর স্নেহের আলিঙ্গনে জড়িয়ে আছে মার সর্ব-সত্তা। অজানা সেই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের জন্য মার বুকখানা উষ্ণতায় ভরে ওঠে। মায়ের মানসলোকে ওরা সব এক হয়ে মিশে যায় এক নির্ভীক ও বিরাট পুরুষের রূপে—যে মানুষকে জীবনের সহজ-সরল সত্য সন্দর্শন করাবে বলে দুই হাতে শতাব্দীসঞ্চিত শ্যাওলা, আবর্জনার স্তূপ সরিয়ে সরিয়ে ধীর দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। মিথ্যা, লোভ, দ্বেষ এই তিন দানবই পৃথিবীকে ভয় দেখিয়ে, দাসত্বের শৃঙ্খলে বেঁধে রেখেছে। ওই মহান্ সত্য ঘরে ঘরে ডাক পাঠাবে প্রত্যেকটি মানুষকে; দীক্ষা দেবে অভয়মন্ত্রে; ডাক দিয়ে বলবে—ওই দানবের হাত থেকে আমি তোদের মুক্তি দেব! মানসলোকের এই মূর্তির কাছে মায়ের হৃদয় প্রণত হয়। যখনই একটি দিন একটু ভালো যেত এমনি অনুভূতি নিয়েই মা আগেকার দিনে সন্ধ্যেবেলায় দেব-মূর্তির সামনে কৃতজ্ঞতাভরে নত-জানু হ'ত। সে সব দিনের কথা আজ আর মনে নেই মায়ের—কিন্তু সে-দিনের সেই অনুভূতি ডালপালা মেলে, ফুলে-ফলে আলোয়-আনন্দে ভরে উঠে আত্মার গভীরে গিয়ে বাসা বেঁধেছে। দীপ্ততর শিখায় জ্বলছে।

হঠাৎ নিকলাই ব'লে ওঠে: 'পুলিশ আজ আর আসবে না বোধ হয়।'

নিকলাইয়ের দিকে ত্বরিত দৃষ্টি ফেলে বলে মা:

'মরুক! মরুক! পাজীরা!'

'তা ম'রবেখন ওরা। কিন্তু এখন একটু শুয়ে নাও গে। ভীষণ ক্লান্ত হ'য়ে আছ তুমি। একটু ঘুমান দরকার। অবশ্যি বলতে নেই, দেহখানা তোমার লোহার। এত ঝক্কি গেল আজ—অথচ তোমার গায়ে যেন কিচ্ছু লাগেনি। এদিকে তোমার মাথাটি কিন্তু লাফে লাফে সাদা হয়ে উঠছে। আচ্ছা আজ বিশ্রাম করোগে—যাও শুয়ে পড়োগে।'

রান্নাঘরের দরজায় বিষম ধাক্কা-ধাক্কি; ঘুম ভেঙে গেল মার। কেরে বাপু? ধাক্কার আর বিরাম নেই। চলছে তো চলছেই। মাঝে মাঝে এক একবার একটু থামে। তখনও অন্ধকার; ভোরের কোলাহল তখনও শুরু হয়নি। আবছা অন্ধকারটা আঁৎকে উঠছে সেই শব্দে। ধড়ফড়িয়ে বিছানা ছেড়ে উঠল মা। গায়ের ওপর একটা চাদর ফেলে রান্নাঘরের দরজার কাছে দাঁড়াল এসে।

'কে?'

'আমি গো।' অপরিচিত কণ্ঠের জবাব আসে।

'কে?'

'খোলনা দরজা!' মিনতি আসে। গলার স্বরটা নেমে এসেছে।

হুড়কো তুলে, পা দিয়ে ঠেলে খুলে দিলে দরজাটা। ইগনাত এসে ঢোকে।

'ভুল করিনি তাহ'লে!' উল্লসিত হ'য়ে ওঠে ইগনাত।

কোমর পর্যন্ত সারা গায়ে ওর কাদা। মুখখানায় যেন কালির ছোপ মারা। চোখ বসা। সেই কোঁকড়া চুলের ঝাঁক কাঠির মত হ'য়ে টুপীর তলা দিয়ে চার দিকে এলোমেলো হাত-পা ছড়িয়ে আছে। দরজা বন্ধ ক'রতে ক'রতে ফিস্‌ফিসিয়ে বলে:

'ভারী বিপদ!'

'জানি।'

শুনে অবাক হয়ে যায় ইগনাত। চোখ মিট্‌মিট্‌ ক'রে শুধায়.

'সেকি? কি ক'রে জানলে?'

সংক্ষেপে বুঝিয়ে দেয় মা।

'সেই যে আরো দু'টি ছেলে ছিল তাদেরও নিয়েছে নাকি?'

'না, ওরা তো ছিলনা ওখানে তখন। ওদের তো সৈন্যদলে যোগ দিতে হবে, হাজিরা দেবার দিন ছিল। তাই সেখানেই গিয়েছিল ওরা। মিখাইলো-কাকাকে নিয়ে পাঁচজনকে ধরেছে।'

একটা লম্বা নিশ্বাস নিয়ে, সংক্ষিপ্ত হাসি হেসে আবার বলে:

'আমিই বাদ প'ড়ে গেছি। এতক্ষণে হয়তো আমার জন্য গরু-খোঁজা ক'রছে।'

'পালালে কি ক'রে?' মা শুধায়। পাশের ঘরের দরজাটা ঈষৎ খুলে যায়।

একটা বেঞ্চির ওপর ব'সে প'ড়ে চারদিকে তাকিয়ে বলে ইগনাত:

'আমি? আমার কথা শুধোচ্ছ? পুলিশ আসার মিনিট দুই আগেই জঙ্গলের পাহারাগুলো ধেয়ে এসে বলল—সাবধান থাক ব্যাটারা, কেউ আসছেরে।'

শান্তভাবে হেসে কোটটা দিয়ে মুখ মুছে ইগনাত বলে:

'মিখাইলো-কাকাকে মাথায় ডাণ্ডা মেরেও ওঠাবে কার বাপের সাধ্যি। আমায় হেঁকে বললে—ইগনাত, বাপ্‌, ধেয়ে যা শহরপানে, পা চালিয়ে যাবি কিন্তু! মনে আছে সেই যে আধবয়সী মেয়েমানুষটি এসেছিল'—ব'লে খস্‌খসিয়ে কি লিখলে একটা চিরকুটে কথা বলতে বলতে, 'ধর্‌ এটা নিয়ে দিবি গে তার হাতে। গুঁড়ি মেরে আমি তো বেরিয়ে এসে ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে আড়ালে পথ ধরনু; আওয়াজে বুঝনু তেনারা আসছে। সেকি আর দু'টো চাট্টে গো! হেই এক দঙ্গল! শালারা চার দিক থে ঘিরে ফেললে আমাদের সেই আলকাতরার থান। আমি জঙ্গলের মধ্যে ঘাপটি মেরে ব'সে থাকলাম। পাশ দিয়ে চলে গেল শালারা। দেখতে পায়নি আমায়।

যাই না ওরা গেল, আমি থপ্ ক'রে উঠেই চোঁচা দৌড়। দুই দিন এক রাত্তির এই ধেয়ে ধেয়ে আসছি; এক লহমার জিরন-থামন দিইনি গো!'

ওর বাদামী চোখের হাসির দুলুনি আর লাল-টুকটুকে ভরা ঠোঁট দুটোর ভঙ্গিতে বেশ বোঝা যাচ্ছিল নিজের ওপর ভারী খুশি হ'য়েছে ইগনাত।

সামোভারের কাছে এসে মা বলে : 'ব'সো, চা আনছি। এই এলাম ব'লে।'

'এই যে, তোমার চিঠি নাও।'

বেঞ্চির ওপর পা দু'টো তুলতে গিয়ে যন্ত্রণায় ককিয়ে ওঠে ইগনাত। মুখ তীব্র যাতনায় কুঁচকে যায়।

দরজার কাছে নিকলাইকে দেখা যায়।

'আরে, এসো এসো কম্‌রেড্!' চোখ কুঁচকিয়ে বলে সে। 'দেখি তো কি হয়েছে? দাঁড়াও আমি ঠিক ক'রে দিচ্ছি।'

ওর পায়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে নিকলাই। মোজা জোটেনি; ময়লা কাপড়ের ফালি জড়িয়ে চলেছে মোজার কাজ। এগুলো খুলে ফেলতে যায় ও।

'না, না!' চেঁচিয়ে উঠে পা টেনে নেয় ছেলেটা আর অবাক হ'য়ে মার দিকে চায়।

সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রেই মা বলে :

'ওর পা-টাকে ভদ্‌কা দিয়ে ভালো ক'রে মালিশ ক'রে দিতে হবে।'

'তাই দিচ্ছি।'

ইগনাত বিব্রত হ'য়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে।

নিকলাই দুমড়ান মোচড়ান ময়লা চিরকুট্‌টা তুলে চোখের খুব কাছে নিয়ে এসে পড়তে আরম্ভ করে :

"আমাদের কাজকর্মকে কখনও ছেড়ে দিওনা, মা। আর সেই ভদ্রমহিলাকে ব'লো, কাজকর্মের কথা যেন আরো বেশী ক'রে লেখেন। ভোলেন না যেন। বিদায়! রীবিন।"

চিঠিশুদ্ধ হাতখানা এলিয়ে পড়ে নিকলাইয়ের। 'অদ্ভুত!' অস্পষ্ট স্বরে বলে।

ইগনাত তার খালি পায়ের ময়লা আঙুলগুলিতে হাত বুলাতে বুলাতে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে এদের ব্যাপার দেখে। মা চোখের জল চাপতে চাপতে এক গামলা জল নিয়ে আসে। তারপর ওর সামনে উবু হ'য়ে ব'সে ওর পায়ের জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়।

ভয় পেয়ে যায় ইগনাত :'না, না, আপনি না, আপনি না,' বলতে বলতে বেঞ্চির তলায় পা লুকোয়।

'শিগ্গির পা বের কর। শিগ্গির শিগ্গির!'

'আমি ভদ্‌কা নিয়ে আসছি।' নিকলাই বলে।

'আমি যেন হাসপাতালে এসেছি!' গোঁ গোঁ করে ইগনাত।

মা ওর আরেকটা পা থেকে জড়ান ন্যাকড়ার ফালিগুলো খুলে নেয়। মায়ের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ঘাড় মোচড়ায় ইগনাত; বড় অস্বস্তি লাগে ওর। জোরে জোরে ফোঁৎ ফোঁৎ ক'রে নিশ্বাস ফেলে।

মা কম্পিত স্বরে বলে : 'জানো, মিখাইলো ইভানোভিচ্‌কে বেদম মেরেছে ওরা।'

'সত্যি?' চাপা চীৎকার বেরিয়ে আসে ইগনাতের মুখ থেকে।

'সত্যি। নিকোলস্কোয়েতে যখন নিয়ে এল তখনই ওর সাংঘাতিক অবস্থা। তার ওপরে ওখানে পুলিশের বড় সাহেব আর ছোট সাহেবের এলোপাতাড়ি কিল চড় ঘুষি লাথি—সারা দেহ রক্তারক্তি! তবু কি ছাড়ে!'

'আর কিছু জানুক না জানুক, ঠ্যাঙ্গানিতে হাত পাকা ওদের!' ভ্রূকুটি করে ইগনাত। কাঁধদুটো ঝাঁকিয়ে আবার বলে :

'বাপ্‌স্‌। ওরা তো মানুষ নয় যম। মুজিকরাও মেরেছে নাকি মিখাইলো-কাকাকে?'

'একজনকে পুলিশ সাহেব হুকুম করলে মারতে। কি আর করবে সে। অন্যরা কিছু করেনি; বরঞ্চ মিখাইলোর হ'য়ে কথা ব'লেছে। কোন্‌ আইনে অমন ক'রে মারবে তাই নিয়ে হাঙ্গামা হুজ্জুৎ করেছে।'

'চাষীভাইদেরও চোখ খুলতে লেগেছে। কে যে কোন্‌ দিকে তা বুঝতে লেগেছে তারা।'

'ভালো লোকও আছে তাদের মধ্যে। খুঁজে নিতে হয়, এই আর কি। এমনিতে মন্দ যদি হয়ে থাকে, সে অভাবে। অভাবে স্বভাব নষ্ট, কথাই আছে।'

নিকলাই এক বোতল ভদ্‌কা নিয়ে এল। তারপর সামোভারে কিছু কয়লা দিয়ে চুপচাপ বেরিয়ে গেল। ইগনাত নিঃশব্দে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে।

'এই বাবুটি কে?—ডাক্তার?' নিকলাই বেরিয়ে যেতেই জিজ্ঞাসা করে।

'আমাদের এখানে বাবু টাবু নেই কেউ। আমরা সব কমরেড্‌।'

'ভারী মজা তো!' অপ্রতিভ ইগনাত সন্দিগ্ধভাবে হেসে বলে।

'কি মজার রে?'

'এমনিই ব'লছিলাম। মানে, এই এক দিকে কেউ তো ঘুষিয়ে নাক চেপ্টে দেয়, আবার আর এক দিকে কেউ পা ধুইয়ে দেয়। মধ্যিখানটায় কে থাকলো?'

দরজা খুলে যায়। নিকলাই বলে :

'মাঝখানে? কেন? আছে, যারা সেই নাক চেপ্টে-দেনে-ওয়ালাদের পা চাটে আর, চেপ্টে-যাওয়া নাক-ওয়ালাদের রক্ত শোষে! এরাই আছে মাঝখানে!'

সসম্ভ্রমে ইগনাত তাকায় নিকলাইয়ের দিকে : 'খাঁটি কথাই বলেছ গো আপুনি।' তারপর উঠে দাঁড়িয়ে কয়েক পা হেঁটে বলে :

'বাঃ এ যে একদম নতুন পা গো! ধন্যবাদ।'

এরপর খাবারঘরে গিয়ে চা খাবার পালা। চা খেতে খেতে ইগনাত নিজের জীবন-কাহিনী বলে; গভীর, হৃদয়-গলানো স্বরে।

'খবর কাগজ আমি বিলি ক'রতাম জানেন? ওঃ জবর হাঁটতে পারি আমি!'

'মেলা লোক পড়ে কাগজ?' নিকলাই শুধায়।

'গল্পের বই-টই তো সব্বাই পড়ে; বড়লোকেরাও পড়ে। তবে বাবুরা তো আমাদের কাছ থেকে নেন না বই...! তেনারা আর কিছু জানে আর না জানে, এটুকুন বুঝতে পেরেছে বেশ যে চাষীরা মুখিয়ে আছে। সুবিধা পেলেই জমিদারদের রক্ত দিয়ে মাটি ভাসিয়ে দেবে। আর ঐটুকু যদি কত্তে পারে, তবে শালা আর না জমিদার না ক্ষেতমজুর! একেবারে সাফ কথা! তা নইলে, লড়াই-টড়াই কেন হে বাপু?'

একটু যেন রেগেছে ইগনাত। জিজ্ঞাসুভাবে সংশয়ের দৃষ্টিতে নিকলাইয়ের দিকে চায়। নিকলাই শুধু হাসে, কিছু বলে না।

'ধরো না হয় আজ দুনিয়ার সাথে লড়লাম। সব্বাইকে দাবিয়ে দিলাম। কাল আবার যে কে সেই—সেই বড় লোক, আর গরীব। কি লাভটা হ'ল শুনি? না বাবা! অত মুখ্যু পাওনি গো আমাদের! ওসব চলবে না। ধন-রতন না শুকনো

বালি—ফ্‌স্‌ কত্তেই উড়ে যাবে!'

'আরে তার জন্য এখন থেকে মাথা খারাপ করছ কেন?' মা হাসে।

'আর আমি ভাবছি রীবিনের গ্রেপ্তার সম্বন্ধে সেই লেখাটা ছাপতে দিয়েছি, সেটা পাই কি ক'রে!' নিকলাই বলে চিন্তিতভাবে।

ইগনাত কান খাড়া করে।

'আছে নাকি বই?' ও জিজ্ঞাসা করে।

'হাঁ।'

হাত কচলাতে কচলাতে ইগনাত বলে : 'দিন, নিয়ে যাব।'

'ওর দিকে না তাকিয়েই শান্তভাবে হাসে মা। তারপর বলে :

'কিন্তু বলছিলে যে বড্ড ক্লান্ত হয়েছ আর ভয় করছে!'

চওড়া থাবাটা দিয়ে কোঁকড়া চুলগুলো ঠিক ক'রতে ক'রতে ইগনাত বলে শুকনো কাজের কথার ধরনে :

'ভয় এক বস্তু আর কাজ হ'ল আর এক। হাসছ কেন গা? আচ্ছা মানুষ তো!'

ছেলেটিকে দেখে কি জানি এক সুখে মায়ের বুক ভরে ওঠে। কিন্তু চাপবার চেষ্টা ক'রে মা। অজান্তে মুখ থেকে বেরিয়ে আসে :

'একেবারে ছেলেমানুষ দেখছি!'

'হুঁ, তাই বইকি,' গোঁ গোঁ ক'রে ইগনাত।

সস্নেহে ওর দিকে তাকিয়ে নিকলাই বলে :

'ফিরে যেতে পারছ না আর।'

'কেন? কেন যেতে পারব না? তাহ'লে কোথায় যাব?' ইগনাত বলে।

'আর একজন যাবে বই নিয়ে। তুমি ভালো করে পথ বাতলে দেবে। কেমন?'

ক্ষুণ্ণস্বরে ইগানত বলে, 'বেশ!'

'তোমায় নতুন পাসপোর্ট জোগাড় ক'রে দেব, আর বনরক্ষীর কাজ জুটিয়ে দেব একটা। হবে তো?'

'তারপর চাষীরা যখন কাঠ চুরি কত্তে আসবে? ধরে কষে হাত পা বেঁধে রাখব? না বাবা ওসব আমার দ্বারা হবে-টবে না।'

মা হাসে, নিকলাইও হাসে। ইগনাত যেন আঘাত পেল, মনে হয়। নিকলাই সান্ত্বনা দেয় :

'আরে আরে, বাঁধতে-টাঁধতে হবে না। আমি বলছি, বিশ্বাস কর।'

ইগনাত খুশি হ'য়ে ওঠে : 'তাহ'লে ক'রব। কিন্তু কারখানায় কাজ-টাজ হয় না? কারখানায় যারা কাজ করে তারা নাকি বড় চালাক-চৌকস হয়!'

মা উঠে জানালার কাছে দাঁড়ায় গিয়ে।

'জীবনটা কি অদ্ভুত!' মনে মনে ভাবে, 'এই হাসি, এই কান্না! হাঁ রে, ইগনাত! খাওয়া শেষ হ'ল? আর না, এবার একটু ঘুমিয়ে নাওগে।'

'ঘুম পায়নি।'

'উঠলে? চট্‌পট্‌ যাও বিছানায়।'

'বাপরে কি কড়া গো তুমি! যাচ্ছি, বাপু যাচ্ছি। বড্ড ভালো তুমি—ধন্যবাদ! চা খাইয়েছ, তার জন্যও ধন্যবাদ।'

মায়ের বিছানায় গিয়ে শুতে শুতে মাথা চুলকিয়ে ভাবতে লাগল :

'সব আলকাতরার গন্ধ হ'য়ে যাবে...ঘুমটুম পায়নি, কিছু না...তবু যত সব...

সেই মধ্যিখানে যারা আছে! কেমন চট্ ক'রে কথাগুলি বললে, য়্যাঁ...যত সব শয়তান! পাজী!...'

মুহূর্তে ওর নাক ডাকতে আরম্ভ করল। মুখটা অর্ধেক খুলে গেল।

একুশ

সেই দিনই সন্ধেবেলার কথা। ছোট্ট একটা মাটির তলার ঘরে ভেসভশিচকভের সামনে বসে কথা বলছে ইগনাত :

'মাঝের জানালাটায় চারবার...'

'চার?' উদ্বিগ্নভাবে নিকলাই বলে।

'প্রথম তিনটে...এই এমনি ক'রে...এক, দুই, তিন ..' টেবিলে টোকা মেরে দেখায়, 'তারপর আর একবার।'

'বুঝতে পারলাম।'

'একজন লালমাথা চাষী এসে দরজা খুলে দিয়ে শুধোবে :

'ধাত্রী ডাকতে এসেছ? তুমি বলবে, হ্যাঁ। কারখানার মালিকের বৌয়ের ছেলে হবে, তারি জন্য...আর ব'লতে হবে না, সব বুঝে নেবে।'

দু'জনে ব'সেছিল। দু'জনেই বলিষ্ঠ জোয়ান তাগড়া মানুষ। কথা বলছে চাপা স্বরে। যুক্ত হাত দু'খানা বুকের ওপর রেখে মা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল ওদের। রহস্যজনক সংকেতগুলি ওর ভারী মজার লাগে। আপন মনেই বলে মা :

'নেহাৎ ছেলেমানুষ!'

ছাতে জলের চিহ্ন—দেয়াল-গিরির আলোয় দেখা যায়। মেজেতে ছড়ান র'য়েছে কতগুলো মাসিক পত্রিকার ছবি, একটা ভাঙা পাত্র, আর টিন-মিস্ত্রী বুঝি কাজ ক'রে গেছে সেই টুক্‌রো টাক্‌রা! ঘর্‌টা মরচে, রং আর ছ্যাঁৎলার গন্ধে ভরা।

মোটা খস্‌খসে বিশ্রী কাপড়ে তৈরী ভারী একটা কোট পরে আছে ইগনাত। মা স্নেহভরে ওর মুখখানা ধ'রে ঘুরিয়ে ভালো ক'রে দেখে। মনে মনে ভাবে :

'আহারে বাছারা!'

ইগনাত উঠতে উঠতে বলে :

'ভুলো-টুলো না বাবা! বুঝলে তো? পয়লা যাবে মুরাতভের কাছে। গিয়ে দা-ঠাকুরকে তালাশ ক'রবে।'

ভেসভশিচকভ উত্তর দেয় : 'না হে না, ভুলব না!'

ইগনাত নিশ্চিন্ত হ'তে পারে না। যাবার আগে বারবার ক'রে সংকেতগুলো মুখস্ত করিয়ে দিয়ে তবে ও ঠাণ্ডা হয়।

'আচ্ছা! আসি তাহ'লে। আমার নমস্কার দিও ওদের। কেমন খাসা মানুষ সব দেখো।'

মাকে বলে জামার আস্তিনে হাত বুলোতে বুলোতে :

'যেতে হবে এখন?'

'যেতে পারবে তো?'

'আলবৎ পারব!'

কাঁধ খাড়া ক'রে, বুক চিতিয়ে, নতুন টুপীটাকে এক পাশে কানের ওপর আড় ক'রে প'রে বেরিয়ে গেল ও। হাত দু'খানা বেপরোয়াভাবে পকেটে পোরা। কোঁকড়া চুলের গোছা কানের কাছে হাওয়ায় উড়ছে!

ধীরে ধীরে মায়ের কাছে এসে বলে ভেসভশ্চিকভ : 'তাহ'লে কাজ জুটল একটা। হাত পা গুটিয়ে ব'সে থেকে থেকে পাগল হবার জো প্রায়। ভাবছিলাম, তাহ'লে পালিয়ে এসে লাভটা কি হ'ল! দিন রাত্তির চুপচাপ শুধু গর্তে সেঁধিয়ে থাকো। তার চাইতে সেখানেই তো ভালো ছিল। পাভেলের সাথে ছিলাম, কত শিখতে পারতাম!'

'হ্যাঁ গো, নিলোভনা? ওদের পালাবার কি হ'ল গা?'

অজান্তে দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে মার। বলে, 'জানিনে।'

নিকলাই মায়ের কাঁধে চাপ দিয়ে মুখের কাছে মুখ এনে বলে :

'আপনি বলুন কথা। আপনার কথা ওরা শুনবে। ওতো জলের মত সোজা। দেখুন না। এই হ'ল জেলের পাঁচিল। তারপরই রাস্তার আলোটা। ঠিক সামনেই একটা পোড়ো জায়গা। বাঁ দিকে কবরখানা; ডান দিকে রাস্তা আর পাকা বাড়ী। আলোগুলি পরিষ্কার ক'রবার জন্য ফরাশ আসে রোজ। দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে রাখা থাকে তার মইটা। মই বেয়ে উঠে একটা দড়ির মই ঝুলিয়ে দেবে সে ভেতর দিকে। ভেতরে ওরা সব জানে, কখন কি ক'রতে হবে। সাধারণ কয়েদীদের ঠিক করাই আছে। ইসারা পেলেই তারা একটা গোলমাল বাধাবে। পাহারাওয়ালারা তখন সব ওই দিকে ছুটবে, আর সেই ফাঁকে আমাদের ওরা দড়ির মই বেয়ে...এক...দুই...তিন...বাস্...চিচিং ফাঁক...। দেখলে তো কি সোজা!'

নানা রকম ভঙ্গি ক'রে নিজের প্ল্যানটা বোঝায় নিকলাই। শুনতে ভারী সহজ লাগে। আগে নিকলাইকে মায়ের বোকা বোকা নিষ্কর্মা মত মনে হ'ত। দুনিয়ার ওপর ওরও ছিল গভীর ঘৃণা আর অবিশ্বাস। এখন যেন ওর পুনর্জন্ম হ'য়েছে। এখন যেন ওর মধ্য থেকে সম-দীপ্তি একটা উষ্ণ আলো বিচ্ছুরণ হচ্ছে। মা মুগ্ধ হ'য়ে যায়। উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে।

'ভাবো দেখিনি একবার! দিনের আলোয়, একবারে গটগটে দিনের আলোয়। দিনের বেলা—চারদিকে সব খাড়া পাহারা, তার মধ্যে কয়েদী পালাবে, কোনও শর্মা সন্দেহ ক'রবে না।'

মার সর্ব-শরীর কেঁপে ওঠে : 'গুলি টুলি ক'রবে না তো?'

'কে? কে ক'রবে? সৈন্য তো থাকে না ওখানে। আর পাহারাওয়ালাদের কাছে যে রিভলবার আছে, তা দিয়ে শুধু পেরেক ঠোকা চলে।'

'তা মনে তো হচ্ছে বেশ সোজা।'

'আমি সব জোগাড়যন্ত্র ক'রে রেখেছি—দড়ির মই, কাঁটা, হুক...সব, আর আমার বাড়ীওয়ালা ফরাশ হবেন।'

দরজার ওধার থেকে কে যেন কেশে উঠল, তারপর কাপড়ের খস্‌খস্ আর টিন টানার শব্দ। নিকলাই বলে :

'ওই যে আসছে!'

দরজার ওপাশে একটা টিনের তৈরী স্নানের গামলা। একটা মোটা গলা অস্পষ্ট স্বরে ব'লে ওঠে :

'এই বুড়ো শয়তান, বেরিয়ে আয়...'

টবটার পেছন থেকে একখানা ভালোমানুষী মুখ দেখা যায়—চোখদুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে; চুল দাড়িতে পাক ধ'রেছে।

নিকলাই ওকে বেরুতে সাহায্য করে। বিরাট লম্বা মানুষটি, দেহটা ঝুঁকে গেছে; ঘরে ঢুকেই এক চোট কেশে নিয়ে অতিথিদের অভ্যর্থনা করে মোটা গলায় :

'ভালো আছেন তো সব!'

নিকলাই বলে : 'এই একে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখোনা!'

'কি জিজ্ঞাসা ক'রব?'

'এই পালানো বিষয়ে।'

টিন-মিস্ত্রী ময়লা হাত দিয়ে গোঁফ-জোড়া মুছে বলে : 'ওঃ!'

'কিছুতেই বিশ্বাস ক'রবে না এ মেয়ে, ইয়াকভ ভাসিলিয়েভিচ্।'

'য়্যাঁ বিশ্বাস ক'রবে না? ক'রবে না নয়, কত্তে চায় না। কিন্তু আমি, তুমি চাই তো!' শান্তভাবে বলে মিস্ত্রী। হঠাৎ কাশতে কাশতে একেবারে বেঁকে যায়। একটু কাশি থামলে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বুক ঘষতে থাকে; আর ওর উদ্গত চক্ষু দিয়ে মাকে নিরীক্ষণ করে! মা বলে :

'ও বিষয় যা করার পাভেল আর তার বন্ধুরাই ঠিক করবে।'

নিকলাই চিন্তিতভাবে মাথা নীচু করে।

'পাভেল, না কি বললে? কে হে?' বসতে বসতে বলে টিন-মিস্ত্রী।

'আমার ছেলে।'

'পদবী?'

'ভ্লাসফ্।'

মাথা নাড়ে টিন-মিস্ত্রী, তামাকের থলিটা বের ক'রে পাইপে ভরতে শুরু করে :

'শুনেছি বটে নাম।' বলে ও। 'আমার ভাইপো চেনে। সে এখন জেলে। ইয়েভ্চেঙ্কো। শুনেছ ওর কথা? আমার নাম গোবান। যত জোয়ান ছেলে আছে—সব ধ'রবে এবার। আমাদের মত বুড়োহাবড়াদের জায়গা করে দিচ্ছে আর কি! একজন পাহারাওলা বলছিল—ভাইপোটাকে নাকি সাইবিরিয়ায় ঠুকে দেবে। তা পারে ওরা—কুত্তাগুলো!'

নিকলাইয়ের দিকে তাকিয়ে পাইপ টানতে থাকে আর ঘন ঘন থুথু ফেলে মেজের ওপর। যেন ঝাঁকানি খেতে খেতে বলে :

'তা হ'লে সে চায় না? ওরই ব্যাপার, ও বুঝবে ভালো। কিন্তু বলি ওহে! হাত পা ঝাড়া থাকলে যা খুশি তাই করতে পার। ব'সে ব'সে ঝিম ধরে যায় তো, চলতে শুরু করো। আর চলতে চলতে ঠ্যাং ব্যথা হয় তো ব'স্তে পারো! ওরা তোমাদের সর্বস্ব কেড়ে নেয়—চোখ বুজে থাক। ধ'রে মারে, খবরদার কেঁদনা। খুন ক'রে ফেলে—ছিঃ ব'লতে নেই ও কথা। সবাই জানে এ কথা। কিন্তু আমি ছেলেটাকে বের ক'রে আনছি দেখনা!'

মা অবাক হ'য়ে যায় ওর কথা বলার ভঙ্গী দেখে। কিন্তু শেষের কথাগুলি! হিংসে হয় মার।

বৃষ্টি মাথায় করেই পথে বেরুল মা। হাওয়া আর ঝাপটা এসে মুখে লাগছে। যেতে যেতে ভাবে মা নিকলাইয়ের কথা।

'আশ্চর্য! কি অদ্ভুত বদলে গেছে!'

গোবানের কথা মনে হয়। ভাবে, 'নতুন জীবন একা আমিই পাইনি!'
মুহূর্তে পাভেল-ময় হ'য়ে ওঠে মায়ের অন্তর!
'কেন মত দেয়না? কেন নয়!'

বাইশ

পরের রবিবার—সাক্ষাতের শেষে করমর্দনের সময় মায়ের মনে হ'ল, পাভেল যেন একটা কাগজের ছোট্ট পুঁটলি গুঁজে দিল হাতে। হাতটা যেন জ্বলে গেল। চম্‌কে উঠে মা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ছেলের দিকে চাইলে; তার মুখের ভাবে কোনও উত্তর পাওয়া গেল না—সেই চিরকালের প্রশান্ত, প্রতিজ্ঞা-কঠিন হাসি ওর নীল চোখে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মা বলে : 'আসি আজ!'

আর একবার হাত বাড়িয়ে দেয় ছেলে—মুখখানি কোমল হয়ে ওঠে।

'এসো, মা।'

মা দাঁড়িয়ে থাকে হাতখানা ধ'রে।

'ভেবো না মা। রাগ-টাগ করো না কিন্তু!' পাভেল বলে।

এই কথাগুলিতে আর ছেলের কপালের কঠিন রেখায় মায়ের জিজ্ঞাসার উত্তর লেখা হ'য়ে গেল।

মাথা নীচু ক'রে, অস্পষ্টস্বরে বলে মা :

'ছিঃ কি বলছিস!...'

আর না তাকিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে মা—ছেলে যেন না দেখতে পায় ওর চোখ-ছাপানো জল, আর ঠোঁটের কাঁপুনি। হাতের মুঠোয় সেই কাগজ। সারা রাস্তা মার মনে হ'ল মুঠোটা যেন ব্যথায় টাটাচ্ছে। ঝোলা হাতখানায় যেন পাথুরে ভার। বাড়ী পৌঁছেই কাগজখানা নিকলাইয়ের হাতে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মা—আশা আকাঙ্ক্ষায় বুক দোলে। কাগজখানা হাত দিয়ে সমান ক'রে প'ড়তে প'ড়তে বলে নিকলাই :

'এই যে লিখছে পাভেল,—আমরা কেউ পালাবার চেষ্টা করব না। ক'রতে পারি না। তাহ'লে আত্ম-সম্মান হারাব। কিন্তু সম্প্রতি যে চাষী ধরা পড়েছে, তাকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করা প্রয়োজন। সে এখানে অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ ক'রছে। প্রতিদিন কর্তৃপক্ষের সাথে তার হাঙ্গামা মারামারি হচ্ছে। এরই মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা তাকে সেলে কাটাতে হয়েছে। অত্যাচার ক'রে ক'রে এরা মেরে ফেলবে ওকে। সুতরাং এই লোকটির হ'য়ে আমরা সকলে আবেদন জানাচ্ছি আপনাদের কাছে। আমার মাকে সান্ত্বনা দেবেন। তাঁকে বুঝিয়ে বলবেন সব। তিনি বুঝবেন।'

কম্পিত স্বরে শান্তভাবে বলে মা :

'বলার আর কি আছে? আমি সব বুঝি।'

নিকলাই তাড়াতাড়ি অন্যদিকে ফিরে নাক ঝাড়ে।

নিজের মনেই বলে : 'সর্দি লেগেছে মনে হচ্ছে।'

ঘরের মধ্যে পায়চারি ক'রতে ক'রতে হাত তুলে চশমাটা সোজা ক'রে নেয়। বলে :

'সময়ও হয়তো আমাদের হ'ত না।'

'বেশ তো হোক না মোকদ্দমা।' ভ্রূ কু'চকে মা বলে। বিষাদের কুয়াশায় বুকটা ছেয়ে যায়।

'এই মাত্র সেণ্টপিটার্সবুর্গের এক কমরেডের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলাম...'

'এখন যাই হোকগে, সাইবিরিয়া থেকে তো পালাতে পারবে? তাই না?'

'নিশ্চয়। কমরেড্ লিখছেন, শিগ্গিরই ওদের মামলা উঠবে। সাজা—সে ঠিক হয়েই আছে—সব্বাই চালান যাবে। পাষণ্ডদের আর আইন-আদালত কি!· সে তো একটা তামাশা! মামলা আরম্ভ হয়নি—ওদিকে সেণ্টপিটার্সবুর্গে ব'সে তার রায় তৈরী হ'য়ে গেল। দেখ দিকি কাণ্ডটা!'

মা দৃঢ় কণ্ঠে বলে : 'ওসব কথা থাক, নিকলাই ইভানোভিচ্! আমাকে বোঝাবারও দরকার নেই, সান্ত্বনা দেবারও দরকার নেই। পাভেল ঠিক কাজই ক'রবে। মিছামিছি ও কাউকে কষ্ট পেতে দেবে না; নিজেকেও না। আর আমায় সে ভালোবাসে। সেতো নিজেই দেখছ। লিখেছে না, মাকে বুঝিও, সান্ত্বনা দিও...!'

বুকে যেন হাতুড়ীর ঘা পড়তে লাগল। আবেগে মাথা ঘুরতে লাগল।

'আশ্চর্য মানুষ তোমার ছেলে,' অস্বাভাবিক জোরে ব'লে ওঠে নিকলাই, 'বলতে গেলে রীতিমত পুজো করি আমি ওকে।'

মা বলে : 'রীবিন-এর জন্য কি ভাবে কি করা যায় ভাবতে হচ্ছে তো!'

ইচ্ছে হয় মা'র তখনই কিছু ক'রে ফেলে। কোথাও যায়.. বলে, কেবলি বলে যতক্ষণ না দেহ শ্রান্তিতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

নিকলাই পায়চারি ক'রতে ক'রতে বলে : 'বেশ! কিন্তু সাশাকে যে দরকার!'

'সে তো আসবেই। পাভেলের সাথে যেদিন আমার দেখা করার দিন থাকে সে-দিন সে নির্ঘাত আসবে।'

নিকলাই মায়ের পাশে এসে ব'সে পড়ে। মাথা নীচু ক'রে কি যেন ভাবে, ঠোঁট কামড়ায় আর দাড়ি পাকায়।

'এ সময় সোফিয়াও নেই...কি যে মুস্কিল!'

'পাভেল ওখানে থাকতে যদি কিছু করা যেত তো খুব ভালো হ'ত। খুব খুশি হ'ত ছেলেটা।' মা বলে।

চুপ ক'রে ব'সে থাকে দু'জনে। খানিক পরে মা বলে :

'কেন যে ও রাজী হ'ল না, বুঝতে পারি না ..'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় নিকলাই। কিন্তু সেই মুহূর্তেই দরজার ঘণ্টা বেজে ওঠে। দু'জনে চোখ-চাওয়া-চাওয়ি করে।

'সাশা বোধহয়...' চাপা গলায় বলে নিকলাই।

মা তেমনি চাপা স্বরে বলে : 'ওকে এখন বলি কি ক'রে?'

'হুঁ! তাইতো...'

'ভারী দুঃখ হয় বেচারার জন্য...'

আবার ঘণ্টা বাজে। এবার যেন ঘণ্টার শব্দে কিছু ইতস্তত ভাব। আগন্তুক যেন এখনও মনঃস্থির ক'রে উঠতে পারেনি। নিকলাই আর মা দু'জনেই রান্নাঘরে আসে। কিন্তু নিকলাই স'রে দাঁড়ায়। বলে :

'তুমি একাই যাও। সেই ভালো...'

মা দরজা খুলতেই সাশা বেশ সপ্রতিভ ভাবে বলে : 'স্বীকার করেনি তো?'

'না।'

'জানতাম।' খুব সাধারণ ভাবে জবাব দেয় সাশা। কিন্তু মুখখানা একেবারে সাদা হয়ে গেল। কোটের বোতাম একবার খুলে, আর একবার খানিক লাগিয়ে খুলবার জন্য টানাটানি ক'রতে লাগল।

'কি বিশ্রী দিন! যেমনি হাওয়া তেমনি বৃষ্টি! ভাল আছে তো ও?'

'আছে।'

নিজের হাতখানা দেখতে দেখতে বলে সাশা : 'ভাল আছে...শরীরও ভালো আছে ...মনও ভালো...'

ওর দিকে না তাকিয়েই বলে মা : 'লিখেছে, রীবিনের জন্য যেন আমরা কিছু করি।'

'তাই নাকি? তাহ'লে তো যে প্ল্যান করেছিলাম, দেখতে হয় ভালো ক'রে।' সাশা বলে ধীরে ধীরে।

'আমারও তাই মনে হয়,' হঠাৎ দরজার কাছে নিকলাইয়ের মূর্তি, 'আরে! সাশা যে!'

হাত বাড়িয়ে দিয়ে সাশা শুধায় : 'দেখলে হয় না একবার? সবাইতো বলছে চমৎকার প্ল্যান।'

'কিন্তু করবে কর্মাবে কে শুনি? আমরা তো সবাই ভয়ংকর ব্যস্ত।'

তড়াক ক'রে লাফিয়ে ওঠে সাশা : 'বেশ তো, আমায় দিন! আমার তো সময় আছে।'

'বেশ! কিন্তু অন্যদেরও একটু জিজ্ঞাসা ক'রে নিতে হবে...'

'আমিই নেব'খন জিজ্ঞাসা ক'রে। এখুনি যাচ্ছি।'

কোটের বোতাম লাগায় সাশা। এবারে আর লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হয়না হাত।

মা বলে : 'আরে এই তো এলে, একটু জিরিয়ে নাও তো!'

ধীর শান্ত একটু হাসি হেসে বলে ও : 'একটুও ক্লান্ত হইনি, মা!'

নীরবে করমর্দন ক'রে বেরিয়ে যায় সাশা! আবার সেই হিম-কঠিন প্রতিমা!

মা আর নিকলাই জানালার কাছে গিয়ে তাকিয়ে থাকে ওর অপসৃয়মান মূর্তির দিকে। নিকলাই ধীরে ধীরে শিস দেয়। তারপর টেবিলে এসে লিখতে বসে। চিন্তিত ভাবে মা বলে :

'হাতে কাজ এসেছে, এখন ক'দিন বেশ থাকবে মেয়েটা!'

'যা ব'লেছ!' নিকলাই জবাব দেয়। 'প্রিয়-কামনা যে কি বস্তু তা হয়তো তুমি জানোই না। হয়তো সুযোগই হয়নি জানবার। তাই না, নিলোভনা?'

'ফুঃ' হাত নেড়ে বলে মা, 'বিয়ে দেবে ব'লেই যে ভয়ে ভয়ে মরতাম!'

'কাউকে ভালোবাসোনি কখনও?'

'মনে টনে নেই বাপু ওসব। হয় তো বেসেছিলাম। কিন্তু সে কি আর মনে আছে!'

বিষাদ-নিবিড় এক অপূর্ব প্রশান্তিতে ছেয়ে যায় মায়ের মুখ। ব'লে চলে : 'এত মার মেরেছে আমার স্বামী! বিয়ের আগের যা কিছু ছিল, ঠ্যাঙানোর চোটে মগজ থেকে সব বেরিয়ে গেছে।'

মা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, একটু পরেই আবার ফিরে আসে। গভীর অন্তরঙ্গতায় নিকলাইয়ের চোখ দুটি কোমল...মনের আকাশে ওর প্রিয় স্মৃতির আলপনা...বলে :

'আমারও দশা সাশার মতই। একটি মেয়েকে ভালোবাসতাম! আশ্চর্য মেয়ে! ওর সাথে দেখা যখন কুড়ি বছর বয়স আমার। আজও তাকে ভালোবাসি...ঠিক তেমনি ভালোবাসি...সমস্ত প্রাণ দিয়ে, প্রাণের গভীর কৃতজ্ঞতা দিয়ে...। বাসি, বাসবো... চিরকাল।'

চোখে ওর অপূর্ব এক উষ্ণ কোমল আলো দোলে। একটা চেয়ারের পিঠে হাত দু'খানি রেখে, তার ওপর মাথা রেখে ব'সে আছে ও...সুদূর চাহনি ডানা মেলেছে কোন দূর দূরান্তরের পানে। ওর সমস্ত শীর্ণ বলিষ্ঠ দেহখানা—রোমে রোমে, অণুতে অণুতে চুর হ'য়ে আছে কোন অলখ স্বপন-চারিণীর প্রেমে...এযেন...'পুষ্প যেমন আলোর লাগি, না জেনে রাত কাটায় জাগি...'

'বিয়ে ক'রলেনা কেন?' মা শুধায়।

'চার বছর হ'লো বিয়ে হয়ে গেছে ওর।'

'আগে? আগে ক'রলেই তো পারতে!'

'কি জানি হ'য়ে উঠল না।' খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলে ও, 'যখন আমি বাইরে, তখন ও হয় জেলে, নয় সাইবিরিয়ায়। আর যখন ও বাইরে, আমি ভেতরে। ঠিক সাশার মত। শেষ বার ওকে দিলে ঠুকে দশটি বছর। সাইবিরিয়ার সব থেকে দূর একটা জায়গায় পাঠিয়ে দিলে। ভাবলাম, আমিও যাই। কিন্তু ভাবী লজ্জা ক'রল। ওরও লজ্জা পেল। সেখানে আরেকজনের সাথে আলাপ হ'ল ওর,— চমৎকার ছেলে। আমাদেরই একজন কমরেড্। তারপর সেখান থেকে এক সাথে ওরা পালাল। এখন বাইরে আছে এক জায়গায় ওরা।'

চশমাটা খুলে মোছে নিকলাই। আলোর সামনে তুলে ধ'রে আর এক বার ভালো ক'রে মুছে নেয়।

'বেচারা!' মাথা নাড়তে নাড়তে গভীর স্নেহের সঙ্গে বলে মা। মায়ের বড় দুঃখ হয় ওর জন্য। কিন্তু কি যেন আছে নিকলাইয়ের মধ্যে, গভীর বাৎসল্যে মার বুক ভ'রে ওঠে। স্নেহ-কোমল স্নিগ্ধ হাসি মিশে যায় ব্যথার সাথে। ন'ড়ে চ'ড়ে বসে নিকলাই। কলমটাকে নাড়তে নাড়তে আবার বলতে আরম্ভ করে :

'পারিবারিক জীবন বিপ্লবীদের সয়না। অভাব, অনটন, ছেলেপুলে হ'লে তারা কি খাবে সেই চিন্তাই খেয়ে ফেলে। সমস্ত কর্ম শক্তি এতেই বরবাদ।...অথচ শক্তি বাড়ানোই দরকার, যাতে ক্রমশ নিজকে ছড়িয়ে দিতে পারে। এ যে যুগেরই দাবী। সবার চেয়ে আগে আগে আমাদের চলতে হবে; কারণ আমরা শ্রমিক—পুরানো পৃথিবীটাকে ভেঙে নতুন পৃথিবীর পত্তন করার কাজে আমাদের ডাক পড়েছে, ইতিহাসের বরণ-মালা প'ড়েছে আমাদের কণ্ঠে। আমরা অলস হ'য়ে, বা সামান্য একটু পেয়ে অনেক পেলাম ব'লে আত্ম-তৃপ্ত হয়ে যদি পেছনে প'ড়ে থাকি তবে মস্ত ভুল করব—এবং সে-ভুল আদর্শের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতারই সামিল হবে। আদর্শের হানি না ঘটিয়ে, সাথে কাঁধ মিলিয়ে চলতে পারি, এমন তো দেখিনে কাউকে। ক্ষুদ্র লাভ আমাদের নয়—আমাদের লক্ষ্য পূর্ণ বিজয়, একথা ভুললে চলবেনা আমাদের।'

ওর স্বর দৃঢ় হ'য়ে ওঠে; মুখ পাণ্ডুর, চোখে ওর সহজ-প্রশান্ত সংযত-সংহত শক্তির প্রদীপন। আবার ঘণ্টা বাজে। লুদমিল্লা। গালগুলো ওর হিমে লাল। গায়ের কোটটি ঋতুর পক্ষে অত্যধিক হাল্কা—ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছে ও।

পুরোনো ছেঁড়া রবারের লম্বা জুতো-জোড়া খুলতে খুলতে রাগত-স্বরে বলে লুদমিল্লা : 'আগামী সপ্তাহে মোকদ্দমা আরম্ভ হবে।'

পাশের ঘর থেকে চীৎকার ক'রে জিজ্ঞাসা করে নিকলাই :

'ঠিক জানো?'

মা ছুটে ও ঘরে যায়। বুকের মধ্যে তুফান—ভয়ের না আনন্দের, কে জানে? লুদমিল্লা সাথে সাথে যায়।

'জানি বৈকি!' ওর গভীর স্বরে বিদ্রূপের আভাস, 'চমৎকার বিচার! বিচারের আগেই রায় তৈরী! আদালতে তো সবাই জানে! গোপন করার দরকারও মনে করেনা বেহায়ারা! বলতে পার এর মানে কি? সরকারের কি ভয় হচ্ছে যে তাদের পোষা গোলামেরা দুষমনদের ওপর যথেষ্ট শক্ত হ'তে পারবেনা! গোলামদের জল্লাদী শেখাবার এত ফন্দিফিকির করেও সরকারের ভয় গেলনা! হয়তো সন্দেহ আছে কি জানি যদি মানুষের ছিঁটেফোঁটা এখনও বাকী থেকে থাকে ওদের মধ্যে!'

লুদমিল্লা চৌকীর ওপর ব'সে পড়ে শীর্ণ গালে হাত বুলায়। ওর চোখে ঘৃণা ঠিকরে পড়ছে। স্বর ক্রমশই উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে! নিকলাই ওকে শান্ত করতে চেষ্টা করে :

'মিছে শক্তিক্ষয় করছ, লুদমিল্লা! ওরা তো আর শুনতে পাচ্ছে না...'

মা নিবিষ্ট মনে লুদমিল্লার কথা শোনে, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারেনা—কারণ সমস্ত চিন্তা জুড়ে...বিচার...আগামী সপ্তাহে...

সহসা সচকিত হ'য়ে ওঠে মা...এক অমোঘ, অমানুষিক শক্তি...তারই সাথে বোঝা-পড়ার পালা এবার।

তেইশ

একটা বিহ্বলতার আবেশে আর উদ্গ্রীব প্রতীক্ষার মধ্যে কেটে গেল দুটো দিন। তৃতীয় দিনে সাশা এসে বললে নিকলাইকে :

'সব তৈরী। আজ একটায়...'

'এত শিগ্গির?' অবাক হয়ে যায় নিকলাই।

'কেন? অবাক হবার কি আছে? খালি তো একটু কাপড়-চোপড়, আর রীবিন এসে কোথায় থাকবে তার একটু ঠিকানা ক'রে রাখা, এই তো! বাকী তো সব গোবান করবে নিজে। ভেসভশিচকভ [ছদ্মবেশেই অবশ্য] তৈরীই থাকবে। বাস্ রীবিন ছুটে এলেই ও তার গায়ে একটা কোট ফেলে দেবে আর মাথায় একটা টুপী। তারপর রাস্তাটা দেখিয়ে দেবে। পুরো পোষাক নিয়ে আমি তৈরীই থাকব। এবং সেখান থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাবো।

'তা মন্দ নয়। কিন্তু এই গোবানটি কে?' নিকলাই জিজ্ঞাসা করে।

'তোমার চেনাই তো। এরই ঘরে তো কল-মিস্ত্রীদের নিয়ে পাঠ-চক্র বসাতে!'

'ওঃ হোঃ! মনে পড়েছে। এক আজব চিড়িয়া!'

'সৈন্য ছিল। অবসর নিয়েছে। এখন টিন-মিস্ত্রীর কাজ করে। খুব যে একটা

উঁচু-পৈঠের লোক তা নয়, তবে রোখা আছে। অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে হাড়ে হাড়ে ওর ঘৃণা।...আর বোধ হয় একটু দার্শনিক ধরনের,' চিন্তিত ভাবে বলে সাশা জানালার দিকে তাকিয়ে। নিঃশব্দে শুনছিল মা; একটা অস্পষ্ট সংশয় যেন মনের মধ্যে দানা বাঁধতে থাকে। বলে :

'মনে আছে সেই ইয়েভচেঙ্কোকে? গোবানের ভাইপো। তাকেই বের ক'রে আনতে চায় গোবান।'

নিকলাই মাথা নাড়ে।

সাশা ব'লে যায় : 'সব ব্যবস্থা ক'রেছে ও। কিন্তু আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে সব ভেস্তে যাবে। কয়েদীরা হাওয়া খেতে বাইরে আসে ঐ সময়। মইটা চোখে প'ড়লে সবাই এদিকে ছুটবে।'

চোখ বোজে সাশা। কথা বলে না। মা উঠে ওর কাছে যায়।

'...সব...সব নষ্ট হ'য়ে যাবে...'

তিন জনেই জানালার কাছে দাঁড়িয়ে। নিকলাই সাশার পেছনে। ওদের দ্রুত কথাবার্তায় মায়ের মনে কতরকম যে অনুভূতির লহর ওঠে তার ঠিক ঠিকানা নাই।

'আমিও যাচ্ছি, চল।' হঠাৎ ব'লে ওঠে মা।

'কেন?' শুধায় সাশা।

'যেও না, শেষে যদি তোমার কিছু হয়! যেও না, বুঝলে!' উপদেশ দেয় নিকলাই। মা ওর দিকে তাকিয়ে অনুচ্চ দৃঢ় কণ্ঠে বলে :

'না, আমি যাবই।'

তিনজনে চোখাচোখি হয়ে যায়। কাঁধ নেড়ে সাশা বলে :

'বুঝেছি।'

তারপর মায়ের হাতখানা ধ'রে সহজ ভাবে বলে : 'কিন্তু মা, বুঝে দেখেছেন তো! মনের মধ্যে কিন্তু কোন আশা রাখবেননা!..'

কাঁপতে কাঁপতে সাশাকে জড়িয়ে ধ'রে মা বলে :

'ভয় নেইরে মা, ভয় নেই। আমায় নিয়ে ওদের কোন অসুবিধা হবে না। শুধু আমায় সঙ্গে যেতে দে। কি জানি আমার মোটেই বিশ্বাস হচ্ছে না যে জেল থেকে সত্যি সত্যিই পালানো যায়...'

'মা কিন্তু যাচ্ছেন আমাদের সাথে।' সাশা বলে নিকলাইকে।

'সে তোমরা জান।' মাথা নীচু ক'রে জবাব দেয় নিকলাই।

'এক সাথে কিন্তু থাকা চলবে না। আপনি যাবেন ওধারের ফাঁকা মাঠটায়। জেলের পাঁচিল দেখা যায় ওখান থেকে। কিন্তু কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে ওখানে কি করছেন, তাহলে?'

'সে তখন দেখা যাবে,' আগ্রহ ভরে বলে মা।

'মনে রাখবেন কিন্তু, জেলখানার সেপাইরা আপনাকে চেনে।' সাশা সাবধান করে। 'তারা যদি আপনাকে দেখে ফেলে...'

'না, না, দেখতে পাবে না...'

যে আশা ধিকিধিকি বুকের মধ্যে জ্বলছিল, হঠাৎ তা শিখায় শিখায় দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠল।

'যদি, যদি পাশাও...'

ঘণ্টা খানেক পরে দেখা গেল মা জেলের পেছন দিককার মাঠে দাঁড়িয়ে আছে।

সাংঘাতিক হাওয়া। মায়ের কাপড় চোপড় যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। জমাট-বাঁধা মাটির বুকে ঝাপটা মেরে, বাগানের নড়বড়ে বেড়াটাকে ঝাঁকানি দিয়ে, সমস্ত শক্তি দিয়ে হাওয়া পাঁচিলের গায়ে আছড়ে পড়ছে। ভেতরকার আঙিনা থেকে মানুষের চীৎকার কুড়িয়ে নিয়ে ঘূর্ণির আবর্তে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ছাড়িয়ে দেয় ঊর্ধ্ব আকাশে যেখানে ক্ষণে ক্ষণে সুনীল উন্নতির বাতায়ন খুলে দিয়ে ছুটোছুটি করে মেঘের দল।

মায়ের পেছনে সমাধি-স্থান। ডান দিকে প্রায় ফুট সত্তরেক দূরে জেলখানা। কবরখানার কাছে একজন সৈন্য একটা ঘোড়াকে দৌড় করাচ্ছে। আরেকজন পাশে দাঁড়িয়ে মাটিতে পা ঠুকে ঠুকে চীৎকার করছে, হাসছে, গাইছে। এ ছাড়া জেল-খানার আশে পাশে আর কেউ নেই!

চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি ফেলতে ফেলতে মা ওদের পাশ কাটিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে কবরখানার বেড়ার ধারে। হঠাৎ যেন হাঁটু দুটো ভেঙে পড়তে চায়; পা যেন মাটির মধ্যে জমে বসে গেছে এমনি ভারী। মইটাকে কাঁধে ফেলে অভ্যস্ত দ্রুতগতিতে কুঁজো ফরাশ আসে ওদিক থেকে। ভয়ে ভয়ে মা সৈন্যদের দিকে তাকায়—। এক জায়গায়ই দাঁড়িয়ে আছে তারা; ঘোড়াটা চর্কীর মত চারধারে ঘুরছে তাদের। মই-ওয়ালা লোকটার দিকে চায় মা—ওইযে মইটাকে দেয়ালে ঠেকিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়ে ধীরে সুস্থে উঠে যাচ্ছে সে। জেলের মধ্যে তাকিয়ে কি ইসারা ক'রে সে তাড়াতাড়ি নেমে ওধার দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। মায়ের বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করতে থাকে। সময় যেন খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলছে। কালো, ছ্যাঁৎলা-ধরা দেয়ালটার সাথে মইটা প্রায় মিশে গেছে। আস্তর খ'সে প'ড়ে জায়গায় জায়গায় ইঁট বেরিয়ে প'ড়েছে দেয়ালের। হঠাৎ একটা কালো মাথা দেখা যায় দেয়ালের ওপর দিয়ে—তারপর দেহটা; পাঁচিল ডিঙিয়ে গুঁড়ি মেরে ওদিকে চ'লে যায়। ভালুকে টুপী-পরা আরেকটা মাথা দেখা যায় এবার—একটা কালো রংএর বল যেন গড়িয়ে গড়িয়ে মাঠ পেরিয়ে মোড়ের দিকে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। সোজা হ'য়ে দাঁড়ায় মিখাইলো...চারদিকে চায়...আর মাথা নাড়ে...।

'পালাও, পালাও!' মাটিতে পা ঠুকে ফিস্ফিস্ ক'রে বলে মা।

মায়ের কান ভোঁ ভোঁ করে। ভয়ংকর চ্যাঁচামেচি উঠল। পাঁচিলের ওপর তৃতীয় মাথা। মা দুই হাতে বুক চাপে। নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসে। অজাতশ্মশ্রু কচি একখানা মুখশুদ্ধ সোনালী মাথাটা ভেসে উঠেই, আবার টুপ্ ক'রে নেমে গেল। কোলাহল বেড়ে উঠল। বাতাসে ভেসে আসে পাগলা ঘণ্টির কর্কশ শব্দ। মিখাইলো পাঁচিল ঘেঁষে চলছে—মায়ের পাশ দিয়ে চলে গেল। জেলখানার সীমা শেষ হ'য়ে এল; খানিক পরেই শহরের বসতি সুরু। মাঝখানের ফাঁকা মাঠটায় এসে পড়েছে মিখাইলো। মায়ের মনে হয় মানুষটা যেন বড্ড সোজা হয়ে, বড্ড ধীরে ধীরে হাঁটছে—ওকে একবার যে দেখেছে, সে যে কখনও ভোলেনা!

'জলদি, জলদি হাঁটো না!' মা চাপা স্বরে চীৎকার করে। ধড়াম্ ক'রে কি যেন একটা পড়ল জেলখানার ওধারে। ঝন্ঝন্ ক'রে কাঁচ ভেঙে পড়ার শব্দ পায় মা। সেপাইদের মধ্যে একজন শক্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে ঘোড়ার রশি ধ'রে টানে। আর একজন হতাটা চোঙের মত ক'রে মুখের সামনে ধরে জেলখানার দিকে ফিরে চীৎকার করতে আরম্ভ করে। তারপর কান পেতে দাঁড়িয়ে রইল—ওধার থেকে কোন সাড়া আসে কিনা।

মায়ের সমস্ত চেতনা উদগ্র হ'য়ে আছে কোথায় কি হয় শোনবার জন্য। ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে চায় চারদিকে—চোখ দেখে সব, বিশ্বাস করতে পারেনা কিছু।

এত সহজে পলক না ফেলতে এত কাণ্ড হ'য়ে গেল! কোথা দিয়ে কখন যে কি হ'ল যেন ঠাহর করতে পারল না মা—হকচকিয়ে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইল। কত ভয়, কত ভাবনা হ'য়েছিল। মনে হ'য়েছিল কত কঠিন সাংঘাতিক ব্যাপার। ফুঃ।

কোথায় রীবিন? রাস্তা দিয়ে চলেছে লম্বা ওভারকোট-পরা এক ঢ্যাঙ্গা ভদ্দরলোক; তার আগে আগে হন্‌হনিয়ে চলেছে এক মেয়ে। তিনজন সান্ত্রী জেলখানার ওধার থেকে ধেয়ে বেরিয়ে এল। ডান হাত বাড়িয়ে গায়ে গায়ে সেঁটে দৌড়ুচ্ছে ওরা। একজন সেপাই ছুটে ওদের কাছে আসে। আর একজনের চলে ঘোড়ায় চড়ার কসরৎ। এক লহমা স্থির হ'য়ে দাঁড়ায়না হতভাগা জানোয়ারটা; অনবরত চর্কিবাজীর মত ঘোরে, আর চড়তে গেলে সামনের দুই ঠ্যাং তুলে মারে শূন্যে লাফ। ওর লাফের সাথে মনে হয় চারধারের সবকিছু লাফিয়ে ওঠে। উন্মত্তের মত হুইসেল বেজে চলেছে অনবরত। বায়ুমণ্ডলের বুক ফালি ফালি হ'য়ে ভেসে আসছে তার শব্দ। সেই মরীয়া চীৎকারে মায়ের সম্বিৎ ফিরে আসে। এতক্ষণে খেয়াল হয় চারধারে বিপদ। কেঁপে ওঠে মা। সেপাইদের দিকে লক্ষ্য রেখে চলতে আরম্ভ করে কবরখানার ধার দিয়ে। কিন্তু সান্ত্রীরা আর সৈন্যরা চলে গেল। ঠিক পরেই আর একটি মানুষ ছুটে এল আলুথালু বেশে। মা চিনতে পারে—ছোট-জেলার। সাথে সাথেই যেন ভুঁই ফুঁড়ে উঠল পুলিশ আর উত্তেজিত দর্শকের ভিড়।

পাগল হাওয়ার ঘূর্ণী-নৃত্য; যেন উল্লাসে মেতেছে। হুইসেলের শব্দ আর টুকরো টুকরো কোলাহল বাতাসে ভেসে আসে...খুশি হ'য়ে ওঠে মা এই ডামাডোলে। পা চালিয়ে দেয়। চলতে চলতে মনে হয়...ও-ও তো পারতো...এত সহজ...।

সহসা দু'জন পুলিশ ছুটে এল সামনের দিক থেকে।

'থামো।' একজন হাঁকে। হাঁপাচ্ছে মানুষটা। 'দেখেছ?.. একটা—লোক... দাড়িওয়ালা?'

বাগানের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় মা। যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাবে বলে: 'ওই হোথা দিয়ে গেল। কেন গা?'

'ইয়েগরোভ! হুইস্‌ল্ বাজাও!'

মা বাড়ীর পথ ধরে। কিসের যেন একটা ব্যথা খচ্‌খচ্ করে বুকের মধ্যে। কিসের যেন তিক্ততা, অনুশোচনা। রাস্তায় এসে পড়ে মাঠ পেরিয়ে। একটা গাড়ী চ'লে যায় পাশ দিয়ে। ভেতরে ব'সে এক যুবক—পাণ্ডুর মুখ, লাল গোঁফ। চোখাচোখি হ'য়ে যায় ছেলেটার সাথে।

উল্লসিত হ'য়ে স্বাগত জানায় নিকলাই:

'তারপর, কি হ'ল?'

'সব ভালোই তো মনে হচ্ছে।'

খুঁটিনাটি মনে ক'রে সব বলতে চেষ্টা করে। কিন্তু যেন কোন শোনা কাহিনী শোনাচ্ছে মা যা নিজেই বিশ্বাস করতে পারেনি।

হাত কচলাতে কচলাতে নিকলাই বলে: 'ভাগ্যি ভালো আমাদের। বাপ্‌রে বাপ্! কি ভাবনাই যে হচ্ছিল তোমার জন্য! কি জানি যদি কিছু হয়। শোন, শুভানুধ্যায়ীর কথা শোন, পাভেলদের মামলা নিয়ে আর ভয়-ভাবনা করো না। ও যত শিগ্‌গির চুকে যায় ততই ভালো। তত শিগ্‌গির পাভেল বেরিয়ে আসতে পারবে। হয়তো বা চালান যাবার পথেই স'রে পড়বে। আর হ্যাঁ মোকদ্দমা—তা মোটামুটি এইভাবে হবে...'

বিচারপদ্ধতি বোঝাতে বসে মাকে। কিন্তু ওর কথা শুনে মার বুঝতে বাকী

থাকেনা, সান্ত্বনা ও দিচ্ছে বটে, কিন্তু ওর নিজের মনেই ভয় রয়েছে।

'তোমার বুঝি ভয় হয়েছে,' হঠাৎ ব'লে ওঠে মা, 'যে আদালতে আমি কোন বেফাঁস কথা ব'লে ব'সব, বা হাত জোড় ক'রে ভিক্ষে ক'রব কর্তাদের কাছে?'

'না, না। তা নয়। কে বললে?' আহত স্বরে বলে নিকলাই।

'ভয় সত্যি করছে, কিন্তু কিসের ভয় বুঝতে পারছিনা নিজেই।' ব'লে থেমে যায় মা। ওর চোখ ঘরের মধ্যে চারধারে ঘোরে।

'এক এক সময় মনে হয় কি, জান? হয়তো পাশার সাথে ইজ্জত রেখে কথা কইবেনা ওরা। চাষাভুষো ক'রে, যাচ্ছেতাই করবে হয়তো। আমার পাশা, ভারী মানী ছেলে। সইবেনা, মুখের ওপর জবাব দিয়ে ব'সবে। আন্দ্রিয়েইও বাঁকা বাঁকা কথা বলবে হয়তো! ওদিকেও তো মাথা গরম সব! যদি...যদি ওরা বরদাস্ত না করে! যদি...যদি...এমন শাস্তি দেয়...ওঃ...আর তো দেখতে পাবনা তা'হলে...!'

নীরব নিকলাই। কপাল কুঁচকে দাড়ি টানতে থাকে শুধু।

'কিছুতেই মনটা ঠাণ্ডা হ'চ্ছে না। থেকে থেকে কেবল ওই কথাই মনে হচ্ছে।' আস্তে আস্তে মা বলে: 'শুধু এজন্যই—নইলে মামলায় আর অত ভয় করার কি আছে। একবার যদি সুরু ক'রে, তো হেস্তনেস্ত ক'রে ছাড়বে। ভয়তো আর সাজাকে নয়, ভয় ওই হেস্তনেস্তকে। ঠিক বোঝাতে পারছিনা...'

মায়ের মনে হয় নিকলাই বুঝতে পারছে না সব কথা। তাই মনের আশংকা বোঝাতে গিয়ে আরো কষ্ট হয় মায়ের।

চব্বিশ

গলায় যেন ছ্যাৎলার মত হ'য়ে জমে আছে ভয়টা। দম বন্ধ হ'য়ে আসে। মামলার দিন বুকের ওপরকার জগদ্দল পাথরটাকে নিয়েই, ধুঁকতে ধুঁকতে মা আদালতে আসে।

আগেকার কারখানা-বস্তির অনেক মানুষের সাথে দেখা হয় রাস্তায়। সম্ভাষণ জানায় সবাই। মা শুধু নিঃশব্দে প্রতি-নমস্কার ক'রে ক্ষুব্ধ জনতার মধ্য দিয়ে চলে যায়। আদালতের ঘরে বারান্দায় আসামীদের অনেকের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দেখা হয়। চাপা স্বরে নানা রকম মন্তব্য করছে তারা। কথাগুলা ঠিক বুঝতে পারেনা মা; নাই বুঝুক। বাইরের প্রকাশ আজ বাহুল্য। সবার বুকে আজ একই ব্যথা জ্বলছে। জানে মা। জেনেই তো আরো বেশী যাতনা।

'বসো এখানটায় আমার পাশে।' স'রে জায়গা ক'রে দিয়ে সিজভ্ বলে।

বাধ্য মেয়ের মত ব'সে পড়ে মা। চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। সবুজ, লাল, হলদে ফুট্কী, ডোরা কাটা নানান রকম রঙের বাহার নাচছে চোখের সামনে।

ওপাশে বসে আছে এক বৃদ্ধা। বলে: 'তোমার ছেলেই বুঝি গো আমার গ্রীশাকে এই সর্বনাশের মধ্যে টেনে নামালে?'

রেগে যায় সিজভ: 'চুপ কর, নাতালিয়া।'

মা স্ত্রীলোকটির দিকে চায়—সাময়লভের মা। তার স্বামী ব'সে আছে ওই ওধারে। বেশ চেহারা লোকটির—মুখখানা যদিও রোগা। মাথায় টাক, লম্বা লাল

দাড়ি। চোখ কুঁচকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সামনে। ভেতরের উত্তেজনায় দাড়ি কাঁপছে থির্‌থির্ ক'রে।

জানালাগুলো অনেক উঁচুতে। কাঁচের ওপর প'ড়েছে তুষারের পুরু পলেস্তারা। তারই মধ্য দিয়ে বিচ্ছুরিত ফিকে আলোয় আদালত-কামরা আলো হ'য়ে আছে। দুই জানালার মাঝখানে ঝলমলে গিল্টিকরা কারুকার্য-খচিত ফ্রেমে আঁটা জারের বিরাট ছবি, লালরঙের ভারী জানালার পর্দার আড়ালে তার ধারগুলো প'ড়েছে ঢাকা। ছবির সামনেই সবুজ বনাত ঢাকা লম্বা একটা টেবিল। ঘরেব প্রায় মধ্যখান পর্যন্ত এসে পড়েছে টেবিলটা। ডানদিকের দেয়ালের কাছে কাঠ-গড়া। দুটো কাঠের বেঞ্চি পাতা তার ভেতরে। আর বাঁ দিকের দেয়াল ঘেঁষে লাল মখমলের গদি আঁটা দুই সারি আরাম-চেয়ার। সবুজ কলার আর সামনের দিকে সার-বাঁধা সোনার বোতাম আঁটা উর্দি-পরা পরিচারকের দল ব্যস্ত হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঘরের মধ্যকার আবহাওয়াটা গুমট্। তার মধ্যে শুধু ভীরু ফিস্‌ফিসানির শব্দ আর ওষুধের গন্ধে ভরা। এই রং, আলো, শব্দ, গন্ধ চোখে কানে যেন বিঁধতে থাকে। নিশ্বাসের সাথে বুকের মধ্যে গিয়ে একটা বস্তুহীন, অনেকটা ব্যথার মত ভয়ে মর্ম ছেয়ে ফেলে।

হঠাৎ কে যেন জোরে কথা ক'য়ে উঠল। মা চম্‌কে ওঠে। দেখে সবাই উঠে দাঁড়িয়েছে। সিজভের হাত ধরে সবার সংগে মাও উঠে দাঁড়ায়।

বাঁ দিকের উঁচু দরজাটা খুলে যায়। চশমাপরা এক বৃদ্ধ খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে ঘরে ঢোকে। তাঁর গালের ওপরকার সাদা জুলপি কাঁপছে। গোঁফহীন ওপরের ওষ্ঠ দন্তহীন মুখের মধ্যে অনেকটা ঢুকে গেছে। কলার-ঘেরা গর্দানটা দেখাই যাচ্ছেনা। মনে হচ্ছে ওটা নেই। শুধু থুতনি আর চোয়াল জেগে আছে কলারের ওপর দিয়ে। এক দীর্ঘকায় যুবকের ওপর ভর দিয়ে বৃদ্ধ হাঁটছেন। যুবকের লাল চওড়া মুখখানাকে মনে হয় চীনেমাটির মুখ। এদের পেছনে এল আরো ছ'জন। তিনজন বেসামরিক পোষাকে, আর তিনজনের জরির কাজ করা উর্দি পরা।

মিছিল করে আসা, টেবিলে এসে গদীয়ান হয়ে বসা—অনেক লম্বা পালা। শেষ হ'তে প্রচুর সময় লাগল। একটা চাছা-ছোলা মুখ, ফোলা ঠোঁটগুলিকে বিশ্রী ভাবে নেড়ে নেড়ে বৃদ্ধের ওপর ঝুঁকে পড়ে ফিস্‌ফিসিয়ে কি জানি বলে। বৃদ্ধ দারুর মত নিশ্চল আর খাড়া হয়ে ব'সে শোনে। চশমার কাঁচের পেছনে মা শুধু দুটি কালো ফুট্‌কি দেখতে পায়।

টেবিলের ওধারটায় লেখার টেবিলটা। তার সামনে টাক-মাথা লম্বা এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। হাতে এক তাড়া কাগজ। গলা খাঁখারি দিতে দিতে কাগজগুলো উল্টে চলেছেন তিনি।

বৃদ্ধ সামনের দিকে ঝুঁকে প'ড়ে বলতে আরম্ভ করে। প্রথম কথাগুলো বেশ স্পষ্ট, কিন্তু পরেরগুলো যেন জট্‌লা হয়ে পাত্‌লা ঠোঁটদু'টির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে লাগল :

'আমি ঘোষণা করিতেছি ..আসামীদিগকে উপস্থিত করা হউক...।'

মাকে একটা ঠ্যালা দিয়ে উঠে দাঁড়ায় সিজফ্। 'দেখ...দেখ...'

কাঠগড়ার পেছন দিককার দরজা খুলে যায়। কাঁধ পর্যন্ত খোলা তলোয়ার উঁচিয়ে প্রথমে আসে একজন সৈন্য। তার পেছনে পাভেল, আন্দ্রিয়েই, ফিওদর, মাজিন, গুসেভ ভাইরা, সাময়লভ, বুকিন, সমভ, আরও পাঁচটি ছেলে—নাম মা জানেনা। পাভেল মায়ের দিকে চেয়ে মৃদু হাসে। আন্দ্রিয়েই এক গাল হেসে

নমস্কার করে। ওদের হাসি আর খুশি খুশি মুখগুলোয় এজলাস ঘরের গুমট কেটে হাওয়া হালকা হ'য়ে যায়। নিবে যায় জাঁকালো উর্দির সোনার কাজের জলুষ। যে প্রশান্ত বিশ্বাস, যে প্রাণ-স্যন্দী শক্তি সাথে ক'রে নিয়ে এলো বন্দীরা তার তেজে মার সাহস ফিরে এল, বুকে বল এল। মায়ের পেছনে বেঞ্চিতে এতক্ষণ বিমর্ষভাবে যারা বসেছিল তারাও সজীব হ'য়ে উঠল। সিজভ বলে :

'দেখছ? ভয় নেই ওদের মোটে!'

সাময়লভের মা কি যেন বলে আপন মনে।

'চুপ!' হুকুম আসে।

বৃদ্ধ হাঁকে, 'সাবধান ক'রে দিচ্ছি...'

প্রথম বেঞ্চিতে ব'সেছিল পাভেল, আন্দ্রিয়েই, মাজিন, সাময়লভ আর গুসেভ ভাইয়েরা। আন্দ্রিয়েই দাড়ি কামিয়েছে, কিন্তু গোঁফ রেখেছে। গোঁফ-জোড়া এমনি ঝুলে প'ড়েছে লম্বা হ'য়ে যে ওর গোল মাথাটা বেড়ালের মাথার মত দেখাচ্ছে। ওর মুখের মধ্যে যেন নতুন একটা কি, ওষ্ঠে তীক্ষ্ণতা, আর শ্লেষ; চোখের দৃষ্টিতে কাঠিন্য। মাজিনের ওপরের ওষ্ঠে দুটো গভীর কালো রেখা প'ড়েছে; মুখখানায় যেন মাংস লেগেছে। সাময়লভের তেমনি কোঁকড়া চুল; ইভান গুসেভের তেমনি গাল ভরা হাসি।

মাথা নীচু ক'রে সিজভ বলে : 'আঃ ফিওদর! ফিওদর!'

জেরা করতে আরম্ভ করেন হাকিম। মা শুনতে পায়। তাকায় না বৃদ্ধ বন্দীদের দিকে; ভালো ক'রে কথা বোঝা যায়না। মাথাটা নিশ্চল হ'য়ে আছে কলারের উপর। মা শোনে তার ছেলের জবাব—শান্ত, ধীর, সংক্ষিপ্ত। মার আশা হয় প্রধান বিচারক আর তাঁর সহকারীরা কেউই নিষ্ঠুর হ'তে পারবে না পাভেলের ওপর। টেবিলে-বসা মানুষগুলির মুখের ভাষা পড়তে চেষ্টা করে মা, রায় কি হবে তার যদি একটু আভাষ পাওয়া যায়। কি জানি কেন আশা বাড়ে—।

চীনেমাটির মতো মুখওয়ালা লোকটি একঘেয়ে স্বরে কি একটা কাগজ প'ড়ে গেল। শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের মত ব'সে রইল শুনে। চারজন উকিল চাপা, উত্তেজিত স্বরে কি আলোচনা করছে আসামীদের সাথে। ওদের চলন-বলন দ্রুত, দৃঢ়; চেহারা মস্ত মস্ত দাঁড়কাকের মত।

বৃদ্ধের ডানদিকের আরাম-কেদারায় ব'সে একজন বিচারক। আর বাঁ দিকে আরও একজন। প্রথম ব্যক্তির ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ চর্বিতে ঢেকে গিয়েছে। দ্বিতীয় জনের লাল গোঁফ, পাঁশুটে মুখ আর ঝুঁকে পড়া কাঁধ। চোখ বুজে ক্লান্ত ভাবে চেয়ারে মাথা এলিয়ে বসে আছেন। মন...কোথায় কে জানে...হয়তো চলে গেছে বহু দূর। সরকারী উকিলের মুখেচোখে অসীম ক্লান্তি আর বিরক্তি। বিচারকদের পেছনে বসে আছেন বিশিষ্ট তিনজন ব্যক্তি। একজন মেয়র—স্থূল দেহ, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ; মুখে চিন্তার ছাপ। বসে বসে গালে টোকা মারছেন। আর একজন এক পদস্থ কর্মচারী, মার্শাল অফ্ দি নোবিলিটি, সাদা চুল, লাল টুকটুকে গাল, বড় বড়, অমায়িক দুই চোখ। আর আছেন ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব—বেচারা তাঁর জালার মত পেটটি নিয়ে বড়ই বিব্রত। কোটের ঝুল দিয়ে বারংবার সেটি ঢাকছেন, বারংবার ঢাকা সরে যাচ্ছে।

পাভেলের বলিষ্ঠ কণ্ঠ গম্‌গম্ ক'রে ওঠে : 'এখানে অপরাধী বা বিচারক নেই—আছে শুধু জুলুমবাজ আর তাদের নিরীহ শীকার।'

এজলাস নিস্তব্ধ। শুধু কলম চলে খস্ খস্ ক'রে। খানিক পর্যন্ত কলমের শব্দ আর নিজের হৃদ্‌পিণ্ডের কলরব ছাড়া আর কিছুই শুনতে পায়না মা।

প্রধান-বিচারক মন দিয়ে শোনেন। এর পর কি হবে তার জন্য যেন উদ্‌গ্রীব হ'য়ে আছেন। সহকারীরা উস্‌খুস্ করে। অবশেষে বলেন :

'আন্দ্রিয়েই নিখোদ্‌কা তুমি কি স্বীকার কর যে—'

ধীরে ধীরে ওঠে আন্দ্রিয়েই। কাঁধটাকে ঝাঁকানি দিয়ে, গোঁফ চুমরিয়ে ভ্রূ কুঁচকে বিচারকের দিকে তাকিয়ে বলে ওর স্বভাব-সুরেলা, তাড়াহীন, ত্বরাহীন কণ্ঠে :

'কি অপরাধ করেছি যে স্বীকার করব? খুন করিনি, চুরি ডাকাতি করিনি; যে অবস্থায় পড়ে মানুষ চুরি-ডাকাতি করতে বাধ্য হচ্ছে, ভাইয়ে ভাইয়ে হানাহানি করছে, সেই হীন অবস্থাটাকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছি। এই কি অপরাধ?'

বৃদ্ধ অতি কষ্টে বলে : 'আরো সংক্ষেপে।'

মা টের পায়, তার পেছনের বেঞ্চির মানুষগুলি চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তারা নড়াচড়া করে, কনাকানি করে—চীনেমাটির মুখের মত মুখ-ওয়ালা মানুষটার কথা কিছু বুঝতে পারেনি তারা, এখন যেন কিছু বুঝতে পারছে। সিজভ বলে : 'আরে শোনই না, বলছে কি।'

'ফিওদর মাজিন! জবাব দাও।'

'জবাব? কিসের জবাব দেব? দেবনা জবাব।' লাফিয়ে ওঠে ফিওদর। ওর মুখ লাল হয়ে উঠছে; চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে। কেন জানি হাত দুটো ও পেছনে করে রেখেছে।

সিজভ হাঁপাতে থাকে। অবাক হয়ে চেয়ে থাকে মা।

'আমার পক্ষ-সমর্থনের জন্য কোন উকিল মোক্তারের দরকার নেই আমার। আমি কোন কৈফিয়ৎ দেব না। এ মামলা বেআইনী। কে তোমরা! আমাদের বিচার করার অধিকার কে দিল তোমাদের? জনসাধারণ তোমাদের সে সনদ দেয়নি। সুতরাং তোমাদের কর্তৃত্ব আমি অস্বীকার করি।'

ব'সে পড়ে ফিওদর। উত্তপ্ত মুখ আন্দ্রিয়েইর কাঁধের পিছনে লুকায়।

স্থূলকায় প্রধান বিচারকের কানে কানে কি যেন বলে। তৃতীয় বিচারক একবার চোখ খুলে বন্দীদের তির্যক দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে সামনে-রাখা কাগজখানায় কি যেন টুকে নেন। ম্যাজিস্ট্রেট্ ন'ড়েচড়ে বসেন। এবারে পেটটি হাঁটুর ওপর পড়ায় একটু সুবিধা হয়েছে বসার। হাত দিয়ে ঢাকাও চলছে ওটি। ঘাড় না ফিরিয়েই শরীরটাকে একটু পাক দিয়ে প্রধান কি যেন বলেন ওর কানে কানে। তিনি নতমস্তকে অবহিত-চিত্তে শোনেন। পদস্থ কর্মচারীর কথা কানে যায়। তিনি আবার সরকারী উকিলকে বলেন। মেয়র গালে টোকা মারতে মারতে শোনেন সে-কথা। প্রধানের প্রাণহীন কণ্ঠ আবার শোনা যায়।

সিজভ অবাক হয়ে মাকে বলে : 'দেখলে তো কেমন দিলে ওদের? এ লোকটাই ভালো দেখছি দলের মধ্যে!'

মা না বুঝেই হাসে একটু। তাঁর মনে হয়, যা কিছু ঘটছে সবই এক অত্যাসন্ন, অতি ভয়ানক ভবিতব্যেরই ক্লান্তিকর ভূমিকা। কি প্রয়োজন ছিল এ ভূমিকার! যা হবার তা তো ঠিক হয়েই আছে। সে পরিণাম ভীষণতায় সকলকে দলে পিষে চুরমার ক'রে দিয়ে যাবে। কিন্তু পাভেল আন্দ্রিয়েইর কথাগুলি যেন অভয়মন্ত্র

ছড়িয়ে দিয়ে গেল। এত জোর কোথায় পেলে? এ যেন আদালত নয়, কুলি-বস্তির সেই ছোট্ট ঘরখানায় বসেই ওরা কথা বলছে—এমনি সহজে, এমনি নির্ভয়ে ব'লে গেল। ফিওদরের তেজোদ্দীপ্ত কথাগুলোও মার প্রাণে ঘা দিয়েছিল। পেছনে যারা ব'সে আছে, তাদের উত্তেজিত কথাবার্তা থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে শুধু মাই নয়, তারাও অনুভব করছে যে এ মামলা আর কিছু না হোক মানুষের ভয়ের আগল ভেঙে দিয়ে গেল।

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করে : 'আপনাদের মত কি?'

টাক-মাথা সরকারী উকিল উঠে দাঁড়ালেন। ডেস্কের ওপর একটা হাত রেখে, নানা রকম সংখ্যার অবতারণা ক'রে গড় গড় ক'রে একটা বক্তৃতা দিয়ে গেলেন। সাদামাটা স্বর। ভয় পাবার মত কিছু নেই। তবু ভয় করে মার। কাঁটার মত খচ্ খচ্ ক'রে ভয়টা বিঁধছে বুকের মধ্যে। হাওয়ার মধ্যেই কি যেন একটা অশুভ ইঙ্গিত, যা দুর্ভেদ্য মেঘের আড়াল রচনা ক'রে বিচারকদের বাইরের সব কিছু থেকে বাঁচিয়ে ঢেকে রাখতে চায়। বিচারকদের দিকে তাকায় মা। দুর্বোধ্য সব! কত ভয় পেয়েছিল মা—পাভেল, ফিওদরের ওপর কত জানি রাগ ক'রবে তারা। কিন্তু কই, রাগ, অপমান কিছুই করল না। অথচ যে-প্রশ্ন ওরা তুলেছিল তাও আমলেই আনল না। নির্বিকার। পুরোপুরি তাচ্ছিল্য। জবানবন্দীটা, নেহাৎ শুনতে হবে তাই ব'সে শোনা। নইলে শেষের অঙ্ক তো আগে থেকেই জানা।

একজন পুলিশ এসে ওদের সামনে দাঁড়িয়ে গম্ভীরভাবে ব'লে গেল :

'পাভেল ভ্লাসফ দলের পাণ্ডা...'

'আর নাখোদকা?' মোটা বিচারক জিজ্ঞাসা করেন।

'সেও...'

একজন উকিল উঠে দাঁড়ায় :

'একটা কথা বলতে পারি?'

'কোন আপত্তি তুলবার আছে?' বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করে।

মায়ের মনে হয় সব ক'জন জজই অসুস্থ। প্রত্যেকের চালচলন, গলার স্বর, মুখের ভাব, সব কিছুর মধ্যে একটা ভারী অস্বস্তিকর ক্লান্তি, আর বিরক্তির ছাপ। এই আদালত, জজের পোষাক, পুলিশ, সান্ত্রী, উকিল-ব্যারিষ্টার, আরাম-চেয়ারে এলিয়ে ব'সে থাকা, সওয়াল, জবাব শোনা—সবই নিরানন্দ। কিছুই ভালো লাগে না।

মা'র আগের চেনা সেই হ'লদে-মুখো পুলিশ অফিসার জজদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে পাভেল আন্দ্রিয়েইর সম্বন্ধে। নিতান্ত নিষ্প্রভ; ঝিমুন স্বর। মা শুনে মনে মনে বলে :

'তুমি আর কি জান?'

কাঠগড়ায় বসা মানুষগুলোর দিকে তাকায় মা—ওদের জন্য আর কোন ভয় করে না; করুণাও নেই! আসে না করুণা—শুধু বিস্ময় আর বুকজোড়া ভালোবাসা—আনন্দোচ্ছল স্বচ্ছতায় সুন্দর ভালোবাসা। ওই যে ব'সে আছে শক্তিমান তরুণ ছেলের দল—সাক্ষী, জজ, সওয়াল-জবাব, সরকারী উকিলের সাথে প্রতিবাদী পক্ষের উকিলদের বাগ্‌যুদ্ধ, কোন দিকেই ওদের ভ্রূক্ষেপ নেই। ওরা আপন মনে অমনি মশগুল হ'য়ে আছে। কেউ হয়ত বাঁকা হাসি হেসে উঠল; কেউ বন্ধুদের সাথে ঠাট্টা মস্করা করে। আন্দ্রিয়েই, পাভেল ফিস্‌ফিস্ ক'রে কথা বলেই চলেছে

একজন উকিলের সাথে। এ'কেই মা কাল রাতে নিকলাইয়ের ঘরে দেখেছিল। মাজিন সব চেয়ে চঞ্চল, কিন্তু সেও পাভেলের আলোচনা শ্নেছে মন দিয়ে। এক এক বার সাময়লভ ইভান গ্রুসেভকে ক্ষ্যাপায়: ইভানও পাল্টা ক্ষ্যাপায় ওকে—হাসি চাপতে গিয়ে মুখ লাল হয়ে, গাল ফুলে ফুলে ওঠে ওদের। মাথা নীচু করে থাকে ও। চেষ্টা করেও কবার কিছুতেই হাসি চাপতে পারেনি—বোমা ফেটে গেছে। সামলাতে বেগ পেতে হয়েছে। সমস্ত ভ্রূকুটি, চেপে রাখার চেষ্টা সব ছাপিয়ে ওঠে বন্দীদের দুর্বার তারুণ্য।

মায়ের কনুইতে স্পর্শ করে সিজভ। মা ফিরে তাকিয়ে দেখে, সে খুশি কিন্তু একটু চিন্তিত। কানে কানে বলে :

'ছোঁড়াগুলোকে দেখলে? কি বুকের পাটা হয়েছে! যেন শাহান-শা-বাদশা এক এক জন!'

সাক্ষীরা অত্যন্ত ব্যস্তভাবে কি সব বলাবলি করছে, কিন্তু স্বরে তাদের বর্ণ নেই। জজেদেরও তাই, নেহাৎ কইতে হবে তাই অনিচ্ছা-সত্ত্বেও কথা কওয়া। মাংস-থলথল হাতখানা মুখের সামনে ধ'রে হাই তোলে মোটা জজ। লাল-গোঁফ-ওয়ালার মুখখানা আরো কালো হয়ে গেছে; বারে বারে আঙুল দিলে কপালের রগ চেপে ধরে শূন্য-দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে কড়িকাঠের দিকে। মুখে ভয়ানক কষ্টের ছাপ। সরকারী উকিল থেকে থেকে পেন্সিল দিয়ে কি জানি টুকছে আর মার্শালের সাথে কথা বলে ইসারায়। শুনতে শুনতে মার্শাল কখনও দাড়িতে হাত বুলায়, কখনও বড় বড় সুন্দর চোখগুলোকে বড় বড় ক'রে ঘোরায়; আবার কখনও বা কর্তৃত্বের ভঙ্গিতে ঘাড় বাঁকিয়ে মৃদু হাসে। মেয়র পায়ের ওপর পা তুলে বসে হাঁটুর ওপর আঙুল দিয়ে তাল বাজান আর তাকিয়ে থাকেন আঙুলগুলোর দিকে। ম্যাজিস্ট্রেট্ সাহেব হাঁটুর খুঁটিতে ঠেকা দেওয়া ভুঁড়িখানিকে দুই হাতের আলিঙ্গনে বেঁধে ব'সেছিলেন। মুখে উদ্বেগের ছায়া। আর ওই যে-বৃদ্ধ নিবাতদিনের হাওয়া-যন্ত্রের মত একেবারে নিশ্চল খাড়া হ'য়ে ব'সে আছে, আরাম-চেয়ারে, হয়ত এক-মাত্র সে-ই একঘেয়ে ঘ্যান্‌ঘ্যানানি শুনছে। একই দৃশ্য একটানা চলছে তো চলছেই। বিরক্তিতে অবসাদে মানুষ যেন আড়ষ্ট হ'য়ে আছে।

বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে উঠে বলে : 'আমি ঘোষণা করি ' বাকি কথা ওর পাতলা ঠোঁটের তলায় মিলিয়ে যায়।

দীর্ঘ-শ্বাস, হর্ষ-বেদনার চাপা উচ্ছ্বাস, কাশি,—পা-ঘষার শব্দে এজলাস ভ'রে যায়। বন্দীদের বাইরে নিয়ে যায়। যাবার সময় আত্মীয়-বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে তারা হাসে। ইভান গুসেফ ফাঁক খুঁজে কাকে ডেকে বলে :

'ঘাবড়াসনি রে, ইয়েগর!'

মা আর সিজভ উঠে বাইরে যায়।

সিজভ বলে : 'যাবে নাকি, চা-টা খাবে? ঘণ্টা-দেড়েক তো এখনও ব'সে থাকতে হবে।'

'ইচ্ছে ক'রছে না তেমন।'

'আমারও ক'রছে না। ছেলেগুলো কি বলতো গো! ব'সে আছে যেন দুনিয়ায় ওরা ছাড়া আমরা কেউ আর কিছু না। আর ঐ ফিওদরটা?'

টুপী হাতে সাময়লভের বাবা এল এগিয়ে। বিমর্ষ হাসি হেসে বলে :

'কান্ডটা দেখলে আমাদের গ্রিগরির? উকিল নিলেনা। একটা কথা অবধি

কইলে না তাদের সাথে। ও ব্যাটাই তো পয়লা রাস্তা দেখালে। তোমার ছেলে তো উকিল লাগানোর পক্ষে ছিল। ওটাই তো বেঁকে বসল। তারপর আর চারজন ওর দেখাদেখি...'

ওর স্ত্রী দাঁড়িয়েছিল পাশেই। প্রাণপণে চোখের জল চাপবার চেষ্টা করছিল। রুমালের কোণা দিয়ে চোখ মুছছিল বার বার।

মুঠো ক'রে দাড়ি ধ'রে মাটির দিকে তাকিয়ে বলে সাময়লভ :

'হয়েছে এক জ্বালা! এক একবার রাগ হয়, ব্যাটারা গেল কেন এসব গণ্ডগোলের মধ্যে! ওদের মুখের দিকে চাইলে কষ্ট হয়। আবার এক এক সময় হঠাৎ মনে হয়, কি জানি হয়তো সত্যি কথাই বলছে ব্যাটারা! বিশেষ ক'রে কারখানায় নিত্যি ওদের দল বাড়ছে। পুলিশ তো গন্ধ পেলেই টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু হ'লে হবে কি! নদীর জলে মাছের পোনার মত কিলবিলিয়ে বাড়ছে সব। তখন সত্যি সত্যি তাক লেগে যায়—খ্যানতাটা যেন ওদের হাতেই।'

'আমাদের মগজে এসব ঢুকবে না হে, স্তেপান পেত্রোভিচ!'

'যা ব'লেছ!' সায় দেয় সাময়লভ।

'জোয়ান মরদ সব, দস্যুগুলো!' জোরে নাক ঝেড়ে বলে সাময়লভ-গিন্নী।

ধ্যাব্ড়া মুখখানায় হাসি ফুটিয়ে মাকে বলে :

'রাগ করো না গো, নিলোভনা! ও বেলায় তোমার ছেলেটাকে অত গাল দিলুম। কে জানে, কার ছেলে কাকে ক্ষ্যাপালে! কিন্তু শুনলে তো পুলিশ আর গোয়েন্দারা আমার খোকার কথা কি বললে! ও ব্যাটাও কম যায় না! মিটমিটে শয়তান!'

বেশ বোঝা যায়, মুখে অন্য ধরনের কথা বললেও ছেলের জন্য সাতহাত হ'য়ে আছে গ্রীগরির মায়ের বুক।

অমায়িক হাসি হেসে ব'লে মা তার গভীর অন্তরের কথা :

'কাঁচ পরাণেই সত্যকে তাড়াতাড়ি চেনা যায় গো!..'

বারান্দা দিয়েই লোকজন যায় আসে, জটলা করে চাপা গলায়, গরম গরম কথা বলে। একা প্রায় নেইই কেউ। প্রত্যেক মুখেই কথা কইবার, প্রশ্ন শুধাবার ব্যগ্রতা। ওরা যেন ঝড়ের বায়ে উড়ে এসে পড়েছে এইখানের এই দুই দেয়ালের মাঝখানকার এই সরু ফালি বারান্দাটায়। নাও বাঁধবার জন্য শক্ত পোক্ত একটা কিছু চাই।

বুকিনের বড় ভাই—লম্বা, সুন্দর দেখতে ছেলেটি—বুকিনের মতই প্রায়—চার দিকে ঘুরে কি যেন ইসারা করছে!

'ওই যে ক্লেপানভ—ম্যাজিস্ট্রেট্ সাহেব—ওর কি দরকারটা বাপু এখানে প'ড়ে থাকার!'

ওর বাপ, ছোটখাট চেহারার এক বৃদ্ধ সতর্ক দৃষ্টিতে চারদিকে তাকিয়ে বলে : 'চুপ্ চুপ! কন্স্তানতিন!'

'কেন, কার ভ'য়ে চুপ করব? জান? কি ব'লছে ওর নামে লোকে?' ও নাকি ওর কেরানীর বৌকে নিয়ে থাকে। আর তাইতে নাকি বৌটার সোয়ামীটাকে মেরে ফেলেছে। তা ছাড়া চোর ও ব্যাটা ওতো সব্বাই জানে!...'

'দোহাই, কন্স্তানতিন!'

'ঠিক বলেছ,' সাময়লভ বলে, 'এর নাম কি বিচার...'

ওর গলার স্বর শুনে এগিয়ে আসে বুকিন। সঙ্গে সঙ্গে অন্যরাও আসে। লাল টক্‌টক্ ক'রছে বুকিনের মুখ—হাত নাচিয়ে নাচিয়ে ও চীৎকার করে :

'খ্নন, জখম, চুরি-ডাকাতির ব্যাপার হ'লে—তখন এদের জ্বরি বসবে। জ্বরির মধ্যে এইসব সাধারণ লোক—চাষী আছে, কুলি-মজ্বর আছে, শহরের মান্বষ আছে। কিন্তু কত্তাদের বিরুদ্ধে যখন মান্বষ খ্যাপে, তখন তার বিচার কত্তারা নিজে হাতে ক'রবেন! কি বলে একে? তুমি আমায় অপমান ক'রলে—তোমার চোয়াল তাক ক'রে মারলুম এক ঘ্বষি, বাস্! তারপর তুমিই যদি বিচারে বস, তাহলে আমার দোষ ষোল কাহন তো হবেই। কিন্তু বাপ্বহে প্রথম দোষখানা কার? তোমার!'

চুল-পাকা, ব'ড়শীর মত নাক-ওয়ালা এক পেয়াদা ভিড় তাড়ায়। ওর ব্বকে অনেক কটা মেডেল ঝোলান। ব্বকিনের দিকে আঙ্বল নাচিয়ে গাল দেয় :

'এই ব্যাটা, থাম বলছি। ব্যাটা যেন আড্ডা পেয়েছে!'

'কত্তা, সে তো না হয় ব্বঝলাম। কিন্তু চাঁদ একট্ব পাল্টে নাও দিকিনি—ধর দ্ব'চার ঘা আমি দিলুম তোমাকে, তারপর আমিই জজ হ'য়ে বসলুম। কেমন লাগে হে মজাটা!...'

কঠিনভাবে বলে পেয়াদা : 'নাঃ তোকে বের না ক'রে দিলে চলছে না!'

'য়্যাঁ! আমায় বের করবি?' কেন শ্বনি?'

'এখানে গোল পাকিয়ে তুলছিস বলে। ধরে রাস্তায় বার করে দেব।'

আশেপাশে যারা ছিল তাদের ম্বখের দিকে চেয়ে চাপা গলায় বলে ব্বকিন :

'আমাদের ম্বখ বেঁধে রাখতে চায় ওরা!'

বৃদ্ধ চীৎকার ক'রে ওঠে : 'আলবৎ ক'রবে। কি ক'রবিটা কি, শ্বনি?'

ব্বকিন কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে, ওর স্বরটা আরো নেমে যায় :

'শ্বধ্ব আত্মীয়-স্বজনকে আসতে দেবে? কেন বাপ্ব! অত ভয়টা কিসের তোদের! বিচার যদি তোদের ঠিকই হবে—দে দেখি সবাইকে আসতে। শ্বনুক সবাই...'

সাময়লভ জোরে জোরেই বলে :

'ন্যায়! কত ন্যায় বিচারই হচ্ছে! ন্যায় বিচার বলে কিছ্ব নেই।'

মা নিকলাইয়ের কাছ থেকে শ্বনেছিল এই মামলাই বেআইনী। ইচ্ছে হ'ল, সেই কথাগ্বলো এদের শ্বনিয়ে দেয়। কিন্তু সবটা ভালো ক'রে ব্বঝতে পারেনি সেদিন। তা ছাড়া কিছ্ব কিছ্ব ভুলেও গিয়েছিল। একট্ব একান্তে স'রে যায়, বসে বসে মনে করার চেষ্টা করে কথাগ্বলো। হঠাৎ চোখ পড়ে, একজন য্ববক ওকে লক্ষ্য ক'রছে। হাল্কা-গোঁফ, ডান হাতখানা পাৎল্বনের পকেটে; ফলে ডান কাঁধের চেয়ে বাঁ কাঁধটা নীচু দেখায়। ভঙ্গিটা কেমন চেনা চেনা লাগে মায়ের। কিন্তু তক্ষ্বণি চোখ ফিরিয়ে নেয় লোকটি। আবার নিজের চিন্তায় ডুবে যায় মা। পরক্ষণেই ছেলেটির কথা আর কিছ্ব মনে থাকে না।

কিন্তু মিনিটখানেক পরেই একটা চাপা স্বরের প্রশ্নে চমক ভাঙ্গে মার।

'একে?'

'হ্যাঁ।' ব্যগ্র উত্তর।

চার দিকে চায় মা। উঁচু-নীচু কাঁধওলা সেই লোকটি কথা বলছে পাশের লোকের সঙ্গে। পাশটাই শ্বধ্ব দেখা যাচ্ছে লোকটির।

মা প্রাণপণে লোকটির কথা আবার মনে ক'রতে চেষ্টা করে। কিন্তু মনটা চঞ্চল হয়ে রয়েছে, স্পষ্ট করে কিছ্বই মনে পড়ছে না। প্রাণ আকুল হ'য়ে উঠেছে—ডেকে ডেকে শোনাতে চায় প্রতিটি মান্বষকে যে-মহান ব্রত পালনে তার ছেলে নিজকে

স'পে দিয়েছে, সেই ব্রতের কথা। শ্নবে মা এরা কি বলে। তাহ'লেই বোঝা যাবে আজ আদালতের রায় কি হবে।

অতি সাবধানে চাপা গলায় বলে সিজভকে : 'এর নাম বিচার? কে কি ক'রল তাই নিয়ে ওদের যত মাথাব্যথা। কিন্তু কৈ, কেন ক'রল সে-দিক পানে তো তাকিয়ে দেখিস্ না তোরা! যত ব্ড়ো হাব্ড়ার দল জজ হ'য়ে ব'সেছে। কচি ছেলেদের বিচার ক'রবে এই ব্ড়োরা! কেন রে বাপ্! ওদের বিচার করাতে হয়, ওদের বয়সী মান্ষ নিয়ে আয়!'

'যা বলেছ!' সিজভ বলে, 'এসব কান্ড-কারখানা বাপ্ বোঝার সাধ্যি নেই আমাদের!' চিন্তিতভাবে মাথা নাড়ে ও।

পেয়াদা এজলাসের দরজা খ্লে দিয়ে হাঁকে :

'টিকিট দেখাও, আসামীদের আত্মীয়-স্বজন যারা আছ!'

'টিকিট!' বাঁকা টিপ্পনি ছোঁড়ে কেউ, 'সার্কাসের টিকিট হে, সার্কাসের টিকিট!'

লোকগ্লির ম্খে কেমন যেন একটা বিরক্তির ছায়া। শাসন-বাঁধন আল্গা হ'য়ে গেছে কোনখান দিয়ে। মান্ষগ্লো তাই সোরগোল ক'রে, সেপাই-সান্ত্রীর সাথে তর্ক জোড়ে। ঢিলে-ঢালা হ'য়ে গেছে সব।

পঁচিশ

বেঞ্চির ওপর নিজের জায়গায় বসতে বসতে কি যেন গ্ন্গ্নিয়ে বললে সিজভ :

'কি বলছ?' মা বলে।

'না কিছ্ না। মান্ষগ্লো সব গাধা...'

ঘণ্টা বাজে।

'চুপ...চুপ...সবাই চুপ...এজলাস বসছে।'

দর্শকেরা উঠে দাঁড়ায়। আগের মতই লাইন বেঁধে জজেরা আসে—বসে। আসামীদের কাঠগড়ায় ফিরিয়ে আনা হয়। সিজভ কানে কানে বলে :

'এই সেরেছে! সরকারী উকিলের বক্তিমে হবে এবার।'

মা নতুন ক'রে আশংকায় কেঁপে ওঠে। সমস্ত দেহটা দিয়ে সামনে ঝ্ঁকে শ্নতে চেষ্টা করে।

জজদের এক পাশে, তাদের দিকে ম্খ ক'রে দাঁড়িয়েছে সরকারী উকিল। একটা হাত তার ডেস্কের ওপর। অনেকখানি লম্বা একটা নিশ্বাস নিয়ে, ডান হাতটাকে প্রবলভাবে নেড়ে নেড়ে বলতে আরম্ভ ক'রল। প্রথম কথাগ্লো কিছ্ই ব্ঝতে পারল না মা। ঘন গলা, মস্ণ। কিন্তু কখনও দ্রত, কখনও মন্থর। একঘেয়ে টানা স্রে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ যেন চিনির ডেলার সামনে মাছির ঝাঁকের মত ভন্ভনিয়ে ওঠে। বরফের মত হিম, ছাইয়ের মত বর্ণহীন কথার স্রোত ভেসে বেড়ায় ঘরের মধ্যে। আবহাওয়া ভারী অস্বস্তিকর হ'য়ে ওঠে, মনে হয় স্ক্ষ্ম ধ্লোর জালে যেন ভরে গেছে ঘরখানা। মমতা-হীন, অন্ভূতি-হীন

রাশি রাশি কথা শুধু—পাভেল ও তার সঙ্গীদের কাছে পৌঁছয় না তার একটি। ওরা গ্রাহ্যও করে না! আগের মত নিরুদ্বেগে নিজেদের মধ্যে আলাপ হাসিঠাট্টায় মশগুল হ'য়ে আছে ওরা।

সিজভ বলে :

'মিথ্যে কথা ব'লে যাচ্ছে যত।'

মা কিন্তু পুরোপুরি সায় দিতে পারে না। মা বুঝতে পারে, সবাইকে নির্বিচারে দোষী সাব্যস্ত ক'রতে চায় মানুষটা। পাভেলের কথা বলতে বলতে শুরু করে ফিওদরের কথা, তার কথা শেষ হ'তেই এল বুকিন। যেন সব্বাইকে সুন্দর ক'রে গুছিয়ে গাছিয়ে এক বস্তায় প্যাক ক'রছে উকিল সাহেব। কিন্তু কথার মানে যাই হোক না কেন, তার জন্য মায়ের এসে যায় না। এখনও মনের মধ্যে ভয়···সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটবে। সেই সাংঘাতিকেরই তালাশ করে মা সরকারী উকিলের বক্তৃতা ছাড়াও অন্য কিছুর মধ্যে—লোকটার মুখে, চোখে, গলার স্বরে, তার গৌর-বরণ হাত-খানার ছন্দোবদ্ধ আস্ফালনে। আছে, কি যেন একটা আছে। গা-বুক ছম্ ছম্ করে। কিন্তু ঠিক বুঝে উঠে উঠতে পারে না কিসের ভয়।

বিচারকদের দিকে চেয়ে দেখে। বক্তৃতা যে মোটেই ভালো লাগছে না ওদের তাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ফ্যাকাশে পাঁশুটে মরা মুখগুলি দেখে কিছু বুঝতে পারা যায় না। কোনও ভাবের বিকার নেই। সরকারী উকিলের কথা ঘরের হাওয়ায় এক অদৃশ্য কুয়াশার জাল বোনে; ঔদাস্য আর ক্লান্তিকর প্রতীক্ষার মেঘে ঘিরে ফেলে বিচারকদের। খাড়া, কাঠের মত হ'য়ে ব'সে আছেন প্রধান বিচারক—যেন জমে গেছেন। চশমার পেছনকার ধূসর রঙের ফুটকিগুলি থেকে থেকে সারা মুখখানার বর্ণহীনতার সাথে এক হ'য়ে মিশে যায়।

এই নিষ্প্রাণ ঔদাস্য, হৃদয়-হীন বৈরাগ্য দেখে মা নিজকে শুধায় :

'রায় দিচ্ছে নাকি ওরা?'

নিজের প্রশ্নেই মনটা ওর কুঁকড়ে এতটুকু হ'য়ে যায়। যে-ভয়ংকরের পথ চেয়ে ব'সেছিল মা, সেই পথ-চাওয়াটুকুর সমস্ত গৌরব ম্লান হয়ে যায়—বুকের মধ্যে তীব্র অপমানের ঘা দগ্‌দগ্ করতে থাকে।

সরকারী উকিলের বক্তৃতা হঠাৎ শেষ হ'য়ে যায়। শেষের কথাকটা তাড়াতাড়ি ব'লে ফেলে, মাথা নীচু করে বিচারকদের অভিবাদন ক'রে হাত ঘষতে ঘষতে ব'সে পড়ে ভদ্রলোক। মার্শাল চোখ ঘুরিয়ে নমস্কার করেন; মেয়র করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দেন; আর ম্যাজিস্ট্রেট্ শুধু নিজের ভুঁড়ির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসেন।

কিন্তু বিচারকেরা নিশ্চল হ'য়ে একভাবেই ব'সে রইলেন। বক্তৃতায় তারা খুশি হননি মনে হচ্ছে চেহারা দেখে।

মুখের সামনে একটা কাগজ নিয়ে বৃদ্ধ বলেন : 'এখন আসামী ফিদোসিয়েভ, মারকভ, জাগারভের পক্ষের কৌঁসুলীর সওয়াল জবাব শুরু হবে।'

উকিল উঠে দাঁড়ায়। সেই নিকলাইয়ের ওখানে যাকে দেখেছিল। চওড়া গড়নের অমায়িক মুখ—হাসি লেগে আছে। ছোট ছোট চোখ—লাল্‌চে ভ্রূ-জোড়ার নীচ্ থেকে ঝক্‌ঝকে ধারাল দু'খানা কাঁচির ফলা যেন হাওয়া কেটে চ'লেছে। স্বর একটু উঁচু, কথা স্পষ্ট ধীর, তবু মা ভাল ক'রে বুঝতে পারেনা।

সিজভ কানে কানে বলে : 'বুঝতে পারছ, কি বলছে? শোন শোন, বলছে,

আসামীরা এত ঘাবড়ে গিয়েছিল যে ওদের মাথার ঠিক ছিলনা। য়্যাঁ, আমার ফিওদরের কথা বলছে নাকি?'

এই পরিণতি আশা করেনি মা। নৈরাশ্যে ভেঙে পড়ে। কথা বলতে পারেনা। মনে হয়, অন্যায় করা হচ্ছে; এবং এই অনুভূতি ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠে বুকের উপর বোঝার মত চেপে বসে। এতক্ষণে বুঝতে পারে, ন্যায় বিচারের জন্য তার মন ব্যাকুল হয়েছিল। ভেবেছিল, নিক্তির ওজনে খোলাখুলি যাচাই হয়ে যাবে কোন্ দিক বেশি ভারী; তার ছেলের দিক না তার ছেলেকে যারা অভিযুক্ত করেছে তাদের দিক! আশা করেছিল অনেকক্ষণ ধ'রে চুলচেরা জেরা করবে জজেরা, ওর কথা মন দিয়ে শুনবে। তাদের তীক্ষ্ণ চোখের সামনে পাভেলের উদ্দেশ্য, আদর্শ সব উদ্ঘাটিত হয়ে যাবে। সত্যকে দেখতে ওরা ভুল করবেনা। এবং ন্যায়ের মর্যাদা রেখে খোলা আদালতে সর্বজনসমক্ষে ঘোষণা ক'রে যাবে—পাভেলই সত্য কথা বলেছে।

কিন্তু কই! সেসব কিছুই হ'লনা! বিচারের কাঠগড়ায় এসে যারা দাঁড়িয়েছে তারা যেন বড্ড দূরে। অত দূরে জজেদের দৃষ্টি পৌঁছায় না। আর এই দস্যু ছেলেগুলোর কাছে এই হোমরাচোমরা জজেদের কানা কড়ার দাম নেই। তাদের ওরা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেনি। মায়ের ভেতরটা অবশ হ'য়ে যায়। মামলা শোনবার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই আর। নিজের মনে হাহাকার করে : 'এর নাম বিচার!'

'ঠিক বলেছ!' সায় দেয় সিজভ।

আর একজন উকিল উঠে দাঁড়ায়। তীক্ষ্ণ, পাণ্ডুর মুখে শাণিত ব্যঙ্গ। বারে বারে বিচারকেরা ওর কথার মাঝখানে বাধা দেয়।

সরকারী উকিল রাগে লাফিয়ে উঠে কি যেন বলে জজের কানে কানে। বৃদ্ধ বিচারপতি উঠে দুর্বল স্বরে, আসামীপক্ষের উকিলকে তিরস্কার করেন। মাথা নীচু করে সসম্মানে শুনে আবার আরম্ভ করে সে।

সিজভ বলে : 'বলতো বাবা। দুটো কথা বল! থোঁতা মুখগুলো ভোঁতা ক'রে দাও!'

একটা উত্তেজনার হাওয়া যেন সরসরিয়ে ব'য়ে যায়। উকিলের ধারাল কথার ঘায়ে জজেদের তেকেলে পুরু গণ্ডারের চামড়া জর্জরিত হ'যে ওঠে। একটা বিরোধী শক্তি যেন ছাড়া পেয়ে ঘরের হাওয়ায় নেচে বেড়ায়। উকিলের বাক্য-বাণের আঘাত এড়াবার জন্য জজেরা গোমড়া মুখে, ঠোঁট ফুলিয়ে স'রে এসে ঘেঁষা-ঘেঁষি হয়ে বসে।

এরপর পাভেল উঠে দাঁড়ায়। নিমেষে সব স্তব্ধ হয়ে যায়। মা সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বসে। অতি ধীর শান্ত-স্বরে আরম্ভ করে পাভেল :

'পার্টির সভ্য হিসেবে আমি শুধু আমাদের পার্টির রায় মানি। সুতরাং আমি পক্ষ-সমর্থন ক'রব না। আমারই মত আরো অনেক কমরেডও পক্ষ-সমর্থন ক'রতে অস্বীকার করেছেন। কয়েকটি জিনিষ আপনারা বোঝেননি, তাঁদেরই অনুরোধে আমি সেইগুলোকে বুঝিয়ে দেবার জন্য এখানে এসে দাঁড়িয়েছি আজ। সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসীর পতাকার তলায় যে জলুষ আমরা সেদিন বের করেছিলাম, সরকার পক্ষের উকিলমশায় তাকে আখ্যা দিয়েছেন রাজ-বিদ্রোহ ব'লে। এবং বরাবর তিনি এই ধারণাই পোষণ ক'রে এসেছেন যে আমাদের এই আন্দোলন জারের উচ্ছেদসাধনের জন্যই। কিন্তু স্পষ্ট ভাষায় সকলকে এই কথাই জানিয়ে দিতে চাই যে—শুধু মাত্র জারতন্ত্রের শেকলেই আমাদের দেশ বাঁধা আছে ব'লে আমরা মনে করি না। দেশের

এই শোচনীয় অবস্থার প্রথম এবং প্রত্যক্ষ কারণ জারতন্ত্রই বটে, এবং এটি নাগালের মধ্যে। এ বন্ধন থেকে জনগণকে মুক্ত করা আমাদের কর্তব্য ব'লে মনে করি।'

দৃপ্ত, বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। স্তব্ধতা গাঢ় হ'য়ে ওঠে। আদালত ঘরের দেয়ালগুলি যেন দূরে স'রে যায়। বহু ঊর্ধ্বে, সব কিছুর ঊর্ধ্বে ভাস্বর দীপ্যমান মূর্তিতে দাঁড়িয়ে থাকে পাভেল।

জজেরা চেয়ারে ন'ড়ে চড়ে বসে—মুখে চিন্তা আর উদ্বেগের ছায়া। মার্শাল নেতিয়ে-পড়া জজের কানে কানে কি বলেন; তিনি প্রধানের ডান কানে আর রোগা জজ তাঁর বাঁ কানে চুপি চুপি কিছু বলেন। প্রধান কুণ্ঠিতভাবে মুখ ঘুরিয়ে কি যেন বলেন পাভেলকে। কিন্তু পাভেলের উত্তেজনাহীন স্থির গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠের নীচে তা ডুবে যায়।

'আমরা সমাজতন্ত্রী। অর্থাৎ আমরা ব্যক্তিগত মালিকানার বিরোধী। এই ব্যক্তিগত মালিকানা আছে বলেই সমাজ ভেঙে পড়ছে, মানুষে মানুষে চলছে হানাহানি ও অবিরাম স্বার্থ-সংঘাত। আর এই সংঘাতকে চাপা দেবার জন্যে বা এই সংঘাতের সমর্থনে ব্যক্তিগত মালিকানা মিথ্যার আশ্রয় নেয় আর মানুষকে টেনে নামায় প্রতারণা ভণ্ডামি আর বিদ্বেষের পঙ্কে।

আমরা মনে করি, যে-সমাজ শুধু স্বার্থ-সিদ্ধির উপায় হিসাবে মানুষকে ব্যবহার করে, সে সমাজ বর্বরের সমাজ এবং জনতার স্বার্থ-বিরোধী। সুতরাং এই মিথ্যা আর দু'মুখো নৈতিকতাকে আমরা কখনই স্বীকার ক'রে নিতে পারিনা। মানুষকে এ-সমাজ সংশয়ের চোখে দেখে, এবং মানুষের প্রতি তার আচরণও নির্মম। আমরা এর তীব্র নিন্দা করি। বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার দৌলতে দৈহিক, নৈতিক যতরকম দাসত্ব চেপে আছে প্রতিটি মানুষের ওপর, স্বার্থপর লোভী মানুষের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য যত রকম শোষণ-ব্যবস্থা আছে, তারি বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই। আমরা লড়ছি, লড়ব। আমরা শ্রমিক; শিশুর খেলনা থেকে আরম্ভ করে, বড় বড় কলকারখানা, সব আমাদেরি মেহনতে তৈরী। অথচ মানুষ হিসেবে আমাদের কোন মূল্য নেই। মানুষের অধিকারটুকু রক্ষা করার ক্ষমতা থেকেও আমরা বঞ্চিত। যার যেমন ভাবে খুশি নিজের স্বার্থে আমাদের ব্যবহার ক'রতে পারে। কিন্তু এ অবস্থা আমরা চলতে দিতে পারিনা। একদিন যাতে সমস্ত ক্ষমতাই আমাদের নিজেদের হাতে আসে সেজন্য যতখানি স্বাধীনতা প্রয়োজন, বর্তমানে সেইটুকু স্বাধীনতাই আমরা চাই। আমাদের আওয়াজ খুবই সহজ : 'ব্যক্তিগত মালিকানা ধ্বংস হোক।' 'শ্রমের হাতিয়ার শ্রমিকের হাতে,' 'জনতার হাতে ক্ষমতা চাই,' 'সবাইকে খেটে খেতে হবে।' আমরা নিছক বিদ্রোহী নই।'

অল্প একটু হাসে পাভেল। ধীরে ধীরে মাথার চুলে আঙুল চালায়। ওর নীল চোখের জ্যোতি দীপ্ততর হ'য়ে জ্বলে।

বৃদ্ধ বিচারকের উচ্চ স্পষ্ট কণ্ঠ শোনা যায় : 'বিষয়ের বাইরে কথা বলো না।' ফিরে পাভেলের দিকে তাকায় বৃদ্ধ—মার মনে হয় ওর নিষ্প্রভ বাঁ চোখটায় একটা লুব্ধ হিংস্র আগুন ধক্ ধক্ ক'রে জ্বলছে। প্রত্যেক বিচারক তাকিয়ে আছে ওর ছেলের দিকে—ওতো তাকিয়ে থাকা নয় দৃষ্টি বিঁধে আছে ওর মুখে; ওর সমস্ত শক্তি শোষণ ক'রে নিচ্ছে। রক্ত পিপাসায় লুব্ধ হ'য়ে উঠেছে ওদের চোখ। ওর রক্ত পান ক'রে ক্ষয়ে-যাওয়া দেহগুলোকে ঝালিয়ে নিতে চায়। কিন্তু উন্নত মর্যাদায় দাঁড়িয়ে আছে পাভেল, ঋজু, বীর্যবান, নির্ভীক। হাত বাড়িয়ে ব'লে চলেছে :

'আমরা বিপ্লবী। একদল শুধু কর্তৃত্ব ক'রে যাবে, আর একদল খেটে যাবে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে—যতদিন দুনিয়ার বুকে এই ব্যবস্থা থাকবে ততদিন ওই আমাদের ভূমিকা। যে-সমাজ-ব্যবস্থাকে আগ্‌লাবার চাপরাশ পেয়েছেন আপনারা, সেই সমাজের আর আপনাদের চিরশত্রু আমরা। আমাদের আপোসহীন লড়াই চলবে যতদিন না আমরা চূড়ান্ত জয়লাভ করি। মাঝামাঝি কোনো রফা সম্ভব নয়। এবং জেনে রাখুন—মেহনতী জনতারই জয় হবে। আপনাদের কর্তারা যতটা মনে করেন তত জোর তাদের নেই। হাতের মুঠোয় ওদের লাখো লাখো মানুষ আছে—নিজেদের সম্পত্তি ও তার খবরদারী ক'রতে ওরা লাখো জান বিকিয়ে দেয়। যে-ক্ষমতায় ওরা আমাদের দাবিয়ে রাখে, সেই ক্ষমতাই আবার ওদের নিজেদের মধ্যে লড়াই বাধিয়ে দেয়। ওতেই ওরা মরে। দেহেও মরে, নৈতিক মৃত্যুও হয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষার খরচ বড় বেশী! সত্যিকথা ব'লতে গেলে, আপনারা মালিকরা আমাদের চেয়ে আরো বেশী বাঁধা। আপনাদের দাসত্ব আরও বেশী। আমাদের দাসত্ব শুধু বাইরের। আপনাদের দাসত্ব মনের, চিন্তার। নানা রকম সংস্কার আর অভ্যাসের ফাঁশ লেগে আপনাদের আত্মার মৃত্যু ঘটেছে। ওই ফাঁশ থেকে মুক্ত হওয়ার সাধ্য আপনাদের নেই। কিন্তু আমাদের আত্মা চির-মুক্ত। তাকে বাঁধতে পারে এমন সাধ্য কার? প্রতিদিন বিষ খাওয়াচ্ছেন আমাদের। আপনাদেরই অজান্তে প্রতিদিন বিষের সাথে তার প্রতিষেধকও দিচ্ছেন। বিষের চেয়ে অনেক বেশী তেজ তার। সত্যকে আমরা চিনি। এবং অপ্রতিহতভাবে, অত্যন্ত দ্রুত গতিতে আমাদের সচেতনতা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। আপনাদের সমাজেরও সেরা সেরা অত্যন্ত নিষ্ঠাবান চরিত্রবান সব মানুষ এদিকে আসছেন। এই দেখুন না কেন আপনাদের মধ্যে স্রেফ নৈতিক সমর্থনটুকু করবার মত মানুষও আপনারা খুঁজে পাবেন না। যে ঐতিহাসিক ন্যায়ের দাবী উঠেছে আজ আকাশে বাতাসে, তার নিদারুণ চাপ থেকে আত্মরক্ষা করার মত কোন যুক্তি নেই আপনাদের ভাণ্ডারে। সব নিঃশেষ হয়ে গেছে। নতুন কিছু বলার মত ক্ষমতাও আপনাদের নেই। আপনাদের ভেতর যে শুকনো বালু। কিন্তু আমাদের দেখুন! নতুন নতুন চিন্তাধারা, নতুন নতুন স্বপ্ন। জনতার বুকে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে প্রতিদিন বেড়ে চলেছে, বাড়ছে তার তেজ, বাড়ছে দীপ্তি। তাইতো দিকে দিকে স্বাধীনতার আন্দোলন গ'ড়ে উঠছে। শ্রমিকরা জানে আগামী দুনিয়ায় তাদের ভূমিকা কি। ওই জেনেই তো সারা দুনিয়ার শ্রমিক এক হ'য়ে হাত মেলাচ্ছে। কি বিরাট সে শক্তি! পৃথিবীর বুকে যৌবনকে ওরা ফিরিয়ে আনছে। কোন্ শক্তি দিয়ে ঠেকাবেন এই যৌবন-জল-তরঙ্গকে। আপনাদের আছে শুধু নিষ্ঠুরতা আর নীচতা। কিন্তু ও আর ক'দিন! নীচতা অতি সহজেই প্রকট হয়ে পড়ে, নিষ্ঠুরতাও মানুষকে শুধু উত্তেজিতই ক'রে তোলে। আজ যে হাত আমাদের টুঁটি চেপে ধ'রছে, কাল সে হাতই এসে আমাদের হাত ধ'রবে বন্ধু ব'লে। আপনাদের শক্তি তো যান্ত্রিক শক্তি—শুধু কাঁড়ি কাঁড়ি সোনার তাল জমাবার শক্তি। ফলে আপনারা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গিয়ে নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি করেন। কিন্তু আমাদের তা নয়। আমরা জানি দুনিয়ার মজদুর সব এক। ওই সচেতনতাই আমাদের শক্তির প্রাণকেন্দ্র। আপনারা যা করেন, মানুষকে শুধু দাসত্ব শৃংখলে বাঁধবার জন্য—কাজেই তা পাপ। আপনাদের লোভ, মিথ্যা আর শঠতা দিয়ে আপনারা এক দানবের দুনিয়া তৈরী ক'রে রেখেছেন মানুষকে ভয় দেখাবার জন্য। ও থেকে মানুষকে মুক্ত করা আমাদের কর্তব্য। জীবনের

মূল ছিন্ন ক'রে দিয়ে আপনারা মানুষকে হত্যা করেছেন। আপনাদের ধ্বংস-করা পৃথিবীটাকে নিজের হাতে নিয়ে সমাজতন্ত্র আবার নতুন ক'রে গড়ে তুলবে এক অখণ্ড রূপে। এ হ'বেই হবে।'

এক সেকেণ্ড একটু থেমে পাভেল বলিষ্ঠ কণ্ঠে, কোমল ভঙ্গিতে পুনরাবৃত্তি করে :

'এ হবেই হবে!'

পাভেলের ওপর থেকে দৃষ্টি না সরিয়েই বিচারকেরা নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করেন ফিস্‌ফিস্ ক'রে। অদ্ভুত মুখভঙ্গি! মায়ের মনে হয় পাভেলের বলিষ্ঠ, সুস্থ দেহটা, ওর অমিত শক্তি আর সরসতা দেখে যেন হিংসায় জ্বলছে বিচারকেরা। তাদের আবিল দৃষ্টির স্পর্শে তার ছেলের দেহটা যেন কলুষিত হ'য়ে উঠছে। নিবিষ্ট চিত্তে পাভেলের বক্তৃতা শুনলে বন্দীরা—তাদের ছায়া-পাণ্ডুর মুখে চোখগুলি সুখে ঝলমল করে। গণ্ডুষ ভ'রে ভ'রে যেন পান করে মা ছেলের কথা। কথাগুলো সার-বাঁধা হ'য়ে মনের মধ্যে একেবারে গেঁথে যায়। বৃদ্ধ প্রধান বিচারপতি কথার মাঝে কয়েকবার বাধা দিয়ে পরিষ্কার ক'রে বুঝতে চেয়েছেন এটা সেটা। একবার মুখে একটু বিষাদের হাসিও ফুটে উঠেছে। প্রত্যেকবার থেমেছে পাভেল, কিন্তু ছন্দ-পতন হয়নি। ওর বলার প্রশান্ত দৃঢ় ভঙ্গি জনতার শ্রবণ, মন, নয়নকে ওর অভিমুখী ক'রেছে, না শুনে তারা থাকতে পারেনি; বিচারকদের ইচ্ছাশক্তিকে ওর ইচ্ছাশক্তির তলায় প্রণমিত করেছে। কিন্তু অবশেষে বৃদ্ধ চীৎকার ক'রে সোজা হয়ে উঠে ব'সলেন হাত বাড়িয়ে। পাভেলের কণ্ঠে বিদ্রূপ ফুটে উঠল :

'এই শেষ হ'য়ে এল ব'লে। ব্যক্তিগতভাবে আপনাদের অপমান করার আমার কোন স্পৃহা নেই। বরঞ্চ করুণা হয়। এখানে ব'সে ব'সে বিচারের নামে আপনাদের এই প্রহসন ইচ্ছে না থাকলেও বাধ্য হয়েই দেখতে হচ্ছে। এবং সত্যি আপনাদের জন্য আমার মায়া হচ্ছে। শত হ'লেও মানুষ আপনারা। সেই হোক না কেন, শত্রু হোক, আর মিত্র হোক, মানুষের অপমান সইতে পারিনে। পশু-শক্তির দাসত্বে এমনি লজ্জাকরভাবে নিজকে ধুলোয় নামিয়ে আনা, মানুষের মর্যাদা বোধটুকুকেও খুইয়ে এমনিভাবে দেউলে হ'য়ে যাওয়া '

ব'সে পড়ে পাভেল, বিচারকদের দিকে একবারও তাকায় না। মা রুদ্ধ নিশ্বাসে তাকিয়ে থাকে তাদের দিকে।

আন্দ্রিয়েই পাভেলের হাত চেপে ধরে; ওর চোখ থেকে যেন আলো উছলে পড়ছে। সামলয়ভ, মাজিন, সবাই ওর দিকে ঝুঁকে আসে। বন্ধুদের এই উৎসাহে বিব্রতভাবে হাসে পাভেল। মায়ের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ে। ওর মূক দৃষ্টি যেন শুধায় :

'খুশি হ'য়েছে তো!'

মায়ের উদ্বেলিত-স্নেহোদ্দীপ্ত মুখে, বুকভরা সুখের নিশ্বাসে প্রশ্নের উত্তর লেখা পড়ে। সিজভ বলে :

'এবারে আসল মামলা শুরু হবে।'

কথা বলেনা, শুধু মাথা নাড়ে মা। এমন নির্ভীকভাবে কথা বলেছে ছেলে, সুখে মা গদ্‌গদ। কথা যে শেষ হয়েছে তাতে যেন আরো সুখী। একটা প্রশ্নই শুধু মনের মধ্যে বাজতে থাকে :

'কি ক'রবে ওরা এখন?'

কিছুই নতুন কথা বলেনি মায়ের ছেলে। ছেলের চিন্তার জগৎটা ওর কাছে খুবই পরিচিত। কিন্তু আজ এই খোলা এজলাসের সামনে দাঁড়িয়ে ছেলের আদর্শের প্রতি অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করে মা। এ অনুভূতি আজই প্রথম। পাভেল আশ্চর্য স্থির সংযত শান্ত হ'য়ে আছে। ছেলের লক্ষ্য আর তার চরম জয়ে মায়ের প্রাণের একান্ত বিশ্বাস যেন জ্যোতিষ্মান নক্ষত্র হ'য়ে জ্ব'লতে থাকে ওই কথাগুলোর মধ্যে। মা আশা ক'রেছিল পাভেলের সাথে ভারী তর্কযুদ্ধ হবে এবারে বিচারকদের। তারা নানা ওজর আপত্তি তুলবে পাভেলের কথায়, নিজেদের বিশ্বাস-গত যুক্তি দিয়ে ওর যুক্তি খণ্ডনের চেষ্টা ক'ববে। কিন্তু কোথায় কি? হঠাৎ আন্দ্রিয়েই উঠে দাঁড়ায়। ওর দেহটা দুলতে থাকে। তারপর ভ্রূ কুঁচকিয়ে বিচারকদের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে :

'প্রতিবাদী পক্ষের ভদ্রমহোদয়গণ...'

'বিচারপতিকে সম্বোধন ক'রে কথা কইবে, প্রতিবাদীপক্ষকে নয়।' রুগ্ন বিচারক রেগে চীৎকার ক'রে বলে। মা লক্ষ্য করে আন্দ্রিয়েইর মুখে দুষ্টুমির হাসি খেলছে; ওর গোঁফগুলি নাচছে, আর বেড়ালের চোখের মত জ্বল জ্বল ক'রছে ওর চোখ। রোগা লম্বা হাতটা দিয়ে মাথাটাকে খুব ঘষে নিয়ে বলে আন্দ্রিয়েই :

'তাই নাকি? তা আপনারা বিচারক, তাতো বুঝতে পারিনি। আমি তো ভেবেছি আপনারাই প্রতিবাদী।'

'যেটুকু বলবার তাই বলবে।' হেঁকে উঠলেন প্রধান।

'যেটুকু বলার? বেশ বেশ! তাহ'লে আপনারা বিচারক! সহজে কি আর মাথায় ঢোকে? ভারী সম্মানিত স্বাধীন...'

'আদালত তোমাদের সুপারিশ চায় না।'

'তাই নাকি? বেশ বেশ! তাহ'লে বক্তব্যই বলি! আচ্ছা আপনারা যখন বিচারক, তখন বলতে পারি আপনারা পক্ষপাতিত্ব করবেন না, কোন ধারণা আগে থেকেই মনের মধ্যে পুষে রাখবেন না; 'তোমার' 'আমার' এসব তফাৎ ফারাক করবেন না। কেমন? আচ্ছা তাহ'লে এই ধরুন—আপনাদের সামনে দু'জন লোককে নিয়ে এল। একজনের নালিশ, দ্বিতীয় জন তার সব কেড়ে কুড়ে নিয়ে ঠেঙিয়ে তুলো ধুনে দিয়েছে। আর একজন তাল ঠুকে বলছে—আলবৎ করব। আলবৎ কেড়ে খাব। হাতে বন্দুক আছে, ভাবনা কি...'

বৃদ্ধের গলা শোনা যায় : 'নাঃ কিছুতেই আসল বিষয়ের ওপর কথা বলবেনা তুমি, কেবল আবোল তাবোল বকবে!' হাত কাঁপছে বৃদ্ধের। মনে হয় যেন রেগে গেছে। মা খুব খুশি। কিন্তু আন্দ্রিয়েইর ধরন ওর ভালো লাগেনা। যেন ছ্যাবলামো করছে ও। ছেলের ওই গুরুগম্ভীর জবানবন্দীর পর এসব হালকা কথা মোটেই খাপ খায়না। যা ইচ্ছে বলুক না! তাতে তো বাধা নেই, তবে একটু গাম্ভীর্য দিয়ে, মর্যাদা দিয়ে বলুক। বলতে বলতে খখল আর একবার বৃদ্ধের দিকে তাকায়। কপালটা মুছে নিয়ে বলে শান্ত ভাবে :

'কাজের কথা বলতে বলছেন! আপনার সাথে ব'লে কি হবে? যা জানবার আমার বন্ধুর জবানবন্দীতেই তো সব জেনেছেন। আমাদের আরও তো কয়েক জন বাকী আছে—তাদের পালা এলে আরও যা জানবার আছে জানতে পাবেন।'

বৃদ্ধ চেয়ারের ওপর নড়ে চড়ে বসে চীৎকার ক'রে বলেন :

'বাস্ চুপ্? আচ্ছা এবার গ্রীগরি সাময়লভ!'

'ঠোঁট চেপে অলসভাবে বেঞ্চির ওপর ব'সে পড়ে খখল। সাময়লভ পাশে দাঁড়িয়ে চুলে হাত বুলায় আর বলে :

'সরকারী উকিল আমার কমরেড্‌দের জংলী বলেছেন, বলেছেন তাঁরা নাকি সভ্যতার শত্রু...'

'আবার বাজে কথা! শুধু তোমার নিজের মামলা সম্পর্কে বল যা বলার।'

'সেই সম্পর্কেই তো বলছি। আলাদা করি কি করে? খাঁটি লোকদের সাথে সম্পর্ক নেই এমন কোন কথা তো থাকতেই পারেনা। তা দেখুন, দয়া ক'রে আমায় বলতে দিন, কথার মধ্যে অমন করে বাধা দেবেন না। আচ্ছা বলুন তো দেখি সভ্যতা কি? ভারী জানতে ইচ্ছে করছে।'

'তোমাদের সাথে তর্ক করতে বসিনি আমরা। কাজের কথায় এস এখন।' দাঁত খিঁচিয়ে বৃদ্ধ বলেন।

আন্দ্রিয়েইর কথার ধরন বিচারকদের মধ্যে একটা পরিবর্তন এনে দিয়েছে। তাদের ওপর থেকে একটা খোলস যেন খ'সে গেল। সাদা মুখগুলো লালে দাগড়া দাগড়া হয়ে উঠল। চোখে হিম সবুজ আগুনের ফুলকি জ্বলতে লাগল। পাভেলের কথা ওদের ভালো না লাগলেও, কথার মধ্যে এমন একটা জোর ছিল যে পাভেলকে শ্রদ্ধা না ক'রে পারলনা এবং মনে যতই বিরক্তি থাক, বাইরে প্রকাশ করল না। খখল ওদের এই সংযমের খোলস ছিঁড়ে ফেলে ওদের চাপা-দেওয়া সত্য-স্বরূপকে টেনে বের করে আনল। বিচারকের দল চঞ্চল হ'য়ে ওঠে—মুখ বিকৃতি ক'রে কি যেন কানাকানি করে।

'তোমরা স্পাই হবার শিক্ষা দিয়ে মানুষগুলোকে স্পাই বানিয়ে তুলছ, সকল বয়সের মেয়েদের কুপথে টেনে আনছ; চোর ডাকাত খুনী বানিয়ে তুলছ। ভদ্‌কা খাইয়ে নেশাখোর বানিয়ে, একটা জাতির পেছনে আর একটা জাতিকে লেলিয়ে দিয়ে, মিথ্যা ব্যাভিচার আর বর্বরতা দিয়ে মানুষের রক্ত বিষাক্ত ক'রে তুলছ তোমরা। একে বলো তোমরা সভ্যতা? এই যদি তোমাদের সভ্যতা হয়, তবে আমরা সভ্যতার শত্রুই বটে।'

বৃদ্ধ বিচারপতি চীৎকার ক'রে ওঠেন : 'আমি আবার বলতে বাধ্য হচ্ছি' কিন্তু বৃদ্ধের কণ্ঠ ডুবিয়ে সাময়লভের জবাব আসে। লালমুখ, দীপ্ত চোখ সাময়লভ :

'আমরা শুধু সেই সভ্যতাকে মানি, শুধু মানি না, পূজো করি, যে সভ্যতার আদর্শ আমাদের সামনে তুলে ধরেছে সেইসব মানুষ যারা তোমাদের কৃপায় আজ জেলে তিল তিল ক'রে পচে গলে মরছে'

'চোপরাও! এর পর...ফিওদর মাজিন!'

তড়াক করে লাফিয়ে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ায় ছোট্ট ফিওদর। ছোট্ট দেহটা তার তলোয়ারের ফলার মত ঝলসে ওঠে!

'আমার বলবার দরকারই বা কি! রায় তো তোমাদের ঠিক হয়েই আছে। বলে টলে আর কি হবে! তবে এই বলে রাখছি, যেখানেই ঠেলে দাওনা কেন আমায়, বেশী দিন আটকে রাখতে পারবেনা। যেমন ক'রে হোক পালাবই। পালিয়ে এসে যতদিন বেঁচে থাকব কাজ করে যাব। বলে রাখলাম, দেখে নিও!'

হাঁপায় ফিওদর। মুখখানা ফ্যাকাশে হ'য়ে মড়ার মুখের মত হ'য়ে যায়। শুধু

চোখদুটো জ্বলতে থাকে।

সিজভ জোরে জোরে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে আর চঞ্চল হ'য়ে উস্‌খুস ক'রে। জনতার মধ্যে অদ্ভুত একটা গুঞ্জন ওঠে। তারপর সেই গুঞ্জন ডুবে গিয়ে ওঠে এক বিপুল উত্তেজনার তরঙ্গ। একজন স্ত্রীলোক ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে, আর একজন বেদম কাশতে আরম্ভ করে। রক্ষীরা অবাক হয়ে বন্দীদের দিকে, আর চোখে আগুন নিয়ে জনতার দিকে চায়। বিচারকরা চেয়ারে বসে দোলে। বৃদ্ধ চেঁচিয়ে ওঠেন :

'পরের আসামী ইভান গুসেফ্‌!'

'কিছু বলবার নেই।'

'ভাসিলি গুসেফ্‌!'

'আমারও নেই।'

'ফিওদর বুকিন!'

অত্যন্ত কষ্টে উঠে দাঁড়ায় সে—সাদা চেহারা, যেন সবখানি রং নিংড়ে নিয়ে গেছে কে। মাথা নেড়ে বলে :

'নির্লজ্জ বেহায়া! আমি বোকা, মুখ্যু, পেটে বোমা মারলেও ক অক্ষর বেরুবেনা। কিন্তু আমিও ভালো মন্দ বুঝি!' যেন বহু দূরের কিছু দেখছে এমনি ভাবে চোখ আধ-বন্ধ ক'রে মাথার ওপর হাত তুলে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে বুকিন।

চেয়ারে এলিয়ে পড়েন বিচারপতি। বিরক্তিতে বিস্ময়ে ব'লে ওঠেন :

'ও আবার কি?'

'কি আবার? শয়তান সব! চুলোয় যাও...'

গম্ভীর মুখে ব'সে পড়ে বুকিন। ওর ওই বিশ্রী কথাগুলি অভাবনীয় গুরুত্বে যেন গমগম ক'রে। কি এক অকপট সারল্য, আর মর্মস্পর্শী তিরস্কার ওর মধ্যে। প্রত্যেকটি মানুষের অনুভূতিকে গিয়ে স্পর্শ করে। এমন কি বিচারকরাও কান খাড়া করেন—যদি কোনও দিক থেকে একটু প্রতিধ্বনি এসে বুকিনের কথাগুলি খোলসা ক'রে দেয়। দর্শকদের কারো মুখে কথা নেই, ওরা যেন জমাট বেঁধে গেছে, এমনি নিস্তব্ধতা। মাঝে মাঝে এক আধটুকু কান্নার শব্দ আসছে। অবশেষে সরকারী উকিল ঘাড় ঝাঁকিয়ে ফিক্‌ করে একটু হাসেন; মার্শাল কাশেন, আর সারা এজলাস ঘরে ফিস্‌ফিসানির ঢেউ ওঠে।

মা সিজভের কানে কানে জিজ্ঞাসা করে : 'জজেরা বলবেন নাকি কিছু?'

'বলবে আর ঘোড়ার ডিম। মামলা তো শেষ। রায়টাই...'

'বাস্‌? আর কিচ্ছু নেই?'

'আর কি থাকবে?'

বিশ্বাস হ'তে চায় না মায়ের। সাময়লভের মা চঞ্চল হয়ে ওঠ্‌-বস্‌ করে, আর কনুই দিয়ে বারে বারে মাকে ধাক্কা দেয়। স্বামীকে বলে :

'হাঁগা? এ কেমন ধারা বিচার গা?'

'দেখতেই তো পাচ্ছ কেমন ধারা।'

'তাহ'লে আমাদের গ্রিশার কি হবে?'

'আঃ মুখ বন্ধ করে ব'স তো!'

সকলের চেতনায় গিয়ে ধাক্কা লাগে। একটা অনাচার অবিচারের অনুভূতি—কোথায় যেন কি বিচ্যুতি ঘটেছে, কি ভেঙেচুরে ছত্রখান হয়ে গেছে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে কি একটা উজ্জ্বল বস্তু চোখের সামনে রয়েছে। তার দীপ্তিটাই দেখতে পাচ্ছে,

জিনিষটার আকার বা অর্থ কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। না বুঝে চোখ মিট্‌মিট্‌ করছে সবাই; কিন্তু জিনিষটার দুর্বার শক্তি অনুভব করে পুরোপুরি।

কত বড় সত্য যে চোখের পলকে উদ্ঘাটিত হ'য়ে গেল সবার সামনে তা উপলব্ধি করতে পারেনি বলেই, খুঁটিনাটি ব্যাপার যে-টুকু ওরা বুঝেছে, তাই নিয়ে আশ্চর্য মনের পরিচয় দিতে লাগল।

'শোন না হে!' বলে বুড়ো বুকিন, 'ওদের বলতে দিলেনা কেন শুনি? সরকারী উকিলের বেলায় পোয়া বারো। যতবার ইচ্ছে বলো, দিল যা চায় বলো। সে বেলায় কিছু না!'

একজন সরকারী কর্মচারী দাঁড়িয়েছিল ওদের বেঞ্চিটার কাছে। ওপর দিকে হাত আস্ফালন করে চোখ রাঙ্গায় সে: 'এই চোপরাও সব!'

সাময়লভ স্ত্রীর পেছনদিকটায় দাঁড়িয়েছিল। ভাঙা ভাঙা কথায় বলে সে:

'আচ্ছা ধরেই নেওয়া যাক যে ওরা অপরাধী, কিন্তু নিজেদের কথা বুঝিয়ে বলবার একটা সুযোগ দেবে তো! কার বিরুদ্ধে ছেলেরা খেপেছে বুঝিয়ে বলো তো হে বাপু! এ ব্যাপারেও আমারও তো খানিকটা স্বার্থ আছে'

সাময়লভের দিকে আঙুল দেখিয়ে সাবধান করে সরকারী কর্মচারী: 'চুপ!'

সিজভ বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়ে।

বিচারকেরা চাপা স্বরে কথা বলে নিজেদের মধ্যে। মা ওদের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। ক্রমশ ওরা উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে। ওদের অস্পষ্ট, অনুভূতিহীন স্বরের ঝাপটা যেন এসে লাগে মায়ের মুখে। গাল দুটো কাঁপতে থাকে, মুখে কেমন এক বিশ্রী পচা স্বাদ। কেন জানিনা মায়ের মনে হয়—ওর ছেলে আর তার সাথীদের টগ্‌বগে রক্তে ভরা বলিষ্ঠ জীবন্ত দেহগুলোর ওপরই যেন হাকিমদের চোখ সেই কথারই আলাপ চলছে যেন ওদের। হিংসেয় মরছে ওরা অসুস্থের হিংসা, ফুরিয়ে-যাওয়া মানুষের ক্লেদাক্ত লোভ, ভিখারীর ক্ষুদ্র হিংসা। ক্ষুব্ধ মনে ব'সে ব'সে ঠোঁট চাটে ওরা। বুঝিবা দুঃখ হয়—অকেজো হ'য়ে যাবে এই শক্তিধর সৃষ্টিধর সুন্দর দেহগুলি। ওরা মেহনত করতে পারে, আনতে পারে কুবেরের ধন লুটে, সৃষ্টি করতে পারে, ভোগ করতে পারে, কিন্তু আজ ওদের কাজ ফুরিয়েছে। এই সুন্দর দেহগুলি আজ বর্জিত, ওরা অকেজো। ওদের স্থান আজ আস্তাকুঁড়ের ভিড়ে, অতএব আর এদের শাসন, শোষণ করার জো রইলনা। সেই জন্যই এই জোয়ান ছেলেগুলোকে দেখে হাকিমদের অত রাগ, অত জ্বালা। ভেতরটা যেন দাঁত বসিয়ে কুরে কুরে খাচ্ছে। সামনে তাজা রক্ত দেখলে বুড়ো বাঘ ভালুকের যেমন হয়—জিভ দিয়ে লালা ঝরে—অথচ ধ'রে ঘাড় মট্‌কাবার তাকত নেই। ভোগের বস্তু হাতে এসে খোয়া গেল—এখন শুধু ব'সে ব'সে নিজের হাত পা কামড়ান। অদ্ভুত চিন্তা। কিন্তু বিচারকদের মুখের দিকে যতই চায় মা, ততই আরো বেশী ক'রে এই কথাই মনে হয়। একদা বহু রক্ত পান ক'রেছে এই হিংস্র জানোয়ারের দল। আজ ওরা অক্ষম, উপোসী; উপোসী হিংস্রতার নগ্ন লোলুপতা আর নিষ্ফল ক্রোধ লুকোবার চেষ্টাও করেনা নির্লজ্জেরা।

নারীর হৃদয়, মায়ের হৃদয় দিয়ে বারে বারে বিশ্লেষণ ক'রে দেখেছে মা, নিজের আত্মার চাইতেও প্রিয়তর পুত্রের ওই বরবপু। আজ ওই প্রিয়-বস্তুর ওপর দিয়ে গুঁড়ি মেরে বেড়াচ্ছে এই প্রেতায়িত চোখগুলির লালা-সিক্ত ক্লেদাক্ত দৃষ্টি! ওদের ক্লিষ্ট স্পর্শ লাগছে ছেলের বুকে মুখে কাঁধে বাহুতে। ওদের প্রাণ-সমৃদ্ধ তরুণ

সজীব দেহের সঙ্গে নিজেদের দেহগুলিকে ঘষে ঘষে ওরা ওদের স্থবির ধমনীর হিম রক্ত-প্রবাহ আর নিষ্ক্রিয় পেশীগুলোকে উষ্ণতায় সঞ্জীবিত করে তুলতে চায়। ভয়ে শিউরে ওঠে মা,—বিদ্বেষের কাঁটার খোঁচায় খোঁচায় মরা মানুষগুলো যেন চাঙ্গা হ'য়ে উঠেছে! হাতের-মুঠোয় এসেছে কাঁচা প্রাণগুলো,—মৃত্যুর পরোয়ানা জারী করে ওদের দেহগুলোকে ছিনিয়ে নিয়ে চিরদিনের মত ভিখারী ক'রে দেবে। পাভেল যেন ওদের এই লালা-ক্লিন্ন স্পর্শটা টের পেয়েছে—মনে হয় মার।

মায়ের দিকে চায় পাভেল। শান্ত কোমল দৃষ্টি, বুঝি বা একটু ক্লান্ত। মাঝে মাঝে একটু মাথা নাড়ে, একটু হাসে। শুধুই হাসি নয় ও—ওযে আদর! 'দেরী নেই, দেরী নেই আর—মুক্তি এবার!' বলছে পাভেল ওই হাসির ভাষায়।

হঠাৎ উঠে পড়ে বিচারকরা। মাও উঠে পড়ে নিজের অজান্তে।

'চলল এবার!' সিজভ বলে।

'রায় দেবার জন্য?' শুধায় মা।

'হুঁ!

এতক্ষণের মানসিক সংগ্রামে অবসন্ন হয়ে পড়েছিল মা। মুহূর্তে সমস্ত শংকা, ভয় ছিন্ন হ'য়ে গেল। ভ্রুজোড়া কাঁপতে লাগল; কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। অপমান আর নৈরাশ্যের প্রচণ্ড ধাক্কা এসে লাগল বুকে। আর নিমেষে হাকিম আদালত সকলের বিরুদ্ধে ঘৃণা হ'য়ে জ্বলে উঠল সেই আঘাত। মাথাটা তীব্র ব্যথায় দপ্ দপ্ ক'রতে লাগল। কপালটাকে চেপে ধ'রে চোখ তুলে তাকায় মা। বন্দীদের সকলের আত্মীয়স্বজন উঠে কাঠগড়ার কাছে গেছে। কথাবার্তার গুন্‌গুনানিতে ঘর ভ'রে গেছে। মাও পাভেলের কাছে যায়; চোখের জলে ভিজে ছেলের হাতখানা চেপে ধরে— আনন্দ ব্যথা ফেটে পড়ছে...বিপরীত এলোমেলো নানা সুরের ভিড় লেগেছে অনুভূতির তারে তারে। পাভেল নরম সুরে কথা কয় মায়ের সাথে; খখল সেই চিরকেলে হাসিঠাট্টা নিয়ে ঠিক তেমনিই আছে।

মায়েরা সবাই কাঁদছে—অনেকটা অভ্যেসেই। দুঃখে ততটা নয়। কারণ বিহ্বল হবার মত অলক্ষ্যে বা আকস্মিক ভাবে তেমন কোন আঘাতই এখনও আসেনি। শুধু বিচ্ছেদের ব্যথা। আজকের এই মামলার সমস্ত ব্যাপারটা মনের মধ্যে যে রং ঢেলে দিয়েছে; তাতে সে দুঃখও খানিকটা মোলায়েম হ'য়ে গেছে। মা-বাপের মনে পাঁচ-মিশেলি ভাব। দস্যি ছেলেগুলোকে বিশ্বাস হ'তে চায় না—শত হ'লেও মা-বাপ গুরুজন...নিজেদের বিচার-বুদ্ধিকেই বড় মনে হয়—অথচ তার সাথে মিশে আছে যে-ভাবটা তা প্রায় শ্রদ্ধার কাছাকাছি। কোথায় কি ক'রে থাকবে ছেলেগুলো, ভাবতে মনটা খারাপ হয়ে যেতে চায়। অথচ ওই ছেলেরাই কেমন সোজা চেয়ে বুক ফুলিয়ে নির্ভয়ে ব'লে গেল তারা নতুন দুনিয়া গড়বে; জীবনকে সুখের পথ দেখাবে। তাক্ লেগে যায়। দুঃখ ছাপিয়ে বিস্ময় ওঠে। কিন্তু মনের ভাব মনেই থাকে—ভাষা নেই। ভাষা নেই ব'লে কথার কাঙ্গাল নয় ওরা। অজস্র কথা কয়। অতি সাধারণ কথা সব— কাপড়-জামা, ধোবা-নাপিত, শরীরের দিকে নজর রাখা, বাস্ ওই পর্যন্ত।

বড় বুকিন ছোট ভাইকে বোঝাতে চেষ্টা করে হাত নেড়ে :

'বুঝলে কিনা, ন্যায় চাই, ন্যায়। আর কিচ্ছুটি নয়!'

'বাচ্চাটাকে দেখো!'

'তা আর বলতে!'

সিজভ ভাইপোর হাত ধ'রে বলে :

'তাহ'লে, ফিওদর! যাচ্ছিস্, আমাদের ছেড়ে!'

ঝুঁকে প'ড়ে কাকার কানে কি যেন বলে ও। চোখে মুখে দুষ্টু হাসি। রক্ষীও হাসে। পরক্ষণেই আবার গম্ভীর হ'য়ে এতখানি মুখ ক'রে গলা খাঁকারি দিয়ে দাঁড়ায়।

মাও অন্য মায়েদের মতই ছেলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিয়েই তার সাথে কথা বলছে। কিন্তু মনের মধ্যে তোলপাড় করে হাজার প্রশ্ন, নিজের সম্বন্ধে, সাশার সম্বন্ধে। সব ছাপিয়ে উদ্বেল হ'য়ে ওঠে পুত্র-স্নেহ। ভাবে, কিসে ছেলে খুশি হবে, কি ক'রে ছেলের আরো কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াবে। এতক্ষণ কি হবে কি হবে ক'রে ভয়ে ম'রেছে মা। এখন সে ভয় ভেঙে গেছে। মনের তলায় এখন তার ছায়াটা আছে শুধু। আর হাকিমদের কথা মনে করলে এখনও বুকটা শিভবে শিউরে ওঠে। হোক তা। ওই ভয়ের মধ্যেও এক বিপুল জ্যোতির্ময় আনন্দ যে জন্ম নিচ্ছে মায়ের ভেতরে সে খবর তার চেতনায় পৌঁছে গেছে। এ সম্ভাবনার জন্য প্রস্তুত ছিলনা মা বড় বিব্রত বোধ করে এখন।

সকলের সাথেই কথা ব'লে বেড়াচ্ছে খখল। বোঝে মা, পাভেলের চাইতেও ও ছেলেরই মায়ের স্নেহের বেশী দরকার। ওর দিকে ফিরে বলে মা :

'তোদের এই মামলার জন্য বেশী চিন্তা-ভাবনা হয়নি আমার।'

'কেন গো নেন্‌কো?' কৃতজ্ঞতার হাসি হেসে বলে খখল.

'বয়স কত? না নেইক গোনা,
কিন্তু যেন গো খাঁটি সোনা।...'

ইতস্তত ক'রে বলে মা : 'কি এমন হাতী ঘোড়া হ'ল যে ভাবনা হবে? তবে কার যে ন্যায় আর কার যে অন্যায় বোঝা গেলনা।'

'ওহো, তাই আশা ক'রে বসেছিলে বুঝি!' আন্দ্রেয়েই বলে, 'সত্য মিথ্যের জন্য ভারী তো মাথা-ব্যথা ওদের!'

একটু হেসে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে মা :

'ভেবেছিলাম কত সাংঘাতিক ব্যাপারই না জানি হবে।'

'এজলাশ চুপ!'

সবাই তাড়াতাড়ি জায়গায় যায়।

প্রধান বিচারক টেবিলের ওপর এক হাতে ভর দিয়ে আর এক হাতে একটা কাগজ নিয়ে পড়তে আরম্ভ করেন নিস্তেজ স্বরে :

'রায় পড়ছেন', সিজভ বলে।

শান্ত ঘর। সবাই দাঁড়িয়ে, বৃদ্ধ বিচারকের দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সবাই। স্থির নিশ্চল স্তব্ধ মূর্তিখানিকে মনে হচ্ছে কোন অদৃশ্য হাতের লাঠি। অন্য বিচারকরাও উঠে দাঁড়িয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেট্ ঘাড় কাৎ ক'রে ছাদের দিকে তাকিয়ে, মেয়রের হাতদুটো আড়াআড়ি ক'রে ভাঁজ ক'রে বুকের ওপর রাখা; মার্শাল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাড়িতে হাত বুলাচ্ছেন। রোগা বিচারক, মোটা বিচারক, সরকারী উকিল সকলেই তাকিয়ে আছে আসামীদের দিকে। তাদের পেছনে জারের ছবি। রক্ত-বর্ণের রাজবেশে ঝলমল করছে মূর্তি, আনত-দৃষ্টি; ঔদাস্য-ভরা গৌরবর্ণ মুখখানার ওপর দিয়ে একটা পোকা হেঁটে বেড়াচ্ছে।

'যাক বাবাঃ দেশান্তর!' একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ব'লে ওঠে সিজভ। 'যাক

বাবা, শেষ তো হ'ল! কঠিন শ্রম—বললে। হোক্‌গে। ভেবোনা মা, সব ঠিক হ'য়ে যাবে।'

'এতো জানাই ছিল।' ক্লান্ত কণ্ঠে বলে মা।

'যাই হোক, একটা কিছু হেস্তনেস্ত হ'য়ে তো গেল। এতদিন তো না এদিক না সেদিক। কত্তাদের দিল মর্জি'র ঠাহর পাওয়া যায়নি।'

বন্দীদের দিকে ফিরে তাকায় সিজভ। এরই মধ্যে তাদের বের ক'রে নিয়ে চলেছে।

'আসি হে, ফিওদর, আর যারা যারা আছে। বিদায়! ভগবান মঙ্গল করবেন।'

মা তাঁর ছেলে আর অন্যদের দিকে তাকিয়ে নীরবে মাথা নীচু ক'রে বিদায় জানায়। বুক ফেটে কান্না আসতে চায়। কিন্তু লজ্জা করে যে।

সাতাশ

আদালত থেকে বেরিয়ে দেখে রাত হ'য়ে গেছে। অবাক হ'য়ে গেল মা। রাস্তায় রাস্তায় বাতি জ্বলেছে। আকাশে জ্বলছে তারা। কাছারির আঙিনায় জটলা ক'রছে দলে দলে মানুষ। হিমেল হাওয়ায় বরফ-ঝরার শব্দ। কতগুলি তরুণ কণ্ঠের স্বর ভেসে আসছে। ধূসর রঙের আলখাল্লা পরা একটা লোক, সিজভের মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যস্তসমস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করে :

'কি সাজা হ'ল?'

'কি আর হবে? হল দেশান্তর!'

'সব্বাইকে?'

'হ্যাঁ!'

'ধন্যবাদ।'

হন্‌হন্‌ ক'রে চ'লে গেল লোকটা।

'দেখলে তো? কোনদিকে ওদের মন টেনেছে?'

তক্ষুণি জন বারো ছেলেমেয়ে এসে ঘিরে ধ'রে। দাঁড়িয়ে পড়ে সিজভ আর মা। প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তোলে ওদের। লোক জমে যায় চারদিকে। কি সাজা হ'ল, ছেলেরা কি ক'রল, কে কে বক্তৃতা দিলে, কি বললে—খুঁটিনাটি সব জিজ্ঞাসা করে। ওদের স্বরে, ভঙ্গিতে এমনি ব্যগ্র কৌতূহল, এমনি আন্তরিকতা যে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে থাকতে পারে না ওরা।

কে একজন ব'লে ওঠে : 'বন্ধুগণ! এই যে পাভেল ভ্লাসফের মা।' নিমেষে কোলাহল থেমে যায়। কারো মুখে কথা নাই।

'আপনার হাতখানা...'

কার একখানা বলিষ্ঠ হাত এসে মায়ের হাত চেপে ধরে। কার যেন ব্যগ্র কণ্ঠ ব'লে ওঠে :

'আমাদের সামনে সাহসের আদর্শ হ'য়ে থাকবে আপনার ছেলে।...'

'রুশ শ্রমিক জিন্দাবাদ!' বাতাসের বুক চিরে ধ্বনি ওঠে। ক্রমশ আরো আরো

মানুষের কণ্ঠ এসে মেলে ওই ধ্বনির সাথে; দিকে দিকে ছড়িয়ে যায় সেই উদাত্ত সম্মিলিত নির্ঘোষ। চারদিক থেকে ছুটে এসে সিজভ আর মাকে ঘিরে ফেলে দলে দলে মানুষ। পুলিশের বাঁশি বাজে অস্থির ভাবে; কিন্তু সব ছাপিয়ে ওঠে জনতার আওয়াজ। সিজভ হাসে। মায়ের কাছে এ যেন সুখস্বপ্ন! হাসি-ভরা মুখে মাথা নুইয়ে সম্ভাষণ জানায় মা, এগিয়ে আসা হাতগুলিকে নিজের হাতে তুলে নেয়। আনন্দাশ্রুতে কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে আসে। শ্রান্তিতে পা কাঁপে। কিন্তু স্বচ্ছ হ্রদের বুকের মত কানায় কানায় ভরা চিত্তে কত অসংখ্য ছায়া ভিড় ক'রে আসে।

মায়ের খুব কাছে দাঁড়িয়েছিল কে একজন। অত্যন্ত স্পষ্ট, আবেগময় স্বরে বলতে আরম্ভ করে :

'বন্ধুগণ, যে দানব আমাদের দেশের মানুষকে গিলে গিলে খাচ্ছে, সে আজ আবার মুখব্যাদান করে...'

সিজভ বলে : 'চলগো, এখেনে দাঁড়ানো কেমন ভাল ঠেকছে না।'

কোত্থেকে যেন ভুঁই ফুঁড়ে উঠল সাশা। মাকে হাতে ধ'রে রাস্তার ওধারে টেনে নিয়ে গিয়ে বলে :

'চল চল। এখানে নয়। মারামারি ধরপাকড় শুরু হবার আগেই বেরিয়ে যাই চল। তারপর কি হ'ল? সাইবিরিয়া?'

'সে আবার বলতে!'

'কি রকম বললে? সব থেকে জোরাল তাই না? খুব সোজাসরল ভাষা, কিন্তু তাই দিয়ে আগুন ছড়িয়ে দিল, তাই না? আমি জানি। বড় অভিমানী মানুষ। কিন্তু প্রকাশ করতে পারেনা। ভয় পায়।'

সাশার প্রাণঢালা কথায় মা যেন শান্তি পায়। নতুন ক'রে বল পায়। ওর হাতে সস্নেহে চাপ দিয়ে জিজ্ঞাসা করে :

'কবে যাবে তুমি ওর কাছে?'

'আমার জায়গায় কাজ করবার মত একজন কাউকে পেলেই চ'লে যাব।' সামনের দিকে তাকায় সাশা। ওর চোখে গভীর বিশ্বাস। 'আমিও একটা কিছু শাস্তি পাবার ব্যবস্থা করছি। হয়তো আমায়ও সাইবিরিয়া পাঠিয়ে দেবে। ও যেখানে আছে সেখানেই পাঠিয়ে দিতে ব'লব।'

'যাও যদি, আমার নমস্কার দিও।' সিজভ বলে : 'কিচ্ছু বলতে টলতে হবেনা, খালি বলো সিজভ পাঠিয়েছে, ফিওদর মাজিনের কাকা। ও চেনে আমায়।'

ফিরে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দেয় সাশা।

'আমি চিনি ফিওদরকে। আমার নাম সাশা।'

'পদবী?'

'আমার বাবা নেই।'

'মারা গেছেন?'

'না।' তীব্র কঠিন স্বর। কঠিন মুখ। বলে :

'জমিদার মানুষ, গাঁয়ের মোড়লী করেন আর চাষীর রক্ত শোষেন।'

'হুঁ।' সিজভ বলে। তারপর সব চুপচাপ। সাশার পাশে পাশে চলে সিজভ— মাঝে মাঝে ওর দিকে তির্যক দৃষ্টিতে তাকায়।

'আচ্ছা, আসি মা,' বলে ও, 'আমি এই বাঁদিকে যাব। চলি তাহ'লে, সাশা! অত

কড়া নাইবা হ'তে বেচারা বাপের ওপর! অবশ্যি তোমার ব্যাপার তুমিই বুঝবে। আমার মাথাব্যাথা কিসের!'

উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে সাশা : 'আচ্ছা ! আপনার ছেলে যদি অপদার্থ হয়, লোকের ক্ষতি ক'রে বেড়ায়! ধরুন, তাকে দেখতে পারেননা আপনি। বলবেননা তাহ'লে?'

একটু চুপ ক'রে থেকে বলে বৃদ্ধ : 'তা হয়ত বলব।'

'তাহ'লেই তো! ছেলেটেলে যেমন তেমন, ন্যায়ই বড় আপনার কাছে। আমার কাছেও তাই। আমার বাবার চাইতে আমার কাছেও ন্যায় বড়...'

সিজভ হাসে আর মাথা নাড়ে। বলে :

'ভারী চালাক মেয়েতো তুমি! তা ওটুকু যদি রাখতে পার বুড়োগুলোর কাছ থেকে কাজ আদায় ক'রতে পারবে। দম আছে দেখছি। আচ্ছা! আজ এই পর্যন্ত। তবে লোকের সাথে একটু নরম-সরম হলে ক্ষতি নেই—কি বল? চলি নিলোভনা। পাভেলের সাথে দেখা হ'লে বলো—আমি তার জবান-বন্দী শুনেছি। যদিও বুঝতে পারিনি সব। কিন্তু মধ্যে মধ্যে কিসব বলছিল বাপু, ভয়ে মরি। অমনিতে বেড়ে হয়েছে। যা বলেছে মোটামুটি ঠিকই বলেছে।'

টুপী তুলে রাস্তার বাঁক ফিরল সে।

ডাগর ডাগর চোখের হাসিভরা দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে রইল সাশা ওর দিকে। বলল : 'বেশ মানুষটি।'

মা'র মনে হয়, সাশার মুখখানা যেন আজ অন্যদিনের চাইতে একটু বেশী মিঠে, কোমল।

বাড়ী এসে দু'জন ঘেঁষাঘেঁষি হ'য়ে দিভানের ওপর বসে। পাভেলের কাছে সাশার যাওয়া নিয়ে কথাবার্তা হয় খানিকক্ষণ। মায়ের চুপ ক'রে থাকতে ইচ্ছে করে। সাশা তার স্বপ্নালু চোখের পূর্ণ দৃষ্টি মেলে দূরের পানে তাকিয়ে আছে। কি যেন ভাবছে গভীর ভাবে। স্থির প্রশান্ত সেই চিন্তার ছায়া প'ড়েছে ওর বিবর্ণ মুখে।

'তারপর, তোর যখন ছেলে হবে, আমি যাব ধাই-মা হ'য়ে। ওখানেই থাকব সবাই মিলে। এখান থেকে কি আর এমন খারাপ হবে! কাজকর্ম জুটিয়ে নিতে পারবেই পাভেল কিছু না কিছু। সব রকম কাজই তো ও জানে।'

জিজ্ঞাসু ভাবে মায়ের দিকে তাকায় সাশা। শুধায় :

'তুমি এখন যাবেনা ওর সাথে সাথে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে মা : 'আমায় নিয়ে ক'রবে কি ও? যদি ওখান থেকে পালাতে চায়, আমায় নিয়ে মুশকিল হবে তখন। আমি যদি যেতেও চাই, দেখো ও নিজেই রাজী হবেনা।'

সাশা মাথা নাড়ে : 'ঠিক বলেছ, সত্যি ও রাজী হবেনা।'

'তা ছাড়া,' মা বলে—স্বরে একটু আত্মপ্রসাদের সুর বাজে : 'আমার কাজও তো পড়ে আছে এখানে।'

'ঠিক বলেছ। বেশ ভালো কথা।'

হঠাৎ চমকে ওঠে সাশা। কি যেন একটা ঝেড়ে ফেললে ও। আবার বলতে আরম্ভ করে অতি সহজ শান্ত ভাবে।

'সেখানে কিছু আর হামেশার জন্য ব'সে থাকবে না। পালাতে তো হবেই...'

'আর তুই? তারপর, বাচ্চা যদি হয়...?'

'তা সে তখন দেখা যাবে। আমার কথা ভাবলে ওর চলবে কেন? আমি ওর

পথের বাধা হব, সে কিছুতেই হতে দেবনা। অবশ্যি খুব কষ্ট হবে আমার ওর কাছ থেকে দূরে থাকতে—তা সে ব্যবস্থা ক'রে নেব'খন যা হয়। কিন্তু বাধা আমি ওর হবনা!'

মা বোঝে, যা বলবে, তাই ক'রবে সাশা। সে ক্ষমতা তার আছে। বড় দুঃখ হয় মেয়েটার জন্য। ওকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে বলে :

'বড় কষ্ট হবে রে তোর, মা!'

সাশা মৃদু হেসে মায়ের কাছে স'রে আসে।

শ্রান্ত ক্লান্ত নিকলাই এসে ঘরে ঢোকে এমনি সময়। কাপড় ছাড়তে ছাড়তে ব্যস্ত হয়ে বলে :

'এখনও সময় আছে সাশা। পালিয়ে যাও। সকাল থেকে দু'জন টিকটিকি লেগেছে পেছনে। এমনি খোলাখুলি ঘুরছে, মনে হচ্ছে এবারে ধ'রবেই আমায়। আমার মন কখনও মিথ্যে কথা বলেনা। কিছু একটা হয়েছে। ভালো কথা, ধরতো এটা! পাভেলের জবানবন্দী। ছাপ্‌বো ঠিক করেছি আমরা। এটা এক্ষুণি নিয়ে যাও লুদমিল্লার কাছে। বলোগে, যত শিগ্‌গির পারে এটা ছেপে ফেলে যেন। আঃ নিলোভনা গো! কি চমৎকার বলেছে পাভেল...! হ্যাঁ, স্পাই, খেয়াল রেখো, সাশা।'

কথা বলতে বলতে জমে-যাওয়া হাত দুটোকে ঘষে নিকলাই। তারপর নিজের ডেস্কে এসে দেরাজ থেকে কি সব কাগজপত্র টেনে বার করে। কতগুলি ছিঁড়ে ফেলল, কতগুলি একধারে সরিয়ে রাখল। ওর চেহারা দেখে মনে হচ্ছে ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে ও।

'কতকাল যে দেরাজে হাত দিইনি! কোত্থেকে এল এসব নতুন কাগজপত্র কে জানে! সে তো যেমন হ'ল, তুমি যেন এখানে রাত্তিরে থেকোনা, নিলোভনা! কি বল? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের তামাশা দেখা, ভারী বিশ্রী লাগে। তাছাড়া তোমায়ও ধ'রতে পারে তো। কিন্তু ধরা প'ড়লে তো চলবেনা, পাভেলের বক্তৃতাটা নিয়ে চারধারে ছুটোছুটি ক'রতে হবে তো তোমাকেই...'

'আমায় ধ'রে ক'রবে কি?'

নিকলাই নিজের চোখের সামনে হাতটা নেড়ে বলে :

'কি জানি এসব ব্যাপারের গন্ধ যেন টের পাই আমি। লুদমিল্লার অনেক সাহায্য করতে পারবে তুমি। মিছিমিছি এখানে থেকে ওদের খপ্পরে প'ড়তে যেওনা...'

ছেলের বক্তৃতা ছাপা হবে, খুশি হ'য়ে ওঠে মা। বলে :

'বেশ তো, তাই যদি হয়, যাচ্ছি আমি। ভগবানের ইচ্ছায় আমার সব ভয়ডর গেছে।'

'চমৎকার!' মায়ের দিকে না তাকিয়েই জবাব দেয় নিকলাই। 'কিন্তু আমার সুটকেস্ আর জামাকাপড় কোথায় আছে একটু ব'লে দাও দিকি। সব নিজের হাতে নিয়ে এমনি ক'রে গুছিয়েছ, আমার নিজের জিনিষও খুঁজে পাইনা।'

সাশা নিঃশব্দে ব'সে স্টোভের আগুনে কাগজ পুড়িয়ে কয়লার ছাইয়ের সাথে তার ছাইগুলো নেড়ে নেড়ে মেশাচ্ছে। নিকলাই হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে :

'এবারে যেতে হয় যে, সাশা! এসো তাহ'লে। ভালো বইটই যা বেরুবে পাঠিয়ে দিও আমায়, ভুলোনা যেন? আচ্ছা, এসো কমরেড! সাবধানে থেকো...'

'তোমারও কি অনেক দিনের জেল হবে?' সাশা জিজ্ঞাসা করে।

'কে জানে? হ'তে পারে। আমার বিরুদ্ধে ওদের অনেক দফা আছে তো!

নিলোভনা, তুমিও না হয় সাশার সাথেই চ'লে যাও। দু'জনকে চট্ ক'রে কিছু ক'রতে পারবেনা।'

'বেশ,' জবাব দেয় মা, 'দু'চারটে জিনিসপত্র একটু গুছিয়ে নি।'

সন্ধানী দৃষ্টি মেলে নিকলাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে মা। সেই চির-কালের শান্ত কোমল মুখ। আজ তার ওপর শুধু একটু উদ্বেগের ছায়া। কোন চঞ্চলতা, ভয়ের চিহ্ন নেই। এই মানুষটির ওপরেই মায়ের স্নেহ সব চেয়ে বেশী পড়েছে। সবার সাথে ওর সমান পক্ষপাতিত্বহীন অমায়িক ব্যবহার—একদিনের তরেও এতটুকু রাগ দেখেনি। শান্ত সমাহিত একা মানুষটি নিজের মধ্যে নিজে ডোবা। ভেতরটা ওর কেউ কোন দিন দেখতে পায়নি—একান্তে সংগোপনে আপনাকে ও সবার আড়াল ক'রে রেখেছে। কিন্তু কোথায় যেন ওর ভেতরের মানুষটি এগিয়ে গেছে সবাইকে ছাড়িয়ে। চিরকাল যেমন ও সবার জন্য ছিল আজও তাই রইল। এই মানুষটি সব চেয়ে কাছে এসেছে—জানে মা। কিন্তু বড় সাবধানী ভালোবাসা; তলায় যেন ভুষি নেই। আজ করুণা হয় মার ওর জন্য। অসহ্য করুণা। কিন্তু দেখাতে ভয় হয়। বিব্রত হবে নিকলাই; ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে উঠবে। ভারী বিশ্রী বোকা বোকা চেহারা হয় তখন—দেখলে হাসি পায়। নিকলাইকে অমন চেহারায় দেখতে মোটেই ইচ্ছে করেনা মার।

আর একবার ঘরে আসে মা। নিকলাই সাশার হাত ধ'রে বলছে শুনতে পেল : 'খাসা! ঠিক তোমাদের দুজনের লাগসই ব্যবস্থা! ছিঁটেফোঁটা ব্যক্তিগত সুখ—কারোই লোকসান নেই তাতে। তৈরী, নিলোভনা?'

চশমাটা ঠিক ক'রতে ক'রতে হাসিমুখে মায়ের কাছে এসে দাঁড়ায় নিকলাই।

'এবার বিদায় কেমন? এই মাস তিন চার আর কি! বড় জোর ছ' মাস। আশা করি তার বেশী না। ছ'টা মাস—বড্ড লম্বা না? সাবধানে থেকো কেমন? থাকবে তো! শেষবারের মত একটু জড়িয়ে ধ'রে নি!'

রোগা, নরম সরম মানুষটি; কিন্তু বলিষ্ঠ দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে মাকে। তার চোখের দিকে চেয়ে থাকে গভীর ভাবে। হেসে বলে :

'ছাড়তে আর ইচ্ছে ক'রছেনা। কিন্তু যে-ভাবে আদর করছি, মনে হ'চ্ছে তোমার প্রেমে প'ড়ে গেছি...'

মা কথা বলতে পারেনা; নীরবে ওর মাথায় গালে চুমু খায়। হাত কাঁপে থরথর ক'রে। সরিয়ে নেয় মা হাত, পাছে টের পায় নিকলাই।

'সাবধান থাকবে কিন্তু। ভোরবেলা একটা ছোট্ট ছেলেকে পাঠাবে—সে এসে আগে দেখে যাবে চারদিকে। লুদমিল্লার চেনা ছেলে আছে। এইবার তাহ'লে এসো কম্‌রেড! এযে হবে তাতো জানাই ছিল! নতুন কিছু তো হয়নি!'

রাস্তার বেরিয়ে সাশা আস্তে আস্তে বলে :

'যমের বাড়ী যেতে হ'লেও বোধহয় মানুষটা এমনি করে বিনা হৈচৈ-এ চুপচাপ ক'রে চ'লে যাবে। আর খোদ যমরাজ যখন সামনে এসে দাঁড়াবেন—তখনও ও এমনি করে চশমা মুছতে মুছতে 'খাশা!' ব'লে চোখ বুজবে! আশ্চর্য মানুষ!'

মা চাপা স্বরে বলে : 'বড় ভালোবাসি আমি ছেলেটাকে।'

'ওকে দেখে দেখে শুধু অবাক হই আমি, ভালোবাসিনে। খুব শ্রদ্ধা করি। ভারী স্নেহশীল; এক এক সময় ভারী নরম হ'য়ে পড়ে ওর মনটা। কিন্তু তবু যেন বড্ড শুক্‌নো—রস-কস হীন। ও যেন ঠিক রক্তমাংসের মানুষ নয়...। বোধ হয় ফেউ

আসছে পেছনে। চল তো আলাদা হ'য়ে কেটে পড়ি। যদি বোঝ যে পেছনে মানুষ আছে, তাহ'লে লুদমিল্লার ওখানে যেওনা।'

'না, তা আর কি ক'রে যাব।' মা বলে। তবু সাশা বলতে থাকে:

'সেখানে যেওনা, তার চেয়ে আমার ওখানে এসো। আচ্ছা এখনকার মত আসি তাহ'লে।'

ফিরে, যে পথে এসেছিল সে পথেই হন্‌হন্‌ ক'রে চলতে থাকে সাশা।

আটাশ

কয়েক মিনিট পর।

লুদমিল্লার ছোট ঘরখানিতে ব'সে স্টোভের আগুন তাপাচ্ছে মা। ধীরে ধীরে পায়চারি ক'রছে লুদমিল্লা। পরনে তার কালো পোষাক—চামড়ার বেল্ট দিয়ে আঁটা। পোষাকের খস্‌খসানি আর ওর গলার গুরুগম্ভীর আওয়াজে ঘরখানা ভ'রে আছে।

স্টোভে গন্‌গন্‌ করছে আগুন; শোঁ শোঁ শব্দে ঘরের বাতাসকে শুষে নিচ্ছে। কাঠ পোড়ার ফট্‌ ফট্‌ শব্দ আছে তার সাথে মিশে। সমান লয়ে ব'য়ে চলেছে লুদমিল্লার কণ্ঠ-স্বর:

'মানুষরা ভালো তো নয়ই, কিন্তু তার চেয়েও বেশী বোকা। ঠিক চোখের সামনে যেটুকু আছে, হাতের মুঠোয় যেটুকু আছে, তার বাইরে আর কিছু ওদের চোখে পড়েনা। এইটুকু বোঝেনা সস্তা জিনিসই হাতের কাছে প'ড়ে থাকে। দুর্লভ বস্তু দূরেই থাকে। সাধনা করে তা পেতে হয়। ঐটুকু তলিয়ে দেখলে বুঝবে -জীবন যদি একটু অন্যরকম হ'ত, আমাদের কাজ যদি আরো একটু সহজ হ'ত আর মানুষ-গুলির আর একটু বুঝ-সুঝ থাকত, তাহ'লে প্রত্যেকেই সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারত। কিন্তু ওটুকু পেতে হ'লে, একটু কষ্ট ক'রতে হবে তো।'

হঠাৎ মায়ের সামনে এসে থম্‌কে দাঁড়ায়।

'লোক জনের সাথে দেখা সাক্ষাৎ আমার বড় একটা হয় না। হয় কম। কিন্তু কেউ এলেই আমার মুখ ছোটে এমনি ভাবে। ভারি বিশ্রী না?' একটু লজ্জিত ভাবে বলে লুদমিল্লা।

'কেন?' মা বলে। মায়ের সন্ধানী চোখ ঘুরে বেড়ায় কোথায় মানুষটার ছাপার সরঞ্জাম। কিন্তু কোথাও কিছু নেই—। রাস্তার দিকে তিনটে জানালা। আসবাবের মধ্যে একটা দিভান, বইয়ের আলমারি একটা, টেবিলটা, খান কয় চেয়ার, আর বিছানা। এক কোণে হাত মুখ-ধোবার সরঞ্জাম, আর এক কোণে স্টোভ। দেয়ালে ঝোলান গুটি কয়েক ফটো। সব একেবারে ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে, প্রায় নতুনের মত। কোথাও ভাঙাচোরা নেই। কিন্তু গৃহকর্ত্রীর কঠিন মূর্তিখানি থেকে নিঃসৃত হয়ে একখানি হিম-ছায়া যেন ছড়িয়ে আছে সব কিছুর ওপর। মায়ের মনে হয় কি একটা লুকোন আছে। কিন্তু কোথায়, তা নজরে পড়েনা। দরজাগুলোর দিকে তাকায়। যে দরজা দিয়ে ভেতরে এল, সেখান দিয়েই ছোট্ট হলটাতে যাওয়া যায়। আর একটা আছে স্টোভের পাশে—অনেক উঁচু আর সরু।

মার খেয়াল হয় লুদমিল্লা নিরীক্ষণ করে দেখছে ওকে। আত্ম-সচেতন হ'য়ে ওঠে মা। বলে : 'একটা কাজে এসেছি।'

'জানি। এমনি বেড়াতে কেউ আসেনা আমার বাড়ী।'

লুদমিল্লার বলার ভঙ্গিতে অদ্ভুত একটা সুর। ওর মুখের দিকে চায় মা—পাতলা ঠোঁট দু'খানির প্রান্তে ক্লান্ত হাসির ক্ষীণ রেখা। চশমা চোখে। তার মধ্যে দিয়ে দেখা যায় ওর অস্বচ্ছ চোখের দীপ্তি। মা একদিকে তাকিয়ে পাভেলের বক্তৃতাটা হাত বাড়িয়ে দেয়।

'এই যে। যদ্দুর সম্ভব তাড়াতাড়ি ছেপে দিতে ব'লে দিয়েছে।' নিকলাই যে ধরা পড়ার আশংকায় আছে সাথে সাথে তাও বলে।

লুদমিল্লা নিঃশব্দে কাগজগুলো বেল্টের মধ্যে গুঁজে ব'সে পড়ে। আগুনের প্রতিচ্ছবি লাল হ'য়ে ওর চশমার কাঁচের মধ্যে জ্বলছে। আর ওর নিশ্চল মুখের ওপর চলছে তার উষ্ণ হাসির নাচ।

মায়ের কথা শেষ হ'লে লুদমিল্লা বলে : 'আসুক না আমায় ধ'রতে, গুলি করে মারব সব।' শান্ত কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা উচ্চারিত। 'জুলুমের হাত থেকে আত্মরক্ষার অধিকার আমার আছে বৈকি। সুতরাং যদি বলি যুদ্ধং দেহি, আমাকেও তো যুদ্ধ ক'রতে হয়!'

আগুনের আভা ওর মুখের ওপর থেকে স'রে যায়। মুখখানায় আবার কাঠিন্য আর ঔদ্ধত্য ফুটে ওঠে।

মা সহানুভূতির সুরে বলে : 'এমনি ক'রে কি থাকা যায়!'

প্রথমে নেহাৎ অনিচ্ছায় লুদমিল্লা পড়তে আরম্ভ করে বক্তৃতাটা। পড়তে পড়তে ক্রমশই কাগজগুলোর ওপর ঝুঁকে পড়ে। পড়া শেষ হ'লে একখানা একখানা ক'রে সরিয়ে রাখে কাগজগুলো। অত্যন্ত আগ্রহ-চঞ্চল অধীর ভাব। অবশেষে উঠে দাঁড়ায়; ঝাঁকানি দিয়ে সোজা হ'য়ে বলে মাকে :

'চমৎকার হয়েছে!' কয়েক মুহূর্ত কি জানি ভেবে মাথা নীচু করে।

'আপনার ছেলের সম্বন্ধে আপনার সাথে আলোচনা ক'রতে আমি চাইনি। কারণ তাঁকে কখনও দেখিনি আমি। তারপর যাতে কারো মনে কষ্ট হয় এমন কথা আলোচনা ক'রতে আমার ভালো লাগেনা। কারণ প্রিয়জনকে নির্বাসনে পাঠিয়ে বেঁচে থাকার যে কি দুঃখ তা আমি জানি। কিন্তু একটি কথা শুধু জিজ্ঞাসা ক'রতে চাই—এমন ছেলে পেটে ধ'রে মায়ের সুখ হয়?'

'সুখ! কতখানি তা তোমায় কি বলব!'

'আর...ভয়—ভয় করে না?'

'না আর ভয় নেই।' শান্ত হাসি হেসে মা বলে।

চুলের ওপর রুক্ষ হাতখানাকে বুলিয়ে জানালার দিকে চায় মা। চাপা হাসির মত কি একটা হাল্কা ছায়া ঝিলমিল করে ওর মুখে।

'এক্ষুনি টাইপগুলি বসিয়ে ফেলছি। একটু শুয়ে নিন ততক্ষণ আপনি। ভারী ধকল গেছে সারা দিন। নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত হ'য়েছেন। এই যে বিছানা। আমি শোবনা এখন। বরঞ্চ রাতে তুলে দেব, একটু সাহায্য করতে হবে আমায়...। শুতে যাবার সময় বাতিটা নিবিয়ে দেবেন যেন।'

স্টোভে দু'খানা কাঠ ফেলে দিলে। তারপর সরু দরজাটা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে ওধার থেকে দরজাটা সেঁটে বন্ধ ক'রে দিলে। মা তাকিয়ে রইল ওর যাওয়ার দিকে।

তারপর কাপড় ছাড়তে আরম্ভ ক'রল। মনটা প'ড়ে রইল লুদমিল্লার ওপর।

'কি যেন কষ্ট ওর মনে...' ভাবে মা।

শ্রান্তিতে মাথা ঘুরছে মায়ের। কিন্তু মনের মধ্যে অগাধ শান্তি। চারদিক যেন একটা কোমল স্নিগ্ধ আলোয় উদ্ভাসিত। আর সেই আলোয় অভিস্নাত মায়ের আত্মা। এমনি শান্তির সাথে মায়ের পরিচয় আগেও ঘটেছে। যখনি মনের ওপর দিয়ে বেশী রকম ঝড় ঝাপটা গেছে—তার পরেই এসেছে এমনি অনাবিল শান্তি। আগে আগে ভয় করত। কিন্তু এখন আর ভয় করে না। বরঞ্চ বৃহৎ, বলিষ্ঠ ভাবনায় দৃঢ় ক'রে আত্মাকে দেয় বিস্তার।

বাতি নিবিয়ে শুতে যায় মা। ঠান্ডা কন্‌কনে বিছানা। কম্বল মুড়ি দিয়ে গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়তে না পড়তেই অগাধ ঘুমে ঢলে পড়ে।

ঘুম যখন ভাঙল, শীতের হিমেল শুভ্র আলোয় ঘরখানা ভ'রে গেছে। দিভানের ওপর একখানা বই হাতে শুয়ে আছে লুদমিল্লা। মুখে একটু হাসি টেনে এনে মার দিকে তাকায়।

'দেখেছ!' বিব্রত হ'য়ে বলে মা, 'আমি একটা হতভাগা! কি দেরী হ'য়ে গেছে!'

'সুপ্রভাত! দশটা বাজে প্রায়। উঠুন শিগ্‌গির চা খাব যে!'

'জাগিয়ে দাওনি কেন আমায়?'

'এসেছিলাম জাগিয়ে দিতে। কিন্তু এমন সুন্দর হাসছিলেন ঘুমের মধ্যে যে আর পারলাম না।'

লঘু ভাবে দেহটাকে ঝাঁকানি দিয়ে মায়ের কাছে উঠে আসে লুদমিল্লা। ওর দীপ্তিহীন চোখে যে ব্যঞ্জনা ফুটে ওঠে—তা মায়ের পরিচিত। বড় ভালো লাগে।

'বড় খারাপ লাগল ঘুমটা ভাঙাতে। বোধহয় ভালো একটা স্বপ্ন দেখছিলেন।'

'না, গো না, স্বপ্ন টপ্ন দেখিনি।'

'যাকগে, হাসিটুকু কিন্তু ভারী ভালো লাগছিল। স্নিগ্ধ মিষ্টি, একেবারে সর্ব-জয়ী হাসি।'

লুদমিল্লা হাসে—মখমলের মত কোমল তুলতুলে হাসি।

'আপনার কথাই ভাবছিলাম। আচ্ছা জীবনে খুব দুঃখ পেয়েছেন, না?'

ভ্রূ কাঁপতে থাকে মায়ের। বুকের মধ্যে ভাবনার ঢেউ ওঠে। উত্তেজিত স্বরে লুদমিল্লা ব'লে ওঠে :

'বুঝতে পারছি, খুব দুঃখ পেয়েছেন।'

'বুঝতে পাচ্ছিনে ঠিক', ধীরে ধীরে মা বলে, 'এক এক সময় মনে হয় ভারী কষ্টের জীবন। কিন্তু গোটা জীবনটাই হাজার জিনিষে এমনি ভরে আছে--আর প্রত্যেকটি জিনিষ এমনি যে হকচকিয়ে যেতে হয়। আর সব বড় বড় সব জরুরী ব্যাপার, একটার পর একটা আসছেই; ফাঁক আর থাকছে কোথায়..'

চিরপরিচিত সুরে মনটা মাভৈঃ ডাক দিয়ে ওঠে; কত ভাবনা কত ছবিতে ভ'রে ওঠে তার আকাশ। বিছানার ওপর উঠে ব'সে ব'লে যায় :

'...চলছেই আর চলছেই ..সব একই নিশানায়। কিন্তু এক এক সময় ভারী কষ্ট হয়। সইতে পারিনে। কী কষ্ট পায় মানুষ। মার খায়—দয়া মায়া নেই ওদের এমনি মার মারে, কী অত্যাচার যে করে! তখন সত্যি যেন অসহ্য লাগে।'

লুদমিল্লা মাথাটা পেছনে হেলিয়ে মায়ের দিকে তাকায়। ও শুধু তাকান নয়, দৃষ্টির আলিঙ্গন। বলে :

'কিন্তু কই নিজের কথা তো বলছেন না কিছু!'

মা বিছানা ছেড়ে উঠে জামাকাপড় প'রতে আরম্ভ করে।

'আমার-তোমার আলাদা কি ক'রে করি যখন একে-তাকে-ওকে—সব মানুষকেই ভালোবাসি! সবার জন্য মমতা হয়, সবার জন্য ভয়ে বুক কাঁপে। সব কটাই ভিড় ক'রে থাকে কলজের মধ্যে...বলতো আলাদা করি কি করে?'

জামাকাপড় পরা শেষ হয়নি, অমনি অবস্থাতেই দাঁড়িয়ে থাকে চিন্তায় ডুবে। এককালে ছেলের জন্য কি ভয়ই না ছিল। যত চিন্তা ছিল ওর দেহটার জন্য। ওটাকে আগলে রাখার জন্যই ছিল যত আকুলি বিকুলি। মায়ের মনে হয় ও যেন সে-দিনের সে-মানুষ আর নেই। এ যেন আর এক মানুষ। পুরানো দিন, পুরানো সংসারটাকে পেছনে ফেলে বহু দূর চ'লে এসেছে। নিজেরই আবেগের আগুনে জ্বলে সেই ভস্ম হ'তে পুনর্ভূ হ'য়েছে ওর আত্মা, নতুন জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান হ'য়ে, শক্তিমান হ'য়ে। বুকের মধ্যে কান পেতে হৃদপিণ্ডের ধুক্‌ধুকানি শোনে। ভয় পায় পুরোনো কথা পাছে মনে প'ড়ে যায়।

কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে লুদমিল্লা :

'কি ভাবছেন বলুন তো?'

নীরব দৃষ্টি বিনিময়; স্নিগ্ধ মৃদু হাসি।

'দেখিগে যাই, আমার সামোভারের কি দশা হ'ল।' বলতে বলতে বেরিয়ে যায় লুদমিল্লা।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকায় মা। ঠাণ্ডা, খট্‌খটে দিন। মায়ের বুকের মধ্যে আলো-ঝলমল্, আর উষ্ণতার আমেজ। ভারী কথা ব'লতে ইচ্ছে ক'রছে আজ। অনেকক্ষণ ধ'রে, অনেক কিছু—সব কিছু নিয়ে। আত্মার গভীরে এই যে এত রূপ, এত রস, এই যে অস্ত-রাগের আলোয় রাঙা হ'য়ে আছে তার দিগ্‌দিগন্ত—এর জন্য কোন এক অজানার উদ্দেশ্যে যেন কৃতজ্ঞতায় লুটিয়ে পড়ে সারা অন্তর। বহুদিন পরে কেন জানি আজ আবার প্রার্থনা করতে ইচ্ছে ক'রছে। কত স্মৃতি ভিড় ক'রে আসে মনে। কচি একখানা মুখ ঝিলমিলিয়ে ওঠে মনের মধ্যে—কানে আসে স্পষ্ট কার স্বর : 'ওই পাভেলের মা; পাভেল ভ্লাসফ!' মনে পড়ে সাশার মুখে—ছল্‌ছল কোমল চোখ দুটি, রীবিনের কালো মূর্তি, ছেলের তামা রঙের কঠিন মুখখানা, নিকলাইয়ের আত্ম-সচেতন দৃষ্টি আর সর্বদা সেই চোখ মিট্‌মিট করা—সব যেন একসাথে একাকার হ'য়ে যায়। তারপর বক্ষমথিত একখানি দীর্ঘশ্বাস হ'য়ে—মিলিয়ে যায় রামধনু রঙের মেঘের স্বচ্ছতায়, যা মায়ের সমস্ত চিন্তার জগৎ ছেয়ে ফেলে অসীম শান্তিতে মন ভরে তোলে।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে লুদমিল্লা বলে : 'ঠিক কথাই বলেছিল নিকলাই। ওকে ধ'রে নিয়ে গেছে। একটা ছেলেকে পাঠিয়েছিলাম আপনার কথা মত। ওর বাড়ীর উঠোনে অনেক পুলিশ নাকি দেখে এসেছে। গেটের পেছনেও নাকি একজন লুকিয়ে ছিল। আর চারধারে স্পাই গিস্‌গিস্ করছে। ছেলেটা চেনে ওদের।'

মাথা নেড়ে মা বলে : 'আঃ! বেচারা...'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মা। কিন্তু একি, দুঃখের নিশ্বাস তো নয়! নিজেই অবাক হ'য়ে যায় মা।

'ইদানীং এই শহরেই মজদুরদের নিয়ে যে রকম পড়াশোনা চালিয়েছিল ও, ধরা প'ড়বার দিন ওর ঘনিয়েই এসেছিল।' লুদমিল্লা বলে। ওর স্বরে উত্তেজনা

নেই কিন্তু কপালে বিরক্তির কুঞ্চন। 'এখান থেকে চলে যেতে বন্ধুরা ওকে অনেক বলেছে। কিছুতেই শুনলনা। এসব মানুষের তো আর বলা-কওয়ায় হয় না, একেবারে ধরে বেঁধে পাঠিয়ে দিতে হয়।'

দরজার কাছে একটি ছেলের মুখ দেখা যায়—কালো চুল, লাল গাল, ভারী সুন্দর নীল এক জোড়া চোখ।

'সামোভার নিয়ে আসব?' জিজ্ঞাসা করে ছেলেটি।

'কে? সার্গি? নিয়ে আয় বাবা, লক্ষ্মী আমার। লুদমিল্লা মার দিকে তাকিয়ে বলে : 'এই-যে সেই ছেলেটি।'

লুদমিল্লা যেন আরেক মানুষ আজ—মায়ের মনে হয়। অনেক সহজ সরল, অমায়িক। ওর ছিমছাম সুন্দর দেহখানির নড়াচড়ার লীলায়িত ছন্দে অপরূপ এক মাধুরী ও বলিষ্ঠতা আছে; তাতেই ওর বর্ণহীন মুখখানার কাঠিন্যে ঢেলে দিয়েছে কোমলতা। রাতের রঙে গভীর দেখিয়েছিল ওর চোখের নীচের রেখাগুলি। অন্তঃসংগ্রামের আভাসও ছিল ওর চেহারায়।

সামোভার নিয়ে এল ছেলেটি।

'এস, সার্গি, পরিচয় করিয়ে দি। ইনি হচ্ছেন পেলাগেয়া নিলোভনা—সেই যে শ্রমিক যার বিচার হ'ল কাল—তার মা।'

সার্গি নিঃশব্দে মাথা নুইয়ে নমস্কার আর করমর্দন ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। একটা রুটি নিয়ে এসে টেবিলে গিয়ে বসল নিজের জায়গায়। চা ঢালতে ঢালতে লুদমিল্লা বোঝাতে চেষ্টা করে মাকে যে এখন তাঁর বাড়ী ফিরে যাওয়া উচিত নয়—বোঝা তো যাচ্ছেনা পুলিশ কার জন্য এসেছিল।

'হ'তেও তো পারে আপনাকেই ধ'রতে এসেছিল পুলিশ' হয়তো জিজ্ঞাসাবাদ করবার জন্য দরকার আছে!'

'বয়ে গেল।' মা জবাব দেয়। 'নিক না ধরে। কোন লোকসান নেই। খালি পাভেলের বক্তৃতাটা বিলি ক'রে ফেলতে পারি আগে! আর কিছু চাই না!'

'টাইপ সাজিয়ে ফেলেছি। কাল বেশ কিছুটা দিতে পারব শহরে মজুরবস্তীতে হ'য়ে যাবে। নাতাশাকে জানেন আপনি?'

'জানিনে আবার!'

'তার কাছেই নিয়ে যাবেন ওগুলো।'

ছেলেটি কাগজটা পড়ছিল। মনে হচ্ছিল কিছুই শুনছেনা ও। কিন্তু বারে বারে তাকাচ্ছিল ও মায়ের মুখের দিকে। ওর সুন্দর চোখদুটি মিলে যায় মায়ের দৃষ্টির সাথে। প্রসন্ন হাসিতে মার মুখ ভ'রে ওঠে। আবার নিকলাইয়ের কথা তোলে লুদমিল্লা—কিন্তু কোন দুঃখ হা-হুতাশ নেই। আশ্চর্য হয় না মা—ভাবে এ তো স্বাভাবিকই। দিনটা আজ যেন দৌড়ে দৌড়ে চলেছে। চা খেতে খেতে দুপুর গড়িয়ে গেল।

'সত্যি দুপুর! ইস্!' চীৎকার ক'রে ওঠে লুদমিল্লা।

কে যেন অত্যন্ত ব্যস্ত হ'য়ে ধাক্কা দিল দরজায়। সার্গি উঠে দাঁড়িয়ে চোখ কুঁচকে লুদমিল্লার দিকে চায়।

'কে এল জানি! খুলে দেতো দরজা, সার্গি!'

এতটুকু উত্তেজনা নেই। শান্তভাবে হাতখানা জামার পকেটে রেখে মাকে বলে :

'যদি পুলিশ হ'য়ে থাকে, আপনি গিয়ে ওই কোণায় দাঁড়াবেন। আর সার্গি—'

'আমি জানি।' বাইরে যেতে যেতে ও বলে।

মা মৃদু হাসে। আজ আর এসবে ভয় করে না মার।

পুলিশ নয়। সেই ক্ষুদে ডাক্তার।

এসেই ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে বলে : 'প্রথম খবর—নিকলাই গ্রেপ্তার। আরে! নিলোভনা যে! আপনি এখানে! ওকে নিয়ে যাবার সময় তাহ'লে বাড়ী ছিলেননা আপনি ?'

'সেই তো আমায় পাঠিয়ে দিলে।'

'হুঁ, এতে বিশেষ সুবিধে হবে ব'লে মনে হয়না। দ্বিতীয় নম্বর হ'ল—কাল রাত্তিরে ছোকরারা সব পাভেলের জবানবন্দীর প্রায় শ' পাঁচেক কপি হেক্‌টোগ্রাফে ছেপে ফেলেছে। আমি দেখেছি, মন্দ হয়নি—বেশ পরিষ্কার, স্পষ্ট ছাপা হয়েছে। আজ রাত্তিরের মধ্যেই ওরা শহরে ওগুলো বিলি ক'রে ফেলতে চায়, কিন্তু আমার মত নয়। বরঞ্চ ছাপা কপিগুলো এখানে বিলি ক'রে, ওগুলো অন্য জায়গার জন্য রাখা ভাল।'

সাগ্রহে বলে মা : 'আমি ওগুলো নিয়ে যাব নাতাশার কাছে। দাও, আমার কাছে।'

আকুল হ'য়ে ওঠে মা—মরীয়া হ'য়ে ওঠে—তার পাভেলের কথা কতক্ষণে ছড়িয়ে দেবে দলের মধ্যে, দেশের মধ্যে, সারা বিশ্বে। আকূতি ভরা চোখে ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে উত্তরের প্রতীক্ষা করে।

'কে জানে বাবা, এখনই নিয়ে যাওয়া উচিত হবে কি না।' ঘড়ি দেখতে দেখতে ডাক্তার একটু ইতস্তত করে বলে : এগারোটা বেজে তেতাল্লিশ মিনিট হয়েছে। দুটো পাঁচ-এ একটা ট্রেন আছে। সওয়া পাঁচটায় গিয়ে পৌঁছায়। সন্ধ্যে হ'য়ে যায় বটে, কিন্তু বিশেষ দেরী হয় না। কথা তাও নয়...'

ভ্রূ কুঁচকে লুদমিল্লা বলে : 'তার মানে ?'

'তাহ'লে কথাটা কি ?' এগিয়ে এসে মা শুধায়, 'কাজটা ভালো ক'রে হাসিল হয়, এই তো ?'

কপাল মুছতে মুছতে লুদমিল্লা সন্ধানী দৃষ্টিতে মা'র দিকে তাকিয়ে বলে :

'বিপদ হ'তে পারে আপনার।'

'কেন ?' আন্তরিক তাগিদের সুর মার কথায়।

'কেন ?' ভাঙা ভাঙা কথায় তাড়াতাড়ি ক'রে বলে ডাক্তার : 'শুনুন তাহ'লে। নিকলাই গ্রেপ্তার হবার মাত্র ঘণ্টাখানেক আগে আপনি বাড়ি ছেড়েছেন। ধরুন আপনি কারখানায় গেলেন। সেখানে আপনাকে সব্বাই তাদের মাস্টারমশায়ের মাসী ব'লে জানে। আপনার যাওয়ার পরেই নিষিদ্ধ কাগজপত্র পাওয়া গেল সেখানে। এখন বুঝে দেখুন—সব মিলিয়ে আপনার গলায় ফাঁশ...'

মা তবু বলে : 'কেউ আমায় দেখতে পাবে না। তারপর ফিরে এলে যদি ধরে, আর যদি জিজ্ঞাসা করে, কোথায় গিয়েছিলাম...'

একটু ইতস্তত ক'রে চীৎকার ক'রে ওঠে মা : 'কি বলতে হবে জানি আমি। ঠিক বলব গুছিয়ে। ওখান থেকে সোজা যাব আমাদের আগের বস্তিতে। সেখানে একজন জানা আছে—নাম সিজভ। বলব, আদালত থেকে সোজা সেখানে গেছি মনটা একটু ঠাণ্ডা করবার জন্য। তা ছাড়া তাকেও তো ভালোমন্দ দু'টো কথা বলতে হয়, বেচারার ভাইপোটাও তো সাজা পেল! তা সিজভ কখনও ফিরিয়ে দেবে না।'

মার পীড়াপীড়িতে রাজী হয় ওরা। অনিচ্ছার সাথে বলে ডাক্তার :

'বেশ যান তাহ'লে!'

লুদমিল্লা একটা কথাও বলে না। গভীর চিন্তায় মগ্ন হ'য়ে শুধু পায়চারি করে ঘরের মধ্যে। ওর মুখটা এমনি রোগা দেখাচ্ছে—যেন প্রেতের মুখ। মাথাটা বুকের ওপর এলিয়ে প'ড়তে চায়—লক্ষ্য করে মা। মাথাটা খাড়া রাখার আয়াস স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে কাঁধের কড়া মাংসপেশীর টানে।

মৃদু হেসে বলে মা : 'তোমরা সবাই আমার জন্যই সাত ভাবনা ভেবে মরছ। কই নিজেদের জন্য একটুও তো ভাবছ না।'

'না, ওকথা ঠিক নয়। নিজেদের কথা ভাবছি বই-কি আমরা। না ভেবে যাব কোথায়! ভাবিয়ে ছাড়ছে। কিন্তু অনর্থক যারা শক্তিক্ষয় করে মরছে তাদের ওপর আমাদের কড়া হ'তে হয়। তাহ'লে কথা রইল—স্টেশনেই পাবেন আপনি ছাপান বক্তৃতা...'

কোথায় কে নিয়ে যাবে ওগুলো, সব মাকে ভালো ক'রে বুঝিয়ে দিয়ে, তারপর গভীর দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে বলে :

'বেশ ভালোয় ভালোয় ফিরে আসুন!' চ'লে যায় ডাক্তার—মুখে বিরক্তির ছায়া যেন।

লুদমিল্লা মায়ের কাছে আসে। নিঃশব্দ হাসি হেসে বলে :

'আপনার মনটাকে বুঝতে পারছি আমি।'

মায়ের হাত ধরে আবার ঘরময় পায়চারি ক'রতে শুরু করে।

'আমার একটি ছেলে আছে—বছর তের বয়েস হয়েছে। কিন্তু থাকে তার বাপের কাছে। আমার স্বামী সরকারী উকিল—এবং ছেলে থাকে তার কাছে। বুঝে দেখুন দশা কি হবে তার। প্রায়ই ভাবি ওর কথা।'

গলা ভেঙে আসে। মিনিট খানেক পরে কি যেন ভাবতে ভাবতে আবার আরম্ভ ক'রে শান্ত স্বরে :

'মানুষকে ভালোবাসি আমি—দুনিয়ার মধ্যে তাদের জুড়ি নেই আর। সেই মানুষের শত্রু সে—এবং জেনেশুনে বুঝেই সে এই বিপরীত পথ ধরেছে। আমার ছেলে বড় হচ্ছে কি মনোভাব নিয়ে? আমারই বুকের সন্তান আমার শত্রু হ'য়ে বড় হচ্ছে। আমার কাছে তার থাকারও উপায় নেই। ছদ্ম নামে আছি আমি। জানেন? আট বছর তাকে দেখিনি! আট বছর! ওঃ কতদিন!'

জানালার সামনে এসে দাঁড়ায় লুদমিল্লা—শূন্য বিবর্ণ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে।

'ও আমার কাছে থাকলে, বুকে আরো বল পেতাম। অন্তত কলজের মধ্যে এই যে কাঁচা ঘাটা দগ্‌দগ্‌ ক'রছে—তার জ্বলুনিটা তো থাকতো না। ও ম'রে গেলেও ভালো হ'ত। আমার পক্ষে সহজ হ'তো।'

'আহা! বাছারে আমার!' মায়ের বুক সমবেদনায় তোলপাড় হয়।

'আপনার কপাল ভাল,' তিক্ত হাসি হেসে লুদমিল্লা বলে : 'আশ্চর্য! না! হাতে হাত ধরে কাজ ক'রতে নেমেছে মা আর ছেলে। কদাচিৎ দেখা যায় এমনি।'

পেলাগেয়া চীৎকার ক'রে ওঠে : 'সত্যি আশ্চর্য!' তারপর স্বর নামিয়ে, যেন কানে কানে কথা বলছে কারো—বলে—'তোমরা সবাই,—নিকলাই ইভানোভিচ এবং আরো যারা যারা আছ সত্যকে আঁকড়ে ধ'রে—সবাই তোমরা বন্ধু—হাত ধ'রে

দাঁড়িয়ে আছ পাশাপাশি। হঠাৎ যেন একেবারে রাতারাতি পরমাত্মীয় হ'য়ে উঠেছে সব। আমি তোমাদের কথা বুঝিনে, কিন্তু তোমাদের বুঝি। সব্বাইকে বুঝি। কথা ছাড়া আর সব কিছু বুঝি।'

গুনগুনিয়ে বলে লুদমিল্লা : 'ঠিক, সত্যি তাই...।'

বুকের ওপর হাত রেখে ব'লে যায় মা এমনি ধীরে, এমনি চাপা স্বরে—যেন নিজের কথাকেই কষ্ট ক'রে বুঝতে হচ্ছে :

একই লক্ষ্যের দিকে পা ফেলে এগিয়ে চলেছে আমাদের সন্তানেরা দুনিয়ার বুকের ওপর দিয়ে। হ্যাঁ, আমাদের সন্তানেরাই—সারা দুনিয়া জুড়ে—এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত। জ্ঞানে, গুণে সেরা সেরা ছেলেরা নেমে এসেছে পথে,—মিথ্যাকে শক্ত পায়ে থেৎলে পিষে গুঁড়িয়ে চলছে তারা—অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই ক'রতে। শক্তিধর সব ছেলেরা—তাদের ঝলমলে সুস্থ দেহের সমস্ত শক্তির ওই এক দাবী—ন্যায় চাই! মানুষের দুঃখকে তারা জয় ক'রবে। দুনিয়া থেকে মানুষের সব দুর্ভাগ্যকে সব অসুন্দরকে তারা একেবারে মুছে ফেলবে। ওদের মধ্যে একজন আমায় বলেছে—নতুন সূর্য তারা জেবলে দেবে আকাশে। যতদিন না পারবে, তাদের বিশ্রাম নেই—বিরাম নেই। তারজন্য ডাক দিয়েছে তারা যেখানে যত ভাঙা বুক আছে সবাইকে, এক জোট ক'রতে হবে তাদের।'

ভুলে-যাওয়া উপাসনার মন্ত্র মনে প'ড়ে যায়। আগুনের ফুলকির মত বুকের তলা থেকে উছলে ওঠে সেই মন্ত্র; প্রাণে নতুন এক বিশ্বাসের আলো জবালিয়ে দেয়।

'সত্য আর মুক্তির পথে চলেছে আমাদের সন্তানেরা—মানুষের প্রাণে প্রেম জাগিয়ে, মাথার ওপর এক নতুন স্বর্গ রচনা ক'রে। মাটির বুকে এক নতুন আগুন জবালিয়ে দিয়েছে তারা—প্রাণের অনির্বাণ বহ্নি। যে মানব-প্রেমে দীক্ষা নিয়েছে ওই দস্যু-ছেলেগুলি—সেই প্রেম দিয়ে রচা এক নতুন জীবন জন্ম নিচ্ছে সেই আগুন থেকে। কে নেবাবে বল ওই আগুনকে? কার সাধ্যি আছে? মাটির বুক থেকে উঠেছে সেই আগুন—লক্‌লকে শিখায়। জয় হোক ওই শিখার। চারদিকে সব... সব ওই পথের পানেই চেয়ে আছে।'

উত্তেজনায় অবসন্ন হয়ে পড়ে মা। লুদমিল্লার হাত ছেড়ে দিয়ে মাটিতে ব'সে পড়ে হাঁপাতে থাকে। লুদমিল্লা সন্তর্পণে সরে যায়—কোথায় যেন কিসের শান্তি-ভঙ্গ হবে। আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে পায়চারি করে—ওর নিষ্প্রাণ চোখের দৃষ্টি সোজা সামনের দিকে স্থির হয়ে আছে। ঋজু, লম্বা দেহটা যেন আরো লম্বা হয়ে গেছে, আরো সোজা হ'য়ে গেছে। আরো যেন অনেকখানি রোগা হয়ে গেছে তনু দেহখানি। কঠিন মুখখানা চিন্তাক্লিষ্ট। চাপা পাতলা ঠোঁট দুখানিতে যেন অস্থিরতার আভাস। ঘরের নিস্তব্ধতায় অনেক শান্ত হ'য়ে ওঠে মা। লুদমিল্লার অবস্থা দেখে অপরাধীর মত জিজ্ঞাসা করে :

'কিছু অন্যায় কথা বলে ফেলেছি?'

লুদমিল্লা ভীত দৃষ্টিতে মায়ের দিকে ফিরে তাকায়। তারপর যেন কিছু থামাতে বলছে এমনি-ভঙ্গিতে হাতখানা মায়ের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি বলে :

'না, না, না। ঠিক কথাই বলেছেন। কিন্তু ও কথা আর আলোচনা করব না। ওই পর্যন্তই থাক।' শেষ করে আবার বলে :

'তাড়াতাড়ি যান আপনি, অনেকটা পথ যেতে হবে।' এবারে স্বর আরও শান্ত, প্রকৃতিস্থ।

'এই উঠছি। তুমি জাননা কত আনন্দ আমার! কি সুখের দিন আমার আজ। আমার ছেলে—আমারই রক্তমাংস দিয়ে তৈরী সে—তার মুখের কথা আমি ঘরে ঘরে বিলোতে চলেছি। মনে হচ্ছে এ যেন আমারি আত্মাকে ছড়িয়ে চলেছি।'

মায়ের মুখে স্নিগ্ধ হাসি। কিন্তু লুদমিল্লার মুখে তার প্রতিফলন কই? মার মনে হয় এ-মেয়ের আত্মনিপীড়নে মার মনের এত আনন্দ সব পিষ্ট হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ মার কেমন জেদ হয়, নিজের মনের আগুন দিয়ে ওই পাথুরে মানুষটাকে জ্বালিয়ে তুলবে। লুদমিল্লার হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে চেপে ধরে বলে :

'বল দেখি যখন জানতে পারা যায় যে বিশ্ব-সংসারের মানুষকে আলো ক'রে দেবার মত আলোও আছে; একদিন সবার চোখেই পড়বে সে আলোটা। তারপর সবাই সে-দিকে ছুটে আসবে; কেমন সুন্দর হয় বল দেখি!'

মায়ের মস্ত বড় অমায়িক মুখখানায় একটা শিহরণ ব'য়ে যায়। চোখ জ্বলে ওঠে; ভ্রূ-জোড়া কাঁপতে থাকে—ভ্রূ'দুটি যেন ডানা মেলা পাখী, ডানা মেলে চোখদুটিকে আলো থেকে আড়াল করে রেখেছে। এত বৃহৎ ভাবনা –যার মধ্যে মা সব ঢেলে দিল! যা কিছু এতদিন চিত্তের জগৎকে আলোড়িত বিক্ষুব্ধ ক'রেছে; যে জীবনের মধ্য দিয়ে এতদিন চলে এসেছে- সব। আর ওই বৃহৎ ভাবনার নির্যাস নিংড়ে নিংড়ে মায়ের কথার আলোক-দানারা ফুটে ওঠে। হেমন্তের কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়েছিল মায়ের হৃদয়। এখন বসন্ত-সূর্যের সৃষ্টিময়ী, শক্তিময়ী আলোর ধারা ঝরে তার 'পর। দিনে দিনে তেজে দীপ্তিতে তা আরও উজ্জ্বল হ'য়ে জ্বলতে থাকে। সেই আলোক-তীর্থে মায়ের কথার আলোক-দানারা অসংখ্য হয়ে ওঠে, বড় হয়ে ওঠে।

'জনতার দেউলে নতুন দেবতা জন্ম নেয়—সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে—এই ভাবনার রূপে। প্রত্যেকটি জিনিষ সকলের জন্য। এই তো আমি বুঝি। আমরা সবাই কমরেড্—এক সাথ, এক প্রাণ' সত্য আমাদের মা, আমরা সেই মায়েরই সন্তান।'

আবেগে ভেসে যায় মা। একটু থেমে, নিশ্বাস নিয়ে, আলিঙ্গনের মত ক'রে হাত বাড়িয়ে বলে :

'জানো কমরেড্ কথাটি যখন একা একা নিজের মনেও বলি, মনে হয় কি যেখানে যত কমরেড আছে সব আমারই বুকের মধ্য দিয়ে দলে দলে পা ফেলে এগিয়ে চলেছে। আমি তাদের পায়ের শব্দ শুনতে পাই।'

মায়ের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। লুদমিল্লার মুখ লাল হ'য়ে ওঠে; ঠোঁট কাঁপতে থাকে। গাল বেয়ে বড় বড় স্বচ্ছ ফোঁটায় চোখের জল ঝরে।

মা স্নিগ্ধ হেসে দুই হাতে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে। বিজয়ী হৃদয় কোমল আনন্দে ভরে ওঠে। আলিঙ্গন-মুক্ত হয়ে লুদমিল্লা মায়ের মুখের দিকে চেয়ে বলে :

'আপনার সঙ্গ পাওয়া যে কত বড় আশীর্বাদ, তা জানেন ..!'

উনত্রিশ

রাস্তায় বেরুতেই হাড়-জমান হাওয়া নাগপাশে জড়িয়ে ধ'রল মায়ের দেহটাকে; নাকে দিতে লাগল সুড়সুড়ি। কয়েক সেকেন্ড নিশ্বাস নিতে পারল না। একটু দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকাতে লাগল। কাছেই কোণে তন্তু-সার টুপীটা মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়েছিল এক এক্কাওয়ালা। আরও খানিকটা দূরে রাস্তা দিয়ে চ'লেছে একটি মানুষ—একেবারে কুঁজো দেহ—দুই কাঁধের মধ্যে মাথাটা যেন গোঁজা। তারও খানিক আগে হন্‌হনিয়ে চলেছে এক সৈন্য কান ঘষতে ঘষতে।

মা মনে মনে বলে : 'হয়তো কোনও দোকানে পাঠিয়েছে সৈন্যটাকে।' নিজের পথে চলে—পায়ের নীচে বরফ মচ্‌মচিয়ে ওঠে, প্রাণ যেন মেতে ওঠে সেই শব্দে। ট্রেন আসার আগেই স্টেশনে পেৌঁছে গেল ও। বিশ্রী ময়লা, চট্‌চটে তৃতীয়-শ্রেণীর বিশ্রাম ঘরটায় মানুষ গিস্‌গিস্‌ ক'রছে। ঠান্ডার জন্য লাইন-মজুরেরা, গাড়োয়ান-কোচম্যানের দল ঘর-হারা অর্ধোলঙ্গ মানুষের দল, সব এসে ওই ঘরখানায় আশ্রয় নিয়েছে। যাত্রীরাও আছে। যাত্রীদের মধ্যে আছে ক'জন কৃষক, রেকুনের চামড়ার জামা-পরা একজন মোটা শেঠ, একজন পাদরি আর তার বসন্তের দাগ-ওয়ালা মেয়েটা। এ ছাড়াও ছিল জন পাঁচ-ছয় সৈন্য আর ক'জন ছোট খাট ব্যবসায়ী। তামাক খাওয়া, কথা, চা-ভদ্‌কা খাওয়া চলছে অবিশ্রাম। খাবারঘরের কাউন্টারে দাঁড়িয়ে যেন কে একজন হো হো ক'রে হাসছে। চুরুটের ধোঁয়া কুন্ডলি পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে মাথার ওপর দিয়ে। দরজাটা ক্যাঁচকোঁচ ক'রে যেন ককিয়ে উঠছে খোলার সময়। ধড়াস ধড়াস ক'রে জানালা বন্ধ হ'য়ে গেল—সার্শি ঝন্‌ঝন্‌ ক'রে উঠল কেঁপে। ধোঁয়া আর নোনা মাছের গন্ধে ঘরের হাওয়া ভস্‌ভস্‌ ক'রছে।

দরজার কাছেই একটা জায়গায় বসল গিয়ে মা। এমনি জায়গা যে চোখে পড়তেই হবে। দরজা খুললেই ঠান্ডা হাওয়ার ঝাপটা এসে গায়ে লাগে। মন্দ লাগছিল না ঠান্ডাটা। যতবার দরজা খোলে বুক ভ'রে সেই ঠান্ডা হাওয়ার নিশ্বাস নেয়। মোট-ঘাট আর শীতের ভারী ভারী জামা পরে যাত্রীরা ঢুকতে এসে আটকে যায় দরজায়। ঠেলে-ঠুলে কোনও মতে ঢুকে পোঁটলা-পুঁটলি মেজেতে, বেঞ্চিতে নামিয়ে রেখে—গা, মাথা, দাঁড়ি-গোঁফ জামা কাপড় থেকে বরফ ঝাড়ে আর গাল দেয়।

একটা সুটকেস হাতে এক ছোকরা ভেতরে ঢুকেই ব্যস্ত হ'য়ে চারদিকে চায়। তারপর সোজা মার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে : 'মস্কো যাচ্ছেন?'

'হাঁ, তানিয়ার ওখানে।' জবাব দেয় মা।

'ওঃ!'

মায়ের পাশেই বেঞ্চির ওপর সুটকেসটা রেখে একটা সিগারেট ধরায় সে। তারপর টুপীটা ঠিক ক'রে নিয়ে বেরিয়ে যায়। মা বাক্সটার ঠান্ডা চামড়ার ওপর হাত বুলিয়ে ওটার ওপর কনুই ভর দিয়ে ব'সে ব'সে খুশিমুখে লোকজনের আসাযাওয়া দেখে। মিনিটখানেক পর উঠে দরজার কাছে আর একটু এগিয়ে বসে। মাথা সোজা করে আশপাশ দিয়ে যাওয়া মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে চলে মা সুটকেসটা হাতে নিয়ে। বেশী বড় নয়, নিতে কষ্ট হয়না ওটা।

হঠাৎ হুড়্‌মুড়্‌ ক'রে গায়ে এসে পড়ে এক ছোকরা। ছোট কোট গায়ে, কলার ওল্টানো। হাতটা মাথায় দিয়ে চুপচাপ এক ধারে স'রে দাঁড়ায় সে। ছেলেটিকে

চেনা চেনা লাগে মার। ফিরে তাকায় মা। লোকটা একচোখে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। দৃষ্টিটা ছুরির ফলার মত গিয়ে বিঁধতে লাগল মাকে। সুটকেস্-ধরা হাতটা কাঁপতে লাগল; হঠাৎ যেন সাংঘাতিক ভারী হ'য়ে উঠল বাক্সটা।

'নিশ্চয় কোথাও দেখেছি লোকটাকে,' মনে মনে ভাবে মা। বুকের মধ্যের অস্বস্তিকর অনুভূতিটা দুই হাতে চাপতে চেষ্টা করে মা। মাথার মধ্যে কেমন জানি করে—কলজেটা ধীরে ধীরে জমে উঠছে যেন। কিন্তু সব ঠেলে সরিয়ে দেয়। কিন্তু সরাবে কি! ক্রমশই বাড়তে লাগল; ঠেলে ঠেলে উঠতে লাগল গলার কাছে; সারাটা মুখ কেমন বিশ্রী একটা শুকনো বিস্বাদে ভ'রে গেল। আর একবার মানুষটাকে দেখতে ভয়ানক ইচ্ছে ক'রতে লাগল। একসময়ে ফিরে তাকিয়ে দেখে ঠায় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। কেবল বারে বারে পা বদল ক'রছে—ভাব দেখে মনে হচ্ছে, কিছু একটা করতে চাইছে, কিন্তু মন ঠিক ক'রে উঠতে পারছে না। ওর ডান হাতটা জামার বুকের মধ্যে ঢোকানো, বাঁ হাতটা পকেটে। ফলে ডান কাঁধটা উঁচু দেখাচ্ছে বাঁটার চাইতে।

একটা বেঞ্চে বসে পড়ে মা, অতি ধীরে সন্তর্পণে, যেন ভেতরের একটা কিছু ছিঁড়ে যাবে। ভয়ে আশঙ্কায় আঁতি পাঁতি ক'রে স্মৃতি ওলট পালট করে কোথায় যেন দেখেছে লোকটাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, দুবার দেখেছে। একবার সেই রীবিন পালাবার সময় শহর পেরিয়ে সেই খোলা মাঠের ধারে; সেই যে পুলিশ অফিসারটিকে ভুল রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছিল মা, তার পাশেই দাঁড়িয়েছিল লোকটা। আর দ্বিতীয়বার দেখেছিল পাভেলদের মামলার সময়। বুঝতে বাকি থাকে না নজরবন্দী হ'য়ে আছে মা।

'ধরা প'ড়ে গেলাম?' নিজেকেই নিজে শুধায় মা। শিউরে ওঠে সারা দেহ। নিজেই জবাব দেয় আবার : 'না, হয়তো এখনও নয়।'

কিন্তু তখনই আবার মনের জোর ক'রে দৃঢ় কণ্ঠে বলে :

'ধরা পড়েছি!'

চারদিকে তাকায় মা—কিন্তু শূন্য দৃষ্টি, দেখে না কিছুই। শুধু একটার পর একটা চিন্তা ফুল্‌কির মত জ্বলে জ্বলে ওঠে মনের মধ্যে।

'সুটকেসটা ফেলে চলে যাই?' সাথে সাথেই আরো উজ্জ্বল হ'য়ে জ্বলে ওঠে : 'কি? আমার ছেলে, আমার পভেল—তার বাণী—জানোয়ারের হাতে দিয়ে যাব?'

শক্ত ক'রে ধরে সুটকেসটা।

'এটাকে নিয়ে পালিয়ে যাই?'

কোনটাই পছন্দ হয় না; যেন কারো জোর ক'রে চাপিয়ে-দেওয়া কথা। মনের মধ্যে দাউ দাউ ক'রে জ্বলতে থাকে; যেন সূক্ষ্ম আগুনের তন্তু দিয়ে হৃদ্‌পিণ্ডটাকে কেউ শত-ছিদ্র ক'রে দিচ্ছে। যন্ত্রণায় ছুটে পালাতে চায় মা—নিজের কাছ থেকে, ছেলের কাছ থেকে, জীবনে যত প্রিয়বস্তু আছে সব কিছুর কাছ থেকে। কি যেন একটা প্রতিকূল শক্তি ওর কাঁধে বুকে চেপে বসেছে—ভয় দেখিয়ে ওর আত্মাকে অপমান ক'রে টেনে নীচে নামাচ্ছে ওকে। ওর রগের শিরাগুলো ফুলে উঠে দপ্ দপ্ ক'রছে। মাথার চুলের গোড়া থেকে ছুটছে আগুন।

হঠাৎ ঝট্‌কা দিয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে মা—সমস্ত ক্ষুদ্র চিন্তা ঝেড়ে ফেলে ধমক্ দিয়ে ওঠে নিজেকে—ছিঃ লজ্জা করে না!

নিমেষে সমস্ত গ্লানি যেন দূর হ'য়ে যায়। সাহসে বুক ভ'রে ওঠে :

'ছেলের অপমান করো না—ওরা যে ভয় কাকে বলে জানে না।' কার নিষ্প্রাণ ভীরু দৃষ্টির সাথে দৃষ্টি মিলে যায় মায়ের। রীবিনের মুখ বিদ্যুৎ-ঝলকের মত ঝিলিক দিয়ে যায় চিত্তের আকাশে। কয়েক মুহূর্তের শুধু দ্বিধা। তারপরেই মনটা শক্ত হ'য়ে ওঠে। হৃদ্‌পিণ্ডের ধড়ফড়ানি শান্ত হ'য়ে আসে। চারদিকে তাকাতে তাকাতে মনে হয়, 'এখন কি হ'বে তাহ'লে?'

গোয়েন্দাটা স্টেশনের একজন রক্ষীকে ডেকে কানে কানে কি বলে, মাকে চোখের ইসারায় দেখিয়ে দিয়ে। রক্ষীটি লোকটার দিকে তাকিয়ে চলে যায়। আর একজন আসে। সে সব শুনে ভ্রূ কোঁচকায়। মস্ত বড় লম্বা চওড়া মানুষ—এক মাথা সাদা চুল। ক্ষৌর-বিবর্জিত মুখ। লোকটা গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে কি ইসারা ক'রে মায়ের দিকে এগিয়ে যায়। গোয়েন্দা বেরিয়ে যায়।

বিরস মুখে মাকে নিরীক্ষণ ক'রতে ক'রতে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে রক্ষী। মা ভয়ে বেঞ্চির একধারে স'রে যায়। মনে হয় :

'আর যাই করুক, না যেন মারে।'

লোকটা এসে দাঁড়ায় মায়ের সামনে। মিনিটখানেক স্তব্ধ হ'য়ে থেকে শান্ত ভাবে বলে :

'কি দেখছ ব'সে ব'সে?'

'কিচ্ছু না।'

'বটে? চোর মাগী? এই বয়সে এত শয়তানী?'

মনে হ'ল কে যেন চড় মারলে মার মুখে। একবার, দু'বার! ওর ওই স্থূল আক্রোশের ছোবলে মার রীতিমত দৈহিক কষ্ট হ'তে লাগল। যেন গাল দুটো চিরে দু'ফাঁক ক'রে, চোখ দুটোকে উপড়ে ফেলে দিলে কেউ।

'আমায় বলছ? আমি চোর নই। মিথ্যে কথা।' সপ্তমে গলা চড়িয়ে চীৎকার করে মা। রাগে, অপমানের তিক্ততায় চারদিক বোঁ বোঁ ক'রে ঘুরতে থাকে। সুটকেসটাকে ধ'রে টান মেরে খোলে মা। একমুঠো কাগজ তুলে নিয়ে শূন্যে হাতটা নাড়তে নাড়তে লাফিয়ে উঠে চীৎকার ক'রতে থাকে মা :

'দেখ! দেখ! সব্বাই দেখ!'

কানের ভেতর ভোঁ ভোঁ করে। তার মধ্য দিয়েই শুনতে পায় মা, চারদিক থেকে মানুষ ছুটে আসছে চীৎকার ক'রতে ক'রতে।

'কি কি কি হয়েছে?'

'ওই যে ওখানে...গোয়েন্দা...'

'সে আবার কি?'

'ওরা বলছে এ নাকি চোর।'

'এ যে ভদ্রঘরের মনে হচ্ছে। এ কখনও চোর হয়? ছিঃ ছিঃ...'

চারদিকে মানুষ দেখে খানিক প্রকৃতিস্থ হ'য়ে ওঠে মা। চীৎকার ক'রে জবাব দেয় : 'আমি চোর নই গো, চোর নই। কাল সেই রাজনৈতিক বন্দীদের মামলা হ'লো না? আমার ছেলে—ভ্লাসভ আছে তাদের মধ্যে। সে একটা জবানবন্দী দিয়েছিল আদালতে—এই যে দেখ সব। আমি এগুলো নিয়ে যাচ্ছিলুম সবাইকে বিলোব বলে—। পড়ে দেখবে সবাই—সত্যি মিথ্যে চিনবে...'

কে একজন সন্তর্পণে একটা কাগজ টেনে নেয়। মা বাকিগুলো ভিড়ের মধ্যে

ছড়িয়ে দেয়। কার ভীত কণ্ঠ শোনা যায় :

'কি করছ! মজাটা টের পাবে'খন!'

মা দেখে, হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে ভিড়ের মধ্যে। লুফে নিয়ে কোটের বুকে পকেটে পুরছে গোছা গোছা কাগজ সবাই। মার দেহে বল আসে—পা দু'টো শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। বুকের মধ্যে আনন্দ গর্ব উথলে উঠেছে। তারই আমেজে জোরাল অথচ শান্ত ভাষায় ব'লে যায় মা। আর সুটকেস থেকে মুঠো মুঠো কাগজ নিয়ে ছড়িয়ে দেয় ডাইনে বাঁয়ে—গুঁজে দেয় এগিয়ে-আসা ব্যগ্র হাতগুলির মুঠোয়।

'তোমরা জানো, বাছারা? কেন আমার ছেলে আর তার সঙ্গীসাথীদের ওরা ধ'রে আদালতে নিয়ে এসেছিল? শোন তাহ'লে বলছি। আমি মা। মায়ের প্রাণ আর এই পাকা চুলগুলোকে তো বিশ্বাস ক'রবে! ওরা সত্য কথা বলেছিল—বুঝলে? ঐ হ'লো বাছাদের অপরাধ। তাই টানা হ্যাঁচড়া করে নিয়ে গিয়ে কাঠগড়ায় তুললে। কাল তো দেখলুম—কেউ পারলে ওদের সত্যকে ঠেলে ফেলতে? কেউ পারেনি। কেউ না!'

ভিড় বেড়ে ওঠে। মাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে জ্যান্ত মানুষের প্রাচীর—এতগুলো মানুষ—স্তব্ধ পাথর।

'মানুষ মেহনত ক'রে মরে; তার বদলে পায় কি? না—অভাব অনটন, ক্ষিদে, রোগ! চিরকেলে ধরা-বাঁধা মজুরি। সব কিছু আমাদের বিরুদ্ধে। দিনের পর দিন শেষ রক্তের ফোঁটা অবধি দিয়ে খাটি- আর থাকি আঁস্তাকুড়ে পড়ে। ওরা আমাদের বোকা মুখ্যু ক'রে রেখে দেয়। আমাদেরই মেহনতের ফল ভোগ করে অন্যে। আর আমরা গলায় শেকল-বাঁধা কুকুরের মত থাকি ওদের হাতের মুঠোয়। আমরা কিছু জানিনা, বুঝিনা—কেবল ভয়ে ভয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে থাকি। ভয় করিনে হেন জিনিষ নেই। আমাদের জীবনটা একটা আস্ত আঁধার রাত—আর কিছুই না।'

প্রাণহীন সাড়া আসে ভিড় থেকে : 'ঠিক বলেছেন।'

'দে তো মাগীর মুখ ভোঁতা ক'রে!'

মার চোখ পড়ে ভিড়ের পেছনে -সেই গোয়েন্দা আর দু'জন পুলিশ। শেষ গোছাটা তুলবার জন্য তাড়াতাড়ি হাত দেয় মা সুটকেসে। কিন্তু হাতটা আর একজনের হাতে এসে ঠেকে। ঝুঁকে প'ড়ে বলে মা :

'নাও নাও নিয়ে যাও!'

ভিড় ছত্রভঙ্গ ক'তে ক'রতে পুলিশ হাঁকে : 'এই সব হট্ যাও, হটো!' নেহাৎ অনিচ্ছায় একটু ফাঁক হয় ভিড়। কিন্তু পুলিশের চারদিকে ঘিরে আসে, এগুতে পারে না পুলিশ। ইচ্ছে ক'রে পথ বন্ধ করেনি ওরা অবশ্য। দুর্বার আকর্ষণে জনতাকে টানে ওই শুভ্রকেশা নারী আর তার স্নেহভরা মুখের বড় বড় উদার চোখ দুটি। জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন, পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন এই মানুষগুলো আজ এক হয়ে, এক রাখী-বন্ধনে বাঁধা পড়ে। গভীর অভিনিবেশে মায়ের অগ্নিময়ী বাণী শোনে। জীবনের অন্যায় অত্যাচারে ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে এদের অনেকেই এমনি দিনটির আশা-পথ চেয়ে ব'সেছিল। মায়ের কাছে যাবা ছিল, তাদের চোখগুলি যেন বিঁধে আছে, তাদের উষ্ণ নিশ্বাস লাগছে এসে মায়ের মুখে।

'স'রে যাও বুড়ী, পালাও!'

'এক্ষুণি ক্যাঁক ক'রে ধরবে এসে টুঁটি টিপে।'

'বাবাঃ কি জবরদস্ত মেয়েমানুষ!'

'তফাৎ যাও, তফাৎ যাও সব!' হাঁকতে হাঁকতে একটু একটু করে এগিয়ে আসে পুলিশ। মায়ের সামনে যারা ছিল—তারা একটু চঞ্চল হয়ে ওঠে প্রথমে, তারপর একেবারে ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে সেঁটে দাঁড়ায় সব।

মায়ের মনে হয় ওরা যেন বুঝতে চাইছে, বিশ্বাস ক'রতে চাইছে। মাও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওদের ব'লে যেতে চায় যা কিছু তার জানা আছে—যে-সমস্ত ভাবনা আদর্শের শক্তি নিজের জীবনে পরখ ক'রেছে। হৃদয়ের অন্তঃস্থল হ'তে স্বতোৎসারে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে সে-সব কথা—গান হ'য়ে উঠতে চায়। কিন্তু কণ্ঠে তো গান নেই মার! মোটা বিশ্রী ভাঙা ভাঙা গলা আছে শুধু—কণ্ঠে গান নেই ভাবতে মার কষ্ট হয়।

'যে কথা ব'লে গেছে আমার ছেলে—সে এক সাচ্চা মেহনতী মানুষের প্রাণের কথা—যে মানুষ তার আত্মাকে বিকিয়ে দেয়নি কারো পায়ে। একেবারে খাঁটি কথা। ওর এই আগুন-আগুন ভয়ডরহীন কথাগুলো শুনলেই বুঝতে পারবে।'

ভয়-আনন্দে ডগমগ এক জোড়া তরুণ চোখ মায়ের মুখে এসে স্থির হ'য়ে থাকে।

হঠাৎ বুকে চোট খেয়ে মা বেঞ্চিতে লুটিয়ে পড়ে। পুলিশের হাতগুলো জনতার মাথার ওপর দিয়ে ছুটোছুটি ক'রে বেড়ায়—কারো ঘাড়, কারো কলার, কারো চুলের মুঠি ধ'রে ধাক্কা দিয়ে এক পাশে সরিয়ে দেয়। টুপীগুলি মাথা থেকে তুলে নিয়ে দুমড়ে মুচড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় আরেক ধারে। মায়ের চোখের সামনে সব অন্ধকার...বোঁ বোঁ ক'রে ঘুরছে সব। অবসাদ ঝেড়ে ফেলে যেটুকু শক্তি বাকী ছিল, তাই দিয়ে আর একবার চীৎকার ক'রে বলে :

'এক হও, এক হও, সব মানুষ এক হ'য়ে এক বিরাট শক্তি গ'ড়ে তোল।'

একজন পুলিশ মস্ত বড় থাবাটা দিয়ে টুঁটি টিপে ধরে প্রচণ্ডভাবে মাকে ঝাঁকানি দিতে দিতে চীৎকার করে :

'চোপরাও মাগী!'

মাথাটা দেয়ালে ঠুকে যায়। ক্ষণিকের জন্য একটা ভয়ের কালো মেঘ ছেয়ে আসে। কিন্তু সেই মুহূর্তেই মেঘের বুককে শত-দীর্ণ করে হৃদয় জ্ব'লে ওঠে সহস্র-শিখায়।

পুলিশ হুঙ্কার করে :

'চল্ মাগী চল্!'

'কিছুতেই ভয় পেওনা। আর বেশী ভয়ংকর কি আছে বলতো যে অবস্থায় জীবন কাটাচ্ছ তার চাইতে...'

'কানে যাচ্ছে না! মুখ বন্ধ করলি!'

পুলিশ ওর হাত ধ'রে একটা হ্যাঁচকা টান মারে। আর একজন আর একটা হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে যায় ওকে।

'...যে অত্যাচার প্রতিদিন কলজেকে, ছাতিটাকে কুরে কুরে খাচ্ছে, তার চাইতে...!'

গোয়েন্দাটা মার মুখের সামনে মুঠি নাচাতে নাচাতে আগে আগে ছুটে যায় আর চীৎকার করে :

'চোপরাও, কুত্তী কহীঁকা!'

মায়ের চোখ বিস্ফারিত হ'য়ে ধক্‌ধক্ ক'রে জ্ব'লে ওঠে। চোয়াল কাঁপতে থাকে।

পিছল পাথুরে মেজের ওপর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে মা চীৎকার করে :

'আমাকে মারতে পারে, কিন্তু আমার আত্মাকে মারতে পারবে না ওরা—মরা নয়, আমার জীবন্ত আত্মা...'

'এই কুত্তী!'

গোয়েন্দাটা এক থাপ্পড় মারে মার মুখে। কার আক্রোশের কণ্ঠ শোনা যায়: 'খুব হয়েছে, ডাইনী বুড়ী! যেমন কুকুর তেমন মুগুর!'

চোখের সামনে লাল...কালো...দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হ'য়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত: রক্তের লবণাক্ত স্বাদে মুখ ভ'রে যায়।

আচ্ছন্ন চেতনার তটে এসে ঘা দেয় জনতার এলোমেলো উত্তেজিত চীৎকার:

'খবরদার ওর গায়ে হাত দিয়েছ তো!'

'চল হে চল!'

'শালা শয়তানের হাঁড়ি!'

'দে, দে, দে ব্যাটাকে ক'ষে!'

'আরে আমাদের মনগুলোকে তো আর জখম ক'রতে পারে না!'

মায়ের পিঠে ঘাড়ে ধাক্কা মারে; মাথায় কাঁধে. .আঘাত পড়ে...।

চীৎকার, আর্তনাদ, হুইস্‌লের শব্দ, সব মিলে এক প্রচণ্ড ঘূর্ণী ঘুরছে মার চোখের সামনে। চাপা অথচ উগ্র কি যেন একটা কানের পর্দায় গিয়ে আঘাত করে কানকে বধির ক'রে দেয়; গলা বন্ধ হ'য়ে, দম বন্ধ হ'য়ে আসে। পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যায়; হাঁটু কাঁপতে কাঁপতে অবশ হ'য়ে আসে। সারা দেহ তীব্র ব্যথায় বিষিয়ে আছে, যেন সর্বাঙ্গে বর্শার খোঁচা মেরে চলেছে কেউ। দেহটা ক্রমশ ভারী হ'য়ে উঠে অসহায় ভাবে কাঁপতে থাকে। কিন্তু চোখ তেমনি জ্যোতিষ্মান। জনতার চোখের সাথে চোখ মিলে যায়—মা দেখে ওই দুঃসাহসী চোখগুলিতে ধক্ ধক্ ক'রে আগুন জ্বলছে। এ আগুন মা চেনে—ভালোবাসে—এযে তার অন্তরের 'প্রিয়ো বৈ সঃ'।

ধাক্কা দিতে দিতে একটা দরজা দিয়ে নিয়ে যায় মাকে।

একটা হাত ছাড়িয়ে শক্ত ক'রে চৌকাঠ ধরে মা।

'রক্তের সমুদ্দুর বইয়ে দাও—তবু সত্যকে দাবাতে পারবে না!'

হাতে আঘাত করে।

'নির্বোধের দল! এমনি ক'রে শুধু মানুষের ঘৃণা কুড়ুচ্ছ। সব জমছে, এক দিন উল্টে তোমাদেরই মাথায় পড়বে সব।'

একজন পুলিশ মায়ের গলা টিপে ধরে—কেবলই মুঠি কষে—দম বন্ধ হয়ে আসে মায়ের।

'হতভাগ্যের দল...' খাবি খায় মা।

কে যেন জোরে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

॥ শেষ ॥